স্বামিজীকে যেরূপ দেখিয়াছি

ভগিনী নিবেদিতা

অনুবাদক—স্বামী মাধবানন্দ

উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা

নিবেদন

ভগিনী নিবেদিতার অমর গ্রন্থ 'The Master as I saw him'-এর স্বামী মাধবানন্দ-কৃত বঙ্গানুবাদ 'আচার্য্য শ্রীবিবেকানন্দ (যেমনটি দেখিয়াছি)' এই নামে 'উদ্বোধনের' ১৩২২, আষাঢ় হইতে ১৩২৪, চৈত্র পর্য্যন্ত সংখ্যাগুলিতে ধারাবাহিকভাবে প্রথম প্রকাশিত হয়। নানা কারণে উহা এতদিন পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই। বর্ত্তমান গ্রন্থখানি সেই অনুবাদেরই ঈষৎ সংশোধিত পুনর্মুদ্রণ। কেবল ইহার নূতন নামকরণ হইল, 'স্বামিজীকে যেরূপ দেখিয়াছি'।

৺শ্যামাপূজা
১৩৬১

প্রকাশক

সূচীপত্র

পাশ্চাত্ত্য পাঠকপাঠিকাগণের প্রতি নিবেদন ১

প্রথম পরিচ্ছেদ—লণ্ডনে, ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে ৩

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—লণ্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ –
১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে ১৮

তৃতীয় " —বিভিন্ন আদর্শের সঙ্ঘর্ষ ৩৯

চতুর্থ " —স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীরামকৃষ্ণসঙ্ঘ ... ৫৯

পঞ্চম " —উত্তরভারতে ভ্রমণ ... ৯০

ষষ্ঠ " —জীবের চৈতন্যদাতা ১০২

সপ্তম " —তত্ত্বালোকের তড়িৎপ্রকাশ ... ১১১

অষ্টম " —অমরনাথ ১২২

নবম " —ক্ষীরভবানী ১২৯

দশম " —কলিকাতা ও স্ত্রীভক্ত-পরিবার ... ১৪১

একাদশ " —শক্তিপূজা ও স্বামিজী ১৬৪

দ্বাদশ " —অর্দ্ধ পৃথিবী অতিক্রম ১৭৬

ত্রয়োদশ " —মহাপুরুষদর্শন-প্রসঙ্গে ১৮৮

চতুর্দ্দশ " —ভারতের অতীত ও ভবিষ্যৎ ... ১৯৭

পঞ্চদশ " —হিন্দুধর্ম্ম ২০৭

ষোড়শ " —পাশ্চাত্ত্যদেশে স্বামিজীর সহিত
কয়েকটী দিন ২২২

সপ্তদশ " —স্বামিজী-প্রচারিত মতসমূহের
সমষ্টিভাবে আলোচনা ২৩৪

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ—স্বামিজী বুদ্ধকে কি চক্ষে দেখিতেন … ২৫৭
ঊনবিংশ ” —ঐতিহাসিক খৃষ্টধর্ম্ম সম্বন্ধে স্বামিজী … ২৭৯
বিংশ ” —নারীজাতি ও নিম্নশ্রেণীসমূহ … ২৮৮
একবিংশ ” —পাশ্চাত্ত্য সেবাব্রতীকে শিক্ষাদান-প্রণালী . … ৩১০
দ্বাবিংশ ” —সন্ন্যাস ও গার্হস্থ্য … … ৩৩০
ত্রয়োবিংশ ” —তথাকথিত অলৌকিক দর্শনাদির সহিত আচার্য্যদেবের সম্বন্ধ … … ৩৫০
চতুর্ব্বিংশ ” —স্বামিজীর মৃত্যুসম্বন্ধীয় শিক্ষা … ৩৬৪
পঞ্চবিংশ ” —সমাধি … … ৩৮৪
ষড়্‌বিংশ ” —স্বামিজীর মহাসমাধি … … ৪০১
উপসংহার … … ৪১০

পাশ্চাত্ত্য পাঠকপাঠিকাগণের প্রতি নিবেদন

বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচারযুগের শেষ হইতে ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে যেদিন স্বামী বিবেকানন্দ গৈরিকধারী সন্ন্যাসীর বেশে চিকাগো প্রদর্শনীর অন্তর্গত ধর্ম্মমহাসভার মঞ্চে দণ্ডায়মান হন, সেদিন পর্য্যন্ত হিন্দুধর্ম্ম আপনাকে প্রচারশীল ধর্ম্ম বলিয়া ভাবে নাই। হিন্দুধর্ম্মের শিক্ষকতা-কার্য্যই যাঁহাদের বৃত্তি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট ছিল, সেই ব্রাহ্মণগণ নাগরিক ও গৃহস্থ বলিয়া হিন্দুসমাজেরই এক অঙ্গস্বরূপ ছিলেন এবং সেই হেতু সমুদ্রযাত্রাধিকার হইতেও বঞ্চিত ছিলেন। আর হিন্দুধর্ম্মান্তর্গত পরিব্রাজক সাধুগণ—যাঁহাদের মধ্যে উচ্চতম অধিকারিগণ প্রভুত্ব হিসাবে জন্মমাত্রেই ব্রাহ্মণ অপেক্ষা ততটা উচ্চে অবস্থিত, যতটা সিদ্ধপুরুষ বা অবতার পুরোহিত বা পণ্ডিত অপেক্ষা উচ্চে অবস্থিত—তাঁহারা তাঁহাদের স্বাধীনতার যে এবম্প্রকার ব্যবহার করা চলে তাহা আদৌ ভাবেন নাই। স্বামী বিবেকানন্দও চিকাগোর দুয়ারে স্বীয় বিশ্বস্ততাজ্ঞাপক কোন পরিচয়পত্র লইয়া উপস্থিত হন নাই। যেমন তিনি ভারতের এক গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ভ্রমণ করিতে পারিতেন, ঠিক তেমনি তিনি কতিপয় অনুরাগী শ্রদ্ধাবান মান্দ্রাজী শিষ্যের প্রেরণায় প্রশান্ত মহাসাগর-পারে আগমন করিয়াছিলেন। আমেরিকাবাসিগণও স্বজাতিসুলভ আতিথ্য ও সরলতাগুণে তাঁহাকে সমাদরে গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহাকে বক্তৃতা করিবার একটী সুযোগ দিলেন। বৌদ্ধপ্রচারকগণের বেলায় যেমন,

তাঁহার বেলায়ও তেমনি, একজন মহাপুরুষের শক্তিই তাঁহাকে জোর করিয়া বিদেশে প্রেরণ করিয়াছিল। তিনি এই মহাপুরুষের পাদমূলে বহু বৎসর ধরিয়া বাস করিয়া তাঁহার জীবনের সঙ্গি-স্বরূপ হইয়াছিলেন। তথাপি পাশ্চাত্ত্য দেশে তিনি কোন বিশেষ আচার্য্যের কথা কহেন নাই, কোন এক সীমাবদ্ধ সম্প্রদায়ের মত ঘোষণা করেন নাই। "হিন্দুগণের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ধারণাবলী"—ইহাই তাঁহার চিকাগো বক্তৃতার বিষয়ীভূত ছিল; এবং ইহার পরেও, যেসকল তত্ত্ব বহু অংশে বিভক্ত সনাতন হিন্দুধর্ম্মের সাধারণ সম্পত্তি এবং উহার বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক, কেবল সেইগুলিই তাঁহার বক্তৃতায় স্থান পাইত। সুতরাং ইতিহাসে এই প্রথম বার, একজন অতি উচ্চদরের মনীষাসম্পন্ন হিন্দু অন্য সকল বিষয় ছাড়িয়া হিন্দুধর্ম্মকেই বিশ্লেষণ, ও বিশ্লিষ্ট অংশগুলির সাধারণ ধর্ম্ম আবিষ্কার করিতে যত্নপর হইয়াছিলেন।

স্বামিজী ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত আমেরিকায় অবস্থান করেন, তৎপরে প্রথমবার ইউরোপে আগমন করেন। সেপ্টেম্বর মাসে তিনি ইংলণ্ডে পৌছেন এবং প্রায় একমাস পরে লণ্ডনে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন।

প্রথম পরিচ্ছেদ

লণ্ডনে, ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে

ইহা মনে করিলে আশ্চর্য্য বোধ হয়, কিন্তু ইহা নিশ্চিতই আমার সৌভাগ্য বলিতে হইবে যে, যদিও আমি আমার গুরুদেব শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতাবলী তাঁহার ১৮৯৫ ও ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দ এই উভয় বার ইংলণ্ড-আগমনকালেই শ্রবণ করিয়াছিলাম, তথাপি ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে ভারতবর্ষে আসিবার পূর্ব্বে আমি তাঁহার ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে অতি অল্পই জানিতাম; এমন কি কিছুই জানিতাম না বলিলেও চলে। সৌভাগ্য, কেন না এই পূর্ব্বপরিচয় না থাকাতেই আমি এই সুফল পাইয়াছি যে, আমি মানসনেত্রে আমার গুরুদেবকে, তাঁহার চরিত্রের স্বতঃস্ফূর্ত্তির প্রতিপদে, ভারতীয় অরণ্য, নগর ও রাজপথরূপ তাঁহারই উপযুক্ত দৃশ্যাবলীর মধ্যে অবস্থিত দেখিতে পাই—প্রাচ্য আচার্য্যকে প্রাচ্য জগতেরই মধ্যে দেখিতে পাই। এমন কি সুদূর লণ্ডনেও যখন আমি তাঁহাকে প্রথম দেখি, সে সময়, এখন যেমন আমার উহা স্মরণ করিয়া হইতেছে, সেইরূপ নিশ্চিত তাঁহার মনেও সৌরকরোদ্ভাসিত স্বদেশের রাশি রাশি স্মৃতিপরম্পরা উদয় হইয়া থাকিবে। সময়টা নভেম্বর মাসের এক রবিবারের ঠাণ্ডা বৈকাল-বেলা, এবং স্থান ওয়েষ্ট-এণ্ডের (West End) একটী বৈঠকখানা;

তিনি অর্দ্ধবৃত্তাকারে উপবিষ্ট শ্রোতৃমণ্ডলীর দিকে মুখ করিয়া এবং কক্ষের অগ্নি রাখিবার স্থানে প্রজ্বলিত অগ্নির দিকে পিছন ফিরিয়া বসিয়া ছিলেন; আর যখন তিনি প্রশ্নের পর প্রশ্নের উত্তর দিতেছিলেন, এবং মধ্যে মধ্যে তৎপ্রদত্ত উত্তরটীর উদাহরণস্বরূপ, কোন সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে সুর করিয়া আবৃত্তি করিতেছিলেন, তখন সেই গোধূলি ও অন্ধকারের সঙ্গমসময়ে তত্রত্য দৃশ্যটী তাঁহার নিকট নিশ্চয়ই ভারতীয় উদ্যানের, অথবা সূর্য্যাস্তসময়ে কূপান্তিকে বা গ্রামের উপকণ্ঠে তরুতলে উপবিষ্ট কোন সাধুর চতুষ্পার্শ্বে সমবেত শ্রোতৃবৃন্দেরই এক কৌতুককর রূপান্তর বলিয়া বোধ হইয়া থাকিবে। ইংলণ্ডে আচার্য্য হিসাবে স্বামিজীকে আমি আর কখনও এমন সাদাসিধাভাবে দেখি নাই। ইহার পরে তিনি সর্ব্বদাই বক্তৃতা দিতেন; অথবা তিনি যে-সকল প্রশ্নের উত্তর দিতেন তাহা এতদপেক্ষা অধিকসংখ্যক শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে কাহারও কাহারও কর্ত্তৃক পদ্ধতি অনুযায়ী জিজ্ঞাসিত হইত। শুধু এই প্রথমবারেই আমরা মাত্র পনর-ষোল জন অভ্যাগত ছিলাম, আমাদের মধ্যে অনেকে আবার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলাম; স্বামিজী তাঁহার গেরুয়া পোষাক ও কোমরবন্ধ পরিয়া আমাদের মধ্যে বসিয়া ছিলেন—যেন আমাদিগের নিকট কোন এক দূরদেশের বার্ত্তা বহন করিয়া আনিয়াছেন। মাঝে মাঝে এক একবার "শিব! শিব!" বলিতেছেন; উহা আমাদের নিকট কেমন নূতন নূতন ঠেকিতেছে —আর তাঁহার মুখমণ্ডলে, লোকে খুব ধ্যানপরায়ণ ব্যক্তিগণের বদনে যে মিশ্রিত কোমলতা ও মহত্ত্বের ভাব দেখিতে পায়, তাহাই লক্ষিত হইতেছিল; হয়ত উহা সেই ভাব, যাহা রাফেল

আমাদিগকে তাঁহার Sistine Child-এর* ললাটফলকে আঁকিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন।

সে অপরাহ্ণের পর আজ দশ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে, এবং সেদিনকার কথোপকথনের একটু আধটু মাত্র এখন মনে পড়িতেছে। কিন্তু তিনি আমাদিগকে সেই বিস্ময়কর প্রতীচ্য সুরসহযোগে যে-সকল সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করিয়া শুনাইয়াছিলেন তাহা কখনও ভুলিবার নহে; উহা আমাদের গীর্জাসমূহে প্রচলিত গ্রিগরি প্রবর্ত্তিত † সুরের কথা এত মনে পড়াইয়া দেয়, অথচ উহা হইতে কত ভিন্ন!

তাঁহার নিজের সম্বন্ধে কেহ কোন প্রশ্ন করিলে তিনি উহার উত্তর দিতে খুব ইচ্ছুক ছিলেন, এবং একটী প্রশ্নের উত্তরে বুঝাইয়া দিলেন, তাঁহার পাশ্চাত্ত্য আগমনের কারণ এই যে, (তিনি বিশ্বাস করেন, জাতিসমূহের মধ্যে, বর্ত্তমানে পণ্যদ্রব্যের বিনিময়ের ন্যায়, পরস্পর আদর্শ-বিনিময়েরও সময় আসিয়াছে।) এই সময় হইতে বরাবর কথাবার্ত্তা বেশ সহজভাবে চলিয়াছিল। তিনি প্রাচ্য "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"-রূপ অদ্বৈতবাদের ব্যাখ্যা করিতেছিলেন, এবং তৎপ্রসঙ্গে বিবিধ ইন্দ্রিয়জ্ঞানগুলিকে সেই এক অদ্বিতীয় বস্তুরই বিভিন্ন বিকাশ বলিয়া বর্ণনা করিয়া গীতা হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিলেন এবং অনুবাদ করিয়া দিলেন—"ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে

---

* এই বিখ্যাত চিত্রখানির মধ্যস্থলে শিশু ঈশা ও তাঁহার জননী মেরীর জ্যোতির্ম্মণ্ডিত মূর্ত্তি, বামে সেণ্ট সেক্টাসের, দক্ষিণে সেণ্ট বার্ব্বারার, এবং নিম্নে দুইটী দেবশিশুর মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে। ইহা এখন ড্রেসডেনে।

† পোপ প্রথম গ্রিগরি—ইনি খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।

মণিগণা ইব”—সূত্রে যেমন বহু মণি গাঁথা থাকে, সেইরূপ আমাতেও এইসমস্ত রহিয়াছে।

তিনি আমাদিগকে বলিলেন যে, (খৃষ্টধর্ম্মের ন্যায় হিন্দুধর্ম্মেও প্রেমই ধর্ম্মভাবের পরাকাষ্ঠা বলিয়া স্বীকৃত হয়।)

তিনি আমাদিগকে আরও বলিলেন যে, হিন্দুগণ শরীর মন উভয়কেই আত্মানামক এক তৃতীয় পদার্থ দ্বারা চালিত ও নিয়ন্ত্রিত বলিয়া জ্ঞান করেন। এটী আমার খুব মনে লাগিয়াছিল; এবং ইহারই বলে আমি পরবর্ত্তী শীতঋতুতে সম্পূর্ণ নূতন প্রণালীতে জগৎকে দৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম।

তিনি বৌদ্ধধর্ম্ম ও হিন্দুধর্ম্মের পার্থক্য বর্ণনা করিতেছিলেন, এবং আমার মনে আছে, তিনি শান্তভাবে এই কথা কয়টি বলিয়াছিলেন, “বৌদ্ধগণ ইন্দ্রিয়জনিত জ্ঞানকেই সত্য বলিয়া মানিয়া লইয়াছিলেন।”

সুতরাং এই হিসাবে বৌদ্ধধর্ম্ম আধুনিক অজ্ঞেয়বাদের (Agnosticismএর) সম্পূর্ণ বিপরীতমতাবলম্বী ছিল; বরং, ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞান মনেরই খেয়ালমাত্র, সুতরাং অনুমানও তাহাই, এইরূপ সন্দেহ অজ্ঞেয়বাদের মূলমন্ত্র বলিয়া উহা অনেকটা হিন্দুধর্ম্মেরই সদৃশ হইল।

আমার মনে আছে, তিনি বিশ্বাস (faith) শব্দটীতে আপত্তি প্রকাশ করেন, এবং তৎপরিবর্ত্তে দর্শন (realisation) কথাটী ব্যবহার করিবার জন্য বিশেষ আগ্রহান্বিত হন। সম্প্রদায় সম্বন্ধে বলিতে বলিতে তিনি একটী ভারতীয় প্রবাদ উদ্ধৃত করিলেন—(“কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে জন্মান ভাল, কিন্তু উহাতেই নিবদ্ধ থাকিয়া মরা অতি ভয়ঙ্কর।”)

আমার মনে হয় যে, পুনর্জ্জন্মবাদও সম্ভবতঃ এই কথাপ্রসঙ্গেই

আলোচিত হইয়াছিল। বোধ হয়, তিনি কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞান—এই তিনটীকে আত্মার তিনটী পথ বলিয়া উল্লেখ করেন। আমার বেশ মনে আছে, তিনি কিছুক্ষণ ধরিয়া মানবের অনন্ত শক্তি সম্বন্ধে কথা কহিতে থাকেন। তিনি আরও বলেন যে, সকল ধর্ম্মের একমাত্র শিক্ষা এই—"ত্যাগ কর, ত্যাগ কর।"

ভারতবর্ষে উচ্চতম ধর্ম্মের সহিত পুরোহিত এবং মন্দিরাদির কোনও সম্পর্ক নাই—এই ভাবের দুই-একটী কথাও হইয়াছিল; তিনি ইহাও বলিয়াছিলেন যে, স্বর্গকামনা তাঁহার দেশে খুব ধার্ম্মিক লোকদের নিকট "কতকটা নীচু থাকের জিনিস" বলিয়া বিবেচিত হয়।

আত্মার মুক্তস্বভাবরূপ আদর্শটীর তিনি নিশ্চয়ই উল্লেখ করিয়া থাকিবেন; পাশ্চাত্ত্যে, নরসেবাই মানব-জীবনের উদ্দেশ্য বলিয়া আমাদের যে ধারণা আছে, তাহার সহিত তাঁহার মতের কিছু আপাতবিরোধও ঘটিয়াছিল। কারণ, আমার স্পষ্ট মনে আছে যে, তিনি সেদিন অপরাহ্ণে 'society' (সমাজ) শব্দটী এমন এক অর্থে ব্যবহার করিয়াছিলেন যাহা আমি কখনও ঠিক ঠিক বুঝিতে পারিয়াছি কিনা বলিতে পারি না। আমার যতদূর মনে হয়, তিনি পূর্ব্বোক্ত আদর্শটীর উল্লেখ করিয়াই আমাদের সম্ভাবিত আপত্তিগুলি আপনা হইতেই উত্থাপন করিলেন, এবং বলিলেন, "তোমরা বলিবে যে, ইহাতে societyর (সমাজের) কোন উপকার হয় না। কিন্তু এই আপত্তি গ্রাহ্য হইবার পূর্ব্বে তোমাদিগকে প্রথমে দেখাইতে হইবে যে, societyর (সমাজের) স্থায়িত্ব জিনিসটী স্বয়ং একটী উদ্দেশ্য বা সাধ্যস্বরূপ।"

সে সময় আমি মনে করিয়াছিলাম, তিনি society (সমাজ) শব্দে সমগ্র মানবজাতিকেই (humanity) উল্লেখ করিতেছেন, এবং ভাবিয়াছিলাম, বিচার করিয়া দেখিলে জগৎ নশ্বর, সুতরাং তাহার উপকারার্থ যাহা করা যায় তাহাও নশ্বর—তিনি এই মতই প্রচার করিতেছেন। এই অর্থই তাঁহার অভিপ্রেত ছিল কি? তাহাই যদি হয়, তবে নরসেবাই যে চিরকাল তাঁহার সমগ্র জীবনব্রত ছিল, তাহার সহিত এই মতের সামঞ্জস্য হয় কিরূপে? অথবা, তিনি শুধু একটী ভাবমাত্রেরই বর্ণনা করিতেছিলেন, এবং নিজে সরিয়া দাঁড়াইয়া ঐ ভাবটীকে যতদূর সম্ভব সমর্থন করিতেছিলেন? অথবা, তাঁহার 'society' শব্দটা শুধু সেই অদ্ভুত প্রাচ্যদেশীয় 'সমাজ' শব্দটীর একটী ভ্রান্ত অনুবাদ মাত্র? প্রাচ্যে সমাজ বলিলেই তৎসঙ্গে ঈশতন্ত্রশাসনের * কিছু কিছু বুঝাইয়া যায়, এবং অন্য নানাভাবের সঙ্গে আমাদের দেশে church বা যাজকসম্প্রদায়ের শাসন সম্বন্ধে যে ধারণা আছে, তাহাও ইহার অন্তর্ভুক্ত।

পরিব্রাজক আচার্য্য হিসাবে তাঁহার নিজের পদমর্য্যাদা কি, এই প্রশ্নেরও তিনি কিঞ্চিৎ আলোচনা করেন, এবং ধর্ম্মসঙ্ঘ-বিষয়ে, অথবা, একজনের কথায় বলিতে গেলে, "যে ধর্ম্মমতের পরিণতি সম্প্রদায়ে, তৎসম্বন্ধে" ভারতবাসিগণের আস্থার অভাব, এই কথা জ্ঞাপন করেন। তিনি বলিলেন, "আমাদের বিশ্বাস, সঙ্ঘ হইতে চিরকালই নূতন উৎপাতের সৃষ্টি হইয়া থাকে।"

* ঈশতন্ত্রশাসন (Theocracy)—যে রাজ্য সাক্ষাৎ ঈশ্বর বা তৎপ্রতিনিধি যাজকগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত হয়। এ মতে রাজ্যের আইনগুলি মানবকৃত নহে, সাক্ষাৎ ঈশ্বরাদেশ।

তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করিলেন যে, তৎকালে পাশ্চাত্ত্যে বহুলপ্রচলিত কতিপয় ধর্ম্মসম্প্রদায় কাঞ্চনাসক্তিবশতঃ অচিরেই বিনষ্ট হইবে। তিনি আরও ঘোষণা করিলেন যে, মানুষ ভ্রম হইতে ভ্রমে অগ্রসর হয় না, সত্য হইতে সত্যেই অগ্রসর হইয়া থাকে।

বাস্তবিক, এই মূল সত্যটীকেই তিনি সর্ব্বদা নানাভাবে প্রচার করিতেন যে, সকল ধর্ম্মই সমভাবে সত্য, এবং আমাদের পক্ষে কোন অবতারেরই বিরুদ্ধ সমালোচনা করা অসম্ভব, কারণ তাঁহারা সকলেই সেই এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মেরই প্রকাশমাত্র। এই স্থলে তিনি গীতার সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শ্লোক উদ্ধৃত করেন—

"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানম্ সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"

—যখনই ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই আমি আপনাকে সৃষ্টি করি। সাধুগণের পরিত্রাণ, দুষ্কৃতকারিগণের বিনাশ এবং ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।

আমরা যে কয়জন এই 'হিন্দু যোগীকে' (তৎকালে লণ্ডনে তিনি ঐ নামেই অভিহিত হইতেন) দেখিতে আসিয়াছিলাম, আমাদের মধ্যে কেহই তেমন ধর্ম্মে আস্থাবান বা বিশ্বাসপ্রবণ ছিলেন না। বিশ্রুতকুলোদ্ভবা যে পলিতকেশা রমণী স্বামিজীর বাম পার্শ্বে বসিয়া ছিলেন এবং অগ্রণী হইয়া তাঁহাকে সুমার্জ্জিত শিষ্টাচারের সহিত প্রশ্ন করিতেছিলেন, তিনিই বোধ হয় ধর্ম্মবিশ্বাসের ব্যাপারে আমাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা কম উদারভাবাপন্না ছিলেন, এবং তিনি

ফ্রেডারিক ডেনিসন মরিসের বন্ধু ও শিষ্যা ছিলেন। আমরা যে মহিলার গৃহে অতিথি হইয়াছিলাম তিনি এবং অপর দুই-এক জন, আজকালকার যে-সকল সম্প্রদায় মনস্তত্ত্বকে স্পিরিচুয়ালিজমরূপ আর এক রাজ্যে লইয়া গিয়া উহাকেই ধর্ম্মবিশ্বাসের কেন্দ্রস্বরূপে অবলম্বন করেন, তাঁহাদেরই গতিবিধি সাগ্রহে লক্ষ্য করিতেন। কিন্তু আমার মনে হয়, আমরা সহজে কোন ধর্ম্মমতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে চাহিতাম না বলিয়া, এবং মোটের উপর ধর্ম্মপ্রচার ব্যাপারটাতেই যে কিছু সত্য থাকিতে পারে এই বিষয়টী আমাদিগকে সহজে কেহ বুঝাইয়া দিতে পারিবে না বলিয়াই, সেদিন অপরাহ্ণে আমাদের মধ্যে অনেককে বাছিয়া বাছিয়া নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল।

সেদিনকার নিমন্ত্রণ হইতে বাড়ী ফিরিবার সময় আমরা বক্তা মহোদয় সম্বন্ধে যেরূপ গর্ব্ব ও উদাসীনতার সহিত নিজ নিজ অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলাম, আমার এখন মনে হয় যে, অবিবেচনাপ্রসূত অনুরাগের হস্ত হইতে বিচারবুদ্ধিকে সর্ব্বদা বাঁচাইয়া রাখিবার প্রয়োজনবশতঃ যে অভ্যাস দাঁড়াইয়া গিয়াছে, তাহাই ইহার একমাত্র ওজরস্বরূপে বলা যাইতে পারে। বিদায় লইবার পূর্ব্বে গৃহস্বামী ও গৃহস্বামিনীর সহিত কথা কহিতে কহিতে আমরা এক এক করিয়া অভিযোগ করিলাম, "ইহা নূতন কথা নহে"—এইসব কথা পূর্ব্বে কেহ না কেহ বলিয়াছে।

কিন্তু আমার নিজের কথা বলিতে গেলে বলিতে হইবে যে, সেই সপ্তাহের নির্দ্দিষ্ট কাজগুলি করিয়া যাইতে যাইতে ধীরে ধীরে আমার মনে হইল যে, এক অপরিচিত দেশের শিক্ষাদীক্ষার মধ্যে পুষ্ট,

একজন নূতন রকমের চিন্তাশীল ব্যক্তি যে বার্ত্তা বহন করিয়া আনিয়াছেন তাহা এইরূপে উড়াইয়া দেওয়া শুধু যে অনুদারতার পরিচায়ক, তাহাই নহে, অধিকন্তু উহা অন্যায়। আমি বুঝিতে পারিলাম যে, তৎকথিত প্রত্যেক মতটীর প্রতিধ্বনি বা তাহারই মত আর একটী মত ইতিপূর্ব্বে শুনিয়া বা ভাবিয়া থাকিতে পারি, কিন্তু ইহার পূর্ব্বে আমার ভাগ্যে এমন কোন চিন্তাশীল ব্যক্তির দর্শনলাভ ঘটে নাই, যিনি সামান্য একঘণ্টা সময়ের মধ্যে, আমি এতাবৎকাল যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ ও উৎকৃষ্ট বলিয়া জানিতাম, সে-সমস্তই প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সুতরাং স্বামিজী লণ্ডনে থাকিতে থাকিতে, তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার যে দুইটীমাত্র সুযোগ মিলিয়াছিল, আমি তাহারই সদ্ব্যবহার করিয়াছিলাম।

অতি উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত আমাদের মনে যে ভাবের উদ্দীপনা করিয়া দেয়, তাহা বার বার শ্রবণ দ্বারা পুষ্ট ও ঘনীভূত হয়। সেই-রূপ, সেই দুইটী বক্তৃতার লিপিবদ্ধ সারাংশ এখন পড়িতে পড়িতে, উহারা আমার নিকট তখনকার অপেক্ষা অনেক অধিক বিস্ময়কর বলিয়া বোধ হইতেছে। কারণ, আচার্য্যদেবের কথাগুলি তখন আমি যেভাবে গ্রহণ করিতাম, তাহাতে এমন একটা অন্ধত্বের ভাব ছিল যে, তজ্জন্য আমার কোন অনুশোচনাই পর্য্যাপ্ত হইবে না। যখন তিনি বলিতেছিলেন, "জগৎ মাকড়সার জালের মত, আর মনগুলি সব মাকড়সা ; কারণ, মন এক, আবার বহু"— তখন তিনি আমার দুর্ব্বোধ্য ভাষায় কথা কহিতেছিলেন। তিনি যাহা যাহা বলিলেন আমি লিখিয়া লইলাম, উহা আমার নিকট ভাল লাগিল, কিন্তু আমি তৎসম্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ করিতে পারিলাম না—মানিয়া লওয়া

ত দূরের কথা। তাঁহার উপদেশাবলী আমি কিভাবে গ্রহণ করিতাম, ইহাই তাহার মোটামুটি স্বরূপবর্ণন ; পর বৎসরেও (তখন আমি তাঁহার একবারকার সমস্ত বক্তৃতা শুনিয়াছি), শুধু তাহাই বা কেন, যেদিন আমি ভারতবর্ষে প্রথম পদার্পণ করি, সম্ভবতঃ সেইদিন পর্য্যন্ত, আমার এইরূপ ভাবই বিদ্যমান ছিল।

স্বামিজীর উপদেশে এমন কতকগুলি বিষয় ছিল যাহার সত্যতা লোকের শ্রবণমাত্রই বোধগম্য হইত। কোন ধর্ম্মই, সচরাচর উহা-দিগকে যেভাবে সত্য বলিয়া দাবি করা হয়, সেভাবে সত্য না হইলেও সকল ধর্ম্মই যে এক হিসাবে বাস্তবিক সমভাবে সত্য— এই মতটীতে আমাদের মধ্যে কেহ কেহ তৎক্ষণাৎ সায় দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। যখন তিনি বলিলেন যে, ঈশ্বর প্রকৃতপক্ষে নিরাকার হইলেও, ইন্দ্রিয়রূপ কুহেলিকার মধ্য দিয়া দৃষ্টি করাতেই তাঁহাকে সাকার বলিয়া বোধ হয়, তখন আমরা ভাবটীর সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ ও স্তম্ভিত হইলাম। যখন তিনি বলিলেন যে, যে ভাববশে কোন কার্য্য করা যায়, তাহা ঐ কার্য্য অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী ; অথবা যখন তিনি নিরামিষ-ভোজনের প্রশংসা করিলেন, তখন আমরা ভাবি-লাম, হাঁ, এই দুইটী বিষয় পরীক্ষা করিয়া দেখা যাইতে পারে। কিন্তু আমার নিজের কথা বলিতে গেলে, সমষ্টিভাবে তাঁহার ধর্ম্ম-মতগুলিকে আমি সন্দেহের চক্ষেই দেখিতে লাগিলাম। জগতের কতকগুলি ধর্ম্মমত এইরূপ যে, লোকে উহাদিগকে প্রথমটা মানিয়া লয় বটে, কিন্তু শেষে নিশ্চিতই উহাদের গণ্ডী ছাড়াইয়া যায় এবং উহাদিগকে পরিত্যাগ করে ; আমার মনে হইল, স্বামিজীর ধর্ম্মমত-গুলিও সেই প্রকারের। আর এইরূপ মতপরিবর্ত্তনে কতটা যন্ত্রণা

ও আত্মগ্লানি উপস্থিত হয়, তাহা ভাবিলে আর কেহ ওপথে অগ্রসর হইতে চাহে না।

গ্রন্থের প্রারম্ভেই সকল কথা খুলিয়া বলা কঠিন। স্বামিজীর ইংলণ্ড পরিত্যাগের পূর্ব্বেই এমন দিন আসিয়াছিল, যখন আমি তাঁহাকে 'গুরুদেব' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলাম। ইনি যে বীরোচিত উপাদানে গঠিত ছিলেন, তাহা আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম, এবং তাঁহার স্বজাতিপ্রেমের নিকট আমি সম্পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলাম। কিন্তু এই যে আমার আনুগত্য-স্বীকার, ইহা শুধু তাঁহার চরিত্রের নিকটেই। ধর্ম্মোপদেষ্টা হিসাবে, আমি দেখিলাম যে, তাঁহার জগৎকে দিবার জন্য একটী স্বতন্ত্র মতবাদ আছে বটে, কিন্তু যদি তিনি দেখেন যে, সত্য উহাতে না থাকিয়া অন্য কিছুতে আছে, তাহা হইলে তিনি এক মুহূর্ত্তের জন্য ঐ মতান্তর্গত কোন কিছুই সমর্থন করিবেন না। আর, এইটী ধরিতে পারায় যতটা বুঝায়, ততটাই আমি তাঁহার শিষ্য হইয়াছিলাম। বাকী যাহা কিছু, তজ্জন্য আমি তাঁহার উপদেশাবলী উত্তমরূপে আলোচনা করিয়া বুঝিতে পারিলাম যে, উহার কোন অংশে অসংলগ্নতা নাই; কিন্তু তাঁহার প্রতিপাদ্য বিষয়গুলিকে হাতে-কলমে প্রমাণিত না করা পর্য্যন্ত আমি উহাদের চরম সত্যতার নিকট আত্মসমর্পণ করি নাই। আর, তাঁহার চরিত্রমাহাত্ম্যে অতীব মুগ্ধ হইলেও, আমি সে সময় তাঁহার, এবং আমার জানিত যে-কোন চিন্তাশীল বা প্রতিভাশালী ব্যক্তির চরিত্রবিকাশের মধ্যে যে বিপুল পার্থক্য আমি পরে দেখিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম, তাহা স্বপ্নেও কল্পনা করিতে পারি নাই।

ক্লাসের অপর সকলে আমার এই সন্দেহের ভাব বিশেষভাবেই জানিতেন, এবং অপেক্ষাকৃত ভাগ্যবান একজন শিষ্য বহু পরে স্বামিজীর সমক্ষে এই বিষয় লইয়া আমাকে খোঁটা দিতেছিলেন, এবং বলিতেছিলেন যে, তিনি স্বামিজীর মুখে যাহা যাহা শুনিয়াছেন, তৎ-সমস্তই মানিয়া লইতে সমর্থ হইয়াছেন। স্বামিজী সে সময় এই কথা-বার্ত্তায় কোন মনোযোগ দিলেন না বলিলেই হয়, কিন্তু পরে যখন লোকজন কেহ ছিল না, এমন একটী সুযোগ পাইয়া বলিলেন, "কেহ যেন এই বলিয়া দুঃখ না করেন যে, তাঁহাকে বুঝাইবার জন্য অপর কাহাকেও বিলক্ষণ কষ্ট স্বীকার করিতে হইয়াছিল! আমি আমাব গুরুদেবের সহিত দীর্ঘ ছয় বৎসরকাল ধ্বস্তাধ্বস্তি করিয়াছিলাম; ফলে এই হইয়াছে যে, আমি রাস্তার কোথায় কি আছে, তাহা তন্ন তন্ন করিয়া জানি, এতটুকুও আমার অজ্ঞাত নাই।"

এই প্রথম কথাবার্ত্তাগুলির মধ্যে দুই-একটী বিষয় স্মৃতিপটে স্পষ্টভাবে জাগরূক রহিয়াছে। এককালে আমি খৃষ্টধর্ম্ম বলিতে ঈশ্বরকে পিতাজ্ঞানে উপলব্ধি করাই বুঝিতাম। কিন্তু বহুকাল যাবৎ আমি এইভাবের উপাসনায় বিশ্বাস হারানর জন্য দুঃখিত ছিলাম, এবং ইহার বাস্তব সত্যতা বা অসত্যতার দিকে না দেখিয়া, শুধু ধারণা বা কল্পনা হিসাবে ইহার মূল্য কি, তাহা ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম। কারণ, আমার একটু একটু মনে হইয়াছিল যে, যাঁহারা এইরূপ ধারণা করিবেন, তাঁহাদের চরিত্রের, এবং সম্ভবতঃ তাঁহাদের সত্যতারও উপরে এই ধারণা স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিবে। কিন্তু তুলনা করিবার উপাদানের অভাববশতঃ এই বিষয়টীকে আমি খুব বেশী দূর অনুধাবন করিতে পারি নাই। আর, কি

আশ্চর্য্য, আমি এমন একজন লোক পাইলাম, যিনি পাঁচ-পাঁচটী উপাসনা-প্রণালীর কথা বলিলেন, যাহাতে ঈশ্বরকে এইরূপে ব্যক্তিভাবে ধারণা করা হইয়া থাকে! তিনি এমন একটী ধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন, ধর্ম্মভাবগুলিকে শ্রেণীবিভাগ করাই যাহার প্রথম সোপান!

তারপর, আমি কতকগুলি ভারতীয় ভাবের নূতনত্ব ও গাম্ভীর্য্যে অতীব মুগ্ধ হইলাম—উহাদিগের সহিত আমার এই প্রথম পরিচয়। এইসকল রূপকের এবং চিন্তাপ্রণালীর নূতনত্বহেতুই আমি উহাদিগকে সম্পদ বলিয়া জ্ঞান করিতে লাগিলাম। দৃষ্টান্তস্বরূপ সেই সাধুর গল্পটী ধরুন, যিনি চোরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ, সে ধরা পড়িয়াছে ভাবিয়া ভয়ে যে-সকল বাসন ফেলিয়া পলাইতেছিল, সেই-সব লইয়া ছুটিয়াছিলেন এবং সেগুলি তাহার পাদমূলে রাখিয়া সজলনয়নে বলিয়াছিলেন, "প্রভু! আমি জানিতাম না আপনি ওখানে ছিলেন! এগুলি গ্রহণ করুন, এগুলি আপনার! সন্তানের অপরাধ মার্জ্জনা করুন!" আবার সেই সাধুটীরই সম্বন্ধে আমরা আর একটী গল্প শুনিলাম—কিরূপে তিনি গোখুরা সর্পের দংশন হইতে নিশাগমে আরোগ্যলাভ করিয়া এই বলিয়া উহার বর্ণনা করিয়াছিলেন, "প্রিয়তমের নিকট হইতে আমার নিকট একটী দূত আসিয়াছিল।" তারপর, মরুভূমিতে মরীচিকাদর্শনে স্বামিজীর নিজের যে জগৎসম্বন্ধীয় অনুমান তাহার কথা ধরুন। পনর দিন ধরিয়া তিনি উহা দেখিয়াছিলেন এবং সর্ব্বক্ষণই উহাকে জল বলিয়া ভ্রম করিয়াছিলেন। কিন্তু একদিন তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া উহাকে মিথ্যা বলিয়া জানিতে পারিয়াছেন বলিয়া, এখন তিনি উহাকে আবার পনর দিন ধরিয়া দেখিতে পারেন, কিন্তু উহাকে বরাবর মিথ্যা বলিয়াই জানিবেন। যে

উপলব্ধির ফলে তিনি এই অপূর্ব্ব জ্ঞানলাভ করিতে পারিয়াছিলেন, এবং যে দর্শনের বলে তিনি এই মরুভূমির মধ্য দিয়া যাত্রা ও জীবন —এই দুয়ের মধ্যে কথঞ্চিৎ সাদৃশ্য আবিষ্কার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, শুধু ইহাদিগকে বুঝিতে পারিলেই যথেষ্ট শিক্ষা হইল না কি ?

কিন্তু স্বামিজীর উপদেশগুলিতে এই দুইটী ছাড়াও আর একটী জিনিস ছিল, যাহা অপ্রত্যাশিত বলিয়া আমার কিঞ্চিৎ বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিল। অন্যান্য কতিপয় উচ্চ উচ্চ ভাব-ব্যাখ্যাতা, যাঁহাদিগকে আমি ধর্ম্মমন্দিরেও বক্তৃতা করিতে শুনিয়াছিলাম, তাঁহাদিগের ন্যায় ইনি যে শুধু বক্তামাত্রই নহেন, তাহা আমার বুঝিতে বিলম্ব হইল না। ধনাঢ্য ও অলস উচ্চশ্রেণীর লোকদের তৃপ্তির জন্য কবিতা ও তর্কযুক্তির সৌখীন ভোজ্যসামগ্রী তাঁহাদের সম্মুখে ধরিয়া দেওয়া তাঁহার আদৌ অভিপ্রেত ছিল না। সামান্য একজন খৃষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচারক অথবা 'মুক্তিফৌজের' কর্ম্মচারী যেমন জগৎ-বাসিগণকে ভগবানের রাজ্যে প্রবেশ করিবার জন্য আহ্বান করেন, তিনিও, অন্ততঃ তাঁহার নিজের মনে, ঠিক সেইরূপই একজন ধর্ম্ম-প্রচারক—সকল নরনারীকে ধর্ম্মের নামে আহ্বান করিতেছেন। তথাপি তিনি আমাদের মধ্যে যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ ও উৎকৃষ্ট, তাহারই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতেন। আমি তাঁহার 'পাপ একটা দুঃস্বপ্ন মাত্র,' এই ঘোষণার কথা বলিতেছি না। আমি জানিতাম যে, এরূপ মতবাদ কোন জটিল ধর্ম্মতত্ত্ব-ব্যাখ্যার অঙ্গমাত্র হইতে পারে, এবং জানিতাম যে, 'কেহ আমাদিগের জামা চুরি করিলে তাহাকে আলখাল্লাটীও দিয়া দেওয়া উচিত,' এই মতটী

আমাদিগের নিকট যতটুকু সত্য, বাস্তব জগতে পূর্ব্বোক্ত মতটী উহার ব্যাখ্যাতার নিকট তদপেক্ষা একচুলও অধিক সত্য নহে। তাহার একটী দৃষ্টান্ত আমার নিকট অতীব বিস্ময়কর বলিয়া বোধ হইয়াছিল। তাঁহার শ্রোতৃগণের মধ্যে অধিকাংশই সম্ভ্রান্তবংশীয়া অল্পবয়স্কা জননী ছিলেন; রাস্তায় সহসা তাঁহদিগের সম্মুখে একটা বাঘ আসিলে তাঁহারা কিরূপ ভীত হইয়া পলায়নপর হইবেন, তিনি এই কথা বলিতেছিলেন। হঠাৎ কণ্ঠস্বর পরিবর্ত্তন করিয়া বলিলেন, "কিন্তু মনে কর, একটী কচি ছেলে বাঘটার সম্মুখে পড়িয়াছে; তখন তোমরা কোথায় স্থান গ্রহণ করিবে বল দেখি? বাঘের মুখে—তোমাদের প্রত্যেকেই—আমি ঠিক জানি!"

সুতরাং সেইবার শীতকালে স্বামিজীর ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিয়া আমেরিকা গমন করিবার পর, তাঁহার সম্বন্ধে আমি কয়েকটী কথা স্মরণ এবং চিন্তা করিতাম—প্রথমতঃ, তাঁহার উদার ধর্ম্মবিষয়ক শিক্ষাদীক্ষা; দ্বিতীয়তঃ, তিনি আমাদিগকে যেসকল ভাব দিয়াছেন তাহার যুক্তিপ্রণালীর অপূর্ব্ব নূতনত্ব ও মনোহারিত্ব; তৃতীয়তঃ, তাঁহার এই আহ্বান যে মানব প্রকৃতিতে যাহা কিছু সর্ব্বাপেক্ষা সবল ও সুন্দর তাহারই প্রতি প্রযুক্ত হইয়াছিল, আদৌ উহার নীচ ভাবগুলির প্রতি নহে, এই বিষয়টী।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

লণ্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ—১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে

পর বৎসর এপ্রিল মাসে স্বামিজী লণ্ডনে প্রত্যাগমন করিলেন এবং সেণ্ট জর্জ্জেস্ রোডের যে বাড়ীতে তিনি তাঁহার সদাশয় বন্ধু মিঃ ই. টি. স্টার্ডির সহিত বাস করিতেছিলেন তথায়, ও পুনরায় গ্রীষ্মাবকাশের পর ভিক্টোরিয়া স্ট্রীটের সন্নিকটে এক বৃহৎ ক্লাশ-অধিবেশন-গৃহে ক্রমাগত শিক্ষা দিতে লাগিলেন। জুলাই, আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে তিনি তাঁহার বন্ধু মিঃ ও মিসেস্ সেভিয়ার ও মিস্ এইচ্. এফ. মুলারের সহিত ফ্রান্স, জর্মানী ও সুইজর্লণ্ডে ভ্রমণ করিলেন। ডিসেম্বর মাসে তিনি কতিপয় শিষ্যসমভিব্যাহারে রোম হইয়া ভারত যাত্রা করিলেন এবং ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ১৫ই জানুয়ারী তারিখে সিংহলান্তর্গত কলম্বোয় উপস্থিত হইলেন।

তাঁহার ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে প্রদত্ত বক্তৃতাগুলির অধিকাংশ পরে প্রকাশিত হইয়াছে। তৎপাঠে সমগ্র জগদ্বাসী, তাঁহার জগৎকে কি দিবার ছিল এবং কিরূপে তিনি উহা সকলের বোধগম্য হয় এমন ভাবে ব্যখা করিয়াছিলেন, তাহা অবগত হইতে পারেন। সর্ব্বভূতে ব্রহ্মদর্শনরূপ হিন্দুগণের যে বিশ্বাস, তিনি আমাদের নিকট তাহারই প্রচারকরূপে আসিয়াছিলেন এবং তৎপ্রচারিত ধর্ম্ম সত্য কিনা তাহা তিনি আমাদিগের সকলকে নিজে নিজে পরীক্ষা করিয়া

লইবার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন। তখনই বা কি, আর পরেই বা কি, আমি তাঁহাকে কখনও তাঁহার শ্রোতৃবর্গের নিকট কোন বিশেষ আকারপ্রাপ্ত ধর্ম্মের পক্ষসমর্থন করিতে শুনি নাই। তাঁহার বক্তব্য বিষয়গুলির উদাহরণস্বরূপে তিনি অসঙ্কোচে ভারতীয় সম্প্রদায়-গুলির (sects)—উহাদিগকে সম্প্রদায় না বলিয়া ধর্ম্মমত (churches) বলিলেই ভাল হয়—উল্লেখ করিতেন বটে, কিন্তু ভারতীয় চিন্তা-প্রণালীতে যে দর্শনসকল ধর্ম্মমতেরই ভিত্তিস্থানীয়, তদ্ভিন্ন তিনি অপর কিছুই কখনও প্রচার করেন নাই। বেদ, উপনিষদ্ ও ভগবদ্গীতা ব্যতীত তিনি অপর কোন গ্রন্থ হইতে কোন কিছু উদ্ধৃত করিতেন না। সাধারণসমক্ষে তিনি কদাপি তাঁহার গুরুদেবের উল্লেখ করেন নাই, অথবা হিন্দুগণের মধ্যে প্রচলিত পৌরাণিক আখ্যানসমূহের অংশবিশেষ সম্বন্ধে কোন সুস্পষ্ট মতামতও প্রকাশ করেন নাই।

তিনি গভীরভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন যে, আধুনিক বিজ্ঞানের আবিষ্কারগুলিকে সাদরে নিজ অঙ্গভুক্ত করিয়া লইবার জন্য এবং (সমগ্র জগৎ এক সূত্রে গ্রথিত হইলে তাহার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ স্থানবিশেষে আবদ্ধ পৌরাণিক আখ্যানসমূহের যে ধ্বংস, তাহার পরেও বাঁচিয়া থাকিবার জন্য পাশ্চাত্ত্য ধর্ম্মভাবকে ভারতীয় চিন্তার সাহায্য লইতে হইবে। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, ধর্ম্মমতকে শুধু এমন এক আকার প্রদান করিতে হইবে যে, উহা যেন সত্যকে কিছুমাত্র ভয় না করিয়া যাঁহারা উক্ত পথাবলম্বী তাঁহাদিগকে স্ববশে রাখিতে সমর্থ হয়। তাঁহার এক বক্তৃতায় তিনি আবেগভরে বলিতেছেন, "বিচারমূলক ধর্ম্মের উপরই ইউরোপের মুক্তি নির্ভর করিতেছে।") আবার তিনি বহুবার বলিয়াছেন, "জড়বাদী ঠিকই

বলিতেছেন যে, একটী বই বস্তু নাই। শুধু তিনি সেই অদ্বিতীয় বস্তুকে জড়নামে অভিহিত করিতেছেন, আর আমি উহাকেই ঈশ্বর বলিতেছি।" আর এক স্থলে তিনি বিস্তৃতভাবে ধর্ম্মভাবের পুষ্টি ও উহার বিভিন্ন আকারগুলির মধ্যে পরস্পর কি সম্বন্ধ, এই বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, "প্রথমে লক্ষ্যবস্তু বহু দূরে, জড়প্রকৃতির বহির্দ্দেশে এবং উহা হইতে বহু অন্তরে থাকিয়া আমাদিগকে স্বাভিমুখে আকর্ষণ করে। লক্ষ্যবস্তুকে ক্রমশঃ নিকটে আনিতে হয়, কিন্তু উহাকে হীন বা নিকৃষ্ট করিয়া নহে; নিকটতর হইতে হইতে স্বর্গস্থ ঈশ্বর জড়প্রকৃতির মধ্যগত ঈশ্বররূপে পরিণত হন; জড়প্রকৃতির মধ্যগত ঈশ্বর আবার প্রকৃতিরূপী ঈশ্বর হইয়া দাঁড়ান; ক্রমে এই দেহমন্দিরাধিষ্ঠাতা ঈশ্বর হন; তারপর এই দেহমন্দিরই তিনি, এইরূপ হইয়া দাঁড়ায়, এবং সর্বশেষে মানবাত্মাই তিনি, এইরূপ হইয়া যায়। এইরূপে জ্ঞানের চরমসীমা উপস্থিত হয়। যাঁহাকে ঋষিরা এইসকল স্থানে অন্বেষণ করিয়া গিয়াছেন, তিনি আমাদেরই হৃদয়ে। তত্ত্বমসি—তুমিই সেই, হে মানব, তুমিই সেই।"

তিনি নিজে বরাবর তাঁহার মায়াসম্বন্ধীয় বক্তৃতাগুলিকেই এই কালে তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তির সর্বশ্রেষ্ঠ বিকাশস্থল বলিয়া মনে করিতেন। এগুলি মনোযোগসহকারে পাঠ করিলেই তবে বুঝিতে পারা যায়। উক্ত ভাবসমূহকে আধুনিক ইংরেজীতে প্রকাশ করিতে গিয়া তিনি কি গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন! ঐ অধ্যায়গুলির আদ্যোপান্তপাঠে আমাদের ইহাই মনে হয় যে, একটী স্পষ্টরূপে অনুভূত ভাবকে তাহার প্রকাশের অনুপযোগী এক ভাষায় প্রকাশ করিবার জন্য একটা প্রাণপণ চেষ্টা চলিতেছে। স্বামিজী বলিতেছেন, "মায়া

শব্দটী ভুল করিয়া মিথ্যাজ্ঞান অর্থে বুঝা হয়।" প্রথম প্রথম, উহাতে ইন্দ্রজালের মত একটা কিছু বুঝাইত, যেমন, "ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে"—ইন্দ্র (ঈশ্বর) মায়ায় নানারূপ ধারণ করিলেন। কিন্তু এই অর্থ লোপ পায় এবং শব্দটী এক এক করিয়া বহু অর্থান্তর প্রাপ্ত হয়। কিরূপে এই বিভিন্ন অর্থসমূহের মধ্য হইতে একটী অর্থ চিরকালের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়া গেল, তাহার একটী নিদর্শন এই বাক্যে পাওয়া যায়—"নীহারেণ প্রাবৃতা জল্প্যা অসুতৃপ উক্‌থশাসশ্চরন্তি।" —অর্থাৎ, আমরা বৃথা বাক্যালাপ করি বলিয়া, ইন্দ্রিয়ের বিষয় লইয়াই সন্তুষ্ট থাকি বলিয়া এবং বাসনারই অনুবর্ত্তন করি বলিয়া সত্যবস্তুকে যেন একটী কুয়াসার দ্বারা আচ্ছাদিত করি। অবশেষে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ হইতে উদ্ধৃত এই শ্লোকেই শব্দটী উহার শেষ অর্থ পরিগ্রহ করিয়াছে দেখিতে পাই—"মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্।" মায়াকে প্রকৃতি বলিয়া জানিবে, আর যিনি মায়াধীশ তাঁহাকেই মহেশ্বর বলিয়া জানিবে। স্বামিজী বলিতেছেন, "বেদান্তের মায়া শব্দ দ্বারা উহার শেষ বিকাশপ্রাপ্ত অর্থে ঘটনাসমূহের বর্ণনামাত্র বুঝায়—আমরা যাহা আছি এবং যাহা আমাদের চতুষ্পার্শ্বে দেখিতেছি, তাহাই বুঝায়।"

কিন্তু এই কথাগুলি যে সংজ্ঞানির্দ্দেশ হিসাবে ব্যবহৃত হয় নাই, তাহা যিনিই ঐ মায়াসম্বন্ধীয় বক্তৃতাগুলি আদ্যোপান্ত নিজে পাঠ করিবেন, তিনিই বুঝিতে পারিবেন। তথায় ইহা স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায় যে, মায়া শব্দে জগৎকে ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়া যেরূপ জানা যায়, শুধু তাহাই লক্ষ্য করা হয় নাই, কিন্তু ঐ জ্ঞান যে কুটিল-পথগামী, ভ্রমপূর্ণ ও স্ববিরোধী তাহাও বর্ণনা করা হইয়াছে।

স্বামিজী বলিতেছেন, "এই জগৎ যে 'ধোঁকার টাটি', ইহাতে যে সুখের লেশমাত্র নাই, কেবল পরিশ্রমই সার, আমরা যে ইহার সম্বন্ধে কিছুই জানি না অথচ জানি না এ কথাও বলিতে পারি না— ইহা মতবাদ নহে, ঘটনাসমূহের উল্লেখ মাত্র। স্বপ্নের মধ্যে অর্দ্ধনিদ্রিত, অর্দ্ধজাগরিত অবস্থায় সঞ্চরণ করা, আমাদের সারাজীবন এক কুহেলিকার মধ্যে যাপন করা— ইহাই আমাদের প্রত্যেকের অদৃষ্টে ঘটিয়া থাকে। সমগ্র ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানেরই এই দশা। ইহারই নাম জগৎ।" তাঁহার ব্যাখ্যার অন্যান্য অংশের ন্যায় এস্থলেও আমরা দেখিতে পাই যে, ভারতীয় শব্দবিশেষকে ঠিক ঠিক ভাবে ইংরেজীতে অনুবাদ করা যায় না; এবং উহা বোধগম্য করিবার একমাত্র উপায় এই—এখানে সেখানে এক-আধটী বাক্যের উপর সমস্ত মনোযোগ না দিয়া বরং বক্তা যে ভাবটী বুঝাইবার প্রয়াস করিতেছেন তাহা ধরিতে চেষ্টা করা। সুতরাং মায়া শব্দে সেই চকিতের ন্যায় প্রকাশমান, এই আছে, এই নাই, অর্দ্ধসত্য, অর্দ্ধমিথ্যা, জটিল কোন কিছুকে বুঝায়, যাহাতে বিশ্রাম নাই, তৃপ্তি নাই, কোন চরম নিশ্চয়তা নাই, এবং যাহা আমরা ইন্দ্রিয়ের ও তদাশ্রয়ী মনের সাহায্যে জানিতে পারি। অথচ, "আর যিনি এইসকলের মধ্যে ওতপ্রোতভাবে রহিয়াছেন, তাঁহাকেই মহেশ্বর বলিয়া জানিও"— "মায়িনন্তু মহেশ্বরম্।" এই দুইটী ভাবকে পাশাপাশি বসাইলেই আমরা স্বামী বিবেকানন্দ সমগ্র হিন্দুধর্ম্মতত্ত্বকে পাশ্চাত্যদেশে কিভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন তাহা দেখিতে পাই। আর সব উপদেশ ও ভাব এই দুইটীরই অনুবর্ত্তী মাত্র। ধর্ম্ম ব্যক্তিগত ক্রমবিকাশের ব্যাপারমাত্র। "ক্রমাগত— সত্তা ও পরিণাম

(being and becoming), থাকা ও হওয়া, এই দুইয়ের ব্যাপারমাত্র।" কিন্তু এই ক্রমবিকাশের মূলে ঐ দুই মুখ্য ঘটনা থাকা চাই। এবং ভারকেন্দ্রটী যেন একটী হইতে অপরটীতে— মায়া হইতে আত্মায়— ধীরে ধীরে স্থানান্তরিত হয়। মায়াতে তন্ময় হইয়া থাকার নাম প্রাচ্যমতে 'বন্ধন'। এই বন্ধন ভাঙ্গিয়া ফেলার নামই 'মুক্তি'; এমন কি উহাকে 'নির্ব্বাণ' পর্য্যন্ত বলা হয়। যিনি ঐ বন্ধন ভাঙ্গিতে চাহেন তাঁহাকে ভোগান্বেষী হইলে চলিবে না; তাঁহাকে ত্যাগমার্গে বিচরণ করিতে হইবে। এই বিষয়ে স্বামিজী যাহা সকল ধর্ম্মের মূলমন্ত্র, শুধু তাহারই প্রতিধ্বনি করিতেছেন মাত্র; তিনি নিজেই সে কথা বলিলেন। কারণ, ভারতীয় এবং অন্যান্য সকল ধর্ম্মই সুখান্বেষণ করিতে করিতে কোন-না-কোন স্থানে 'আর নয়' বলিয়া নিবৃত্ত হইয়াছেন। সকল ধর্ম্মই সংসারকে নাচঘরে পরিণত না করিয়া বরং সমরাঙ্গণরূপে পরিণত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। সকল ধর্ম্মই মানবকে জীবন অপেক্ষা বরং মৃত্যুর সম্মুখীন হইবার জন্য বল দিয়াছেন। আমার মতে অন্যান্য আচার্য্যগণ হইতে স্বামিজীর কিঞ্চিৎ পার্থক্য এইখানে যে, তিনি সকল প্রকার শ্রেষ্ঠতাকে ত্যাগেরই কোন-না-কোন রূপান্তর বলিয়া জ্ঞান করিতেন। তাঁহার জীবনের শেষভাগে আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম, "আপনার মুখে আমি শুধু 'ত্যাগ ত্যাগ' এই কথাই শুনিতে পাইয়াছি।" কিন্তু সত্যকথা বলিতে গেলে আমার মনে হয় যে, 'জয় কর' এই কথাটীই তাঁহার প্রকৃতির অধিকতর অনুযায়ী ছিল; কারণ, তিনি দেখাইয়াছিলেন যে, দৃষ্টান্তস্বরূপ ষ্টিফেন্‌সনের কথা ধরিলে তাঁহার বাষ্পীয় ইঞ্জিন-আবিষ্কার ত্যাগের দ্বারাই, অর্থাৎ বহুদিনব্যাপী ঐকান্তিক

চেষ্টা, নির্জ্জনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া কঠিন সমস্যাপূরণে তন্ময় হইয়া থাকা এবং দেহসুখ বর্জ্জন করিয়া ক্লেশকে বরণ করিয়া লওয়া— এইসকলের দ্বারাই সাধিত হইয়াছিল। তিনি দেখাইয়াছিলেন যে, প্রার্থনা বা চিন্তাসহায়ে রোগ আরাম করিবার জন্য যতটা একাগ্রতার প্রয়োজন, ভৈষজ্যবিজ্ঞান আরোগ্যসম্পাদন ব্যাপারটার উপর মানবমনের ততটা একাগ্রতারই পরিচায়ক। তিনি আমাদিগকে প্রাণে প্রাণে অনুভব করাইয়াছিলেন যে, অধ্যয়নমাত্রেই কোন বিশেষ জ্ঞানলাভোদ্দেশ্যে প্রযুক্ত তপস্যাবিশেষ। সর্ব্বোপরি, তিনি প্রচার করিয়াছিলেন যে, ধর্ম্মভাবের বন্যাকে স্থায়িত্ব প্রদান করিবার শক্তি একমাত্র চরিত্রেই বর্ত্তমান। তাঁহার মতে অন্যায়ের প্রতিকার করাই গৃহীর কর্ত্তব্য, আর অপ্রতিকার সাধুর ধর্ম্ম। ইহার কারণ এই যে, সকলের পক্ষে বল-লাভই সর্বশ্রেষ্ঠ লাভ। তিনি বলিয়াছেন, "যখন তুমি অসংখ্য দেবসেনা আনয়ন করিয়া সহজে জয়লাভও করিতে পারিবে, তখনই ক্ষমা করিও।" কিন্তু যতক্ষণ জয়সম্বন্ধে সন্দেহ আছে, ততক্ষণ তাঁহার মতে শুধু কাপুরুষ ব্যক্তিই এক গালে চড় খাইয়া অপর গালও ফিরাইয়া দিবে।

তাঁহার গুরুদেব এক বালকের গল্প করিতেন, যে জলের উপর দিয়া হাঁটিয়া যাইবার শক্তিলাভ করিবার জন্য বার বৎসর ধরিয়া পরিশ্রম করিয়াছিল; ঐ গল্পেও আমরা ঐ উপদেশ দেখিতে পাই। এক সাধু তাহাকে বলিলেন, "বাঃ, মাঝিকে এক পয়সা দিয়া লোকে যে কার্য সম্পন্ন করে, তুমি তাহাই করিবার জন্য বার বৎসর পরিশ্রম করিয়াছ!" বালকটী উত্তর দিতে পারিত যে, সে বার বৎসর সহিষ্ণুতার সহিত পরিশ্রম করিয়া যে চরিত্রদার্ঢ্য প্রভৃতি সদ্‌গুণ লাভ

করিয়াছে, তাহা কোন মাঝি তাহার আরোহিগণকে দিতে পারিবে না। কিন্তু ইহা অতি সত্য যে, এইসকল পরম বিবেচক আচার্য্যের নিকট জগতের নৌবিদ্যারও সমুচিত মূল্য ও উপযুক্ত স্থান আছে। বহুবর্ষ পরে প্যারিসে এক ব্যক্তি তাঁহাকে এইসকল বিষয়ে ভারতীয় চিন্তাসমূহের ক্রমপরিণতির সাধারণ ইতিহাস সম্বন্ধে একটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। প্রশ্নটী এই—"সনাতন হিন্দুধর্ম একেকেই সৎ ও বহুকে অসৎ বলিয়াছেন, আবার বুদ্ধ কি বহুকেই সৎ ও (তদধিষ্ঠান) অহংকে অসৎ বলেন নাই?" স্বামিজী উত্তর দিলেন, "হাঁ। আর শ্রীরামকৃষ্ণ ও আমি উহাতে শুধু এইটুকু যোগ করিয়াছি যে, বহু ও এক উভয়ে একই মনের দ্বারা বিভিন্ন কালে ও বিভিন্ন অবস্থায় উপলব্ধ সেই একই সত্য।"

অধ্যাত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে জ্বলন্ত ভাষায় বলিবার অসাধারণ ক্ষমতা থাকায় এবং অদ্ভুত গাম্ভীর্য্যময় এক প্রাচীন সাহিত্য হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিতেন বলিয়া তিনি আমাদের নিকট সর্ব্বোপরি আধ্যাত্মিক জীবনেরই মাহাত্ম্যপ্রচারক ঋষিরূপে, বহির্জগৎ অন্তর্জগতের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হইবে—এই মতপ্রচারক ঋষিরূপে, প্রতিভাত হইতেন। একবার তিনি জনৈক শিষ্যকে বলিয়াছিলেন, "মনে রাখিও, 'আত্মা প্রকৃতির জন্য নহে, প্রকৃতিই আত্মার জন্য'—এই বাণীই ভারত ঘোষণা করিতেছে।" তিনি যেসকল বিষয়ের আলোচনা করিতেন এবং যেদিক হইতে উহা করিতেন, সেগুলি যুক্তিবিচারগুণে উপভোগ্য হইলেও উহাদের মধ্য দিয়া ক্রমশঃ এই গুরুগম্ভীর ধ্বনিটীই, এই সুগভীর মূল সুরটীই, শ্রুতিগোচর হইত। যিনি দীর্ঘকাল ধরিয়া তাঁহার বক্তৃতাবলী শ্রবণ করিয়াছেন, তাঁহার নিকট পাশ্চাত্ত্য ও

প্রাচ্য আধ্যাত্মিক জীবনের প্রভেদ এইরূপ বোধ হইবে—একটী যেন প্রত্যুষে বহুদূরে কোন নদীতীর হইতে আগত বংশীধ্বনির ন্যায়; উহা জগতের বহু সুমধুর গীতের মধ্যে অন্যতম; অপরটী সেই স্বরলহরীই, শ্রোতা যখন ক্রমশঃ নিকটতর হইতে হইতে অবশেষে উহাতে তন্ময় হইয়া গিয়া নিজেই গায়ক হইয়া যান, তখন যেরূপ হয়, সেইরূপ। আর উহার সঙ্গে সঙ্গেই ত্যাগের মাহাত্ম্য জ্বলন্তভাবে ফুটিয়া উঠে। এমন নহে যে, ঐ শব্দটী তাঁহার উপদেশসমূহে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকবার প্রযুক্ত হয়; কিন্তু সেই মুক্ত, অপরিসীম, অপ্রতিহতপ্রভাব জীবনের সত্যতা প্রত্যক্ষভাবে অনুভূত হয়। এ অবস্থায় লোককে মৌনব্রতী, কপর্দ্দকবিহীন সাধুর জীবন সম্যক্ যাপন করিবার অধিকারলাভের জন্য সংসারত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবার, এবং অসহ্য হইলেও নিজ মনকে আত্মনিবেদনরূপ শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া ফেলার, প্রলোভনকে দমন করিয়া রাখিতে হয়।

একটী সময় উপস্থিত হইল যখন এই আহ্বান অতি গম্ভীর নির্ঘোষে উচ্চারিত হইল। একদিন প্রশ্নোত্তর-ক্লাশে কথায় কথায় কিছু বাদানুবাদ হইল। সহসা স্বামিজী, তিনি যাহাকে 'বজ্রপাতেব ন্যায় লোককে চমৎকৃত করা' বলিতেন, সেইরূপ এক সঙ্কল্পের বশবর্ত্তী হইয়াই বলিয়া উঠিলেন, "আজ জগতে কিসের অভাব জান? জগৎ চায় এমন বিশজন নরনারী, যাহারা সদর্পে ঐ রাস্তার উপর দাঁড়াইয়া বলিতে পারে, 'আমাদের ঈশ্বর ভিন্ন আপনার বলিতে আর কিছুই নাই।' কে কে যাইতে প্রস্তুত?" বলিতে বলিতে তিনি দাঁড়াইয়া উঠিয়াছেন এবং তদবস্থায় শ্রোতৃবর্গের দিকে একে একে চাহিয়া দেখিতেছেন, যেন তাঁহাদের কাহাকেও কাহাকেও তাঁহার সহিত যোগদান

করিবার জন্ত ইঙ্গিত করিতেছেন। বলিলেন, "কিসের ভয়?" তারপর বজ্রগম্ভীর নাদে অচল অটল বিশ্বাসের সহিত যে কথাগুলি বলিলেন তাহা এখনও আমার কানে বাজিতেছে—"ইহাই যদি সত্য হয়, তবে অন্ত কিছুতে আর কি প্রয়োজন? আর যদি ইহা সত্য না হয়, তাহা হইলে আমাদের জীবনেই বা ফল কি?"

তিনি তাঁহার জনৈক ছাত্রকে এই সময়ে লিখিত এক পত্রে বলিতেছেন, "জগতে চরিত্রবলেরই প্রয়োজন। জগৎ এমন সব লোক চাহিতেছে যাহাদের জীবন জ্বলন্ত, নিষ্কাম প্রেমের পূর্ণাহুতিস্বরূপ। ঐ প্রেমের শক্তিতে প্রতি কথাটী বজ্রের ন্যায় কার্য্য করিবে। জাগো, জাগো মহাপ্রাণগণ! জগৎ যন্ত্রণায় জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেছে। তোমাদের ঘুমের কি অবসর আছে?")

চরিত্রই যে সত্যকে অপরের উপর প্রভাবশালী করে, কোন সাহায্যের অন্তরালে যে প্রেমের পরিচয় পাওয়া যায় তাহাই যে উহাকে সফলতা প্রদান করে; এবং কোন উক্তির পিছনে যে পরিমাণে চিত্তৈকাগ্রতা থাকে তদনুসারেই যে উহার বলবত্তা ও শক্তিমত্তা নির্ণীত হয়—ভারতবাসিগণের এই ধারণা তখন আমার নিকট কত নূতন ঠেকিয়াছিল, তাহা আমার মনে আছে। স্বামিজী বলিলেন, এইজন্ত বাইবেলের 'কুমুদফুলগুলির কথা ভাব দেখি, তাহারা কেমন স্বতঃই বিকাশপ্রাপ্ত হয়'—এই কথাগুলির সৌন্দর্য্যই যে শুধু আমাদের মনোহরণ করে তাহা নহে, কিন্তু উহাতে যে গভীর ত্যাগের ভাব প্রকাশ পাইতেছে, তাহাই আমাদের মুগ্ধ করে।

ইহা কি সত্য? আমি অনুভব করিলাম যে, পরীক্ষা দ্বারা প্রশ্নটীর সত্যাসত্যতা নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে; এবং কিছুকাল

পরে এই সিদ্ধান্ত করিলাম যে, ইহা সত্যই। একজন লোক, যাঁহার ভাষার অন্তরালে ভাব রহিয়াছে, তাঁহার একটী মাত্র সাদাসিধা কথাতেই তৎক্ষণাৎ কাজ হইয়া গেল, কিন্তু ঐ কথাটীই, যিনি চিন্তার ধার ধারেন না, এমন এক লোকের মুখে উচ্চারিত হইলে কেহ তাহাতে কর্ণপাত করে না। খলিফা আলি (Caliph Ali) যে একটী কথা বলিয়াছিলেন বলিয়া পাঠ করা যায়, তদপেক্ষা আমি এতদ্বিষয়ক প্রকৃষ্টতর উদাহরণ জানি না। অনেকেই এই ইসলামধর্ম্মী পুরুষসিংহের "সংসারে তুমি যে পদ লাভ করিবে তাহা তোমাকে অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছে; অতএব তুমি উহার অন্বেষণ না করিয়া নিশ্চিন্তমনে বসিয়া থাক"—এই কথাগুলি শ্রবণ করিয়াছেন এবং শ্রবণ করিয়া কেহই নিশ্চিত মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারেন নাই। কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত না আমরা কথাগুলিকে উহাদের বক্তার জীবনের সহিত গ্রথিত করি—যাঁহাকে চারি বার তাঁহার উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্য খলিফার পদ হইতে বঞ্চিত করিয়া অপরকে ঐ পদে অভিষিক্ত করা হইয়াছিল—যতদিন পর্য্যন্ত না আমরা জানি কিরূপে ঐ ব্যক্তির সমগ্র জীবনের স্পন্দন ঐ কথা কয়টীর মধ্যে অনুভূত হইতেছে, ততদিন আমরা ঐ সামান্য বাক্যটীর মধ্যে যে অসাধারণ শক্তি রহিয়াছে তাহার কোন অর্থ খুঁজিয়া পাই না।

আমি আরও দেখিয়াছিলাম যে, যে কথা শুধু শ্রোতার শ্রবণগোচর না করাইয়া যত্নপূর্ব্বক তাহার মনের মধ্যে গাঁথিয়া দেওয়া হয়, তাহাতে উহার বিপরীত প্রক্রিয়াটী অপেক্ষা অধিক সাড়াই পাওয়া গিয়া থাকে। আর এইসকল মনস্তত্ত্ববিষয়ক আবিষ্ক্রিয়া করিতে করিতে আমি ক্রমশঃ এটী বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে, যদিও বিচারবলে

চৈতন্য ও জড়ের মধ্যে রেখা টানিয়া উহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক করিয়া ফেলা অসম্ভব, একথা বহুপূর্বে সিদ্ধান্ত হইয়া গিয়াছে, তথাপি ইহাই যুক্তিযুক্ত বোধ হয় যে, এই দুইটীর মধ্যে অদ্বিতীয় সত্তার যে দিকটাকে আমরা জড় বলি সেইটাই বরং যাহাকে আমরা চৈতন্য নামে অভিহিত করি তাহার ফলস্বরূপ, কিন্তু উহার বিপরীত পক্ষটী সত্য নহে। ইচ্ছাশক্তি নয়, শরীরকেই জীবত্বের একটী গৌণফল মাত্র বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে। ইহা হইতে আবার দেহ অপেক্ষা উচ্চতর এক চৈতন্যের ধারণা আসিল—যাহা জড়ের অধীন না হইয়া বরং জড়কে পরিচালিত করিতেছে; সুতরাং শরীর যেমন জীর্ণত্বক পরিত্যাগ করে, সেইরূপ উহা যে জীর্ণবস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নববস্ত্রও গ্রহণ করিতে পারে, অর্থাৎ এই শরীরটাকেই ত্যাগ করিতে পারে, এরূপ কল্পনা কষ্টসাধ্য নহে। অবশেষে আমি দেখিতে পাইলাম যে, আমার নিজের মনই স্বামিজীর "শরীর আসে ও যায়"—এই অমরত্বজ্ঞাপক মহান্ উক্তিটীর প্রতিধ্বনি করিতেছে। কিন্তু এই চিন্তার পরিণতি ধীরে ধীরে সংসাধিত হইয়াছিল, এবং উহার পূর্ণতালাভ ঘটিতে অনেক মাস লাগিয়াছিল।

ইতিমধ্যে এই সময়ের প্রতি পশ্চাদ্দৃষ্টি করিয়া আমি ইহাই অনুভব করি যে, স্বামিজীর ক্লাশগুলিতে আমরা তর্কযুক্তিমূলক ব্যাখ্যা অপেক্ষা নূতন ও উচ্চ ভাবময় জীবনই সমধিক পরিমাণে লাভ করিয়াছিলাম। ভারতে উহা 'দর্শন' বা 'প্রত্যক্ষানুভূতি' নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

ভগবানকে গোপালভাবে উপাসনা করার বর্ণনাপ্রসঙ্গে আমরা

স্বামিজীকে "আমরা তাঁহার নিকট হইতে কিছু চাই নাকি?" —এইরূপ বিস্ময়োক্তি করিতে শুনিলাম। "প্রেম চিরকালই আনন্দের বিকাশমাত্র," সুতরাং কোন যন্ত্রণা বা অনুশোচনা স্বার্থপরতা ও দেহসুখসর্ব্বস্বতারই নিদর্শনমাত্র—আমরা এই উপদেশ মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিলাম। আমাদের ও অপরের মধ্যে অণুমাত্র ভেদদৃষ্টি করিবার প্রবৃত্তিও 'ঘৃণা'পদবাচ্য, এবং উহার বিপরীতই 'প্রেম'—এই কঠোর আদেশবাণী আমরা স্বীকার করিয়া লইলাম। যাঁহারা শৈশবের ধর্ম্মমতে আর বিশ্বাসী নহেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে এইরূপ অনুভব করিয়াছেন যে, অন্ততঃ পরোপকার জিনিসটা একটা শ্রেষ্ঠ আদর্শ, আর আমাদের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য জীবসেবার সম্ভাবনাটা ত রহিয়াছে। পূর্ব্বোক্ত মতে বিশ্বাসী হওয়ায়, "ধর্ম্মদানই শ্রেষ্ঠ দান, তাহার একধাপ নীচে বিদ্যাদান, আর সর্ব্বপ্রকার দৈহিক ও জড়বস্তুমূলক সাহায্য সর্ব্বনিম্নস্থানীয়"—এই ভব্য প্রাচ্যদেশীয় উপদেশটা শুনিয়া যে আমরা বিস্মিত হইয়াছিলাম, তাহা আজি এই দশ বৎসর পরে আমার নিকট কৌতুককর বলিয়া বোধ হইতেছে। রোগদারিদ্র্যপীড়িতগণের প্রতি আমাদের উচ্ছলিত দয়ারাশির এইভাবে স্থাননির্দ্দেশ করা! ইহা বুঝিতে আমার বহু বৎসর লাগিয়াছে, কিন্তু আমি এখন জানি যে, উচ্চতর দানটীর পিছনে পিছনে নিম্নতর দানটী আপনা হইতে না আসিয়া থাকিতে পারে না।

ঐরূপে, আমরা পাশ্চাত্ত্য দেশে বিশুদ্ধ বায়ু চাই এবং আশপাশের লোকালয়সমূহ স্বাস্থ্যের অনুকূল হওয়া চাই বলিয়া যে উৎকট আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকি—যেন ঐগুলিই মহা সাধুত্বের লক্ষণ—তাহার

বিরুদ্ধে আমরা এই কঠোর শিক্ষা পাইলাম—'জগতের প্রতি উদাসীন হও।' সত্যকথা বলিতে গেলে, এই শিক্ষার রহস্য উদ্ভেদ করা আমাদের একেবারে সাধ্যাতীত বোধ হইল। তিনি যাহা বলিতেছেন তাহা সত্য হইলেও আপাততঃ অসংলগ্ন বলিয়া বোধ হইবে, ইহা জানিয়াও যখন তিনি সদর্পে বলিলেন যে, ঋষিরা "দৃশ্য উপভোগ করিবার জন্যই" পর্ব্বতশিখরে বাস করিতেন, এবং যখন তিনি শ্রোতৃবর্গকে পূজার ঘরে পুষ্পাদি রাখিতে ও ধূপধুনা দিতে এবং খাদ্য ও শরীরসম্বন্ধীয় বিশুদ্ধি ও পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে বিশেষ অবহিত হইতে উপদেশ দিলেন, তখন আমরা এই দুই বিপরীতধর্ম্মাক্রান্ত ভাবকে কিরূপে একসূত্রে গ্রথিত করিব তাহা বুঝিতে পারিলাম না। কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, তিনি অস্মদ্দেশে প্রচলিত দৈহিক পারিপাট্যের মতটী ভারতীয় আকারে প্রচার করিতেছিলেন। আর ইহা সত্য নহে কি যে, যতদিন না পাশ্চাত্ত্যবাসী আমরা আমাদের বড় বড় নগরগুলির হীনদশাপন্ন দরিদ্র পল্লীসমূহ (slums) পরিষ্কার করিতে সমর্থ হই, ততদিন আমাদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার জন্য অত্যাগ্রহ অধিকারপ্রাপ্ত শ্রেণীসমূহের আত্ম-পূজারই অনুরূপ?

যে-সকল মহাপুরুষ বিশিষ্ট সফলতা ও হিসাবী বুদ্ধির সহিত তাঁহাদের সাংসারিক কার্য্যসকলের বন্দোবস্ত করিতে পারেন, তাঁহাদিগকে আমরা যে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতাম তাহারও ঐরূপ দুর্গতি ঘটিল। প্রকৃত ধার্ম্মিক ব্যক্তি ঐহিক বিষয়সকলে শুধু যে উদাসীন থাকেন তাহাই নহে, তিনি উহাদিগকে ঘৃণার চক্ষে দেখেন এবং আদৌ সহিতে পারেন না। স্বামিজী কদাপি এই উপদেশটীকে খর্ব্ব করিতেন না। ইহা ঘোষণাকালে তিনি কখনও ইতস্ততঃ

করিতেন না। শ্রেষ্ঠ ধার্ম্মিক ব্যক্তি সাংসারিকতা আদৌ সহিতে পারেন না।

আমরা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে, এগুলি সাধুত্বেরই আদর্শস্বরূপ। আমরা অধ্যায়ের পর অধ্যায় এক মহতী ভাষা শিক্ষা করিতেছিলাম যদ্দ্বারা আমরা জগতের উদ্দেশ্যগুলির সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইতে পারিব। যে-সকল বিষয় সামাজিক জীবন ও গৃহস্থালীধর্ম্মের সহিত সংশ্লিষ্ট, এবং যাহাদিগকে আত্মোন্নতির হাতে-খড়ি ('কিণ্ডারগার্টেন') স্বরূপ বলা যাইতে পারে, সে-সকল সম্বন্ধে আমাদের কোনরূপ মতিভ্রম উপস্থিত হয় নাই। একটী দেশ যে, যাহা অপর এক দেশের গৌরবের স্থল, এইরূপ শৃঙ্খলা ও দায়িত্ব-জ্ঞানের আদর্শসমূহের আদর করিতে শিখিয়াই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উন্নতি করিতে পারে, এই ধারণাটীকে তিনি আদৌ অবিশ্বাস্য বলেন নাই। সেই সঙ্গে আবার ভারতবর্ষীয় আদর্শসমূহের মূলমন্ত্রস্বরূপ এই কথাগুলি শুনিতে পাইলাম—"ধার্ম্মিক ব্যক্তি সাংসারিকতা সহিতে পারেন না।" ইহার প্রতিবাদস্বরূপে আমরা সুপরিচালিত, সুসংহত, পরহিতরত ধর্ম্মসম্প্রদায়গুলির উল্লেখ করিলাম এবং প্রাচ্যের জনকয়েক জীর্ণবস্ত্রপরিহিত, ঈশ্বরপ্রেমোন্মত্ত ভিক্ষুকের তুলনায় আমাদের ভূরিভূরি মঠাধ্যক্ষ, যাজক এবং মহাধার্ম্মিকা মঠধারিণীগণের উৎকর্ষ দেখাইলাম। কিন্তু আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইয়াছিল যে, পাশ্চাত্ত্যেও যখনই ধর্ম্মবহ্নি সহসা দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে, তখনই উহা প্রাচ্য আকার ধারণ করিয়াছে। কারণ, যাঁহারা মীরাবাই ও চৈতন্য, তুকারাম ও রামানুজের জন্মভূমি ভারতকে জানেন, তাঁহাদের পক্ষে আসিসির

সেণ্ট ফ্রান্সিসকেও গৈরিকমণ্ডিত করিয়া দিবার লোভ সংবরণ করা কঠিন হইয়া পড়ে।

বৌদ্ধ জাতকগুলির ইংরেজী অনুবাদের কোন একখণ্ডে, "যখন মানব সেইস্থানে উপনীত হয় যথায় সে স্বর্গকেও নরকবৎ ভয় করে"—এই কথাগুলির বারংবার উল্লেখ দেখা যায়। স্বামিজীর উপস্থিতি যে আধ্যাত্মিক অনুভূতিলাভে সহায়তা করিত তাহার পরিচয় কিরূপে এতদপেক্ষা স্পষ্টতরভাবে দেওয়া যাইতে পারে, তাহা আমার অজ্ঞাত। যাঁহারা তাঁহাকে ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনে বক্তৃতা করিতে শুনিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই এমন কিছু কিছু আভাস প্রাপ্ত হইয়াছিলেন যদ্দ্বারা তাঁহারা, প্রাচ্যদেশীয়গণ কেন জন্মান্তরপরিগ্রহ হইতে নিস্কৃতি পাইতে চাহেন তাহার অর্থ কথঞ্চিৎ বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

কিন্তু এইসকল মানসিক অবস্থার মধ্যে যেটী সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল হইয়া অপর অবস্থাগুলিকে স্ববশে পরিচালিত করিত, তাহার আভাস মাত্র ইতিপূর্ব্বে এই কথাগুলিতে ব্যক্ত হইয়াছে—"যদি ইহাই সত্য হয় তবে অন্য কিছুতে কিবা আসে যায়? আর যদি ইহা সত্য না হয় তবে আমাদের জীবনেরই বা মূল্য কি?" কারণ, এই আচার্য্যের, তিনি স্বয়ং যে-সকল সত্য শিক্ষা দিতে আসিয়াছিলেন এবং নিজে যে সর্ব্বোচ্চ আশা পোষণ করিতেন, এইগুলিকে একত্র করিবার এবং উহাদিগকে হীন উৎকোচস্বরূপে জ্ঞান করিয়া, প্রয়োজন হইলে অপরের কল্যাণের নিমিত্ত নির্ভীকভাবে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিবার এক আশ্চর্য্য ক্ষমতা ছিল। বহুবৎসর পরে তিনি আমার কোন এক মন্তব্যের উত্তরে সক্রোধে যাহা বলিয়াছিলেন

তাহা হইতেই এই বিষয়টী স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়—"যদি আমি কোন গুরুতর অপরাধ করিলে তদ্দ্বারা কাহারও বাস্তবিক উপকার হয়, তাহা হইলে আমি এখনই উহা করিয়া অনন্ত নরকভোগ করিতে প্রস্তুত!" আবার তিনি আমাদিগের কাহাকেও কাহাকেও বারংবার যে বোধিসত্ত্বের গল্পটী বলিতেন—যেন উহা বর্ত্তমানযুগের বিশেষ উপযোগী—তাহাতেও এই সদিচ্ছাই প্রকাশ পাইত। এই বোধিসত্ত্ব, যতদিন না জগতের শেষ ধূলিকণাটী পর্য্যন্ত মুক্তিপদবীতে আরূঢ় হয়, ততদিন পর্য্যন্ত নিজে নির্ব্বাণ গ্রহণ করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। মুক্তির শেষ লক্ষণ তল্লাভের চেষ্টা হইতে বিরতি—ইহাই কি এতদ্দ্বারা সূচিত হইতেছে? পরে আমি ভারতে প্রচলিত অনেকগুলি গল্পে ঠিক এই বিষয়টীই লক্ষ্য করিয়াছি; দৃষ্টান্তস্বরূপ, রামানুজের ব্রতভঙ্গ করিয়া পবিত্র মন্ত্র পারিয়াদিগের নিকট উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিয়া দেওয়া, বুদ্ধের কোন কিছু গোপন না রাখিয়া সমগ্র জীবন কর্ম্মে উৎসর্গ করিয়া দেওয়া, শিশুপালের শীঘ্র শীঘ্র ভগবৎসকাশে ফিরিয়া যাইবার জন্য তাঁহাকে শত্রুভাবে বরণ করিয়া লওয়া এবং সাধুগণেব নিজ নিজ ইষ্টের সহিত দ্বন্দ্বেব ভূরি ভূরি গল্প—এইসকলের উল্লেখ করা যাইতে পারে।

কিন্তু স্বামিজী সকল সময়েই যে নিজের কথা সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন করিতেন তাহা নহে। একদিন তাঁহার বক্তৃতান্তে আমরা কয়েকজন একসঙ্গে বসিয়াছিলাম; তিনি নিকটে আসিয়া যে বিষয়ে প্রসঙ্গ চলিতেছিল তাহারই সম্বন্ধে বলিলেন, "আমার একটা কুসংস্কার আছে যে—অবশ্য ইহা আমার ব্যক্তিগত কুসংস্কার ছাড়া আর কিছুই নহে—যিনি একসময়ে বুদ্ধরূপে আসিয়াছিলেন তিনিই পরে

খৃষ্টরূপে আসিয়াছেন।”) তারপর ঐ বিষয়েরই আলোচনাপ্রসঙ্গে ক্রমশঃ তাঁহার গুরুদেবের কথা আসিয়া পড়িল। আমরা এই প্রথম বার ইঁহার এবং যিনি বিবাহের পর স্বামিকর্ত্তৃক বিস্মৃত হইয়াও সজলনয়নে তাঁহাকে আপন অভিলষিতমার্গে বিচরণ করিবার স্বাধীনতা দিয়াছিলেন, সেই বালিকার কথা শুনিতে পাইলাম। কথা কহিতে কহিতে তাঁহার স্বর ক্রমশঃ মৃদু হইয়া আসিল, অবশেষে স্বপ্নাবিষ্টপ্রায় হইয়া উঠিল। কিন্তু শেষে যেন স্বগতোক্তির মত তিনি দীর্ঘনিঃশ্বাস সহকারে এই বলিয়া উক্ত আবেশের হস্ত হইতে আপনাকে জোর করিয়া মুক্ত করিলেন—“এইসব ব্যাপার হইয়া গিয়াছে এবং আবার হইবে। যাও বৎসে, সুখে গমন কর, তোমার বিশ্বাসই তোমাকে রোগমুক্ত করিয়াছে।”* . .

আর একদিন কথোপকথনপ্রসঙ্গে এতদপেক্ষাও সামান্য এক উপলক্ষ্য পাইয়া তিনি আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, “আমার স্বদেশীয় নারীগণের কল্যাণকল্পে আমার কতকগুলি সঙ্কল্প আছে। আমার মনে হয়, উহাদিগকে কার্য্যে পরিণত করিতে তুমি বিশেষভাবে সাহায্য করিতে পার।” আমিও বুঝিলাম যে, আমি এমন এক আহ্বান শুনিতে পাইলাম যাহা আমার জীবনকে পরিবর্ত্তিত করিয়া দিবে। এই সঙ্কল্পগুলি কি ছিল তাহা আমি জানিতাম না, এবং ভাবী জীবনের যেরূপ চিত্র অঙ্কন করিতে অভ্যস্ত হইয়াছিলাম তাহা পরিত্যাগ করা সেই সময়ের জন্য এত কষ্টকর ব্যাপার বলিয়া বোধ হইতেছিল যে, আমি তদ্বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিতেও চাহিলাম না। কিন্তু আমি ইতিপূর্ব্বেই অনুমান করিয়াছিলাম যে, অন্যান্য

* বাইবেল—সেণ্ট ম্যাথিউ, ৯ম অধ্যায়।

জাতিরা জগৎকে যে চক্ষে দেখে তাহার সহিত আমার জগতের ধারণাটাকে সামঞ্জস্য করিয়া লইতে হইলে আমাকে অনেক জিনিস শিখিতে হইবে। একবার আমি লণ্ডন নগরীকে শোভাশালিনী করার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বলিয়াছিলাম। তাহাতে তিনি এই তীব্র উত্তর দিয়াছিলেন, "আর তোমরা অন্য নগরগুলিকে শ্মশানপুরী করিয়াছ!" আমার নিকট লণ্ডনের রহস্যময়তা ও দুঃখপূর্ণতা অনেক দিন হইতে মানবজাতির সমস্যারই—সমগ্র জগৎ যাহা চাহিতেছে তাহারই—একটী ক্ষুদ্র প্রতিরূপ বলিয়া বোধ হইত। "আর তোমরা তোমাদের এই নগরীটীকে সৌন্দর্য্যশালিনী করিবার জন্য অন্য নগরগুলিকে শ্মশানপুরী করিয়াছ!"—তিনি আর অধিক কিছু বলিলেন না, কিন্তু কথাগুলি অনেকদিন ধরিয়া আমার কানে বাজিতে লাগিল। আমার চক্ষে আমাদের নগরী সৌন্দর্য্যশালিনী ছিল না। স্বামিজী আমার প্রশ্নটী ভুল বুঝিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার এই ভুল বুঝা হইতেই আমি দেখিতে পাইলাম যে, বিষয়টীকে আর এক দিক দিয়া দেখা চলে। আচার্য্যদেব একদিন আমায় বলিয়াছিলেন, "ইংরেজেরা দ্বীপে জন্মগ্রহণ করিয়াছে এবং দ্বীপেই বাস করিবার জন্য সর্ব্বদা চেষ্টা করিতেছে।" আর আমার জীবনের এই অংশটীর প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে তাঁহার এই উক্তি আমার সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে সত্য বলিয়া বোধ হয়, কারণ আমার আদর্শগুলি এতাবৎকাল বিশেষরূপ সঙ্কীর্ণ ছিল। ইংলণ্ডে অবস্থানকালে, ভারতবাসীরা জগৎকে কি চক্ষে দেখে তৎসম্বন্ধে আমি আর অধিক কিছু জানিতে পারি নাই। আমার যে মহিলা বন্ধুটী আমায় পরে ভারতে তাঁহার সহকারিণী হইবার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন,

তিনি একদিন সন্ধ্যাকালে লণ্ডনে স্বামিজী ও আমি ঘণ্টাখানেকের জন্য তাঁহার গৃহে অতিথি হইলে স্বামিজীকে জানাইয়াছিলেন যে, আমি তাঁহার কার্য্যে যোগদান করিতে সম্মত আছি। দেখিলাম, তিনি ইহা শুনিয়া বিস্মিত হইয়াছেন, কিন্তু ধীরে ধীরে বলিলেন, "আমার কথা ধরিতে গেলে, আমি স্বদেশবাসিগণের উন্নতিকল্পে এই যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি, তাহা সম্পন্ন করিবার জন্য, প্রয়োজন হইলে দুই শতবার জন্মপরিগ্রহ করিব।" এই কথাগুলি এবং অপর কয়েকটী কথা, যাহা তিনি আমার যাত্রা করিবার প্রাক্কালেই আমায় লিখিয়াছিলেন, আমার মানসপটে দেদীপ্যমান হইয়া রহিয়াছে—"তুমি ভারতের কল্যাণকল্পে কার্য্য কর বা নাই কর, তুমি বেদান্তমত পরিত্যাগ কর বা বেদান্তবাদী থাক, আমি তোমাকে আমরণ সাহায্য করিব। 'মরদকী বাত, হাথীকা দাঁত।' হাতীর দাঁত একবার বাহির হইলে আর ভিতরে প্রবেশ করে না। পুরুষের কথাও সেইরূপ।"

কিন্তু স্বামিজীর নিজ জন সম্বন্ধে এইসব উল্লেখ ব্যক্তিগত ব্যাপারমাত্র বলিয়া উহারা তাঁহার নিকট চিরকাল গৌণ স্থানই অধিকার করিত। তাঁহার ক্লাশগুলিতে এবং তাঁহার উপদেশাবলীতে, মানুষকে অজ্ঞানের হস্ত হইতে রক্ষা করাই তাঁহার একমাত্র কামনা বলিয়া মনে হইত। যাঁহারা তাঁহার কথা বা বক্তৃতা শুনিয়াছেন তাঁহারা এরূপ প্রেম, এরূপ অনুকম্পা অন্য কোথাও দেখেন নাই। তাঁহার নিকট, তাঁহার সকল শিষ্যই শিষ্যমাত্র; সেখানে আর ভারতীয়, ইউরোপীয় ভেদ নাই। তথাপি তিনি স্বীয় প্রচারকার্য্যের ঐতিহাসিক অর্থবত্তা সম্বন্ধে বিলক্ষণ সচেতন

ছিলেন। তাঁহার শেষবার লণ্ডনে বক্তৃতার সময় (১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের ১৫ই ডিসেম্বর, রবিবার, অপরাহ্ণে 'রয়েল সোসাইটি অব পেণ্টার্স ইন্ ওয়াটার-কলার্স" নামক চিত্রশিল্পিসঙ্ঘমন্দিরে) তিনি দেখাইয়া দিয়াছিলেন যে, ইতিহাসে একই রূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তি হইয়া থাকে, এবং রোমকরাজ্যে শান্তি বিরাজ করাতেই খৃষ্টধর্ম্মসংস্থাপন সম্ভবপর হইয়াছিল। দূরদৃষ্টির ফলস্বরূপ তাঁহার এই স্থির ধারণা ছিল যে, ভবিষ্যতে আবার একদল ভারতীয় প্রচারক পাশ্চাত্ত্যে আগমন করিয়া, তিনি এমন উত্তমরূপে যে বীজ বপন করিয়া যাইতেছেন তাহার ফল উপভোগ করিবেন, এবং তাঁহারাও আবার তাঁহাদের ভাবী বংশধরগণের ফললাভের জন্য নূতন নূতন বীজ বপন করিয়া যাইবেন। খুব সম্ভবতঃ, তাঁহার চালচলনে যে বুদ্ধের ন্যায় প্রশান্ত গম্ভীরভাব আমাদিগকে এত মুগ্ধ করিয়াছিল তাহা শুধু তাঁহার এই স্থির ধারণারই বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বিভিন্ন আদর্শের সঙ্ঘর্ষ

স্বামী বিবেকানন্দ একবার তাঁহার গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছিলেন, "তিনি বেদান্তের মত-মতান্তরের ধার ধারিতেন না। তিনি শুধু সেই মহৎ জীবন যাপন করিয়াই যাইতেন; উহা ব্যাখ্যা করিবার ভার তিনি অপরের উপর ফেলিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতেন।" আর, কোন মহাপুরুষের জীবনে যে এমন সব অংশ থাকিতে পারে যাহার অর্থ সেই মহাপুরুষ নিজেই বুঝেন না—এই অর্থে কথাগুলি তাঁহার নিজ জীবনালোচনা-প্রসঙ্গে আমার অনেকবার মনে পড়িয়াছে।

পাশ্চাত্ত্যে স্বামিজী আমাদিগের নিকট শুধু ধর্ম্মাচার্য্যরূপেই প্রকাশিত হইয়াছিলেন। এখনও মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিলেই আমরা তাঁহাকে সেই পুরাতন বক্তৃতাগৃহে তাঁহার ছাত্রমণ্ডলীর অপেক্ষা কিঞ্চিৎ উচ্চ আসনে উপবিষ্ট দেখিতে পাই; দেখি তিনি বুদ্ধের ন্যায় প্রশান্তভাবে এই সিংহাসনে অধিষ্ঠিত, এবং তাঁহার শ্রীমুখ হইতে এই আধুনিক জগতে সুদূর অতীতের সেই বাণী পুনরায় উচ্চারিত হইতেছে। ত্যাগ, মুক্তি-পিপাসা, বন্ধনক্ষয়, অগ্নিবৎ পবিত্রতা, সাক্ষিস্বরূপ হওয়ার আনন্দ, সাকারকে নিরাকারে লয়করণ—শুধু এইসকল বিষয়ই উক্ত আলোচনার বিষয়ীভূত হইত। সত্য বটে,

এক-আধবার ক্ষণিকের মত আমরা তাঁহাকে মহা দেশভক্তরূপে দেখিয়াছি। তথাপি নিয়তি যথায় আহ্বান করে তথায় ইঙ্গিতমাত্রই যথেষ্ট হয়, এবং যেসকল মুহূর্ত্ত একজনের জীবনের গতি পরিবর্ত্তিত করিয়া দেয় তাহারা হয়ত অপর একশত জনের চক্ষের সম্মুখ দিয়া চলিয়া যাইলেও কেহ তাহাদিগকে ধরিতে পারে না। পাশ্চাত্ত্যে আমরা স্বামিজীকে ভারতের উন্নতিকামী কর্ম্মিরূপে দেখি নাই, হিন্দুধর্ম্মের প্রচারকরূপেই দেখিয়াছি। তিনি আবেগভরে বলিয়াছিলেন, "আহা! যিনি বাস্তবিকই মানবের দেবত্ব উপলব্ধি করিয়াছেন তাঁহার কার্য্য কিরূপ শান্তিপূর্ণ! এইরূপ লোকের পক্ষে মানুষের চোখ খুলিয়া দেওয়া ভিন্ন কিছুই করিবার নাই; বাকী সমস্ত আপনা হইতেই হইয়া যায়।" আমরা তাঁহার সম্বন্ধে যাহা কিছু দেখিয়াছিলাম বা শুনিয়াছিলাম তাহা এইরূপ কোন অগাধ শান্তির ফলস্বরূপ, সন্দেহ নাই।

কিন্তু আমার ভারতবর্ষে পদার্পণের মুহূর্ত্ত হইতেই আমি এই সমস্ত ব্যাপারের অন্তরালে নিহিত একটী সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত বস্তু দেখিতে পাইলাম। যাহা এরূপ অদ্ভুতভাবে এই আমার প্রথম জ্ঞানগোচর হইল, তাহা শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস বা তৎসম্বন্ধীয় ধারণা-সকল নহে। উহা আমার গুরুদেবের নিজ ব্যক্তিত্বের জালবদ্ধ-সিংহবৎ পুনঃ পুনঃ ব্যর্থ চেষ্টা ও তজ্জনিত দুঃসহ ক্লেশ। কারণ, যেদিন আমি জাহাজ হইতে অবতরণকালে তাঁহাকে জেটীতে দেখি, সেই দিন হইতে, যখন তিনি গোধূলির সময় দেহটীকে ভাঁজকরা পোষাকের মত ফেলিয়া রাখিয়া এই জগৎরূপ গ্রামখানি চিরদিনের মত পরিত্যাগ করিয়া যান সেই শেষ শান্ত মুহূর্ত্তটী পর্য্যন্ত

আমি এই ভাবটীকে তাঁহার জীবনের অপর ভাবটীর সহিত অচ্ছেদ্য-ভাবে জড়িত দেখিয়াছিলাম।

কিন্তু এই সঙ্ঘর্ষের মূল কোথায়? কেন তিনি আপনাকে উদ্দেশ্যসাধনে পুনঃপুনঃ বিফলপ্রযত্ন ও বাধাপ্রাপ্ত বোধ করিতেন? এক মহান উদ্দেশ্যের ধারণা তাঁহার যতই স্পষ্টতর হইয়া উঠিতেছিল, তাঁহার শারীরিক দুর্ব্বলতা-বোধও ততই বৃদ্ধি পাইতেছিল—ইহাই কি তাহার কারণ? তাঁহার ভারতবর্ষে সসম্মান অভ্যর্থনার যেসকল প্রতিধ্বনি তাঁহার ইংরেজ বন্ধুবর্গের কর্ণে পৌঁছিয়াছিল তৎসঙ্গে এক বন্ধুর মুখে আমি নিজে এই বিষয়টীই শুনিতে পাইয়াছিলাম। যে মুহূর্ত্তে তাঁহার ক্ষমতা চরম সীমায় আরোহণ করিয়াছিল, ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই ভগ্নস্বাস্থ্য লইয়া হিমালয়ে নির্ব্বাসিত হইয়া তিনি তাঁহার বন্ধুকে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। উহা হতাশার কাতর ক্রন্দন। উহা পাঠ করিয়া আমাদের মধ্যে কয়েকজন যে-কোন উপায়ে হউক তাঁহাকে ভারতের কার্য্যভার অপরের স্কন্ধে ন্যস্ত করিয়া পাশ্চাত্ত্যে প্রত্যাগমনেসম্ম ত করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। ঐরূপ ব্যবস্থা করিবার সময়, ঐসকল কার্য্য কি প্রকারের, এবং উহা সম্পন্ন করিতে হইলে কত কঠিন ও বহু-অঙ্গ-বিশিষ্ট শিক্ষার প্রয়োজন, তাহা আমরা অতি অল্পই হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলাম।

এই সঙ্ঘর্ষ বাস্তবিক কিসের জন্য? উহা কি যাহাকে তিনি 'মনবুদ্ধির অগোচর' বলিতেন তাহাকেই সাধারণ জীবনে বহন করিয়া আনার প্রাণান্তকর চেষ্টাপ্রসূত? একথা নিঃসন্দেহ যে, তিনি যে-কার্য্য করিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা এত কঠিন

যে উহা শুধু বীরেরই সাধ্য। প্রচলিত আদর্শসমূহের নিরাপদ পন্থা পরিত্যাগ করিয়া, পুরাতন উপায়সমূহের আপাতবিরোধী উপায়-সকলের দ্বারা কোন নূতন আদর্শকে কার্য্যে পরিণত করিতে যাওয়ার মত দুষ্কর কার্য্য এ জগতে আর নাই। একবার শ্রীরামকৃষ্ণ 'নরেন্দ্রকে' (তখন স্বামিজী ঐ নামেই অভিহিত হইতেন) তাঁহার বাল্যাবস্থায় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ("তোমার জীবনের সর্ব্বোচ্চ অভিলাষ কি?" তিনিও তৎক্ষণাৎ উত্তর দিয়াছিলেন, "সর্ব্বদা সমাধিস্থ থাকা।") শুনা যায়, তাঁহার গুরুদেব এই কথা শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়াছিলেন, এবং উত্তরে শুধু এই বলিয়াছিলেন, "বাবা, আমি মনে করিয়াছিলাম যে তুমি আরও কিছু বড় অধিকার লাভের জন্য জন্মিয়াছ!" উক্ত মুহূর্ত্তটী যে শিষ্যের জীবনে একটা নূতন যুগ প্রবর্ত্তন করিয়া দিয়াছিল, ইহা বুঝিতে বোধ হয় কাহারও বিলম্ব হইবে না। এ কথা নিশ্চয় যে, ভবিষ্যতে, বিশেষতঃ তাঁহার স্বদেশবাসিগণের প্রতি শ্রেষ্ঠ দান-স্বরূপ এই যে সাড়ে পাঁচ বৎসর ইহাতে, তিনি নিষ্কামকর্ম্ম বা পরার্থকর্ম্মকেই ধর্ম্মজীবনের একটী শ্রেষ্ঠ বিকাশ বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। ইহারই ফলস্বরূপ ভারতের ইতিহাসে এই প্রথম বার একটী সন্ন্যাসি-সম্প্রদায় সংগঠিত হইয়া উঠিল, যাঁহারা নূতন নূতন রকমের সামাজিক কর্ত্তব্যের সৃষ্টি ও পরিপুষ্টি-সাধনেই বদ্ধপরিকর হইলেন। ইউরোপে প্রত্যক্ষভাবে ধর্ম্মভাব লাভ করা প্রাচ্যের তুলনায় অতি অল্পই ঘটিয়া থাকে বলিয়া এবং লোকে উহা খুব কমই বুঝে বলিয়া সাধারণের চক্ষে এইরূপ পরার্থকর্ম্ম পুণ্যকর্ম্ম বলিয়াই বিবেচিত হইয়া থাকে। কিন্তু ভারতবর্ষে সাধুসম্প্রদায়ের

নিকট লোকে প্রধানতঃ এই আশা করিয়া থাকে যে, উহা হইতে মহাপুরুষগণ উৎপন্ন হইবেন। আর, যে সন্ন্যাসী পরম্পরাগত সমাধিমূলক জীবনের মাহাত্ম্য বজায় রাখিতে আপনাকে নিয়োজিত না রাখিয়া সমাজকে উন্নীত করিতে প্রয়াস পান, তাঁহার মূল্য প্রাচীনকালের লোকেরা সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতেন না।

পূর্ব্বে বিশেষ বিশেষ সাধনপ্রণালী ধর্ম্মবিষয়িণী শিক্ষায় যে স্থান অধিকার করিত, স্বামিজীর প্রণালীমতে এইসকল সৎকর্ম্মই যেন সেই স্থান অধিকার করিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। ভারতীয় বেদান্ত দর্শনের চরমপন্থী—অদ্বৈতীর পক্ষে 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' অবস্থালাভই আদর্শ। যিনি এই অবস্থায় উপনীত হইয়াছেন তাঁহার পক্ষে উপাসনা অসম্ভব হইয়া উঠে, কারণ তাঁহার নিকট উপাস্য, উপাসক কেহই নাই ; এবং সকল কর্ম্মই উহাদের অন্তরালে অবস্থিত একত্বের তুল্য বিকাশ বলিয়া, কোন কর্ম্মকেই বিশেষভাবে উপাসনাখ্য বলিয়া পৃথক করা যাইতে পারে না। তাঁহার নিকট উপাস্য, উপাসক, উপাসনা সবই এক; তথাপি অদ্বৈতীও স্বীকার করেন যে, ভগবদ্‌গুণ-বর্ণনা ও প্রার্থনায় সাধকের চিত্তশুদ্ধি হয়। কারণ, একথা স্পষ্টই বুঝা যায় যে, অন্য সকল উপায় অপেক্ষা ঈশ্বর-চিন্তা দ্বারাই অহং-জ্ঞানকে সহজে দমন করিয়া রাখা যায়। সুতরাং উপাসনা উচ্চতর আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রথম সোপান বলিয়া বিবেচিত হয়। কিন্তু স্বামিজী কর্ম্ম বা নরসেবাকেও ঠিক এই পৌর্ব্বাপর্য্য-সম্বন্ধে সম্বদ্ধ বলিয়া জ্ঞান করিতেন, এইরূপ বোধ হয়। চিত্তশুদ্ধির অর্থ—স্বার্থপরতা নিঃশেষে দগ্ধ হইয়া যাওয়া। উপাসনা করা—ব্যবহার করা বা খাটাইয়া লওয়ার ঠিক বিপরীত ভাব বটে,

কিন্তু সেবা বা দানও ইহার অপর একটী বিপরীত ভাব। এইরূপে তিনি সাহায্যদান-ব্যাপারটীকে ত পবিত্রতামণ্ডিত করিলেনই, অধিকন্তু মানবের নামও পবিত্রতাময় করিয়া তুলিলেন। এমন কি, আমি একজন শিষ্যের কথা জানি যিনি এই সঙ্ঘ স্থাপিত হইবার অনতিকাল পরেই এই ভক্তির আবেগে এতদূর পূর্ণ হইয়াছিলেন যে, তিনি কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্তগণের যাতনা উপশম করিবার জন্য তাহাদের ক্ষতগুলি চুষিয়াছিলেন। অবশ্য, পীড়িতগণের সেবাশুশ্রূষা ও দরিদ্র-গণকে ভোজনদান প্রথম হইতেই শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তানগণের স্বাভাবিক কার্য্য ছিল। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দের পাশ্চাত্ত্য হইতে প্রত্যা-বর্ত্তনের পর এই কার্য্যগুলি বিপুলতর আকার ধারণ করিল। তাঁহারা উহাদিগকে জাতীয় দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলেন। দুর্ভিক্ষ-পীড়িত স্থানসমূহে সাহায্য দিবার জন্য, কোন বিশেষ সহরে স্বাস্থ্যবিধিগুলি পালন করাইবার জন্য, অথবা কোন তীর্থে ব্যাধিগ্রস্ত ও মুমূর্ষুগণকে সেবাশুশ্রূষা করিবার জন্য, মঠ হইতে লোক পাঠান হইতে লাগিল। একজন মুর্শিদাবাদে একটী অনাথাশ্রম ও শিল্প-বিদ্যালয় খুলিলেন; অপর একজন দাক্ষিণাত্যে একটী শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করিলেন। স্বামিজী বলিয়াছিলেন যে, ইহারা ধর্ম্মবাহিনীর জঙ্গল-সাফ-করা ও রাস্তা-তৈয়ার-করা দল (sappers and miners)। তাঁহার সঙ্কল্প কিন্তু এতদপেক্ষা অনেক ব্যাপক ছিল। ভারতীয় নারীকুলের শিক্ষাবিধান এবং দেশের মধ্যে বিজ্ঞান ও শিল্পশিক্ষাবিস্তারের আকাঙ্ক্ষা তাঁহার ষোল আনা হৃদয় অধিকার করিয়াছিল। পরার্থে কর্ম্ম করিবার প্রবৃত্তি হইতে দুঃখভোগের ক্ষমতা কত বৃদ্ধি পায়, তাহা কেবল ভুক্তভোগীরাই

বুঝেন। যে 'ত্রিশ কোটী টাকা' পাইলে তিনি ভারতবর্ষকে তাহার পায়ের উপর দাঁড় করাইয়া দিতে পারিতেন বলিতেন, তাহা না আসিয়া জুটায় সত্যসত্যই কি (সময়ে সময়ে তাঁহার যেরূপ মনে হইত) তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য বিফল হইয়াছিল? অথবা ইহা কোন উচ্চতর বিধানসমূহেরই খেলা, যাহাতে অন্তিমে তিনি এক জীবনে যে কিছু সাফল্য লাভ করিতে পারিতেন তদপেক্ষা অনেক অধিক সফলতা আনয়ন করিবে?

তাঁহার দৃষ্টি যেমন ব্যাপক, তেমনি গভীর ছিল। ভারতে যে উন্নতির প্রবর্ত্তন করিতে হইবে, তাহার উপাদানগুলিকে তিনি বিশ্লেষণ করিয়া দেখিয়াছিলেন যে, ভারতকে একটী অভিনব আজ্ঞাবহতার আদর্শ শিক্ষা করিতে হইবে। এইহেতু, ধর্ম্মবিষয়ক স্বাধীনতার সকল প্রচলিত ধারণার প্রতিকূল হইলেও, মঠটী সঙ্ঘ-বন্ধনের ভিত্তির উপর স্থাপিত হইল। এখন হাজার নূতন নিত্য-ব্যবহার্য্য জিনিসকে ধীরে ধীরে প্রকৃতিগত করিয়া লইতে হইবে। সেইহেতু তিনি নিজে খুব সাধাসিধাভাবে থাকিতে অভ্যস্ত থাকিলেও, দুই-তিনটী ঘর আসবাবে সজ্জিত হইল। মাটী খোঁড়া, বাগান করা, দাঁড় টানা, ব্যায়াম ও গবাদি পালন—এইগুলি ক্রমে ক্রমে তরুণ ব্রহ্মচারিগণের ও তাঁহার নিজের জীবনের অঙ্গীভূত হইল। তিনি আবার পূর্ণ উৎসাহের সহিত কূপখনন বা পাঁউরুটী প্রস্তুত-করণাদি গুরুতর সমস্যার সমাধানার্থ দীর্ঘ পরীক্ষাপরম্পরাতেও যোগদান করিতেন। তাঁহার জীবনের শেষ চড়কপূজাদিবসে একটী ব্যায়ামসমিতি মঠে ক্রীড়া দেখাইয়া পারিতোষিকলাভের জন্য আগমন করেন। স্বামিজী এতদুপলক্ষ্যে বলেন যে, তাঁহার ইচ্ছা,

(খৃষ্টানদের লেণ্ট-স্থানীয় *) এই হিন্দু পার্ব্বণটী অতঃপর বিশেষ বিশেষ ব্যায়ামপ্রদর্শন দ্বারা সুসম্পন্ন হউক। তাঁহার মতে, যে শক্তিটা এতাবৎকাল শরীর-নিগ্রহে ব্যয়িত হইয়া আসিয়াছে, তাহাকে বর্ত্তমান অবস্থাদৃষ্টে পেশিসমূহের উন্নতিকল্পে নিয়োজিত করিলে উহার সদ্ব্যবহারই করা হইবে।

পাশ্চাত্ত্যগণের নিকট ইহা অনায়াসেই প্রতীয়মান হইতে পারে যে, স্বামিজীর জীবনে ইহার মত প্রশংসার্হ আর কোন কিছুই নাই। বহুপূর্ব্বে তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের উচ্চতম আদর্শগুলিকে জীবনে প্রতিফলিত করিয়া উহাদিগের পরস্পর বিনিময় সংঘটন করাকেই শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের বিশেষ কার্য্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। আর এই বিষয়ে তিনি যেমন শিক্ষাদানসামর্থ্য দ্বারা, তেমনি শিক্ষা-গ্রহণসামর্থ্য দ্বারাও নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রমাণিত করিয়াছিলেন যে, তাঁহার এবংবিধ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার শক্তি আছে। কিন্তু তিনি যে সময়ে সময়ে নিজেই নিজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া মর্ম্মযাতনা ভোগ করিবেন, ইহা ত অনিবার্য্য। হিন্দুগণ আদর্শ ধর্ম্মজীবন বলিতে ইহাই বুঝেন যে, উহা সেই শুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব, সদা সাক্ষিস্বরূপ, অচল-অটল-অস্পর্শ, পরব্যোমে অবস্থিত দেবদেবেরই এই মর্ত্ত্যধামে প্রতিফলিত প্রতিচ্ছায়াস্বরূপ। এই ধারণা তাঁহাদের মনে এত সুস্পষ্ট ও বদ্ধমূল যে, কেহ নিজে মানসিক দ্বন্দ্বরূপ বিপুল ক্ষতিস্বীকার না করিয়া এই আদর্শকে অন্য কোন নূতন মার্গে লইয়া যাইতে পারেন না। কোন ভাস্করকে একটী নূতন আদর্শের প্রবর্ত্তনা

* Lent—ভগবান ঈশার উপবাসের স্মরণার্থ খৃষ্টানদিগের মধ্যে প্রচলিত চল্লিশদিনব্যাপী উপবাস।

করিতে হইলে কি মানসিক যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয়, তাহা কেহ অনুভব করিয়াছেন কি? সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয় ধরিবার ও অনুভব করিবার যে ক্ষমতা তাঁহার কার্য্যসাধনের জন্য অত্যাবশ্যক, যে নৈতিক উচ্চাবস্থা তাঁহার হাতের বাঁটালিস্বরূপ, তাহারাই আবার তাঁহার অবসরমুহূর্ত্তগুলিতে সন্দেহ ও গুরুতর দায়িত্ববোধরূপে তাঁহাকে চাপিয়া ধরে। সুতরাং এরূপ ব্যক্তির নিকট, যাঁহাদের জীবন অতিকঠোর হইলেও জনসাধারণের অনুকরণ-প্রবণ নৈতিক জ্ঞান দ্বারা আয়ত্তীকৃত ও সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে, তাঁহাদের জীবন কত সুখময় বলিয়া বোধ হয়! অনেক স্থলেই আমি দেখিয়াছি, যেন বোধ হয় আমাদের জীবনে দুইগাছি সূত্র ঘনিষ্ঠভাবে মিলিত হইয়া রহিয়াছে—একগাছি, যাহা আমরা স্বেচ্ছায় করি; অপরগাছি, যাহা আমরা সহ্য করিয়া যাই। কিন্তু এক্ষেত্রে এই দ্বন্দ্ব দুইটী পৃথক আদর্শের মধ্যে ঘাতপ্রতিঘাতের আকারে প্রকাশ পাইয়াছিল—ইহাদের প্রত্যেকটীই নিজ নিজ জগতে সর্ব্বোচ্চ স্থান পাইয়া থাকে, কিন্তু প্রত্যেকেই প্রতিপক্ষ মতাবলম্বীর পক্ষে প্রায় পাতকতুল্য।

কথনও কথনও কোন সহচরের নিকট তিনি হয়ত অন্যমনস্ক-ভাবে দুই-একটী কথা বলিয়া ফেলিতেন; তাহা হইতেই এই ভিতরের সঙ্ঘর্ষ ধরা পড়িত। একদিন তিনি খেতড়ীরাজের সহিত অশ্বারোহণে যাইতেছিলেন, এমন সময় দেখিলেন রাজার হাত কাটিয়া খুব রক্ত পড়িতেছে; এবং জানিতে পারিলেন যে, তিনি যাহাতে নিরাপদে যাইতে পারেন তজ্জন্য রাজা একটী কাঁটা-ডাল সরাইয়া ধরাতেই ঐরূপ হাত কাটিয়া গিয়াছে। স্বামিজী ভৎর্সনা করিলে রাজপুতবীর ব্যাপারটীকে এই বলিয়া হাসিয়াই উড়াইয়া

দিলেন, "স্বামিজী, আমরা কি চিরকালই ধর্ম্মের রক্ষাকর্ত্তা নহি?" গল্পটী বলিয়া স্বামিজী আরও বলিলেন, "দেখ, তারপর আমি তাঁহাকে বলিতে যাইতেছিলাম, 'আপনাদের একজন সন্ন্যাসীকে এত সম্মান দেখান উচিত নহে,' এমন সময়ে হঠাৎ আমার মনে হইল যে, সব দিক দেখিলে হয়ত তাঁহারাই ঠিক করিতেছেন। কে জানে! হয়ত আমিও তোমাদের এই আধুনিক সভ্যতার ক্ষণস্থায়ী অত্যুজ্জ্বল ছটার মধ্যে পড়িয়া গিয়াছি!" একজন তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "আমার মতে, যিনি চতুর্দ্দিকে জ্ঞান বিস্তার করিতে করিতে যদৃচ্ছা ভ্রমণ করিতেন এবং একস্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করিবার সময় নাম পরিবর্ত্তন করিতেন, সেই 'রমতা সাধু'ই বহুচিন্তা ও বহুকার্য্য-ভারপীড়িত বেলুড় মঠের মোহান্ত অপেক্ষা বড় ছিলেন।" এতদুত্তরে তিনি শুধু এই কথা কয়টী বলিয়াছিলেন, "আমি জড়াইয়া পড়িয়াছি।" জনৈক আমেরিকাবাসিনী আমায় যে গল্পটী বলিয়াছিলেন, তাহাও আমার মনে আছে। তাঁহার স্বামী এই অদ্ভুত অতিথিকে বুঝাইয়া বলিয়াছিলেন, "আপনাকে এস্থান হইতে চিকাগো যাইতে হইবে; আমি আহ্লাদপূর্ব্বক অর্থ দিতেছি; আমরা আপনার মুখ হইতে ধর্ম্মবিষয়ক বক্তৃতা শুনিতে পাইলে কৃতার্থ হইব।" উক্ত মহিলা বলিয়াছিলেন, "এই কথা শুনিবামাত্র তাঁহার মুখখানি এমন হইয়া গেল যে, তাহা মনে করিতেও কষ্টবোধ হয়। ইহাতে যেন তাঁহার শরীরাভ্যন্তরস্থ কোন কিছু তখনই তখনই ছিঁড়িয়া গেল, যাহা আর কখনও জোড়া লাগিবার নহে।" পাশ্চাত্যে একদিন তিনি মীরাবাইয়ের গল্প করিতেছিলেন। মীরাবাই এক সময়ে চিতোরের রাণী ছিলেন, আবার পরে উচ্চ আধ্যাত্মিক অবস্থা লাভ

করিয়াছিলেন। তাঁহার স্বামী তাঁহাকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিবেন বলিয়াছিলেন, শুধু তাঁহাকে রাজান্তঃপুর মধ্যে থাকিতে হইবে। কিন্তু কেহ তাঁহাকে বাঁধিতে পারিল না। শ্রোতৃবর্গের মধ্যে একজন বিস্ময়-সহকারে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "কিন্তু কেন তিনি থাকিবেন না?" স্বামিজীও উত্তরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন থাকিবেন? তিনি কি এ জগতের এই পচা পাঁকের মধ্যে থাকিতেন?" শ্রোতাও সহসা স্বামিজীর মনের ভাব বুঝিতে পারিলেন, এবং সামাজিক জীব হিসাবে জীবনযাপনে কত অসংখ্য অবান্তর-সম্বন্ধ ও ঘাতপ্রতিঘাতের সৃষ্টি হয়, এবং উহা যে অসহ্য বন্ধন ও তীব্র অন্তর্দ্দাহের কারণ হয়, তাহাও তিনি বুঝিতে পারিলেন।

এইরূপে, ধর্ম্মাচার্য্য হিসাবে স্বামিজী রবিকরোদ্ভাসিত অম্বরবৎ অনাবিলতা ও শিশুসুলভ শান্তি দ্বারা মণ্ডিত থাকিলেও, তাহার সঙ্গে সঙ্গেই আমি তাঁহার স্বদেশে আসিয়া এই দেখিতে পাইলাম যে, আর একদিক হইতে দেখিলে তিনি একেবারে পুরাদস্তুর মানব-ভাবাপন্ন। আর, এই ক্ষেত্রে, যদিও তাঁহার চেষ্টা-সমূহের ফল আমাদের অনেকেরই অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর বা অধিকতর স্থায়ী হইত, তথাপি ঐসকল ফল পাইবার জন্য তাঁহাকেও ঠিক আমাদেরই ন্যায় অন্ধকার ও অনিশ্চয়তার মধ্যে দীর্ঘ শ্রম স্বীকার করিয়া, কালে-ভদ্রে আলোকের সাক্ষাৎ লাভ করিতে হইত। প্রায়ই, বিফলপ্রযত্ন হইয়াছি, এইরূপ ধারণার হস্ত হইতে কিছুতেই অব্যহতি না পাওয়ায়, প্রায়ই, যে দেহরূপ যন্ত্রসাহায্যে তাঁহাকে কার্য্য করিতে হইতেছে ও যাহাদিগকে তিনি গড়িয়া পিটাইয়া মানুষ করিয়া তুলিতে চাহিতেছেন, এই উভয়ই, তাঁহার মনের মত না হওয়ায়,

তাঁহাকে যে সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে হইতেছিল, তাহাতে অত্যন্ত বিরক্তি বোধ করিতে থাকায়, যেমন বৎসরের পর বৎসর যাইতে লাগিল, ভবিষ্যতের জন্য ধরাবাঁধা মতলব আঁটিবার, অথবা যেসকল বিষয় অজ্ঞাত, তৎসম্বন্ধে নিশ্চিতভাবে কিছু বলিবার সাহসও তাঁহার ক্রমশঃ কমিয়া যাইতে লাগিল। একবার তিনি বলিয়াছিলেন, "সব দিক ভাবিয়া দেখিলে, সত্যই আমরা জানি কি? মা-ই সব জিনিস নিজের ইচ্ছামত ব্যবহার করিতেছেন। আমরা শুধু আনাড়ীর মত হাতড়াইয়া বেড়াইতেছি।" সম্ভবতঃ মহাপুরুষগণের জীবনের এই অংশটী তাঁহাদের জীবনচরিতকারগণ বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করিতে পরাঙ্মুখ হইয়াছেন। তথাপি শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে আমরা তাঁহার জগদীশ্বরীর প্রতি নিম্নলিখিত অনুযোগবাক্য হইতেই ইহার কিঞ্চিৎ আভাস প্রাপ্ত হই—"মা, এ কি করলি? আমার সব মনটা এই ছেলেগুলোর উপর পড়েছে যে, মা!" আর 'ধম্মপদের' একাদশ অধ্যায়ে, ঘটনাটীর পর চতুর্ব্বিংশতি শতাব্দী অতীত হইয়া যাইলেও, আমরা এখনও আর একজন আচার্য্যের চিত্ত-মহাহ্রদের তটভূমিতে ঐরূপ ঝঞ্ঝাসমূহেরই তরঙ্গাভিঘাত-চিহ্ন দেখিতে পাই।*

---

* অনেকজাতি-সংসারং সন্ধাবিস্‌সম্ অনিব্বিসং।
গহকারকং গবেসন্তো দুক্খা জাতি পুনপ্পুনং॥
গহকারক দিট্‌ঠোসি পুন গেহং ন কাহসি।
সব্বা তে ফাসুকা ভগ্‌গা গহকূটং বিসংখিতং।
বিসংখারগতং চিত্তং তন্‌হানং খয়মজ্‌ঝগা॥

—আমি এই দেহরূপ গৃহের নির্ম্মাণকর্ত্তাকে অন্বেষণ করিতে করিতে বহু জন্মজন্মান্তর

কিন্তু একটী জিনিস আচার্য্যদেবের প্রকৃতিতে বদ্ধমূল ছিল—যাহাকে তিনি কিরূপে ঠিকমত রাখিবেন, তাহা নিজেই জানিতেন না। উহা তাঁহার স্বদেশপ্রেম এবং স্বদেশের দুর্দ্দশার প্রতীকারেচ্ছা। কয়েক বৎসর ধরিয়া আমি তাঁহাকে প্রায় প্রত্যহ দেখিতে পাইতাম; দেখিতাম, ভারতের চিন্তা তাঁহার নিকট শ্বাসপ্রশ্বাসস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। সত্য বটে, তিনি কোন বিষয়ের উন্নতি করিতে চাহিলে একেবারে উহার মূলে না গিয়া ছাড়িতেন না; তিনি 'জাতীয়ত্ব' শব্দটীও ব্যবহার করিতেন না, বা বর্ত্তমান যুগকে 'জাতিগঠনের'ই যুগ বলিয়াও ঘোষণা করিতেন না; তিনি বলিতেন, 'আমার কাজ মানুষ গড়া।' কিন্তু তিনি প্রেমিকের হৃদয় লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, আর জন্মভূমিই তাঁহার আরাধ্যদেবতা ছিল। একটী ঘণ্টাকে চারিদিকের ভার সমান করিয়া নিপুণভাবে ঝুলাইয়া রাখিলে যেমন উহা যেকোন শব্দ দ্বারা তাড়িত হইবামাত্র ঝঙ্কৃত ও স্পন্দিত হইয়া উঠে, তাঁহার জন্মভূমিসংশ্লিষ্ট সকল ব্যাপারেই তাঁহার হৃদয়ও সেইরূপ হইত। ভারতের চতুঃসীমার মধ্যে যেকোন কাতরধ্বনি উঠিত, তাহাই তাঁহার হৃদয়ে প্রতিধ্বনিরূপ উত্তর পাইত। ভারতের প্রতি ভীতিমূলক চীৎকার, দুর্ব্বলতাপ্রসূত গাত্রকম্প, অপমানজনিত সঙ্কোচবোধই, তিনি জানিতেন এবং

পরিগ্রহ করিয়াছি। হায়, পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ কি দুঃখদায়ক! হে গৃহনির্ম্মাণ-কারিণী তৃষ্ণে, আমি তোমায় দেখিতে পাইয়াছি। আর তুমি গৃহনির্ম্মাণ করিতে পারিবে না। তোমার গৃহের সমস্ত পার্শ্বক (চালের 'রুয়া') ভগ্ন হইয়াছে এবং শীর্ষকাষ্ঠ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। আমার চিত্ত সংস্কারবিহীন হইয়া তৃষ্ণা-সকলের ক্ষয়সাধন করিয়াছে।—ধম্মপদ

বুঝিতেন। তিনি ভারতকে তাহার পাপাচরণ-সমূহের জন্ত তীব্র তিরস্কার করিতেন, তাহার সাংসারিক অনভিজ্ঞতার উপর খড়্গাহস্ত ছিলেন; কিন্তু সে কেবল তিনি ঐ দোষগুলিকে তাঁহার নিজেরই দোষ মনে করিতেন বলিয়া। পক্ষান্তরে, কেহই আবার তাঁহার ন্তায় ভারতের ভাবী মহিমা-কল্পনায় অভিভূত হইতেন না। তাঁহার নিকট ভারত ইংরেজী সভ্যতার প্রসূতি বলিয়া প্রতিভাত হইত। তিনি বলিতেন, "দেখ না কেন, আকবরের ভারতের তুলনায় এলিজাবেথের ইংলণ্ড কি ছিল? শুধু তাই বা কেন, ভারতবর্ষের ধনভাণ্ডার পিছনে না থাকলে ভিক্টোরিয়ার ইংলণ্ডই বা কি হত? তার সভ্যতা কোথায় থাকত? তার অভিজ্ঞতা কোথায় থাকত?") তাঁহার মুখ হইতে স্বদেশের ধর্ম্ম, ইতিহাস, ভূগোল ও জাতিতত্ত্বের কথা অবিরত ধারায় প্রবাহিত হইত। ব্যষ্টি ও সমষ্টি উভয় ভাবেই তিনি ভারতীয় প্রসঙ্গে কথা কহিতে সমান আনন্দ অনুভব করিতেন— অথবা তাঁহার শ্রোতৃবর্গের নিকট এইরূপই বোধ হইত। এমন কি, সময়ে সময়ে এমনও হইত যে, যদি কেহ স্বামিজী ইতিপূর্ব্বে যাহা বলিয়াছেন, তাহাই মনে রাখিতে ইচ্ছা করিতেন, তাহা হইলে আর অধিক শুনা তাঁহার শক্তিতে কুলাইত না। কিন্তু আবার যদি কেহ উহাদিগকে সম্বদ্ধভাবে মনে রাখিবার চেষ্টা না করিতেন, তাহা হইলে তিনি দেখিতে পাইতেন, আরও দুই ঘণ্টা কাল ধরিয়া স্ত্রীজাতির উত্তরাধিকারবিষয়ক আইনগুলির, অথবা বিভিন্ন প্রদেশের জাতিগত আচারব্যবহারের খুঁটিনাটিগুলির, অথবা কোন জটিল অধ্যাত্মবাদ বা ধর্ম্মতত্ত্বের, অবিশ্রান্ত ধারায় বিশ্লেষণ চলিয়াছে।

তাঁহার এইসকল কথোপকথনে রাজপুতগণের বীরত্ব, শিখদিগের বিশ্বাস, মারহাট্টাগণের শৌর্য্য, সাধুদিগের ঈশ্বরভক্তি, এবং মহানুভাবা নারীগণের পবিত্রতা ও নিষ্ঠা—এইসব যেন পুনর্জ্জীবিত হইয়া উঠিত। আর মুসলমান যে এই প্রসঙ্গে বাদ পড়িবেন, তাহা তিনি হইতে দিতেন না। হুমায়ুন, সের শা, আকবর, সাজাহান—ইঁহাদের এবং আরও একশত লোকের নাম তিনি কোন-না-কোন দিন এই ইতিহাসপৃষ্ঠোজ্জলকারী নামাবলীর আবৃত্তিপ্রসঙ্গে যথাস্থানে উল্লেখ করিতেন। এই তিনি অদ্যাপি দিল্লীর রাস্তায় রাস্তায় গীত, তানসেনরচিত আকবরের সিংহাসনাধিরোহণবিষয়ক গানটী তানসেনেরই সুরলয়ে আমাদিগকে গাহিয়া শুনাইতেছেন, এই আবার বুঝাইয়া দিতেছেন যে, মোগলবংশে বিবাহিতা হিন্দুরমণীগণ বিধবা হইলে কখনও দ্বিতীয়বার বিবাহ করিতেন না—তাঁহারা হিন্দুরমণীর ন্যায় পূজাপাঠে মগ্ন থাকিয়াই জীবনের সঙ্গহীন বর্ষগুলি যাপন করিতেন। অন্য এক সময়ে তিনি, যাঁহার মহতী প্রতিভা মুসলমান পিতা ও হিন্দু মাতা হইতে ভারতীয় সম্রাটগণের জন্ম হওয়া উচিত, এইরূপ বিধান করিয়াছিলেন, সেই জাতীয় গৌরব আকবরের কথা কহিতেন।/ আবার এক সময়ে তিনি আমাদিগের নিকট সিরাজুদ্দৌলার উজ্জল, কিন্তু গ্রহবৈগুণ্যে ক্ষণস্থায়ী, রাজত্বের বর্ণনা করিতেন—কিরূপে পলাশী ক্ষেত্রে হিন্দুসেনাপতি মোহনলাল, বিশ্বাসঘাতকতাবশতঃ প্রদত্ত একটী আদেশশ্রবণে, "তাহা হইলে আজিকার যুদ্ধে জয়াশা নাই!"—এই আক্ষেপোক্তি করিয়া অশ্বসমেত গঙ্গায় ঝাঁপ দিলেন; আর কিরূপে সিরাজের সতীসাধ্বী স্ত্রী নিজ আত্মীয়স্বজনগণের মধ্যে বৈধব্যের শ্বেতবাস পরিধান করিয়া

দীর্ঘ বর্ষের পর বর্ষ পরলোকগত স্বামীর কবরের উপর দীপদান করিয়া যাইতেন।— আমরা রুদ্ধশ্বাসে তাঁহার মুখে এইসকল কথা শ্রবণ করিতাম, এবং শুনিতে শুনিতে উক্ত দৃশ্যগুলি যেন আমাদের প্রত্যক্ষগোচর হইয়া উঠিত।

কখনও কখনও কথোপকথন অপেক্ষাকৃত কৌতুকপরিহাসময় হইত। কোন সামান্য ঘটনা হইতেই ঐরূপ হইত। কোন মিষ্টান্নপ্রাপ্তি, অথবা মৃগনাভি বা জাফরানের মত কোন দুর্লভ বস্তুলাভ, অথবা এতদপেক্ষাও সামান্য ঘটনাই উহার সূত্রপাত করিয়া দিবার পক্ষে যথেষ্ট হইত। পাশ্চাত্ত্যে অবস্থানকালে আর একবার তিনি, প্রদোষে কোন ভারতীয় গ্রামের বহির্ভাগে কিয়দ্দূরে দাঁড়াইয়া ক্রীড়ারত বালকবালিকাগণের তন্দ্রাজড়িত কোলাহল, সন্ধ্যারতির কাঁসর-ঘণ্টাধ্বনি, গোপালকগণের চীৎকার এবং স্বল্পকালস্থায়ী গোধূলির আধ-অন্ধকারে শ্রুত অস্ফুট কণ্ঠস্বর— এই-সকল সান্ধ্য আওয়াজ পুনরায় শুনিবার জন্য তিনি কত উৎসুক হইয়াছিলেন, তাহা আমাদিগকে বলিয়াছিলেন। বঙ্গদেশে আশৈশব তিনি যাহা শুনিয়া আসিয়াছেন, সেই আষাঢ়ের বারিপাতশব্দ শুনিয়া তাঁহার দেশের জন্য কত মন কেমন করিয়াছিল! বৃষ্টি, অথবা জলপ্রপাত, অথবা সমুদ্রের জলের শব্দ তাঁহার নিকট কত বিস্ময়কর বলিয়া বোধ হইত! একবার তিনি দেখিয়াছিলেন, একটী জননী উপলখণ্ড হইতে উপলখণ্ডান্তরে পাদবিক্ষেপ করিয়া একটী পার্ব্বত্য তটিনী পার হইতেছেন, আবার উহারই মধ্যে এক একবার মুখ ফিরাইয়া পৃষ্ঠস্থিত শিশুসন্তানটীকে খেলা দিতেছেন ও আদর করিতেছেন। এই দৃশ্যটীই তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর দৃশ্য বলিয়া

মনে পড়িত। তাঁহার চক্ষে, হিমালয়ের অরণ্যানীমধ্যস্থ এক পর্ব্বতপৃষ্ঠে শয়ন করিয়া, নিম্নে স্রোতস্বিনীর অবিরাম 'হর হর' ধ্বনি শুনিতে শুনিতে শরীর ছাড়িয়া দেওয়াই আদর্শ-মৃত্যু।

স্পাইর‍্যালের (ক্রমসূক্ষ্মাকার পেঁচের) বেড়গুলি যেমন ঘুরিয়া ঘুরিয়া মোটা হইতে ক্রমশঃ সরু হইয়া উঠিতে উঠিতে শেষে এক বিন্দুতে পর্য্যবসিত হয়, স্বামিজীর স্বদেশভক্তিরূপ আবেগও যেন সেইরূপ একটী বিরাট বস্তু ছিল; স্বদেশের মৃত্তিকার প্রতি ভালবাসা ও নিসর্গপ্রেমই ছিল উহার সর্ব্বনিম্ন বেড়গুলি; জাতি, অভিজ্ঞতা, ইতিহাস এবং চিন্তা—এইসকল-সম্পর্কীয় যাহা কিছু, সমস্তই উহার পরবর্ত্তী বেড়গুলির অন্তর্গত; আর সমস্তটী সরু হইয়া আসিয়া একটীমাত্র নির্দ্দিষ্ট বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত। ভারত যে উহার সমালোচকগণের ধারণামত স্থবির ও জীর্ণ হইয়া পড়ে নাই, পরন্তু যুবাবস্থই আছে এবং উহার ভাবী সমৃদ্ধি-বীজ যে পরিপক্ক হইয়াছে, আর উহা যে, এই বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে, পূর্ব্বে যাহা কখনও হয় নাই, এরূপ এক মহান বিকাশের পথে পদার্পণ করিয়াছে—এই দৃঢ় বিশ্বাসই ঐ কেন্দ্রস্থানীয় বিন্দু। কিন্তু একবারমাত্র আমি তাঁহাকে এই ভাব কথায় প্রকাশ করিতে শুনিয়াছি। খুব শান্তিপূর্ণ একটী মুহূর্ত্তে তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি নিজেকে বহুশতাব্দীর পর আবির্ভূত পুরুষ বলিয়া অনুভব করিতেছি। আমি দেখিতেছি যে ভারত যুবাবস্থ।" কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁহার প্রত্যেক কথাটীতে এই উপলব্ধির পরিচয় পাওয়া যাইত। তাঁহার প্রত্যেক গল্পটীতে ইহার স্পন্দন অনুভূত হইত। যাহা কিছু ভারতসংক্রান্ত তাহার জন্য ন্যূনতা স্বীকার করাকে তিনি সর্ব্বান্তঃকরণে ঘৃণা

করিতেন, আর কোন মিথ্যা অপবাদ বা অবজ্ঞাসূচক সমালোচনার তীব্র প্রতিবাদ করিতে করিতে, অথবা কিরূপ বিশ্বাস ও ভালবাসা লইয়া স্বদেশসেবায় প্রবৃত্ত হওয়া উচিত, তন্ময়ভাবে এই বিষয়ে কাহাকেও শিক্ষা দিতে দিতে (অবশ্য, এই বিশ্বাস ও ভালবাসা তাঁহার নিজের বিশ্বাস ও ভালবাসার ক্ষীণ প্রতিচ্ছায়া হওয়া ব্যতীত কখনও আর কিছুই হইতে পারিত না), কতবারই না মনে হইত, তাঁহার সন্ন্যাসীর পরিচ্ছদ খসিয়া পড়িয়া গিয়াছে, এবং তাহার ভিতর হইতে যোদ্ধার বর্ম্ম বাহির হইয়া পড়িয়াছে!

তাই বলিয়া কেহ যেন ইহা না মনে করেন যে তিনি এইসকল বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে কতটা প্রলোভনও আসিয়া যায়, তদ্বিষয়ে অজ্ঞ ছিলেন। তিনি যখন সবেমাত্র শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছেন, সেই সময়ে তাঁহার গুরুদেব তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, "সত্য বটে, তার মনের উপর অজ্ঞানের একটা পর্দ্দা আছে। সেটুকু আমার ব্রহ্মময়ী মা-ই রেখে দিয়েছেন, তাঁর কাজ হবে বলে। কিন্তু সেটা ফিনফিনে কাগজের মত পাত্‌লা, নিমেষেই ছিঁড়ে ফেলা যায়।" এইরূপে, যে ব্যক্তি গৃহপরিজন ত্যাগ করিয়া আসিয়াছে, সে যেমন উহাদিগের চিন্তাকে স্ববশে রাখিবার প্রাণপণ চেষ্টা করে, সেইরূপ তিনিও বার বার দেশ ও ইতিহাসঘটিত এইসকল চিন্তাকে দমন করিয়া, যাহাতে তিনি সকল দেশ ও সকল জাতির প্রতি সমদৃষ্টি, নিঃসম্বল, পরিব্রাজকমাত্র হইতে পারেন, তাহাই চেষ্টা করিতেন। কাশ্মীরে, তাঁহার জীবনের একটী মহান্ দর্শনলাভের পর প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তিনি শিশুর ন্যায় সরলভাবে বলিয়াছিলেন, "আর এরকম রাগ করা চলবে না। মা বললেন, 'বাঃ, যদিই বা ম্লেচ্ছ

আমার মন্দিরে ঢুকে আমার প্রতিমাসকল অপবিত্র করে, তাতে তোর কি? তুই আমাকে রক্ষা করিস্, না আমি তোকে রক্ষা করি?”

তাঁহার নিজের আদর্শ ছিলেন সিপাহী-বিদ্রোহ-কালের সেই সন্ন্যাসী, যিনি একজন ইংরেজ সৈনিক কর্ত্তৃক বিদ্ধ হইয়া পনর বৎসরের মৌন ভঙ্গ করিয়া তাঁহার ঘাতককে বলিয়াছিলেন, “মেরেছ তাতে কি? তুমিও তিনিই— তত্ত্বমসি।”

তিনি সর্ব্বদাই শ্রীরামকৃষ্ণের পদাঙ্কানুসারী হইতে চেষ্টা করিতেন, এবং তাঁহার নিজের কোন বাণীর উল্লেখ যেন তাঁহার নিকট অপরাধ বলিয়া বোধ হইত। এতদ্ভিন্ন, তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, যে শক্তি শুধু ভাবপ্রবণতায় ব্যয়িত হয়, তাহা বৃথাই নষ্ট হয়; শক্তিকে সংযত করিলেই তাহা সঞ্চিত হইয়া কর্ম্মরূপে প্রকাশ পায়। তথাপি, তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব লোককে দান করিবার প্রবল বাসনা তাহাকে অভিভূত করিত, এবং তিনি উহা জানিতে পারিবার পূর্ব্বেই আবার তাঁহার স্বদেশ ও স্বজাতি সম্বন্ধে প্রেম ও আশাপূর্ণ চিন্তাসকল চতুর্দ্দিকে ছড়াইতে থাকিতেন। এইসকল চিন্তাবীজ অনেক স্থলে, যেন তাঁহার অজ্ঞাতসারেই, উপযুক্ত ক্ষেত্রে পতিত হইয়াছে, এবং ইতিমধ্যেই ভারতের দূর-দূরান্তর প্রান্তসমূহে ইহাদের অঙ্কুরোদ্গমও হইয়াছে। যাঁহারা জন্মভূমির প্রতি ভক্তিবশতঃ তাঁহারই জন্য মনঃ-প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছেন, এরূপ ব্যক্তিগণই এই অঙ্কুর। শ্রীরামকৃষ্ণ যেরূপ কোন পুস্তক না পড়িয়াও বেদান্তের মূর্ত্তিমান সারনিষ্কর্ষ-স্বরূপ ছিলেন, শ্রীবিবেকানন্দও সেইরূপ জাতীয় জীবনের সারনিষ্কর্ষস্বরূপ ছিলেন। কিন্তু ইহার

বিচারমূলক ব্যাখ্যা সম্বন্ধে তিনি কিছুই জানিতেন না। তাঁহার গুরুদেবের প্রতি প্রযুক্ত তাঁহার নিজমুখের কথাতেই বলিতে হয়, "তিনি শুধু সেই মহৎ জীবন যাপন করিয়াই খুশী ছিলেন; তাহার ব্যাখ্যা অপরে খুঁজিয়া বাহির করুক!"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীরামকৃষ্ণসঙ্ঘ

গঙ্গাতটস্থ শষ্পাবৃত ভূমি ও তরুরাজির মধ্যেই আমি, যাঁহার কার্য্যে আমি ইতিপূর্ব্বেই জীবন সমর্পণ করিয়াছিলাম, সেই লোক-শিক্ষকের বিষয় সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জানিতে পারিয়াছিলাম। আমার ভারতবর্ষে পদার্পণের সময় (১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ২৮শে জানুয়ারী) বেলুড়ে সবেমাত্র একখণ্ড জমি ও একটী বাড়ী ক্রয় করা হইয়াছিল; উহাই পরে রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের মঠরূপে পরিণত হয়। আরও কয়েক সপ্তাহ পরে কতিপয় বন্ধু আমেরিকা হইতে আগমন করেন, এবং স্বভাবসুলভ নির্ভীকতার সহিত ঐ ধ্বংসাবশেষপ্রায় বাড়ীখানি অধিকার করিয়া উহাকে সাদাসিধা অথচ স্বচ্ছন্দবাসের উপযোগী করিয়া লয়েন। এই বন্ধুগণের অতিথিরূপে বেলুড়ে ঐখানে বাসকালে এবং পরে কুমায়ুন ও কাশ্মীরে ভ্রমণকালেই আমি তাঁহাদের সহিত ভারতবর্ষকে ভাল করিয়া চিনিতে ও স্বামিজী নিজদেশে নিজজনের মধ্যে কিরূপ জীবন যাপন করেন তাহা উত্তমরূপে লক্ষ্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম।

আমাদের বাড়ীখানি কলিকাতা হইতে কয়েক মাইল উত্তরে গঙ্গার পশ্চিমতীরে এক উচ্চ সমতল ভূমির উপর নির্ম্মিত ছিল। জোয়ারের সময় ছোট পান্সীগুলি (এইগুলিই গঙ্গাতীরবাসিগণের

পক্ষে গাড়ীর কাজ করে) একেবারে সিঁড়ির নীচেই আসিয়া লাগিত। আমাদের এবং অপর পারের গ্রামখানির মধ্যে নদীটী বিস্তারে অর্দ্ধ হইতে তিন-চতুর্থাংশ মাইল হইবে। উহার পূর্ব্বতটে আরও প্রায় এক মাইল উত্তরে দক্ষিণেশ্বরের মন্দির ও বৃক্ষশীর্ষগুলি দৃষ্টিগোচর হইত; এই মন্দির ও তৎসংলগ্ন উদ্যানেই স্বামিজী ও তাঁহার গুরু-ভ্রাতৃগণ বাল্যকাল্যে শ্রীরামকৃষ্ণপদপ্রান্তে বাস করিতেন। যে বাড়ীটী এই সময়ে মঠরূপে ব্যবহৃত হইত তাহা আমাদের বাড়ীখানির দক্ষিণে প্রায় অর্দ্ধ মাইল দূরে অবস্থিত ছিল। এই মঠ ও আমাদের মধ্যে অনেকগুলি বাগানবাড়ী এবং অন্ততঃ একটী জলনির্গমপ্রণালী ছিল। আধখানি তালগাছের তৈয়ারী এক পুলের উপর দিয়া উহা পার হইতে হইত; পুলটীকে দেখিলে, উহা ভার সহিতে পারিবে কিনা তদ্বিষয়ে সন্দেহ হইত। আমাদের এই বাড়ীখানিতেই স্বামিজী প্রতিদিন প্রাতঃকালে একাকী বা কতিপয় গুরুভ্রাতা সমভিব্যাহারে আগমন করিতেন। এইখানেই বৃক্ষতলে আমাদের প্রাতঃকালীন জলযোগ সমাপ্ত হইবার বহুক্ষণ পর পর্য্যন্ত আমরা বসিয়া বসিয়া একমনে স্বামিজীব সেই অফুরন্ত ব্যাখ্যাপ্রবাহ শ্রবণ করিতাম। ভাবতীয় জগতের কোন না কোন গভীর রহস্য তিনি ঐ কালে আমাদের নিকট উদ্‌ঘাটিত করিতেন। উহাতে কদাচিৎ প্রশ্নোত্তর স্থান পাইত। এই কালের কথা যখনই আমার স্মৃতিপথে উদিত হয়, আমি এই ভাবিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হই যে, কি প্রকারে এরূপ চিন্তা ও অভিজ্ঞতাসম্ভার সঞ্চয় করা যাইতে পারে, আবার সঞ্চয় করিলেই বা কি প্রকারে উহার বিতরণকালে এরূপ প্রবল শক্তি আসিতে পারে! যাঁহাদের উচ্চদরের কথোপকথনসামর্থ্য আছে তাঁহাদের

মধ্যেও স্বামিজীর একটী বিষয়ে বিশেষত্ব ছিল। কেহ কোন আপত্তি উত্থাপন করিলে তিনি কখনও বিন্দুমাত্র বিরক্তি প্রকাশ করিতেন না। তিনি যাঁহাদের সহিত বার্ত্তালাপ করিতেন তাঁহাদের মনোবৃত্তির সম্বন্ধেও উদাসীন থাকিতেন না। যাঁহারা একটী অব্যক্ত সহানুভূতি ও ভক্তির ভাব হইয়া কথোপকথনে যোগদান করিতেন, শুধু সেই-সকল শ্রোতার উপস্থিতিকালেই তাঁহার গভীরতম উক্তিগুলি শ্রবণ-গোচর হইত, কিন্তু তিনি স্বয়ং এ বিষয় জানিতে পারিতেন, এরূপ মনে হয় না। কোন বাহ্য ঘটনা যে তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে, এরূপ একেবারেই মনে হইত না। এমন অনেকবার ঘটিয়াছে যে তিনি উত্তেজিত হইয়া জোরের সহিত কথা কহিয়াছেন; কিন্তু ঐসকল অবস্থা তাঁহার মনের অতি মধুর অবস্থাগুলির ন্যায় কোন অজ্ঞাত-কারণসম্ভূত ছিল ; উহারা সম্পূর্ণরূপে সাধারণ কারণসমূহ হইতে উদ্ভূত হইত; কোন ব্যক্তিবিশেষ উহাদের কারণ নহে।

এইখানেই আমরা ভারতীয় চেষ্টাসমূহের সর্ব্বজনবিদিত মূলমন্ত্র কি এবং কি আদর্শ দ্বারা উহারা নিয়ন্ত্রিত, তাহা জানিতে পারিয়াছিলাম। কারণ কথোপকথনগুলিতে সর্ব্বোপরি বিভিন্ন আদর্শেরই ব্যাখ্যা হইত। একথা সত্য যে ইতিহাস সাহিত্য এবং অপর সহস্র স্থল হইতে ঘটনা ও দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করা হইত, কিন্তু উদ্দেশ্য সকল সময়েই সেই এক সিদ্ধি বা পূর্ণতালাভ-সম্বন্ধীয় কোন এক ভারতীয় আদর্শকে আরও বিশদ করা। আর এই আদর্শগুলিকে যত সহজবোধ্য মনে করা যাইত, সকল সময়ে তাহারা তত সহজবোধ্য হইত না। এই ভারতীয় জগতে পরোপকারপ্রবৃত্তি অপেক্ষা চিত্তৈকাগ্রতা-বিষয়েই সমধিক পুষ্টিসাধনচেষ্টা হইয়া থাকে,

কিন্তু ইহা ভারতের কল্যাণ অথবা অকল্যাণের হেতু, তাহা তর্কযুক্তি-সহায়ে প্রমাণ করিবার এখনও সময় আসে নাই। ব্যক্তিগত ব্যাপারে স্বামিজীর নির্ভীক উপদেশ এই যে, আমাদিগকে ব্যক্তিত্বের গণ্ডী ছাড়াইয়া ঐসকলের প্রতি দৃষ্টি করিতে হইবে। আমাদিগকে শত্রুর জন্যও প্রার্থনা করিতে হইবে, এই আদেশ অপেক্ষা 'সাক্ষিস্বরূপ হও' এই আদেশই অধিক শ্রুত হইত। জগতে আমার কোন শত্রু আছে, এইরূপ চিন্তা করাই এই মনীষীর চক্ষে দ্বেষবুদ্ধির প্রমাণ। তিনি বিশেষভাবে বলিতেন, প্রেম 'অহেতুক' না হইলে প্রেমই নহে; পাশ্চাত্ত্য বক্তা হইলে এই ভাবটীই 'উদ্দেশ্যবিরহিত' শব্দ দ্বারা প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিতেন, কিন্তু বোধ হয় তাহাতে বক্তার জোর কতকটা কমিয়া যাইত। ব্রহ্মচর্য্য ও ত্যাগের বিশ্লেষণ করিতে তিনি কখনও ক্লান্তিবোধ করিতেন না। আমাদের সকল চিন্তার মধ্যে বিরাজ করিতেন শ্রীমহাদেব, যাঁহাকে তাঁহার সৃষ্ট ত্রৈলোক্যের রাজত্ব বা পিতৃত্ব, ঐশ্বর্য্য বা সুখ, কিছুই প্রলোভিত করিতে পারে না; আবার যিনি সাংসারিক ব্যাপারে 'একজন অতি সাদাসিধা লোক,' যাঁহার কোন কৌতূহল নাই, যিনি সহজে প্রতারিত হন এবং যিনি প্রতিদিন লোকের দ্বারে দ্বারে তণ্ডুলমুষ্টি ভিক্ষা করেন। তিতিক্ষা ধর্ম্মজীবনের একটী চিহ্ন। আমরা পাশ্চাত্ত্য দেশে ইহার একটী উদাহরণ দেখিতে পাই সেই সাধুতে, যিনি কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত ছিলেন, এবং যিনি তাঁহার অঙ্গুলিপর্ব্বসমূহ হইতে কৃমিগুলি পড়িয়া যাইলে হেঁট হইয়া উহাদিগকে তুলিয়া, "খাও, ভাইসকল" বলিয়া যথাস্থানে স্থাপন করিয়া দিতেন। রঘুনাথের দর্শনলাভ জীবের চরমোৎকর্ষ-সমূহের

মধ্যে অন্যতম, এবং যে সাধুটী সম্মুখে কয়েকটী বলদকে তাড়িত হইতে দেখিয়া মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এবং যাঁহার পৃষ্ঠে সেই চাবুকের দাগগুলি ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তিনি উক্ত সিদ্ধাবস্থা লাভ করিয়াছিলেন। স্বামিজী আমাদিগকে আমাদের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় সকল পূর্ব্বধারণা হইতে আকাশপাতাল তফাৎ একটী ভাবকে হৃদয়ঙ্গম করিতে আহ্বান করিলেন; বলিলেন যে, (দেহবুদ্ধির একান্ত অভাবই পূর্ণ সাধুত্বের লক্ষণ।) এই দেহবোধরাহিত্য এত গভীর হয় যে, সাধু জানিতেই পারেন না তিনি উলঙ্গ হইয়া বসিয়া আছেন। কারণ, বিশেষ বিশেষ স্থলে নগ্নতারও একটী উচ্চতর অর্থ আছে বলিয়া সূক্ষ্মদর্শিগণ বুঝিতে পারেন। (পাশ্চাত্ত্যে উহার বিকাশ ললিত-কলায়; ভারতে উহার বিকাশ ধর্ম্মে।) আমরা যেমন একটী গ্রীক প্রতিমূর্ত্তির সম্মুখে সৌন্দর্য্যাদর্শের প্রতি শ্রদ্ধার ভাবই উপলব্ধি করি, হিন্দুও তেমনি উলঙ্গ সাধুতে শুধু মাহাত্ম্য ও বালকসুলভ পবিত্রতাই দেখেন।

কিন্তু এই নূতন চিন্তা-জগতে একটী আকাঙ্ক্ষা চিত্তৈকাগ্রতারই ন্যায় ধর্ম্মজীবনে মুখ্যভাবে এবং সকল বিষয়ে প্রযোজ্য বলিয়া গণ্য ছিল—উহা জীবাত্মার স্বাধীনতা। চিন্তা, মতামত এবং কার্য্য, এসকল বিষয়ের সমস্ত ছোটখাট অধিকারগুলিও উহার অন্তর্ভুক্ত। একমাত্র এই অধিকারটীকেই সাধুগণ নিজস্ব অধিকার বলিয়া সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিয়া থাকেন; একমাত্র এই সম্পত্তিটীতেই তাঁহারা কোন অনধিকার-প্রবেশ সহ্য করিতে পারেন না। আর দৈনন্দিন জীবনে এই ব্যাপারটীকে লক্ষ্য করিতে করিতে আমি দেখিলাম যে, ইহা একপ্রকার ত্যাগের ভাবেই দাঁড়াইয়া যায়।

যাহাতে বন্ধনশৃঙ্খল লুক্কায়িত রহিয়াছে, এমন কোন কিছু সুখকর হইলেও গ্রহণ না করা ; এক কথায়, যাহাতে বন্ধনের ইঙ্গিতও আছে এমন সকল সম্পর্ক ছেদন করিতে প্রস্তুত থাকা —যিনি এরূপ করিতে পারেন তাঁহার চিত্ত কিরূপ নির্ম্মল হওয়া চাই, ইচ্ছাশক্তি কিরূপ বিশুদ্ধ হওয়া চাই ! কিন্তু এই আদর্শ হইতেই আবার অনেক তথ্য সংগ্রহ করা যায়। ভারতবর্ষে সঙ্ঘবদ্ধ সন্ন্যাস-ধর্ম্মের অপেক্ষাকৃত অল্প পরিপুষ্টির যে ইহাই কারণ, তাহা কাহারও বুঝিতে বিলম্ব হয় না। কারণ প্রাচীনকালে ধর্ম্মজীবনের আদর্শ-স্থানীয় মহাপুরুষগণ সর্ব্বদা একাকী থাকিতেন, তা পরিব্রাজকই হউন, আর কুটীচকই হউন। আমাদের সন্নিকটস্থ মঠটীতে এমন সব লোক ছিলেন বলিয়া শুনিতে পাইতাম, যাঁহারা তাঁহাদিগের নেতার স্ত্রীলোকদিগের সহিত বাক্যালাপ করা পছন্দ করিতেন না ; অপর কতকগুলি লোক ছিলেন যাঁহাদের ক্রিয়াকাণ্ডমাত্রেই আপত্তি ছিল। একজনের ধর্ম্মকে শক্তিমানের পূজা দ্বারা প্রশমিত আস্তিকতা বলিয়া বর্ণনা করা যাইতে পারে ; অপর একজনের ধর্ম্ম তাঁহাকে এমন অনুষ্ঠানপরম্পরায় প্রবৃত্ত করিত, যাহা আমাদের অনেকেরই পক্ষে অসহ্য ভার বলিয়া বোধ হইবে ; কতকগুলি লোক মহা-মহাপুরুষ, ধ্যান ও অলৌকিক দর্শনাদির রাজ্যে বাস করিতেন ; অপর কতকগুলি লোক এইরূপ অর্থহীন ব্যাপার লইয়া মাথা না ঘামাইয়া তর্কের চুলচেরা বিচারসহায়ে আপন গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতেন। এইসমস্ত লোক যে ঘনিষ্ঠ ভ্রাতৃত্ববন্ধনে একত্র হইতে পারিয়াছেন, তাহা হইতেই তাঁহারা যে প্রত্যেক ব্যক্তির নিজ নিজ পথ নির্ব্বাচন করিয়া লইবার অধিকারে বিশ্বাসী ছিলেন, একথা

নির্ব্বিবাদে প্রতিপন্ন হয়। আবার আমি তখন এবং পরেও ইহা না ভাবিয়া থাকিতে পারি নাই যে, ভারতে প্রাচীন শাসনপদ্ধতিগুলির কোন কোন বিষয়ে বিফল হওয়ার কারণও উহাই। কারণ, যাহাতে শ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বাপেক্ষা নিঃস্বার্থ ব্যক্তিগণ নগর ও রাজ্যরক্ষা-সম্বন্ধীয় কার্য্যে আপনাদিগকে সম্যকরূপে নিয়োজিত করিতে পারেন, তজ্জন্য তাঁহাদের এরূপ ধারণা থাকা খুবই আবশ্যক যে, এবংবিধ সঙ্ঘবন্ধনকার্য্যই তাঁহাদের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ ও সম্মানজনক উদ্যম। কিন্তু প্রাচীনযুগের ভারতে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ অপেক্ষাকৃত দূরবর্তী আধ্যাত্মিক আদর্শসকলেই—এই স্বাধীনতাবোধও তাহাদের অন্যতম—এত তন্ময় হইয়া থাকিতেন যে, নগর ও রাষ্ট্রসংক্রান্ত সুনিয়ম-স্থাপনের প্রতি তাঁহারা আগ্রহান্বিত হইতেই পারিতেন না। আর ইহাতে আমাদের আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কিছুই নাই যে, তাঁহাদের ক্ষমতা ও চরিত্রবল থাকা সত্ত্বেও আধুনিক বিধিব্যবস্থার যে-সকল সুফল, তাহাদের কতকগুলিকে প্রমাণিত করিবার ভার আধুনিক লোকদিগেরই উপরে পড়িয়াছে। তথাপি এইসকল কার্য্যকে সম্যকরূপে ধারণা ও পোষণ করিয়া উহাদিগকে নিজ উন্নতির অঙ্গীভূত করিয়া লইবার শক্তি যে হিন্দুধর্ম্মের আছে, আমার বিশ্বাস তাহা শ্রীরামকৃষ্ণ ও তদীয় শিষ্য শ্রীবিবেকানন্দের উদ্ভব ও জাতীয় চিন্তাভাণ্ডারে তাঁহাদের নিজ নিজ বিশিষ্ট দান হইতেই প্রমাণিত হইতেছে।

যাহা আমরা শুধু নিজেদেরই কল্যাণকর বলিয়া বুঝিতে পরিয়াছি তাহাকে জোর করিয়া অপরের উপর প্রয়োগ করিবার চেষ্টাকে স্বামিজী পাশ্চাত্ত্যগণের চরিত্রের এক মহা দোষ বলিয়া বিবেচনা করিতেন। আর তিনি যে গম্ভীরভাবে আমাদিগকে ঐ দোষ-

পরিহার-বিষয়ে পুনঃ পুনঃ সতর্ক করিতেন, তাহা সম্ভবতঃ তাঁহার চিরাভীপ্সিত 'আদর্শ-বিনিময়ে'রই অন্যতম উদাহরণ। কিন্তু আবার যখন তাঁহার কতিপয় আপনার লোক তাঁহাকে প্রশ্ন করেন, ("আপনি ইংরেজগণকে তাহাদের দেশে থাকিয়া দেখিয়া আসিয়াছেন। আপনার মতে তাহারা কোন্ জিনিসটীর সর্ব্বাপেক্ষা উৎকর্ষসাধন করিয়াছে ?"—তখন তিনি উত্তর দেন, "আত্মসম্মান বজায় রাখিয়া কিরূপে আজ্ঞাবহ হওয়া চলে, এইটী তাহারা শিখিয়াছে।"

কিন্তু বেলুড়ে আমরা শুধু স্বামিজীকেই দেখি নাই। সারা মঠই আমাদিগকে তাঁহাদের অতিথি বলিয়া জ্ঞান করিতেন। সেই-জন্য এই অতিথিসৎকারপরায়ণ সাধুগণ কখনও আমাদের প্রতি অনুগ্রহবশতঃ এবং কখনও সেবা-উদ্দেশ্যে আমাদের নিকট যাতায়াতের কষ্টস্বীকার করিতেন। যে গরুটী আমাদের দুধ দিত তাহাকে তাঁহারাই দোহন করিতেন, এবং যে ভৃত্যের উপর রাত্রিতে ঐ দুগ্ধ আমাদের নিকট পৌঁছাইয়া দিবার ভার ছিল, সে একদিন পথে গোখুরা সাপ দেখিয়া ভয় পাইয়া আর যাইতে অস্বীকার করায়, সাধুগণের মধ্যে একজনই এই ভৃত্যজনোচিত কার্য্যে তাহার স্থান গ্রহণ করিলেন। আমাদের ভারতীয় গৃহস্থালীর নিত্য নূতন সমস্যা-গুলির সমাধান করিবার জন্য প্রত্যহ একজন করিয়া ব্রহ্মচারী মঠ হইতে প্রেরিত হইতেন। আর একজনের উপর বাঙ্গালা শিখাইবার ভার ছিল। সঙ্ঘের পুরাতন সাধুগণ প্রায়ই লৌকিকতা-ব্যপদেশে বা অনুগ্রহপূর্বক আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন। আর যখন স্বামিজী স্বয়ং কয়েক সপ্তাহের জন্য অন্যত্র গমন করিলেন, তখন ইঁহাদিগের মধ্যে কেহ-না-কেহ অতিথিগণের সৎকার ও সুখ-

স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য আপনাকেই দায়ী ভাবিয়া নিয়মমত আগমন করিয়া প্রাতঃকালের চায়ের টেবিলে তাঁহার স্থান গ্রহণ করিতেন। এই-সকল এবং এইরূপ সহস্র অন্য উপায়ে, আমরা সেইসকল লোকের সংস্পর্শে আসিয়াছিলাম যাঁহাদের মধ্যে আমরা সেই উজ্জ্বল স্মৃতির প্রকাশ দেখিতে পাইতাম, যে স্মৃতিরূপ 'টানা'র উপর এই সমুদয় ত্যাগীর জীবন 'পড়েনে'র মত বোনা হইয়াছিল।

কারণ, এই যে সন্ন্যাসিগণ আমাদিগকে দর্শনদানে অনুগৃহীত করিতেন, ইঁহাদের একমাত্র চিন্তার বিষয় ছিল শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁহার শিষ্যাগ্রণী স্বামী শ্রীবিবেকানন্দ। স্বামিজী মাত্র তের-চৌদ্দ মাস হইল তাঁহাদের মধ্যে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছেন, এবং এখনও তাঁহাদের সেই প্রথমদর্শনজনিত আনন্দ ও বিস্ময় অপনীত হয় নাই বলিলেই চলে। তাহার পূর্ব্বে প্রায় ছয় বৎসর কাল তিনি তাঁহাদের নিকট একরূপ অদর্শনই ছিলেন। সত্য বটে, তিনি শেষাশেষি তাঁহাদের সহিত ঘন ঘন পত্রব্যবহার করিতেন, এবং কোন সময়েই তাঁহারা বহুদিন ধরিয়া তাঁহার গতিবিধির একেবারে খেই হারাইয়া ফেলেন নাই; তথাপি যখন তাঁহার গুরুভ্রাতৃগণ তাঁহার আমেরিকায় প্রথম সফলতার কথা শুনিলেন, তখন তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই, "উহার দ্বারা জগতের অনেক কাজ হইবে"—তাঁহার গুরুদেবের এই ভবিষ্যদ্বাণীর উপর দৃঢ়বিশ্বাস করিয়াই অনুমান করিয়াছিলেন যে, ইনি তাঁহাদেরই স্বামী বিবেকানন্দ।

যাঁহারা কোথাও কোন মহাত্যাগীর জীবন প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাঁহারা অবগত আছেন যে, নিজের আমিত্বকে দূর করিব, যে-সকল বস্তু অতি তুচ্ছ ও যাহাদের কেহ খোঁজখবর রাখে না এরূপ সব

বন্ধুর সহিত মিশিব, লোকসঙ্গ হইতে দূরে চলিয়া যাইব এবং লোকে আমার স্মৃতিপর্য্যন্ত মুছিয়া ফেলুক—এইরূপ একটী প্রবল আকাঙ্ক্ষা ত্যাগাগ্রহের একটী অঙ্গস্বরূপ। আমার মনে হয়, এই প্রকার ধর্ম্মের বহুকালব্যাপী মৌন ও নির্জ্জনগুহাবাস এবং বন হইতে বনান্তর ও গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে গমনকালে অঙ্গে মৃত্তিকা-বিভূতি আদি লেপন প্রভৃতি যে-সকল অসংখ্য আকারভেদ আছে এবং পাশ্চাত্ত্য দর্শক বাহির হইতে যাহার অর্থবোধ করিতে পারেন না, সে-সকলের ইহাই ব্যাখ্যা। এই ভাবটী শ্রীরামকৃষ্ণের অদর্শনের পর প্রথম কয়েক বৎসর স্বামিজীর মনে খুব অধিক আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল বলিয়াই বোধ হয়; এবং তিনি যে বারবার আর কেহ কখনও তাঁহার সন্ধান না পায় এই উদ্দেশ্যেই ক্ষুদ্র ভ্রাতৃমণ্ডলীকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেন, একথা নিশ্চয়। একবার তিনি এইরূপ একটী যাত্রায় বাহির হইয়াছিলেন। ভ্রাতৃমণ্ডলী শুনিতে পাইলেন যে তিনি হাথরাসে পীড়িত হইয়া রহিয়াছেন এবং তাঁহাকে আনিবার জন্য লোক পাঠাইলেন। কারণ, তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে, বিশেষতঃ স্বামিজীর সহিত, তাঁহাদের এমন প্রেমসম্বন্ধ ছিল যে, তাঁহারা স্বয়ং তাঁহার সেবা না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার মঠে আসিবার কয়েক মাস পরেই তাঁহার এক শিষ্যও মঠে আগমন করিলেন। ইঁহাকে তিনি ভ্রমণকালে শিষ্যত্বে বরণ করিয়াছিলেন। ইঁহার সন্ন্যাসের নাম স্বামী সদানন্দ। ইঁহারই ভাঙ্গা-ভাঙ্গা অথচ সতেজ ইংরেজীর সাহায্যে কথিত বিবরণ হইতে আমি, এইকালে স্বামিজী মঠে কিরূপ জীবন যাপন করিতেন, তাহার ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করিয়াছি। পূর্ব্বাশ্রমের গৃহ হইতে কলিকাতা

আসিবার পাথেয় সংগ্রহ করিবার জন্ত তিনি রেলে চাকরী স্বীকার করেন। এই কার্য্যে তাহার দুই-তিন মাস লাগিয়াছিল। যখন তিনি মঠে আসিয়া পৌঁছিলেন, তখন দেখিলেন যে স্বামিজী পুনর্ব্বার যাত্রা করিবার জন্ত প্রস্তুত হইয়াছেন, কেবল বাহির হইলেই হইল। কিন্তু তাঁহার জন্ত স্বামিজী এই সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলেন, এবং সেই দিনই যে যাত্রা করিবার কথা, তাহা এক বৎসরের পূর্ব্বে আর করা হয় নাই। এই সময়ের কথা উল্লেখ করিয়া স্বামিজীর এই প্রথম শিষ্য সগর্ব্বে বলিলেন, "স্বামিজীর জগদ্ধিতায় কর্ম্মের আরম্ভ আমাকে লইয়াই।"

এই বৎসর আচার্য্যদেব "একদমে চব্বিশ ঘণ্টাই কাজ করিয়া যাইতেন। তিনি পাগলের মত হইয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার এত কাজ ছিল!" অতি প্রত্যূষে, অন্ধকার থাকিতে থাকিতেই, তিনি গাত্রোত্থান করিয়া "জাগো, জাগো সকলে, অমৃতের অধিকারী"— এই গানটী গাহিতে গাহিতে অপর সকলকে উঠাইতেন। তখন সকলে ধ্যান করিতে বসিতেন এবং তৎপরে যেন অজ্ঞাতসারেই ভজন ও সৎপ্রসঙ্গে উপনীত হইতেন। উহা দ্বিপ্রহর বা তারও পর পর্য্যন্ত চলিত। স্তবপাঠ ও ভজন হইতে হইতে ইতিহাসের প্রসঙ্গ উঠিত। কখনও ইগ্নেশিয়াস্ লয়োলার * গল্প, কখনও বা

* Ignatius de Loyola (১৪৯১—১৫৫৬ খৃঃ)—ইউরোপের বিখ্যাত জেস্যুইট-সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। ইনি স্পেনের এক সম্ভ্রান্তবংশোদ্ভব সন্তান ছিলেন। প্রথম জীবনে যুদ্ধবিদ্যার চর্চ্চা করিয়াছিলেন। পরিশেষে একবার আহত হইয়া দীর্ঘকাল হাসপাতালে ছিলেন। তথায় উপন্যাসাদি নিঃশেষিত হওয়ায় 'মহাপুরুষগণের জীবনী' পাঠ করিতে বাধ্য হন। এই পুস্তকপাঠে তাঁহার জীবনে

জোয়ান অব আর্ক অথবা ঝান্সীর রানীর গল্প হইত। আবার কখনও স্বামিজী কার্লাইলের 'ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লব' হইতে লম্বা লম্বা অংশ আবৃত্তি করিতেন, এবং সকলে স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় দুলিতে দুলিতে সমস্বরে "সাধারণতন্ত্রের জয় হউক!" "সাধারণতন্ত্রের জয় হউক!"—এই বাক্য পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিতেন। অথবা তাঁহারা সেণ্ট ফ্র্যান্সিস্ অব অ্যাসিসির কথায় তন্ময় হইয়া যাইতেন, এবং নাট্যকার যেমন নিজের অজ্ঞাতসারে স্বভাববশেই নাটকীয় পাত্রগণের সহিত এক হইয়া যান, তাঁহারাও তেমনি উক্ত মহাপুরুষের "এস, এস, ভাই মৃত্যু!"—এই বাক্য দীর্ঘকাল ধরিয়া চিন্তা করিতে করিতে আত্মহারা হইয়া যাইতেন। বেলা একটা-দুইটার সময় হয়ত স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ—তিনিই একাধারে এই সঙ্ঘের পাচক, গৃহস্থালীর তত্ত্বাবধায়ক এবং পূজারী ছিলেন—তাঁহাদিগকে ভয় দেখাইয়া স্নানাহার করিবার জন্য উঠাইয়া দিতেন। কিন্তু ইহার পর তাঁহারা আবার একত্র হইতেন, আবার ভজন ও সৎপ্রসঙ্গ চলিত; এইরূপ করিতে করিতে সন্ধ্যা হইয়া যাইত, এবং তৎসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের দুইঘণ্টাব্যাপী আরাত্রিক সম্পন্ন হইত। অনেক সময়, ইহাতেও তাঁহাদের তন্ময়ভাব ভঙ্গ হইত না, আবার ভজন ও শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রসঙ্গ হইত; আবার তাঁহারা ধ্যানে মগ্ন হইয়া যাইতেন।

ধর্ম্মভাবের প্রবল বন্যা আসিয়া উপস্থিত হয়। ১৫২২ খৃষ্টাব্দে ইনি জেরুজেলেমে তীর্থযাত্রা করেন এবং পথিমধ্যে অপূর্ব্ব সেবাভাব ও তপস্যার বিকাশ দেখান। ১৫৩৪ খৃষ্টাব্দে ইনি ঈশা সমিতি (Society of Jesus) স্থাপন করেন। ১৫৪০ খৃষ্টাব্দে এই সমিতি পৃষ্টাবয়ব হইয়া পোপ তৃতীয় পল কর্ত্তৃক অনুমোদিত হয়। ১৬২২ খৃষ্টাব্দে ইনি 'সেণ্ট' আখ্যায় ভূষিত হন।

ছাদের উপর বসিয়া সময়ে সময়ে মধ্যরাত্রির অনেক পর পর্য্যন্ত তাঁহারা "জয় সীতারাম!" বলিয়া নামগান করিতেন। সকল ধর্ম্মের বিশেষ বিশেষ পর্ব্বগুলি তদুপযোগী বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানসহকারে সম্পন্ন হইত। যেমন, বড়দিনের সময় তাঁহারা একখানি জ্বলন্ত কাষ্ঠখণ্ডের চতুর্দ্দিকে অর্দ্ধশয়ান থাকিয়া, কিরূপে এক জনকোলাহল-শূন্য স্থানে কতকগুলি মেষপালক বাঁকা-মাথা পাঁচনবাড়ি-হস্তে মেষযূথের রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত ছিলেন, এমন সময় কিরূপে দেবদূতগণ তাঁহাদিগের নিকট শুভাগমন করেন, এবং কিরূপে সেই দিনই জগতের প্রথম ঈশ্বরস্তুতিগান উচ্চারিত হইল—এইসকল সম্বন্ধে অনুচ্চস্বরে আলোচনা করিতেন। কিরূপে তাঁহারা একবার গুড্-ফ্রাইডের উৎসব সম্পন্ন করিয়াছিলেন, সে গল্পটী অতি কৌতুকাবহ। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়া গিয়াছে, এবং তাঁহারা ক্রমে, উক্ত উৎসব-ব্রতিগণের যে উৎকট ভাবাতিশয্য লাভ হইয়া থাকে তাহা লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু আহারের ত নাম পর্য্যন্ত করা চলিবে না—তাঁহারা কয়েকটী আঙ্গুর সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন, উহারই রস বাহির করিয়া লইয়া জলের সহিত মিশান হইল। সকলে একই পাত্র হইতে উহা পান করিবেন, এইরূপ আয়োজন চলিতেছে, এমন সময় দ্বারে একজন ইউরোপীয় অতিথির কণ্ঠ শুনা গেল, "কে আছ, খৃষ্টের দোহাই, দ্বার খোল।" অনির্ব্বচনীয় আনন্দসহকারে তাঁহারা দশ-পনর জন মিলিয়া ছুটিয়া তাঁহার চতুর্দ্দিকে একত্র হইলেন—সকলেই একজন খৃষ্টানের মুখ হইতে ঐ দিনের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিতে সমুৎসুক। কিন্তু তিনি বলিলেন যে, তিনি মুক্তিফৌজের লোক, গুড্-ফ্রাইডের কথা কিছুই জানেন

না, তাঁহারা শুধু জেনারেল বুথের জন্মদিনে উৎসব করিয়া থাকেন। স্বামী সদানন্দ বলিলেন, "তিনি আরও কি কি বলিলেন, আমার মনে নাই।" বলিতে বলিতে বক্তার বদন ও কণ্ঠস্বর যেন বিষাদময় হইয়া গেল; তাহা হইতেই সাধুগণ এই সংবাদশ্রবণে সহসা কিরূপ বিষণ্ণ হইয়া পড়িলেন তাহা আমরা স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম। বোধ হয় যে, তাঁহারা আশাভঙ্গের প্রথম মুহূর্ত্তেই, "তোমার ইহা রাখিবার অধিকার নাই" বলিয়া পাদ্রী বেচারার হস্ত হইতে বাইবেলখানি কাড়িয়া লইয়া তাঁহাকে দূর করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু শুনা যায় যে তাঁহাদেরই একজন অন্য একটী দ্বার দিয়া চুপে চুপে ঘুরিয়া গিয়া তাঁহাকে ফিরাইয়া আনেন, এবং কিঞ্চিৎ ভোজ্য প্রদান করিয়া গোপনে তাঁহার দ্রব্য তাঁহাকেই প্রত্যর্পণ করেন।

যিনি এইসকল কথার বর্ণনা করিতেছিলেন তিনি উৎসাহভরে বলিতে লাগিলেন, "সে সময় সর্ব্বদা শশব্যস্ত থাকিতে হইত, এক মুহূর্ত্তেরও বিশ্রাম ছিল না। অনেক বাহিরের লোক আসা যাওয়া করিতেন, অনেক পণ্ডিত তর্ক আলোচনাদি করিতেন, কিন্তু স্বামিজী এক মুহূর্ত্তের জন্যও কাজ ছাড়া থাকিতেন না। কখনও কখনও তিনি কিছুক্ষণের জন্য একাকী থাকিবার অবসর পাইতেন; সেই সময় তিনি 'হরিবোল, হরিবোল!' অথবা 'মা, মা!' বলিতে বলিতে পায়চারি করিতে থাকিতেন। এইসকল উপায়ে তিনি আপনাকে উদ্দিষ্ট মহৎকর্ম্মের জন্য প্রস্তুত করিতে-ছিলেন। আমি সর্ব্বদা দূর হইতে তাঁহাকে লক্ষ্য করিতাম, এবং কোন একটী অবসরে বলিতাম, 'আপনি খাইবেন না?' প্রত্যেক বারেই তিনি কোন-না-কোন কৌতুকপূর্ণ উত্তর দিতেন।" কখনও

কখনও রাঁধিতে রাঁধিতে অথবা ঠাকুরপূজার আয়োজন করিতে করিতে এইরূপ কথাবার্তা চলিত ; এইসকল কর্ম্মে সকলেই ভেদ-বিচার না করিয়া যোগদান করিতেন। এই সময়ে সাধুরা নির্ধন হইলেও অনেকেই তাঁহাদের নিকট আহারপ্রার্থী হইয়া আসিত। তাঁহাদের নিজেদের সম্বল অতি অল্পই ছিল। মঠের বাহিরে গায়ে দিয়া যাইবার মত চাদর তাঁহাদের একখানি মাত্র ছিল। সেইখানি একগাছি দড়িতে ঝুলান থাকিত, এবং যিনিই বাহিরে যাইতেন তিনিই উহা লইয়া যাইতেন। তাঁহাদের দ্বিতীয় উত্তরীয় রাখিবার সঙ্গতি ছিল না। তথাপি কোন রকমে দরিদ্র ও অভ্যাগতদিগের জন্য আহার্য্য সংগৃহীত হইত। সাহায্য বা উপদেশলাভের জন্যও অনেকে আসিতেন। সাধুরা আবার অর্থ সংগ্রহ করিয়া কয়েক শত গীতা ও Imitation of Christ ('খৃষ্টের অনুসরণ') ক্রয় করিয়া বিতরণ করিয়াছিলেন। এই দুইখানি পুস্তক ঐ সময়ে সঙ্ঘের বড় আদরের বস্তু ছিল। বহু বৎসর পরে ঐ পুস্তকের একটী মাত্র বাক্য স্বামিজী যদৃচ্ছাক্রমে আবৃত্তি করিতে পারিয়াছিলেন, "ওহে লোকশিক্ষকসকল, চুপ কর! ওহে ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ, তোমরাও থাম। হে প্রভো, একমাত্র তুমিই আমার অন্তরাত্মার সঙ্গে কথা কও!" টমাস-আ-কেম্পিসের গ্রন্থের শুধু ঐ অংশটুকুই তাঁহার মনে ছিল। কারণ, শ্রীরামকৃষ্ণের এই হিন্দুকুলোদ্ভব সন্তানগণের মন হইতে এই পুস্তকখানির প্রভাব যে ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া উহাকে শুধু স্মৃতিমাত্রে পর্য্যবসিত করিতেছিল এবং তাহার পরিবর্ত্তে গীতার সৌন্দর্য্য ও প্রভাবই দিন দিন পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছিল, একথা বুঝিতে বিলম্ব হয় না।

এইরূপে প্রায় এক বৎসর কাটিয়া গেল। তৎপরে স্বামিজী পওহারী বাবাকে* দর্শন করিতে গাজীপুরে গমন করেন। ইনিই সেই সাধু যাঁহাকে স্বামিজী চিরকাল শ্রীরামকৃষ্ণের নিম্নেই আসন দিতেন। তথায় তিনি যে অমূল্যধন লাভ করিলেন তাহা অপর সকলের সহিত একত্রে সম্ভোগ করিবার জন্য তিনি দুই মাস পরেই ফিরিয়া আসিলেন। সহসা সংবাদ আসিল যে স্বামী যোগানন্দ নামক এক গুরুভ্রাতা বসন্তরোগাক্রান্ত হইয়া এলাহাবাদে পড়িয়া আছেন। অমনি কয়েকজন ভ্রাতা তাঁহাকে সেবা করিবার জন্য ছুটিলেন; স্বামিজীও তাঁহাদের পশ্চাদ্‌গমন করিলেন।

আমরা পুনরায় স্বামী সদানন্দের বর্ণনার অনুবর্ত্তন করিব। এলাহাবাদে অনেক দিবস ধর্ম্মচর্চ্চায় ব্যতীত হইল। স্বামী যোগানন্দের পীড়া যেন একটী সামান্য উপলক্ষ্য মাত্র হইল; যেন তাঁহার দ্বারা সকলকে নিমন্ত্রণ দেওয়া হইল, আর সমস্ত নগরটী যেন মহা ব্যগ্রভাবে যাতায়াত করিতে লাগিল। বহুদিন ও বহুরাত্রি ব্যাপিয়া লোক ক্রমাগত ছোট ছোট দলবদ্ধ হইয়া আসিতে এবং দর্শন করিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল। স্বামিজীর মনও এই সময়ে সর্ব্বদাই শ্রেষ্ঠ ও মহত্তম ভাবসমূহে আপ্লুত থাকিত। একদিন তিনি এক মুসলমান পরমহংস সাধুকে দর্শন করেন; "তাঁহার অঙ্গের প্রত্যেক রেখাটী বলিয়া দিতেছিল যে ইনি একজন পরমহংস।" এই মিলনাবসরটী একটী অপূর্ব্ব ক্ষণ ছিল, সন্দেহ নাই।

---

* ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে হোমাগ্নিতে নিজদেহ আহুতি দিয়া এই যোগী মানবলীলা সংবরণ করেন।

"দিগম্বরো বাপি চ সাম্বরো বা
ত্বগম্বরো বাপি চিদম্বরস্থঃ।
উন্মত্তবদ্বাপি চ বালবদ্বা
পিশাচবদ্বাপি চরত্যবন্যাম্॥"

—আত্মবিৎ পরমহংসগণ কখনও দিগম্বর হইয়া, কখনও বা বসন পরিধান করিয়া, কখনও বল্কল বা চর্ম্ম পরিধান করিয়া, কখনও জ্ঞানাম্বরে আচ্ছাদিত হইয়া, উন্মত্ত, বালক বা পিশাচের ন্যায় পৃথিবীতে বিচরণ করেন।

'বিবেকচূড়ামণি' হইতে এই পরমহংস-লক্ষণগুলি আবৃত্তি করিতে করিতে শিষ্য বলিলেন, তাঁহারা একরাত্রি ধরিয়া নানাবিধ চর্চ্চা করিতে লাগিলেন। এইরূপ নানাপ্রকার ঘটনাবৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া সম্ভবতঃ একপক্ষ কাল কাটিয়াছিল; তৎপরে তাঁহারা এলাহাবাদ পরিত্যাগ করিয়া দুই-দুই বা তিন-তিন জন করিয়া গঙ্গাতীরস্থ মঠে ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের কোন এক সময়ে স্বামিজী ভ্রাতৃবর্গকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন; ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের মহাদিগ্বিজয়ের পূর্ব্বে তিনি আর তথায় প্রত্যাগমন করেন নাই।

এবার তিনি স্বামী অখণ্ডানন্দ নামক জনৈক সন্ন্যাসীর সহিত যাত্রা করেন। ইনি তাঁহাকে আলমোড়া লইয়া গিয়া তথায় এক গৃহস্থের অতিথিরূপে রাখিয়া দেন। পূর্ব্বে স্বামী অখণ্ডানন্দ যখন তিব্বত যাত্রা করেন, সেই সময় এই গৃহস্থটী তাঁহাকে বন্ধুর ন্যায় সাহায্য করিয়াছিলেন। শুনা যায়, পর্ব্বতের উপর দিয়া চলিতে চলিতে পথিমধ্যে স্বামিজী একদিন ক্ষুধায় সংজ্ঞাশূন্য হইয়া

পড়িয়া যান। একজন মুসলমান তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া একটী শশা কাটিয়া আনিয়া তাঁহাকে খাইতে দেয়, এবং উহাতেই একপ্রকার তাঁহার জীবন রক্ষা হয়। কতদিন ভ্রাতৃদ্বয় অনাহারে ছিলেন, জানি না। সম্ভবতঃ এই সময়ে তিনি আকাশবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন, এবং খাদ্য, পানীয় প্রভৃতি আপনা হইতে না আসিলে তিনি উহা চাহিতে পারিতেন না। অন্ততঃ তিনি যে পরে একবার ঐরূপ করিয়াছিলেন, তাহা নিঃসন্দেহ। এক ব্যক্তি স্বামিজীকে এই ভ্রমণকালে জানিতেন ; তাঁহার প্রশ্নের উত্তরে স্বামিজী বলেন যে, এই কঠোর সাধনকালে তিনি পাঁচ দিনের অধিক অনশনে যাপন করেন নাই।

ইহার পর আমরা তাঁহার গতিবিধির খেই হারাইয়া ফেলি। তিনি মধ্যে মধ্যে পত্র লিখিতেন, কিন্তু সাধুগণ নিজেরাই ছোড়ভঙ্গ হইয়াছিলেন। স্বামী সদানন্দ বলিলেন, তিনি চলিয়া যাইবার পর তাঁহারা বড়ই নিরানন্দে দিনযাপন করিতেন। আবার প্রথম মঠবাড়ীটীও পরিত্যাগ করিবার কথা হইতেছিল। কারণ, গৃহস্বামী উহা পুনর্নির্ম্মাণ করিবেন বলিতেছিলেন। কিন্তু একজন সন্ন্যাসী কিছুতেই তাঁহাদের গুরুদেবের ভস্মাবশেষ ছাড়িয়া যাইবেন না ; তিনি অচল অটল প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, সম্পদে বিপদে ঐ ভস্মাবশেষ ও তাঁহার গুরুভ্রাতৃগণকে, তাঁহারা পুনরায় ঠাকুরঘরে একত্র না হওয়া পর্য্যন্ত, কিছুতেই আচ্ছাদনবিহীন হইতে দিবেন না। ইনি স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ। তিনি, স্বামী নির্ম্মলানন্দ, মধ্যে মধ্যে স্বামী প্রেমানন্দ নামক একজন এবং সঙ্ঘের বাসন মাজা ইত্যাদি কার্য্যে রত নবাগত সেবক স্বামী সদানন্দ—এই চারি জন কিছু দূরে, কিন্তু দক্ষিণেশ্বরের

সন্নিকটে, একটী গৃহে স্থান পরিবর্ত্তন করিলেন, এবং পূর্ব্বে যে মঠ বরাহনগরে অবস্থিত ছিল, তাহা এখন আলমবাজার মঠ নামে অভিহিত হইল।

স্বামী অখণ্ডানন্দ এই সময়ে সর্ব্বদা স্বামিজীর পশ্চাদ্ধাবন করিতেছিলেন। প্রায়ই মধ্যে মধ্যে তিনি শুনিতে পাইতেন, স্বামিজী অমুক সহরে রহিয়াছেন; শুনিয়াই তথায় ছুটিতেন; গিয়া দেখিতেন, স্বামিজী এইমাত্র চলিয়া গিয়াছেন; কোথায় গিয়াছেন, তাহার ঠিকানা নাই। একবার স্বামী ত্রিগুণাতীত গুজরাটের কোন এক ক্ষুদ্র রাজ্যে বিপদে পড়েন। এই সময়ে একজন তাঁহাকে বলেন, "এক বাঙ্গালী সাধু রাজমন্ত্রীর ভবনে বাস করিতেছেন; আপনি যদি তাঁহার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন ত নিশ্চয়ই সাহায্য পাইবেন।" তদনুসারে তিনি সাহায্য প্রার্থনা করিতে গিয়া দেখিলেন যে, সেই অজ্ঞাত সাধু স্বয়ং স্বামিজী। কিন্তু তিনি ভ্রাতার যে সাহায্যের প্রয়োজন তাহা করিয়া তাঁহাকে গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতে বলিলেন, এবং নিজে একাকী চলিলেন। 'ভগবান বুদ্ধদেবের যে সারগর্ভ বাক্যগুলি তিনি সর্ব্বদা আবৃত্তি করিতেন, তাহাই তাঁহার এই সময়ে মূলমন্ত্রস্বরূপ ছিল—"সিংহ যেমন সামান্য শব্দে ভয় পায় না, বায়ু যেমন জালবদ্ধ হয় না, পদ্মপত্র যেমন জলে লিপ্ত হয় না, তুমিও তেমনি গণ্ডারবৎ একাকী বিচরণ কর।"'

আমরা এখন জানি যে, আলমোড়াতেই তিনি সংবাদ পান যে, তাঁহার শৈশবের প্রিয় ভগিনী শোচনীয় দারিদ্র্যের পীড়নে দেহত্যাগ করিয়াছেন। এই সংবাদ পাইয়াই তিনি, কোথায় যাইতেছেন তদ্বিষয়ে কাহাকেও কিছু না বলিয়া, নিবিড়তর অরণ্যানীসঙ্কুল পার্ব্বত্য

প্রদেশে পলাইয়া যান। বহু বৎসর পরে একজন, যিনি স্বামিজীর জীবনের ঘটনাসমূহ গভীরভাবে পর্য্যালোচনা করিয়াছিলেন, তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, এই মৃত্যুতে স্বামিজীর হৃদয়ে অতি গুরুতর আঘাত লাগিয়াছিল—এত গুরুতর যে উহার তীব্র যন্ত্রণার এক মুহূর্ত্তের জন্য কখনও বিরাম হয় নাই। আর ভারতীয় নারীকুলের শিক্ষা ও উন্নতিকল্পে তাঁহার যে প্রবল আগ্রহ দেখা যাইত, তাহার অন্ততঃ কিয়দংশ যে এই মর্ম্মবেদনাপ্রসূত, তাহা আমরা বোধ হয় ভরসা করিয়া বলিতে পারি।

এই সময়ে তিনি কয়েক মাস এক পার্ব্বত্য গ্রামের ঠিক ঊর্দ্ধদেশে একটী গুহায় বাস করিয়াছিলেন। মাত্র দুইবার আমি তাঁহাকে এই সময়ের অনুভূতির উল্লেখ করিতে শুনিয়াছি। একবার তিনি বলিয়াছিলেন, "আমাকে কাজ করিতে হইবে, এই ধারণা আমাকে এই সময়ে যত অভিভূত করিয়াছিল, এমন আমার সারা জীবনে কখনও হয় নাই। মনে হইত কে যেন আমাকে সবলে সেই গুহা হইতে গুহান্তরে জীবনযাপন হইতে বিরত করিয়া নিম্নে সমতল প্রদেশে বিচরণ করিবার জন্য নিক্ষেপ করিল।" আর একবার তিনি একজনকে বলিয়াছিলেন, "সাধু কিপ্রকার জীবন যাপন করিতেছে, তাহাই তাহার সাধুত্বের পরিচায়ক নহে। কারণ, একজন গুহার মধ্যে বসিয়া থাকিয়াও অনায়াসে মনে মনে, রাত্রে কয়খানা রুটী মিলিবে, এই প্রশ্নের বিচারে নিমগ্ন থাকিতে পারে।"

সম্ভবতঃ এই কালের অবসানেই, এবং যে শক্তি তাঁহাকে ঠেলিয়া বাহির করিয়া দিতেছে বলিয়া তিনি উল্লেখ করিয়াছিলেন, তাহারই একটী নিদর্শন-স্বরূপে, তিনি কন্যাকুমারিকায় মাতা কুমারীকে

পূজা করিবেন বলিয়া ব্রত গ্রহণ করেন। এই ব্রত-পালন তিনি ধীরে-সুস্থে করিয়াছিলেন। তথাপি উহাতে তাঁহার কিঞ্চিন্ন্যূন দুই বৎসরমাত্র লাগিয়া থাকিবে। এই উদ্দেশ্যে ভ্রমণ উপলক্ষ্যে তিনি ভারতীয় জীবনের প্রত্যেক বিষয়টী লক্ষ্য ও অনুশীলন করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়। এই সময়ের যে-সকল গল্প প্রচলিত আছে, তাহাদের আর শেষ নাই। তিনি এত বন্ধু লাভ করিয়াছিলেন যে, তাঁহাদিগের সকলের নাম-নির্দ্দেশ অসম্ভব। তিনি শিখদিগের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছিলেন; মহারাষ্ট্রীয় পণ্ডিতগণের নিকট মীমাংসা-দর্শন এবং জৈনদিগের নিকট জৈন-শাস্ত্রসমূহ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন; রাজপুতরাজগণ কর্ত্তৃক গুরুরূপে পরিগৃহীত হইয়াছিলেন; মধ্য-ভারতে এক মেথর-পরিবারের সহিত কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া বাস করিয়াছিলেন; মালাবারের জাতিঘটিত আহারাদির ন্যায় কূট বিষয়সকল স্বচক্ষে নিরীক্ষণ করিতে পারিয়াছিলেন; তাঁহার জন্মভূমির বহু ঐতিহাসিক দৃশ্য ও নৈসর্গিক সৌন্দর্য্য উপভোগ করিয়াছিলেন; এবং অবশেষে যখন কন্যাকুমারিকা পৌঁছিলেন, তখন তিনি এত দরিদ্র যে, মাতা কন্যাকুমারীর মন্দিরের অদূরবর্ত্তী শৈলদ্বীপটীতে যাইবার নৌকাভাড়া পর্য্যন্ত তাঁহার ছিল না। সুতরাং সঙ্কল্পিত পূজাদানের পর তিনি, হাঙ্গর থাকা সত্ত্বেও, প্রণালীটী সন্তরণ দ্বারা পার হইয়া সেই দ্বীপে উপস্থিত হইলেন। মাদ্রাজ হইয়া উত্তরাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তনকালেই তিনি, যাঁহারা তাঁহাকে আমেরিকা প্রেরণ করিবার হেতুভূত হইয়াছিলেন সেই অনুরক্ত শিষ্যমণ্ডলী লাভ করেন। অবশেষে ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের জুন মাসের প্রথম সপ্তাহ আন্দাজ তিনি বোম্বাই হইতে জাহাজে চড়িয়া উক্ত মহাদেশে যাত্রা করেন।

কিন্তু এই যাত্রা করিতেও তাঁহার আগ্রহ ছিল না। তাঁহার মাদ্রাজী শিষ্যেরা বলেন যে, ঐ উদ্দেশ্যে সংগৃহীত প্রথম পাঁচ শত মুদ্রা তিনি তৎক্ষণাৎ পূজা-দানাদিতে ব্যয় করিয়া ফেলেন, যেন তাঁহাকে সবলে কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর করিয়া দিবার ভার তিনি অদৃষ্টের স্কন্ধেই জোর করিয়া চাপাইয়া দিবেন। এমন কি, বোম্বাই পৌঁছিবার পরও তিনি পাশ্চাত্ত্যে গমন করাই সঙ্গত, এইরূপ নিশ্চয়বোধের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। ঐ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে না হয়, এইরূপ মানসিক চেষ্টা করিতে করিতে তিনি অনুভব করিলেন, যেন তাঁহার গুরুদেবের মূর্ত্তি তাঁহার নিকট পুনঃ পুনঃ আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে যাইবার জন্য উত্তেজিত করিতেছে। অবশেষে তিনি গোপনে পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীকে এই পত্র লিখিলেন যে, সম্ভব হইলে তিনি যেন দয়া করিয়া তাঁহাকে উপদেশ দেন ও আশীর্ব্বাদ করেন; এবং বিশেষ করিয়া বলিয়া দিলেন, যেন তিনি পুনরায় তাঁহার পত্র না পাওয়া পর্য্যন্ত এই নূতন রকমের কাণ্ডটার কথা কাহাকেও না বলেন। এই পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীমার আন্তরিক উৎসাহ ও তিনি যে তাঁহার জন্য ভগবৎ-সমীপে সদা প্রার্থনা করিতে থাকিবেন, এইরূপ দৃঢ় আশ্বাস পাইবার পর তবে তিনি ভারতভূমি পরিত্যাগ করিয়া পাশ্চাত্ত্যে যাত্রা করেন। এবার আর অদৃষ্টকে এড়াইবার উপায় নাই। যে আত্মগোপনেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া তিনি মঠ পরিত্যাগ করেন, সেই ইচ্ছার বশেই তিনি ভারতের প্রত্যেক গ্রামে পৌঁছিবামাত্র নাম পরিবর্ত্তন করিতেন। ইহার অনেক বৎসর পরে একজন তাঁহার নিকট শ্রবণ করেন, কিরূপে তাঁহার শিকাগো নগরীর সেই প্রথম

বিখ্যাত বক্তৃতার পর সমস্ত রাত্রি ধরিয়া তিনি, এইরূপ বিজয়-গৌরব-লাভ সত্ত্বেও, এই ভাবিয়া মর্ম্মযাতনা ভোগ করেন যে, তাঁহার আত্মগোপনের আশা একেবারে নির্ম্মূল হইল। তিনি এখন লোকলোচনের সম্মুখে প্রকাশ্য দিবালোকে দণ্ডায়মান। অজ্ঞাত ভিক্ষুক আর অজ্ঞাত থাকিতে পারিলেন না!

ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত তাঁহার এই-সকল ভ্রমণের মধ্যেই আমি, যে সত্য-সমূহ আমার গুরুদেবে প্রত্যক্ষ ও প্রমাণীকৃত হইয়াছিল তাঁহার সেই-সকলের উপলব্ধির তৃতীয় ও শেষ উপাদান দেখিতে পাই।

আমার মনে হয়, এ কথা নিঃসন্দেহ যে, ত্রিবিধ প্রভাবের ফলে তাঁহার জীবন গঠিত হইয়াছিল: প্রথমতঃ, তাঁহার ইংরেজী ও সংস্কৃত সাহিত্যে শিক্ষালাভ; দ্বিতীয়তঃ, তাঁহার গুরুদেবের অলৌকিক চরিত্র—যিনি, সমুদয় শাস্ত্র যে-জীবনকে একবাক্যে আদর্শ বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন, সেই জীবনের উদাহরণ ও প্রমাণস্বরূপ ছিলেন; এবং তৃতীয়তঃ, আমার যত দূর মনে হয়, তাঁহার ভারত ও ভারতবাসিগণ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান—যাহার বলে তিনি উহা-দিগকে এমন এক বিপুল সজীব ধর্ম্মশরীরেরই অঙ্গ বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহার অশেষ মহিমান্বিত গুরুদেবও স্বয়ং যাহার সাকার বিগ্রহ ও বাণীমাত্র ছিলেন। আমার মনে হয়, এই তিনটী প্রভাব তাঁহার বিবিধ বক্তৃতা হইতে স্পষ্টরূপে লক্ষ্য করা যায়। যখন তিনি বেদান্ত প্রচার করিতেছেন ও জগতের সম্মুখে স্বদেশবাসিগণের দর্শনের পক্ষসমর্থন করিতেছেন, তখন তিনি প্রধানতঃ প্রাচীনকালের সংস্কৃত গ্রন্থ-সমূহ হইতেই উপাদান সংগ্রহ

করিতেছেন ; অবশ্য যেরূপ প্রাঞ্জলভাবে ও দৃঢ়তার সহিত তিনি উহার ব্যাখ্যা করিতেছেন, তাহা শুধু ঐসকল গ্রন্থপ্রতিপাদ্য সত্য-সমূহ তাঁহার গুরুদেবের জীবনে একাধারে সমষ্টীভূত দেখিয়াছিলেন বলিয়া। আবার, যখন তিনি বলিতেন, "ভক্তির আরম্ভ, স্থিতি ও পরিণাম প্রেমে," অথবা যখন তিনি কর্ম্মযোগের বিশ্লেষণ করিতেছেন, তখন আবার যেন আমাদের চক্ষের সমক্ষে তাঁহার গুরুদেবকেই দেখিতে পাই ; দেখিতে পাই যে, শিষ্য অপর একজনের পাদমূলে যে জ্যোতির্ম্ময় রাজ্যে বাস করিয়া আসিয়াছেন, শুধু তাহারই কথা বলিতে যথাসাধ্য প্রয়াস পাইতেছেন মাত্র। কিন্তু যখন আমরা তাঁহার শিকাগো মহাসভাসমক্ষে পঠিত বক্তৃতা অথবা ঠিক ঐরূপই অদ্ভুত 'মাদ্রাজ অভিনন্দনের উত্তর,' অথবা ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে লাহোরের যে বক্তৃতাগুলিতে তিনি হিন্দুধর্ম্মের মুখ্য ও সাধারণ লক্ষণগুলি চিত্রিত করেন, সেইগুলি পাঠ করি, তখন আমরা এমন কিছুর পরিচয় পাই যাহা তাঁহার নিজের পরিশ্রমলব্ধ অভিজ্ঞতা হইতে প্রসূত ;—এইসকল বক্তৃতার পশ্চাতে যে শক্তি নিহিত রহিয়াছে, তাহা তাঁহার ভারতভূমে দীর্ঘ-ভ্রমণেরই ফল। মনে হয়, এই ভ্রমণ-কাহিনী বলিয়া শেষ করিবার নহে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, তাঁহার স্বদেশের ও স্বদেশবাসিগণের প্রতি শ্রদ্ধা কোন ফাঁকা ভাবুকতা বা ইচ্ছাকৃত অন্ধতার ফল নহে, উহা এই প্রত্যক্ষজ্ঞানজনিত। এখানে ইহাও বলিয়া রাখি যে, তাঁহার অনুমান-প্রক্রিয়াও সতেজ ও বর্দ্ধনশীল ছিল, উহা নূতন নূতন ঘটনা-সংগ্রহের জন্য সদা উন্মুখ থাকিত, এবং প্রতিকূল সমালোচনায় কিছুমাত্র ভয় পাইত না। তিনি একবার বলিয়াছিলেন, হিন্দুধর্ম্মের সাধারণ ভিত্তিগুলি কি, ইহাই তাঁহার সমগ্র

জীবনের আলোচনার বিষয় হইয়াছে। শুধু তাহাই নহে, এই সর্ব্বাঙ্গ-সম্পন্ন ও প্রত্যক্ষ জ্ঞান ছিল বলিয়াই তাঁহার স্বদেশ ও স্বজাতীয়গণের ধারণায় হিন্দু-সভ্যতার প্রাচীনতর ও অপেক্ষাকৃত সাদাসিধা উপাদান-গুলিও খুব বড় বড় দেখাইয়াছে। তাঁহার দেশে যতদূর সম্ভব, ততদূর পর্য্যন্ত আধুনিক শিক্ষালাভ করিয়াও তিনি কতকগুলি নব্যপন্থীর ন্যায়, সন্ন্যাসী বা কৃষককুলকে, যাঁহারা প্রতিমাপূজা করেন বা যাঁহারা জাতিভেদপ্রথা দ্বারা পীড়িত তাঁহাদিগকে, অখণ্ড ভারত-বর্ষের অঙ্গবিশেষ নহে বলিয়া উড়াইয়া দেন নাই। আর এই যে কাহাকেও বাদ না দিবার দৃঢ় সঙ্কল্প, তাহা তিনি যে উহাদের সহিত একত্র বহু বৎসর ধরিয়া জীবনযাপন করিয়াছিলেন, তাহারই ফলস্বরূপ।

কিন্তু ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, কোন মহাপুরুষের জীবনের মূলমন্ত্রস্বরূপ কতকগুলি ধারণাকে তাঁহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সহিত কার্য্যকারণসম্বন্ধে জড়িত করিলেই যে উহার সম্যক্ বিশ্লেষণ করা হইল এমত নহে। আমাদিগকে এখনও সেই মূল প্রেরণার কারণ নির্দ্দেশ করিতে হইবে—যে অফুরন্ত শক্তি আজন্ম লাভ করায় একজনের নিকট জগদ্দৃশ্য অন্যাপেক্ষা অধিকতর অর্থবান বলিয়া প্রতীয়মান হয়। আর আমি শুনিয়াছি যে, স্বামী বিবেকানন্দের আশৈশব এই অন্তর্নিহিত সংস্কার ছিল যে, তিনি দেশের উপকার করিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। অনেক পরে তিনি এই কথা মনে করিয়া গর্ব্ব অনুভব করিতেন যে, আমেরিকাগমনের পর প্রথম প্রথম তাঁহাকে যেসকল অবস্থাবিপর্য্যয় সহ্য করিতে হইয়াছিল—যখন ওবেলার আহারের জন্য কাহার দ্বারস্থ হইবেন, তাহার ঠিকানা ছিল না, সেই সময়েও ভারতে শিষ্যগণকে তিনি যেসকল পত্র লিখিয়া-

ছিলেন, তাহাতে বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায় যে, তাঁহার এই দৃঢ় প্রত্যয় একক্ষণের জন্যও বিচলিত হয় নাই। যেসকল মহাত্মা কোন বিশেষ কার্য্য সংসাধিত করিবার জন্য জন্ম পরিগ্রহ করেন, তাঁহাদের প্রত্যেকেরই মধ্যে এইরূপ একটী অদম্য আশা বর্ত্তমান থাকেই থাকে। ইহা ভাবী মহত্ত্বের একটী গভীর ধারণা, ইহা ভাষায় প্রকাশ করিতে হয় না ; উহার একমাত্র প্রকাশ জীবনে। হিন্দুদের চিন্তাপ্রণালী অনুসারে, এই ভাবী মহত্ত্বের ধারণা এবং আত্মাভিমান—এ দুয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ, এবং আমার মনে হয়, স্বামিজীর জীবনেও ইহার পরিচয় তাঁহার শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত দ্বিতীয়-বার সাক্ষাৎকালে, যখন তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের তৎসম্বন্ধীয় প্রশংসা দ্বারা আকৃষ্ট হওয়া দূরে থাকুক, বরং বিশেষরূপ পরাঙ্মুখ হইয়াছিলেন। কারণ, তিনি মনে করিয়াছিলেন, এসকল অতিশয়োক্তি মাত্র।

যখন তিনি আঠার বৎসরের বালক, সেই সময়ে তিনি দক্ষিণেশ্বর-দর্শনে আগত একদল লোকের সঙ্গে তথায় আসিয়াছিলেন, এবং কোন এক ব্যক্তি, সম্ভবতঃ তাঁহার কণ্ঠের অসাধারণ মাধুর্য্য এবং তাঁহার সঙ্গীতে পারদর্শিতার কথা জানিতেন বলিয়া, তাঁহার গান গাহিবার কথা উত্থাপন করেন। উত্তরে তিনি ব্রাহ্ম-সমাজের 'মন চল নিজ নিকেতনে' এই গানটী গাহিলেন।

ইহাই যেন সঙ্কেতস্বরূপ হইল—শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়া উঠিলেন, "বাবা, এই তিন বৎসর ধরিয়া তোমার অপেক্ষায় বসিয়া আছি। বাবা, তুমি এতদিনে আসিলে!" ইহা বলা যাইতে পারে যে, সেইদিন হইতে তিনি তাঁহার অনুগত বালকবৃন্দকে একমনঃপ্রাণ করিয়া এমন একটী সঙ্ঘে পরিণত করিতে ব্যাপৃত হইলেন, যাঁহাদের 'নরেন্দ্রে'র

(স্বামিজীর তখন উহাই নাম ছিল) প্রতি অনুরাগ চিরকাল অটুট থাকিবে।

তিনি যে মহাযশের ভাগী হইবেন, তৎসম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিতে অথবা তাঁহার প্রতিভা যে অসাধারণ, তাহা উল্লেখ করিতে শ্রীরামকৃষ্ণ কখনও ক্লান্তিবোধ করিতেন না। যদি অধিকাংশ লোকের দুইটী, তিনটী অথবা দশটী বা বারটী গুণ থাকে, তবে তিনি নরেন্দ্রের সম্বন্ধে শুধু এই বলিতে পারেন যে, তাঁহার সহস্রটী গুণ আছে; তিনি সত্য সত্যই 'সহস্রদল পদ্ম'। উচ্চাধিকারিগণের মধ্যেও, শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন যে, যদি কাহারও যেসকল গুণ শিবত্বের লক্ষণ এরূপ দুইটী গুণ থাকে, তাহা হইলে নরেন্দ্রের অন্ততঃ আঠারটী ঐরূপ গুণ আছে।

কোন ব্যক্তি ভণ্ড কি না, তাহা শ্রীরামকৃষ্ণ এত চিনিতে পারিতেন যে, উহা সময়ে সময়ে তাঁহার দৈহিক যন্ত্রণা উপস্থিত করিত। একবার তিনি একটী লোককে খাঁটী বলিয়া কিছুতেই গ্রহণ করিলেন না, যদিও উপস্থিত সকলেই তাঁহাকে প্রকৃত ধার্ম্মিক বলিয়াই স্থির করিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, "সমস্ত বাহাড়ম্বর সত্ত্বেও লোকটা 'চুনকাম করা কবর'! রাতদিন শৌচাচারী থাকা সত্ত্বেও উহার উপস্থিতি অপবিত্রতাজনক, আর নরেন্দ্র যদি ইংরেজের হোটেলে গোমাংসও খায়, তথাপি সে পবিত্রই থাকিবে—এমন পবিত্র যে, তাহার স্পর্শমাত্রেই অপরে পবিত্র হইয়া যাইবে।" এইরূপ নানা কথা বলিয়া তিনি সর্ব্বদা এই শিষ্য—যিনি ভবিষ্যতে নেতৃত্বপদবী লাভ করিবেন এবং অপর সকলে—যাঁহারা ভবিষ্যতে তাঁহার সহায়ক হইবেন, তাঁহাদের মধ্যে গুণসমূহের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত একটী স্থায়ী সম্বন্ধ স্থাপন করিতে চেষ্টা করিতেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের এই অভ্যাস ছিল যে, কোন নূতন শিষ্য তাঁহার নিকট আসিলে তিনি তাহার যত রকমে সম্ভব শারীরিক ও মানসিক পরীক্ষা গ্রহণ করিতেন। কারণ, একটী কলের ছোট নমুনার (মডেল) প্রত্যেক অঙ্গটী একজন দক্ষ বৈজ্ঞানিকের চক্ষে যেরূপ অর্থবান বলিয়া প্রতীত হয়, মানবশরীরের প্রত্যেক অঙ্গটীও তেমনি তাঁহার সুশিক্ষিত চক্ষুতে অর্থবান্ বলিয়া প্রতীত হইত। এই পরীক্ষাগুলির মধ্যে একটী—নবাগতকে ঘুম পাড়াইয়া দিয়া তাহার নিদ্রাকালীন মনের গতিবিধি লক্ষ্য করা। শুনিয়াছি, যাঁহারা বিশেষ সংস্কারবান্, তাঁহাদিগকে তিনি এই সময়ে আপন আপন পূর্ব্বজন্ম-বৃত্তান্ত আপনা হইতেই বলিতে দিতেন; আর যাঁহারা তদপেক্ষা হীন অধিকারী, তাঁহাদিগের নিকট উক্ত বৃত্তান্ত প্রশ্নদ্বারা জিজ্ঞাসা করা হইত। 'নরেন্দ্র'কে ঐভাবে পরীক্ষা করিবার পর শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন উপস্থিত সকলকে বলিলেন যে, যে-দিন এই বালক জানিতে পারিবে সে কে এবং কিরূপ উচ্চাধিকারী, সে আর এক মুহূর্ত্তও এই দেহধারণরূপ বন্ধন সহ্য করিতে চাহিবে না—এই প্রতিবন্ধসঙ্কুল জীবন পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে। ইহা শুনিয়া শিষ্যগণ তৎক্ষণাৎ বুঝিলেন যে, স্বামিজী এই জগতেই পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে যাহা যাহা করিয়াছেন তাহা তাঁহার স্মরণ আছে। এই বিশেষ শিষ্যটীর নিকট হইতে শ্রীরামকৃষ্ণ কোন সেবা লইতে পারিতেন না। পাখার বাতাস করা, তামাক সাজা, এবং অন্য হাজার রকমের ছোট-খাট সেবা যাহা সচরাচর শিষ্যেরা গুরুর জন্য করিয়া থাকে, সে-সমস্তই শ্রীরামকৃষ্ণের জন্য অপরে নিষ্পন্ন করিত।

প্রাচ্যের বহু অদ্ভুত আচারের মধ্যে, যিনি জাত্যংশে শ্রেষ্ঠ নহেন

এরূপ লোকের রন্ধিত দ্রব্য ভোজন করার বিরুদ্ধে যে আপত্তি, তাহার ন্যায় আর কোন আপত্তিই দৃঢ়মূল নহে। আর এই বিষয়ে স্বামিজীর গুরুদেব স্ত্রীলোকের ন্যায় অবহিত ছিলেন। কিন্তু যাহা তিনি নিজে খাইতেন না, তাহা তিনি অবাধে তাঁহার প্রিয় শিষ্যকে খাইতে দিতেন; কারণ তিনি বলিতেন, নরেন্দ্র 'জ্বলন্ত আগুন,' সমস্ত মলিনতা দগ্ধ করিয়া ফেলিবে। আবার বলিতেন, এই বালকের ভিতরে যে ঈশ্বরীয় সত্তা ছিল, তাহা পুরুষসত্তা, এবং তাঁহার নিজের ভিতর যে সত্তা, তাহা স্ত্রীসত্তা। এইরূপে, এই বালকের প্রতি একটী প্রশংসার ভাব—কার্য্যক্ষেত্রে শ্রদ্ধাও যে উহার সহিত মিশ্রিত ছিল না, এমন নহে—পোষণ করিয়া তিনি, তাঁহার দ্বারা ভবিষ্যতে যে অনেক মহৎ কর্ম্ম সাধিত হইবে, এমন একটী বিশ্বাসের সূত্রপাত করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার দেহান্তে ঐ বিশ্বাস স্বামিজীর অনেক কাজে লাগিয়াছিল—উহারই বলে তাঁহার কার্য্যসমূহ প্রামাণিক বলিয়া গণ্য এবং সমর্থিত হইয়াছিল। কারণ, স্বামিজীর প্রধান বিশেষত্ব এই যে, তিনি সর্ব্ববিধ বন্ধনের মোচনকর্ত্তা ছিলেন। আর এটী বিশেষ প্রয়োজনীয় ছিল যে, তাঁহার চতুষ্পার্শ্বে এমন কতকগুলি লোক থাকিবেন, যাঁহারা তাঁহার আচার-উল্লঙ্ঘন ও অলস ইন্দ্রিয়সুখাভিলাষীর আচার-উল্লঙ্ঘনের মধ্যে যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিবেন। আমার ভারতবাসের প্রথমভাগে এটী সর্ব্বাপেক্ষা স্পষ্টভাবে এবং বারংবার চক্ষে পড়িয়াছিল যে, এই সঙ্ঘের অন্যান্য ভ্রাতৃগণ তাঁহাদের উপর ন্যস্ত আদেশগুলির এই অংশটী যাবপরনাই নিষ্ঠার সহিত প্রতিপালন করিতেন। যেসকল ব্যক্তির জীবন কঠোরতম আচার-নিষ্ঠার, এমন কি, তপস্যার ছাঁচে গঠিত

হইয়াছিল, তাঁহারাও, তাঁহাদের নেতা যেসকল ইউরোপীয়গণকে শিষ্যত্বে বরণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের সহিত একত্র ভোজন করিতে রাজী ছিলেন। হয়ত মান্দ্রাজে কেহ কেহ স্বামিজীকে জনৈক ইংরেজ ও তাঁহার স্ত্রীর সহিত ভোজন করিতে দেখিয়াছিল; হয়ত কেহ বলিল, তিনি পাশ্চাত্ত্যবাসকালে কখনও কখনও মদ্যমাংস স্পর্শ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন; কিন্তু এসকল শুনিয়া তাঁহার গুরুভ্রাতৃগণের মুখে এতটুকু উদ্বেগের চিহ্ন দেখা যাইত না। উহার ভালমন্দ বিচার করা, কারণনির্দ্দেশ দ্বারা উহাকে বুঝাইয়া দেওয়া, এমন কি, আদৌ উহার যথেষ্ট কারণ এবং ওজর ছিল কি-না, তাহা জিজ্ঞাসা করাও তাঁহারা নিজ কর্ত্তব্যের মধ্যে জ্ঞান করিতেন না। তিনি যাহাই করুন না কেন এবং যেখানেই তাঁহাদিগকে লইয়া যাউন না কেন, তাঁহারা অবিকারে তাঁহার পার্শ্বে স্থান গ্রহণ করিবেন, এইটুকুই তাঁহারা জানিতেন। আর এ কথা নিঃসন্দেহ যে, যিনিই এই দৃশ্যের আলোচনা করিবেন, তিনিই ইহা হৃদয়ঙ্গম না করিয়া থাকিতে পারিবেন না যে, (স্বামী বিবেকানন্দ ব্যতীত শ্রীরামকৃষ্ণসঙ্ঘ যেমন অর্থহীন হইয়া দাঁড়াইত, স্বামিজীর পশ্চাতে এই গুরুভ্রাতৃগণ না থাকিলেও তাঁহার জীবন ও পরিশ্রম তেমনই বিফল হইয়া যাইত।) প্রাচীন সাধুগণের মধ্যে একজন সম্প্রতি আমাকে বলিয়াছিলেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ স্বামী বিবেকানন্দকে তৈয়ার করিবার জন্যই জীবনধারণ করিয়াছিলেন। বাস্তবিক কি তাই? না, জগন্মাতার একটীমাত্র মহীয়সী বাণীর এক অংশকে তাহার অংশান্তর হইতে নিশ্চয়পূর্ব্বক পৃথক করিয়া দেখা যেমন অসম্ভব, তেমনি এই দুই জনের জীবনকেও পৃথক করিয়া দেখা অসম্ভব? এসকল জীবনের সম্যক আলোচনা

করিতে করিতে অনেক সময় আমার এইরূপ মনে হইয়াছে যে, 'শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ নামক একটী আত্মা আমাদের মধ্যে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, এবং তাঁহারই জীবনের অর্দ্ধ আলোকময় অংশে অনেকগুলি মূর্ত্তি দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল; তাহাদের মধ্যে কতকগুলি এখনও আমাদের মধ্যে রহিয়াছে, এবং ইহাদের কোনটীর সম্বন্ধে পূর্ণ সত্যতার সহিত বলিতে পারা যায় না যে, এইখানে ইহার নিজ পরিধির শেষ, অথবা এইখানে ইহার সহিত অপর যেগুলির সম্বন্ধ, তাহাদের পরিধির শেষ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

উত্তরভারতে ভ্রমণ

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালটী আমার স্মৃতিপটে কতকগুলি চিত্রের ন্যায় জাজ্জ্বল্যমান রহিয়াছে। উহারা যেন প্রাচীনকালের প্রতীচ্য-দেশীয় বেদিকাপশ্চাদ্বর্ত্তী পর্দ্দার ও ন্যায়-ধর্ম্মানুরাগ-সরলতারূপ সোনালি জমির উপর অঙ্কিত। আর সকল চিত্রই একজনের উপস্থিতির দ্বারা মহিমান্বিত, যিনি আমাদের অন্তরঙ্গ ভক্তপরিধির জ্যোতির্ম্ময় মধ্যবিন্দুস্বরূপ ছিলেন। আমরা চারিজন পাশ্চাত্ত্য রমণী ছিলাম; তাঁহাদের মধ্যে একজন ম্যাসাচুসেট্‌সের অন্তঃপাতী কেম্ব্রিজ-নিবাসী মিসেস্ ওলিবুল, এবং অপর একজন কলিকাতার উচ্চপদস্থ এঙ্গলো-ইণ্ডিয়ান রাজকর্ম্মচারিজগতের অন্যতম অঙ্গ। স্বামিজী তাঁহার গুরুভ্রাতা ও শিষ্যগণ-পরিবৃত হইয়া আমাদেরই পাশাপাশি যাইতেছিলেন। আলমোড়ায় পৌঁছিয়াই তিনি সদলবলে সেভিয়ার-দম্পতির আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। ইঁহারা সে সময়ে তথায় অবস্থান করিতেছিলেন। আমরা কিছু দূরে একটী বাঙ্গলায় স্থান গ্রহণ করিলাম। এইরূপে, সকলেই অন্তরঙ্গ ছিলাম বলিয়া খুব অবাধে মিলিবার মিশিবার সুবিধা হইয়াছিল। কিন্তু যখন মাসখানেক পরে আমরা আলমোড়া পরিত্যাগ করিয়া কাশ্মীর যাত্রা করিলাম, তখন স্বামিজী সঙ্গিগণকে তথায় রাখিয়া মিসেস্ বুলের অতিথিরূপে আমাদের সহিত গমন করিলেন।

উত্তরভারতে ভ্রমণ

মে মাসের প্রথম হইতে অক্টোবর মাসের শেষ পর্য্যন্ত আমরা কি অপরূপ দৃশ্যাবলীর মধ্য দিয়াই না ভ্রমণ করিয়াছি! আর যেমন আমরা একটীর পর একটী করিয়া নূতন নূতন স্থানে আসিতে লাগিলাম, কি অনুরাগ ও উৎসাহের সহিতই না স্বামিজী আমাদিগকে তত্রত্য প্রত্যেক জ্ঞাতব্য বস্তুটীর সহিত পরিচয় করাইয়া দিতেছিলেন! ভারত সম্বন্ধে শিক্ষিত পাশ্চাত্ত্য লোকদের অজ্ঞতা—অবশ্য, যাঁহারা এ বিষয়ে চেষ্টা করিয়া কতক ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র—এত বেশী যে উহাকে প্রায় নিরেট মূর্খামি বলা চলে! আর আমাদের এ বিষয়ে হাতে-কলমে শিক্ষা প্রাচীন পাটলীপুত্র বা পাটনা হইতেই আরম্ভ হইয়াছিল বলিতে হইবে। রেলযোগে পূর্ব্বদিক হইতে প্রবেশ করিবার মুখে কাশীর ঘাটগুলির যে দৃশ্য চক্ষে পড়ে, তাহা জগতের দর্শনীয় দৃশ্যগুলির মধ্যে অন্যতম। স্বামিজী সাগ্রহে উহার প্রশংসা করিতে ভুলিলেন না। লক্ষ্ণৌয়ে যেসকল শিল্পদ্রব্য ও বিলাসোপকরণ প্রস্তুত হয়, তাহাদিগের নাম ও গুণবর্ণনা অনেকক্ষণ ধরিয়া চলিল। কিন্তু যেসকল মহানগরীর সৌন্দর্য্য সর্ব্ববাদিসম্মত ও যাহারা ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, শুধু সেইগুলিকেই যে স্বামিজী আগ্রহের সহিত আমাদের মনে দৃঢ়াঙ্কিত করিয়া দিতে প্রয়াস পাইতেন তাহা নহে। আর্য্যাবর্ত্তের সুবিস্তৃত খেত, খামার ও গ্রামবহুল সমতল প্রদেশ অতিক্রম করিবার সময় তাঁহার প্রেম যেরূপ উথলিয়া উঠিত, অথবা তন্ময়তা যেরূপ প্রগাঢ় হইয়া উঠিত, এমন আর বোধ হয় কোথাও হয় নাই। এইখানে তিনি অবাধে সমগ্র দেশকে এক অখণ্ডভাবে চিন্তা করিতে পারিতেন, এবং তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া কিরূপে ভাগে জমি চাষ করা হয়, তাহা বুঝাইয়া দিতেন অথবা

কৃষক-গৃহিণীর দৈনন্দিন জীবনের বর্ণনা করিতেন; তাহার আবার কোন খুঁটিনাটিটী বাদ যাইত না—যেমন সকালের জলখাবারের জন্য যে রাত্রি হইতে খিচুড়ী উনানে চড়াইয়া রাখা হইত, তাহাও উল্লিখিত হইত। আমাদিগকে সকল কথা বলিতে বলিতে তাঁহার নয়নপ্রান্তে যে আনন্দরেখা ফুটিয়া উঠিত, অথবা কণ্ঠ যে আবেগভরে কম্পিত হইত, তাহা নিশ্চয়ই তাঁহার পূর্ব্ব পরিব্রাজক-জীবনের স্মৃতিবশতঃ। কারণ, আমি সাধুদিগের মুখে শুনিয়াছি যে, দরিদ্র কৃষকগৃহে যে অতিথিসৎকার লাভ হয়, তাহা ভারতের আর কুত্রাপি দেখা যায় না! সত্য বটে যে, গৃহস্বামিনী তৃণশয্যা ব্যতীত আর কোন উত্তম শয্যা এবং মাটীর দেওয়ালবিশিষ্ট একখানি পরচালা ব্যতীত আর কোন উত্তম আশ্রয় অতিথিকে দিতে পারেন না; কিন্তু তিনিই আবার শেষ মুহূর্ত্তে নিজে শয়ন করিতে যাইবার পূর্ব্বে—যখন বাটীর অপর সকলে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে—একটী দাঁতন ও একবাটি দুধ চুপে চুপে এমন একস্থানে রাখিয়া যান, যেন অতিথি প্রাতে শয্যাত্যাগ করিয়া উহা দেখিতে পান এবং পুনরায় অন্যত্র গমন করিবার পূর্ব্বে কিছু জলযোগ করিয়াও যাইতে পারেন।

সময়ে সময়ে এরূপ মনে হইত, যেন স্বদেশের অতীত গৌরববোধই স্বামিজীব ষোলআনা মনঃপ্রাণ অধিকার করিয়াছিল। তাঁহার স্থান-মাত্রেরই ঐতিহাসিক মূল্যবোধ অতি অসাধারণরূপে বিকাশ পাইয়াছিল। এইহেতু যখন আমরা বর্ষার প্রাক্কালে একদিন অপরাহ্নে গুমোটের মধ্য দিয়া তরাই অতিক্রম করিতেছিলাম, সেই সময় তিনি আমাদিগকে যেন প্রত্যক্ষ করাইয়া দিলেন যে, এই সেই ভূমি, যথায় ভগবান বুদ্ধের কৈশোর অতিবাহিত ও বৈরাগ্যলীলা প্রকটিত

হইয়াছিল। বন্য ময়ূরগণ রাজপুতানা ও তাহার চারণগণের গীত মনে পড়াইয়া দিল। ক্বচিৎ কোথাও একটী হস্তী স্বামিজীর ভারতের প্রাচীনকালের যুদ্ধকাহিনীসকল বলিবার উপলক্ষ্যস্বরূপ হইল—সেই প্রাচীন যুগের ভারত, যাহা যতদিন সে বিদেশীয়দিগের আক্রমণের বিরুদ্ধে এই জীবন্ত কামানরূপ সামরিক প্রাকার খাড়া করিতে পারিয়াছিল, ততদিন কখনও পরাজিত হয় নাই।

আমরা বঙ্গদেশের সীমা অতিক্রম করিয়া যুক্তপ্রদেশে প্রবেশ করিতেছি, এই অবসরে স্বামিজী আমাদিগকে তৎকালে যে মহানুভব দয়াবান ইংরেজ উহার শাসনকর্তৃপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাঁহার বিজ্ঞজনোচিত কার্য্যপ্রণালীর কথা বলিলেন। তিনি অতি মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় বলিলেন, "অন্য সকল শাসনকর্ত্তা হইতে তাঁহার পার্থক্য এই যে, তিনি বুঝেন যে, প্রাচ্যদেশসমূহে এখনও জনসাধারণের মত তেমন প্রবল হইয়া না উঠায় উহাদের শাসনভার ব্যক্তিবিশেষের উপর থাকা আবশ্যক। সেইজন্য কোন হাসপাতাল, বা কলেজ, বা অফিসের লোক জানেন না, কোন্ দিন তিনি উহা পরিদর্শন করিতে আসিয়া উপস্থিত হইবেন। আর যে অতি গরীব, তাহারও বিশ্বাস যে, যদি সে শুধু তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারে, তাহা হইলেই তাঁহার হস্তে সুবিচার প্রাপ্ত হইবে।" প্রাচ্য দেশসমূহের শাসনব্যাপারে ব্যক্তির প্রভাব খুব বেশী, এই ভাবটী স্বামিজীর কথাবার্ত্তায় প্রায়ই বিশেষভাবে প্রকাশ পাইত। তিনি সর্ব্বদাই বলিতেন যে, বিচারের চক্ষে দেখিতে গেলে সমগ্র দেশশাসনের পক্ষে গণতন্ত্র বা ডিমক্রেসি সর্ব্বাপেক্ষা অপকৃষ্ট শাসনপ্রণালী। তাঁহার একটী প্রিয় ধারণা এই ছিল যে, জুলিয়াস সীজার যে স্বয়ং সম্রাটের পদবী আকাঙ্ক্ষা

করিয়াছিলেন, তাহা এই সত্যটী উপলব্ধি করিয়াছিলেন বলিয়াই। সম্রাটপদবীতে আরূঢ় কোন ব্যক্তিবিশেষের শাসন হইতে—যাঁহার নিকট সর্ব্বদা প্রার্থনা করা যায়, যিনি সর্ব্বদা কৃপাবিতরণে তৎপর, এবং যিনি অন্য সকলের মতামত উপেক্ষা করিয়া নিজের ইচ্ছানুযায়ী ন্যায় বিধান করিতে সমর্থ, এরূপ লোকের শাসন হইতে, কতকগুলি ক্রমনিবদ্ধ বিভাগের দয়ামায়াহীন শাসনের অন্তর্ভুক্ত হওয়া ভারতের নিম্নশ্রেণীর লোকদের পক্ষে যে কি কষ্টকর পরিবর্ত্তন, তাহা আমরা তাঁহার কথা শুনিতে শুনিতে মাঝে মাঝে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি। কারণ, আমরা তাঁহার মুখ হইতে শুনিতে পাইলাম যে, ইংরেজ-রাজত্বের প্রথমভাগে কত সরলচিত্ত লোক যে লণ্ডনে উইণ্ডসর প্রাসাদে ভারতেশ্বরী মহারাণীর নিকট গিয়া তাঁহাকে সাক্ষাতে সমস্ত নিবেদন করিবার উদ্দেশ্যে নিজেদের যথাসর্ব্বস্ব ক্ষয় করিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। তাহাদের অধিকাংশই এই নিষ্ফল যাত্রার পথিক হইয়া আশাভঙ্গ ও অভাব হেতু নিজ নিজ গ্রাম ও ঘরদ্বার হইতে বহু দূরে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছে—যাহার পুনঃ সন্দর্শনলাভ তাহাদিগের ভাগ্যে আর ঘটিয়া উঠে নাই।

কিন্তু পাঞ্জাবে প্রবেশ করিয়াই আমরা গুরুদেবের স্বদেশ-প্রেমের গভীরতম পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। যদি কেহ তাঁহাকে সে সময়ে দেখিতেন, তাহা হইলে তিনি ধারণা করিয়া বসিতেন যে, স্বামিজী এই প্রদেশেই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন—তিনি উহার সহিত আপনাকে এত অভিন্ন করিয়া ফেলিয়াছিলেন। মনে হইত যেন তিনি ঐ প্রদেশের লোকের সহিত বহু প্রেম ও ভক্তিবন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন; যেন তিনি উহাদের নিকট পাইয়াছেনও অনেক এবং দিয়াছেনও অনেক। কারণ,

তাঁহাদের মধ্যে কতক লোক ছিলেন যাঁহারা পূর্ণ বিশ্বাসের সহিত বলিতেন যে, তাঁহাতে তাঁহারা গুরু নানক ও গুরু গোবিন্দের—তাঁহাদের প্রথম এবং শেষ গুরুর—অপূর্ব্ব মিশ্রণ লক্ষ্য করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা সর্ব্বাপেক্ষা সন্দেহপ্রবণ, তাঁহারা পর্য্যন্ত তাঁহাকে বিশ্বাস করিতেন। আর যদি তাঁহারা তাঁহার আশ্রিত ইউরোপীয় শিষ্যগণ সম্বন্ধে—যাহাদিগকে তিনি নিজের করিয়া লইয়াছিলেন—তাঁহার সহিত একমত হইতে না পারিত, অথবা তাঁহার ন্যায় উচ্ছ্বসিত সহানুভূতি প্রকাশ করিতে না পারিত, তাহা হইলে তিনি এই উদ্দামহৃদয় লোকগুলিকে তাঁহাদের মত পরিবর্ত্তন না করা ও অটুট কঠোরতার জন্য যেন আরও অধিক ভালবাসিতেন। তিনি যে পাঞ্জাবী বালিকার চরকা ঘুরাইতে ঘুরাইতে 'শিবোহহং, শিবোহহং' ধ্বনি শুনার কথা বলিতেন—যাহার বর্ণনা করিতে করিতে তাঁহার মুখমণ্ডল একটী অস্ফুট আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিত—তাঁহার আমেরিকাবাসী শিষ্যগণ পূর্ব্বেই তাহার সম্বন্ধে অবগত হইয়াছিলেন। আবার এ কথাও বলিতে ভুলিলে চলিবে না যে, এই পাঞ্জাবপ্রবেশের পরই তিনি (যেমন আর একবার তিনি কাশীতে জীবনের অপরাহ্ণ-সময়ে করিয়াছিলেন) একজন মুসলমান মিঠাইওয়ালাকে ডাকিয়া তাহার নিকট হইতে মুসলমানী খাবার কিনিয়া খাইয়াছিলেন।

আমরা যখন কোন গ্রামের ভিতর দিয়া যাইতাম, তখন তিনি আমাদিগকে হিন্দু পরিবারগুলির বিশেষত্বসূচক দ্বারদেশের উপরিভাগে দোদুল্যমান গাঁদাফুলের মালাগুলি দেখাইয়া দিতেন। আবার ভারতবাসিগণ 'সুন্দর' বলিয়া যাহার আদর করেন, গায়ের সেই

'কাঁচা সোনার রঙ্গ' তিনি আমাদিগকে দেখাইয়া দিতেন। ইউরোপীয়দিগের আদর্শস্থল যে ঈষৎ রক্তাভ শ্বেত, তাহা হইতে উহা কত বিভিন্ন! আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া টাঙ্গাযোগে যাইবার সময় তিনি অন্য সব ভুলিয়া, যে শিবমাহাত্ম্য-বর্ণনে তিনি কদাপি ক্লান্তি-বোধ করিতেন না, তাহাতেই মগ্ন হইয়া যাইতেন। মহাদেবের লোকসমাগম হইতে অতিদূরে পর্ব্বতশীর্ষে মৌনভাবে অবস্থিতি, তাঁহার মানবের নিকট কেবল নিঃসঙ্গত্ব যাচ্ঞা এবং এক অনন্ত ধ্যানে তন্ময় হইয়া থাকা—এইসকল বিষয় বর্ণিত হইত।

রাওয়ালপিণ্ডি হইতে আমরা গাড়ী করিয়া মারীতে গমন করিলাম এবং তথায় কয়েক দিবস অতিবাহিত করিলাম। তৎপরে কতক টাঙ্গায়, কতক নৌকায়, আমরা কাশ্মীরান্তঃপাতী শ্রীনগরে গমন করিলাম। ইহার পরে আমবা যে কয় মাস ভ্রমণ করিয়াছিলাম, শ্রীনগর আমাদের প্রধান আড্ডা হইয়াছিল।

এই স্থলে আমাদের যাত্রাপথের সৌন্দর্য্যসমূহের বর্ণনা করিতে গিয়া সহজেই আত্মহারা হইয়া পড়িতে হয়। কারণ, আলমোড়ার রাস্তার পার্ব্বত্য অরণ্যানী এবং বিতস্তা গিরিসঙ্কটের গীর্জার আকারে শোভমান পাহাড়গুলি ও শস্যক্ষেত্রবক্ষে লুক্কায়িতপ্রায় গ্রামসমূহ ঐ পথের অন্তর্গত। ঐ সময়ের কথা স্মরণ করিলে কতকগুলি সুষমাময় দৃশ্যপরম্পরা মানসপটে উদিত হয়। এই সমুদায় চিত্রের মধ্যে কাশ্মীরী কৃষকরমণীগণোচিত রক্ত মুকুট ও শ্বেত অবগুণ্ঠন-যুক্তা সেই প্রাচীনার সৌম্যমূর্ত্তি বড়ই প্রীতিপ্রদ। যখন আমরা ঐ পথ দিয়া যাইতে যাইতে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তাঁহার আবাস-স্থলের সমীপবর্ত্তী হইলাম, দেখিলাম তিনি একটী খামারের মধ্যস্থিত

এক বিশাল চিনার বৃক্ষতলে পুত্রবধূগণপরিবৃত হইয়া চরকায় সূতা কাটিতেছেন। স্বামিজীর ইহা দ্বিতীয় সন্দর্শন। পূর্ব্ববৎসর তিনি তাঁহার নিকট কোন ছোটখাট উপহার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং সেই সময়ে বিদায়গ্রহণের অব্যবহিত পূর্ব্বে তাঁহাকে 'মা, আপনি কোন্ ধর্ম্মাবলম্বিনী'—এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। প্রশ্ন-শ্রবণে তাঁহার মুখমণ্ডল গরিমা ও আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল; জয়োল্লসিত উচ্চকণ্ঠে বৃদ্ধা এই স্পষ্ট উত্তর দিলেন, "ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, প্রভুর কৃপায় আমি মুসলমানী।" স্বামিজী এই গল্পটী সংখ্যাতীতবার আমাদের নিকট বলিয়াছেন।

এ স্থলে আমি শ্রীনগরের বহির্দ্দেশে সমুন্নত লম্বাডিদেশসুলভ পপ্‌লার গাছগুলি যে বীথি রচনা করিয়াছে তাহার কথা উল্লেখ করিতে পারি। উহা হবিমা (Hobbema)-রচিত বিখ্যাত চিত্রখানির অবিকল অনুরূপ। এইখানে আমরা ভারত ও সনাতন-ধর্ম্ম সম্বন্ধে স্বামিজীর কত কথোপকথনই না শ্রবণ করিয়াছি!

অথবা আমি জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে ফসল কাটিয়া ঘরে তুলিবার পর সেই ক্ষেত্রে গ্রামবাসিগণের সময়োচিত আনন্দোৎসবের কথা অনেকক্ষণ ধরিয়া বর্ণনা করিতে পারি। অথবা আমি ইসলামাবাদের উন্নত পপ্‌লার তরুরাজিতলে তাম্রাভ অ্যামারান্থ (amaranth) শস্যের বা সদ্যোজাত হরিদ্বর্ণ ধানগাছগুলির কথা বলিতে পারি। বনফুলসমূহের মধ্যে উজ্জ্বল নীলবর্ণের একজাতীয় 'ফরগেট-মি-নট্' গ্রীষ্মকালে কাশ্মীরের খেতগুলিতে অতি সাধারণ দৃশ্য, কিন্তু শরৎ ও বসন্তকালে খেত ও নদীতট ছোট ছোট বেগুনী আইরিস (iris) ফুলে একেবারে ছাইয়া যায়। উহাদের বর্শার মত সূচাল পাতাগুলির

মধ্যে বেড়াইতে বেড়াইতে উহাদিগকে ঘাস বলিয়াই ভ্রম হয়। কোন কোন স্থলে রাস্তার পার্শ্বে ছোট ছোট পাহাড় দৃষ্টি অবরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। ঐসকল ভূমি মুসলমানদিগের গোরস্থান। আর ঐগুলি আইরিস-কুসুমমণ্ডিত হওয়ায় কি অনন্ত করুণ ভাবেরই না উদ্দীপনা করিয়া দিতেছে!

আবার এখানে সেখানে ঘাস ও আইরিসফুলগুলির মধ্যে দুই-চারিটী করিয়া গ্রন্থিবহুল আপেল বা নাশপাতি বা আলুবোখারার গাছ দেখিতে পাওয়া যায়। একসময়ে রাজ-সরকার হইতে প্রত্যেক গ্রামের প্রজাগণ বিনাব্যয়ে এক একটী ফলের বাগান উপভোগ করিতে পাইত। এই গাছগুলি তাহাদেরই ধ্বংসাবশেষ। একদিন গোধূলিসময়ে উচ্চ নদীতটে ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিলাম, একদল মুসলমান রাখাল পাঁচন-হস্তে কতকগুলি দীর্ঘরোম ছাগলকে গ্রামাভিমুখে তাড়াইয়া লইয়া যাইতেছে। তারপর কতকগুলি আপেলগাছের নিকট পৌঁছিয়া তাহারা একটু থামিল এবং প্রার্থনা-কালে ব্যবহৃত গালিচার পরিবর্ত্তে কম্বল বিছাইয়া সেই ঘনায়মান গোধুলি-আলোকে তাহাদের সান্ধ্য উপাসনায় প্রবৃত্ত হইল। আমার হৃদয় বলিতেছে, এ সৌন্দর্য্যের অন্ত নাই, বাস্তবিকই অন্ত নাই।

কিন্তু সত্যসত্যই বর্ত্তমান পুস্তকে এইসকল বস্তুর কথা বলাই আমার উদ্দেশ্য নহে। আমার বর্ণনীয় বিষয় ভূগোল বা রাজনীতি নহে, এমন কি, কৌতূহলোদ্দীপক লোকসমূহ বা অপরিচিত জাতি-সমূহের আচার-ব্যবহারও নহে। সৌভাগ্যবশতঃ আমি এই পরিবর্ত্ত-নের যুগের শত বিরোধ ও গণ্ডগোলের মধ্যেও সেই প্রাচীন যুগের একটী ধর্ম্মজীবনের যে উন্মেষ দেখিতে পাইয়াছিলাম, এখানে তাহারই

কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া আমার উদ্দেশ্য। এই মহাপুরুষ আবার সেই-সকল বিরোধের বিষয় সম্যক্ অবগত ছিলেন বলিয়া সমধিক মর্ম্মযাতনা ভোগ করিতেন। তাঁহার সম্বন্ধে আমার বলিবার খুব ইচ্ছা থাকিলেও আমার অক্ষমতাবশতঃ ঐ বর্ণনা অসংলগ্ন ও অস্পষ্টই থাকিয়া যাইবে। স্বামিজী নিজেই যেমন একবার বলিয়াছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন যেন একটী ফুলের মত, একটী মন্দিরসংলগ্ন উদ্যানে স্বতন্ত্রভাবে জীবনযাপন করিতেন ; সরল, অর্দ্ধনগ্ন, আচারনিষ্ঠ, ভারতের প্রাচীন কালের আদর্শস্বরূপ। তিনি এমন একটী জগতের মাঝখানে সহসা ফুটিয়া উঠিয়াছিলেন যে, জগৎ সেই কালের স্মৃতি পর্য্যন্ত মুছিয়া ফেলিবার সঙ্কল্প করিয়াছিল। আমার গুরুদেবের জীবনের মহত্ত্ব এবং সেই সঙ্গে খেদেরও বিষয় এই যে, তিনি এই ছাঁচের লোক ছিলেন না। যে অবস্থায় মানুষ ভগবানকে প্রত্যক্ষ করে, সেই সমাধি-অবস্থালব্ধ শাশ্বত প্রজ্ঞালোকে তাঁহারও চিত্ত উদ্ভাসিত থাকিত বটে, কিন্তু উহা সেইসকল প্রশ্ন ও সমস্যার উপরই নিপতিত হইত, যাহা আধুনিক জগতের মনীষী ও কর্ম্মিগণের আলোচনার বিষয়। তাঁহার আশা বিংশ শতাব্দীর মানবগণের আশাকে আপনার অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইতে বা বর্জ্জন করিতে পারিত, কিন্তু উহার খোঁজখবর না লইয়া থাকিতে পারিত না। সমুদয় জ্ঞানভাণ্ডারকে একসূত্রে গ্রথিত করার প্রথম ফলস্বরূপ, চারিদিক হইতে সমগ্র মানবজাতির দুর্দ্দশা ও তৎপ্রতিকূলে সংগ্রামের যে দৃশ্য প্রকাশ্য দিবালোকের ন্যায় লোকের নয়নপথে সহসা পতিত হইয়াছিল, তাহা ইউরোপীয়গণের মত তাঁহারও চক্ষে পড়িয়াছিল। ইউরোপ এ বিষয়ে কি অভিমত প্রকাশ করিয়াছে, তাহা আমরা জানি। গত ষাট বৎসর বা ততোধিক কাল ধরিয়া

ইউরোপীয় কলা, বিজ্ঞান ও কাব্য হতাশার ক্রন্দনে পূর্ণ। এক দিকে অধিকারপ্রাপ্ত জাতিসমূহের উত্তরোত্তর বর্দ্ধমান তুষ্টি ও ইতরজনোচিত প্রবৃত্তি, অন্যদিকে অধিকারনিরাকৃত জাতিসমূহের উত্তরোত্তর বর্দ্ধমান বিষাদ ও যন্ত্রণা; আর মানবের উদার প্রকৃতি এসকলকে পাপ বলিয়া জানিয়াও শক্তি-অভাবে ইহাদের রোধ বা দমনে অসমর্থ—এই দৃশ্যই ইউরোপের শ্রেষ্ঠ মনীষিগণের চক্ষে পড়ে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও এবং মর্ম্মযাতনা ভোগ করিলেও উপায়ান্তর না দেখিয়া পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষা শুধু দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে ইহাই বলিতে পারে, "যাহার আছে তাহাকে আরও দেওয়া হইবে, আর যাহার নাই তাহার নিকট হইতে তাহার যৎসামান্য সম্বলটুকুও কাড়িয়া লওয়া হইবে। সাবধান, যে পরাজিত হইবে তাহারই সর্ব্বনাশ!"

প্রাচ্য জ্ঞানিমণ্ডলীরও কি এই অভিমত? তাহা হইলে মানব-জাতির আর আশা কি? আমি আমার গুরুদেবের জীবনে এই প্রশ্নের একটী উত্তর দেখিতে পাই। আমি তাঁহাকে একাধারে ভারতের ও জগতের অতীতকালের সংখ্যাতীত আচার্য্য ও ঋষিগণের আধ্যাত্মিক আবিষ্কার ও ধর্ম্মলাভের জন্য সংগ্রামের উত্তরাধিকারি-স্বরূপে এবং এক নূতনবিধ ভবিষ্যৎ উন্নতির প্রবর্ত্তক ও ঋষিরূপে দেখিতে পাই। কোন একটী সমস্যাকে তিনি মনে মনে যেভাবে গ্রহণ করিতেন, তাহা হইতেই আমি উহার কি সমাধান হইবে, তাহা বুঝিতে পারিতাম। আর আমি পূর্ব্ব হইতেই উহার ঠিক বিপরীত মতটীকে দৃঢ়ভাবে অবলম্বন না করিয়া থাকিলে (এরূপ স্থলে তিনিই সর্ব্বপ্রথম উহা আমাকে দেখাইয়া দিতেন) তাঁহার ঐ সমাধানের ইঙ্গিত আমার প্রভূত উপকারে আসিত। এইভাবে চিন্তা

করিয়াছি বলিয়া আমার বিশ্বাস যে, যেসকল উন্নত ও অসাধারণ চিন্তাপ্রণালী ও জ্ঞানভূমিতে তিনি অবাধে বিচরণ করিতেন, তাহার প্রত্যেকটীর আধুনিক যুগের জন্য কোন-না-কোন সার্থকতা আছে। আমার বিশ্বাস, অনেক জিনিস যাহা আমি বুঝিতে পারি নাই বলিয়া আমার দৃষ্টি অতিক্রম করিয়াছে, তাহা অন্য কাহারও জীবনে অনুকূল ক্ষেত্র প্রাপ্ত হইবে। আর আমি প্রার্থনা করি, নিজের মনগড়া কোন কিছু না জুড়িয়া দিয়া, বা সত্যের অপলাপ হয় এমন কোন রঙ না লাগাইয়া, আমি যেন সর্ব্বদা সত্য সাক্ষ্য প্রদান করিতে পারি।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

জীবের চৈতন্যদাতা

কলিকাতায় বাসকালে শুনিয়াছিলাম যে আধ্যাত্মিক জীবন চেষ্টালভ্য একটী নির্দ্দিষ্ট বস্তু, উহাকে ইচ্ছাপূর্ব্বক বরণ করিয়া লইতে হয় এবং কতকগুলি সুপবিচিত পন্থা-অবলম্বনে লাভ করিতে হয়। হিমালয়ে পৌঁছিয়া দেখিলাম যে ইহার মূল দুইটী বস্তুতে নিবদ্ধ—একটী ভগবানের প্রতি গভীর আকাঙ্ক্ষামূলক প্রেম এবং অপরটী প্রবল উৎকণ্ঠার সহিত সেই অনন্ত বস্তুর অন্বেষণ—এরূপ প্রবল উৎকণ্ঠা যে আমি তাহার কোনরূপ বর্ণনা করিবার আশাই করিতে পারি না। ইহাই আমার গুরুদেবের বিশেষত্ব ছিল। অপরে যেখানে উপায়ের আলোচনাতেই ব্যস্ত, তিনি সেখানে রীতিমত আগুন জ্বালিতে জানিতেন। অপরে যেখানে শুধু উপায় নির্দ্দেশ করিত, তিনি সেখানে আসল জিনিসটীকেই দেখাইয়া দিতেন!

আমি এস্থলে আমার বক্তব্যটী অতি বিশদভাবে বলিতে চাই। তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করা অবধি বরাবর আমার কার্য্য ছিল যেন কতকটা অপরের মনের ভাব ধরিতে পারা। আমি শুধু এইটুকু দাবী করিতে পারি যে, গুরুদেবের বিভিন্নমুখী শক্তিপ্রবাহের সহিত আমার এতটা ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল যে আমি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে তৎসম্বন্ধে বলিতে পারি। আর যেহেতু আমি বিশ্বাস করি যে, জড়-

মাত্রেই যেরূপ কতকগুলি সুনির্দ্দিষ্ট নিয়মে বদ্ধ, অভিজ্ঞতাও ঠিক সেইরূপ কতকগুলি নিয়মাধীন, সেইহেতু যে-যে অবস্থার মধ্য দিয়া আমার উক্ত অভিজ্ঞতা লাভ হইয়াছিল, সেগুলিকে আমি যথাযথভাবে বর্ণনা করিতে চেষ্টা করিব।

স্বামিজী তাঁহার নিজ জীবনের ঘটনা বা অনুভূতিগুলি সম্বন্ধে অত্যন্ত চাপা লোক ছিলেন। অবশ্য, জগতের বিভিন্ন স্থানে অনেক লোক তাঁহার নিকট নিজ নিজ দোষসকল উদ্‌ঘাটিত করিয়াছে, কিন্তু যাহাতে কাহারও আধ্যাত্মিক গুরু না হইতে হয় তজ্জন্য তিনি যত ব্যাকুলভাবে চেষ্টা করিতেন, এমন আর কেহ কখনও করিয়াছেন কি না জানি না। এমন কি, যে প্রশ্নগুলি কোন ব্যক্তিবিশেষকে উদ্দেশ করিয়া নহে, অথচ যাহাতে মনে হইত যে নিজ ব্যক্তিগত অনুভূতিগুলিকে অতিরিক্ত মাত্রায় প্রকাশ না করিলে তাহাদের উত্তর দেওয়া চলে না, এমন সব প্রশ্নেও প্রথমটা তাঁহার মুখচোখ লাল হইয়া উঠিত—নিজের অন্তরের কথা অপরের নিকট প্রকাশ করিব কেন, মনে এইরূপ একটী সঙ্কোচ আসিয়া উপস্থিত হইত। তাঁহার লণ্ডনের ক্লাসগুলিতে আমি কখনও কখনও দেখিয়াছি যে লোকে কতকগুলি প্রশ্ন তাঁহাব উপর জোর কবিয়া চাপাইয়া দিয়াছে —যেমন, সমাধিকালে কিরূপ অনুভূতি হয়, ইত্যাদি। সে সময় উপস্থিত সকলেই বুঝিতে পারিতেন যে, ঐরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা না করিয়া বরং যদি কেহ তাঁহার কোন অনাবৃত স্নায়ু অসাবধানতাবশতঃ জোরে চাপিয়া ফেলিত, তাহা হইলে উহা সহ্য করা তাঁহার পক্ষে সহজ হইত।

তিনি নিজেই তাঁহাদের সহিত একসঙ্গে আমার যাওয়ার কথা উত্থাপন করিয়াছিলেন। উদ্দেশ্য, তিনি আমার দ্বারা ভারতে যে

কার্য্য করাইবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে আমাকে নিজে উপদেশ দিবেন। কিন্তু এই শিক্ষা অত্যন্ত সাধারণভাবেই প্রদত্ত হইত। আমরা সকলে একসঙ্গে বারান্দা বা বাগানে বসিতাম, এবং সেই সময়ে স্বামিজী যে কথাবার্ত্তা কহিতেন তাহাই মনোযোগসহকারে শুনিয়া যাইতাম—প্রত্যেকেই যিনি যতটা পারেন উহার ততটুকু গ্রহণ করিতেন এবং পরে ইচ্ছামত তাহার আলোচনা করিতেন।

আমার যতদূর মনে পড়ে, ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের সারা বৎসরটীর মধ্যে মাত্র একটী দিন তিনি আমাকে অর্দ্ধঘণ্টার জন্য তাঁহার সহিত একাকী ভ্রমণ করিতে লইয়া গিয়াছিলেন, এবং তৎপরে আমাদের কথাবার্ত্তা —তখন গ্রীষ্মঋতু প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, এবং আমিও আমাকে কি করিতে হইবে তাহা একটু একটু বুঝিয়াছি—অনুভূতিমূলক কোন কিছু সম্বন্ধে না হইয়া বরং ভাবী কার্য্যের উদ্দেশ্য ও প্রণালী সম্বন্ধেই হইয়াছিল।

কোন বিশিষ্ট চিন্তাশীল ব্যক্তির চতুর্দ্দিকে যেসকল লোক আকৃষ্ট হন, তাঁহাদের তাঁহার সহিত কতকগুলি নিগূঢ় ভাবসম্বন্ধ স্থাপিত হয়। এইসকল প্রণালী-অবলম্বনেই যেন তাঁহার চিন্তারাশি চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত ও জনসমূহ কর্তৃক পরিগৃহীত হয়। এমন কি, একজন গণিতবেত্তা তাঁহার সমসাময়িক লোকগণের উপর সেই পরিমাণে স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন, যে পরিমাণে তাঁহার চিন্তাসমূহ ভাবের (feeling) মধ্য দিয়া প্রচারিত হয়। কিন্তু এই ভাবসম্বন্ধের কোন নির্দ্দিষ্ট রূপ নাই; উহা বিভিন্ন লোকের পক্ষে বিভিন্ন আকার ধারণ করে। কেহ দাসভাবে, কেহ বা ভ্রাতা, সখা বা বন্ধুভাবে, এমন কি, কেহ বা সেই অলৌকিক পুরুষকে প্রাণপ্রিয় সন্তানরূপে দেখিয়া

থাকেন। ভারতবর্ষে এইসকল ব্যাপার একটী সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন বিজ্ঞানে পরিণত হইয়াছে, এবং তথায় লোকে অসঙ্কোচে বুঝে ও মানিয়া লয় যে, এইরূপ কোন একটী ভাবসম্বন্ধ-স্থাপন ব্যতীত সাধারণ লোকে কোন বিরাট ধর্ম্মান্দোলনের দ্বারা প্রভাবিত হইতে পারে না। আমার নিজের কথা বলিতে গেলে, ধর্ম্মরাজ্যে ক্রমশঃ আমি তাঁহার কন্যাস্থানীয়া হইলাম, এবং যেসকল ভারতবাসী ও ভারতীয় সম্প্রদায়ের সহিত গুরুদেবের জীবদ্দশায় আমার পরিচয় হইয়াছিল, তাঁহারা সকলেই আমাকে ঐ চক্ষেই দেখিতেন।

কিন্তু এই যাত্রার প্রারম্ভে, যখন অন্য নানা বিষয়ের ন্যায় পূর্ব্বোক্ত ব্যাপারটীও আমার মোটেই বোধগম্য ছিল না, সেই সময় আমার মন একেবারে দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছিল, এবং মহা সৌভাগ্যবশতঃই আমি এই সময়ে স্বামী স্বরূপানন্দ নামক তরুণ সন্ন্যাসীকে আমার বাঙ্গালাভাষা ও হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রের নিত্য শিক্ষকরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। কারণ, আমার বরাবর ধারণা যে, এই ঘটনা হইতেই আমি তাঁহার এবং আমার গুরুদেবের মনের সংযোগপথে আসিয়া পড়িয়াছিলাম, এবং যেমন দর্পণসঙ্কেতে (heliograph) একটী বৃহৎ ও একটী ক্ষুদ্র দর্পণের পরস্পর সঙ্কেত-আদান-প্রদান-মার্গে অবস্থিত হইলে তত্রত্য সমস্ত তথ্য অবগত হওয়া যায়, সেইরূপ আমিও এই ঘটনায়, আমরা যে ঘনীভূত ভাব ও চিন্তারাজ্যে বাস করিতাম, তাহাদিগকে কতকটা ধরিতে ও বুঝিতে সমর্থ হইয়াছিলাম।

আমি মঠের ঠাকুরঘরে ব্রহ্মচর্য্যব্রতে দীক্ষিত হইবার কয়েক দিনের মধ্যেই স্বামী স্বরূপানন্দ মঠে আশ্রয় লাভ করেন। কিন্তু তিনি অল্প কয়েক সপ্তাহকাল ব্রহ্মচারী থাকিবার পরেই স্বামিজীর নিকট

গৈরিকবস্ত্র প্রাপ্ত হইয়া সন্ন্যাসিপদবীতে আরোহণ করেন। ইঁহার মানসিক বিকাশকাহিনী আমার নিকট অত্যন্ত কৌতুকাবহ বলিয়া বোধ হইত। কারণ, ইনি বাল্যে বৈষ্ণবমতে লালিত হইয়াছিলেন। এই মতে ঈশ্বরকে দয়াল ও প্রেমময় প্রভু এবং জগৎপাতা বলিয়া এবং শ্রীকৃষ্ণকে অবতার ও জগত্রাতা বলিয়া ধারণা করা হইয়া থাকে। ইহা বস্তুতঃ পাশ্চাত্ত্য খ্রীষ্টধর্ম্মেরই অনুরূপ। ইহার পরেই কিন্তু, সচরাচর যে বিতৃষ্ণা আমাদের সকলকেই জীবনে ভোগ করিতে হইয়াছে, তাহা তাঁহাকেও ভোগ করিতে হইয়াছিল। তরুণ বয়সে, যখন পরোপকারপ্রবৃত্তি হৃদয়ে খুব প্রবল থাকে সেই সময়, তিনি জীবনের অবিচারদ্যোতক কয়েকটী ঘটনা হইতে এই মর্ম্মভেদী সত্য হৃদয়ঙ্গম করেন যে, এ জগতে বলবানেরই জয়, এবং ঈশ্বর পরম দয়াবান জগৎপাতা, বাল্যের এই মধুর কল্পনায় তিনি আর বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। ইহাদের মধ্যে একটী গল্প আমার মনে আছে। একদিন রাস্তার ভিড়ের মধ্য দিয়া যাইতে যাইতে তিনি দেখিলেন, এক দরিদ্র রমণী হাঁটু গাড়িয়া অনুচ্চস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে একটী একটী করিয়া একমুঠা চাউল ধূলা হইতে খুঁটিয়া তুলিতেছে। একজন লোক ঐ পথ দিয়া যাইতেছিল; তাহার ধাক্কা লাগিয়া ঐ চাউল দরিদ্রা রমণীর হস্তস্থিত পাত্র হইতে মাটিতে পড়িয়া যায়। এই দৃশ্য দেখিয়া স্বামী স্বরূপানন্দ গভীর দুঃখভরে চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিলেন, "ঈশ্বর যদি থাকেন, তবে তিনি বসিয়া বসিয়া কি করিতেছেন?—এইসব ঘটনাকে কেন তিনি রোধ করিতেছেন না?"

এইরূপ দুই-তিনটী ঘটনা এক বৎসরকাল তাঁহাকে সহসা এরূপ অশান্তির মধ্যে ফেলিয়া দিল যে, তিনি জীবনে আর কখনও

অটুট স্বাস্থ্য কাহাকে বলে তাহা জানিতেন না। কিন্তু যখন তিনি উহা হইতে নির্ম্মুক্ত হইলেন, তখন পরম শান্তি লাভ করিয়াছেন—জীবনের প্রতি একটা অপরিবর্ত্তনীয় ভাবে দৃষ্টিনিক্ষেপ করাই এই শান্তির মূল। তিনি এই স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া ফেলিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। অর্থাৎ, ভগবান বুদ্ধের জন্মগ্রহণের পূর্ব্বে এবং পরে সহস্র সহস্র ভারতীয় ব্রহ্মচারী যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তিনিও সেই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন। এখন হইতে তিনি ইহা কল্পনাও করিতে পারিতেন না যে, এই সমস্যার চরম সমাধান ঈশ্বরকে সিংহাসনাধিরূঢ় এবং মানবকে তাঁহার সম্মুখে নতজানু অবস্থায় উপবিষ্টরূপে কল্পনা দ্বারা নিষ্পন্ন হইবে। বরং তিনি মনের অজ্ঞতা ও স্বার্থপরতাকেই এবংবিধ সকল স্বপ্নের, শুধু তাহাই নহে, সুখ, দুঃখ, ন্যায়, অন্যায় প্রভৃতি অপর যে স্বপ্নসমূহ দ্বারা আমাদের এই পরিদৃশ্যমান জগৎ গঠিত, সেগুলিরও মূল কাবণ বলিয়া বুঝিতে পারিলেন। মানুষের যতদূর অন্তর্দ্দৃষ্টি ও নিশ্চয়তা-লাভ সম্ভব তাহা লাভ করিয়া সকল দ্বন্দ্বের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য এবং হিন্দুরা যাহাকে মুক্তি নামে অভিহিত করেন, সেই চরম একত্ব স্থায়িভাবে সাক্ষাৎকার করিবার জন্য তিনি বদ্ধপরিকর হইলেন।

এই সময় হইতে সেই পরাবস্থালাভের জন্য আপনার সর্ব্বশক্তি নিয়োজিত করাই যেন তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য হইয়া উঠিল। তাঁহার পিতৃগৃহে বাসের অবশিষ্ট কয়েক বৎসর যে, তিনি মঠে যে কয় বৎসর যাপন করিয়াছিলেন তাহা অপেক্ষা কঠোরতর সংযমের মধ্যেই কাটিয়াছিল, তাহা নানা প্রকারে বুঝিতে পারা যায়। ইহার

অনেক পরে আমি আলমোড়ায় তাঁহার নিকট গীতাপাঠকালে, ভগবৎপ্রেমকে দারুণ তৃষ্ণার সহিত কেন তুলনা করা হইয়া থাকে, তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলাম।

স্বামী স্বরূপানন্দের শিক্ষায় আমি ষোল-আনা মন দিয়া ধ্যানের চেষ্টা আরম্ভ করিলাম। তাঁহার এই সহায়তা না পাইলে আমার জীবনের একটী শ্রেষ্ঠ অবসর একেবারে বিফল হইয়া যাইত। গুরুদেবের সহিত আমার এই সময়ের সম্বন্ধ দ্বন্দ্ব ও সঙ্ঘর্ষেই পূর্ণ ছিল বলা যাইতে পারে। এখন আমি দেখিতেছি, শিখিবার জিনিস কত অধিক ছিল, কিন্তু শিক্ষার সময় ছিল কত অল্প! শিক্ষার্থীর অহঙ্কার-নাশই এ বিষয়ে প্রথম শিক্ষা। কিন্তু এই সময়ে আমার সমস্ত যত্নপোষিত ধারণাগুলির উপর যে নিত্য আক্রমণ ও তিরস্কার বর্ষিত হইতে লাগিল, আমি তাহার জন্য আদৌ প্রস্তুত ছিলাম না। দুঃখভোগের অনেক সময় কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। আমি এই সময়ে দেখিলাম যে, অনুকূলভাবাপন্ন প্রিয় আচার্য্যলাভের স্বপ্ন ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হইয়া তৎস্থানে এমন এক ব্যক্তির চিত্র মনোমধ্যে উদিত হইতেছে, যিনি অন্ততঃ উদাসীন হইবেন এবং সম্ভবতঃ মনে মনে প্রতিকূলভাবাপন্ন থাকিবেন। ইহা দেখিয়া আমার যে গুরুতর দুঃখ হইয়াছিল, এখন তাহার কোন যুক্তিযুক্ত কারণ নির্দ্দেশ করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র।

সৌভাগ্যক্রমে আমি সেবাকার্য্যে যোগদান করিব বলিয়া যে কথা দিয়াছিলাম, তাহা প্রত্যাহার করিবার ভাবনা আমার মনে কখনও উদিত হয় নাই। কিন্তু যত দিন যাইতে লাগিল, আমি হৃদয়ঙ্গম করিতে বাধ্য হইলাম যে, এই সেবাকার্য্যে কোন ব্যক্তিগত মধুর সম্বন্ধ

বিদ্যমান থাকিবে না। তৎপরে এমন এক সময় আসিল যখন আমাদের দলের অনৈক বর্ষীয়সী রমণী, এরূপ তীব্র যন্ত্রণাভোগ সহজেই অসহ্য হইয়া উঠিতে পারে, সম্ভবতঃ এইরূপ বিবেচনা করিয়াই, অনুগ্রহ-পূর্ব্বক স্বামিজীর নিকট আমার হইয়া কিছু বলিলেন এবং বিষয়টী যে গুরুতর তাহাও উল্লেখ করিলেন। স্বামিজী নীরবে শুনিলেন এবং চলিয়া গেলেন। কিন্তু সন্ধ্যার সময় তিনি ফিরিয়া আসিলেন, এবং আমাদিগকে বারান্দায় একত্র দেখিয়া তাঁহার দিকে ফিরিয়া বালকের ন্যায় সরলভাবে বলিলেন, "তুমি ঠিক বলিয়াছ। এরূপ অবস্থার পরিবর্ত্তন একান্ত প্রয়োজনীয়। আমি নির্জ্জনবাসের জন্য অরণ্য-প্রদেশে যাইতেছি, আর যখন ফিরিব, তখন শান্তি লইয়া ফিরিব।" তৎপরে তিনি চাহিয়া দেখিলেন যে, আমাদের মাথার উপর চন্দ্রকলা শোভা পাইতেছে। অমনি তাঁহার কণ্ঠস্বর এক উচ্চভাবের প্রেরণায় গদ্‌গদ হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, "দেখ, মুসলমানগণ চন্দ্রকলার অতিশয় গৌরব করিয়া থাকেন। এস, আমরা বালশশীর সহিত নূতন জীবন আরম্ভ করি।" কথাগুলি বলিয়াই তিনি হস্তোত্তোলন করিয়া নীরবে তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা বিদ্রোহী শিষ্যটীকে হৃদয়ের অন্তস্তম তল হইতে আশীর্ব্বাদ করিলেন। শিষ্য ইত্যবসরে তাঁহার সম্মুখে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়াছেন। নিশ্চিতই এই মুহূর্ত্তটী মিলনের অপূর্ব্ব মাধুর্য্যে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। তথাপি এরূপ মুহূর্ত্ত ক্ষত আরোগ্য করিতে পারে, কিন্তু যে সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া শতখণ্ড হইয়া গিয়াছে, তাহাকে আর ফিরাইয়া আনিতে পারে না। আমার এই ঘটনাটী লিপিবদ্ধ করিবার কারণ এই যে, আমি উহার পরে যাহা ঘটিয়াছে তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিব। বহু বহু পূর্ব্বে শ্রীরামকৃষ্ণ

তাঁহার শিষ্যগণকে বলিয়াছিলেন যে, এমন দিন আসিবে যখন তাঁহার প্রাণপ্রিয় নরেন্দ্র তাঁহার জন্মগত, স্পর্শমাত্রে জ্ঞানদান-ক্ষমতার বিকাশ করিবে। আলমোড়ায় সেই দিন সন্ধ্যাকালে আমি এই ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতার প্রমাণ পাইয়াছিলাম। কারণ, একাকী ধ্যান করিতে করিতে দেখিতে পাইলাম, আমি এক অনন্ত মঙ্গল-সমুদ্রে একেবারে ডুবিয়া গিয়াছি; এই মঙ্গলময় সত্তা সম্বন্ধে আমি শত অহঙ্কারমূলক বিচার দ্বারাও কখন জানিতে পারি নাই। এতদ্ভিন্ন, হিন্দুধর্ম্মের মনোবিজ্ঞান-গ্রন্থসমূহে যে অনুভূতির উল্লেখ আছে, তাহা যে এই জড় ভূমিতেই সহজভাবে নিত্য প্রত্যক্ষ, তাহা আমি জানিতে পারিলাম। আর আমি এই প্রথমবার বুঝিলাম, শ্রেষ্ঠ আচার্য্য যে আমাদিগের মধ্য হইতে ব্যক্তিগত সম্বন্ধের বিলোপসাধন করেন, তাহা তৎপরিবর্ত্তে নিরাকারের দর্শনলাভ ঘটিবে বলিয়াই।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

তত্ত্বালোকের তড়িৎপ্রকাশ

এইপ্রকারের উপলব্ধিসকলের মধ্যে ইহাই আমার একমাত্র উপলব্ধি নহে বটে, কিন্তু শুধু এইটীর সম্বন্ধেই বিস্তারিতভাবে বলা প্রয়োজন ছিল। আর, যে পূর্ণ ঘটনাটীর ইহা একটী অংশমাত্র, তাহা হইতেই, প্রাচ্যদেশীয় আচার্য্যগণ শিষ্যের কিরূপ ভাবাপন্ন হওয়া অত্যাবশ্যক জ্ঞান করেন, তাহার আভাস পাওয়া যায়। সর্ব্বপ্রথমে শিষ্যকে গুরুর আনুগত্য স্বীকার করিতে হইবে। আমি ইহাও শুনিয়াছি যে, কিছু কিছু সেবা করাও একান্ত আবশ্যক। শুনা যায়, এইরূপ হইলে আচার্য্যের চিন্তারাশি বীজস্বরূপ হইয়া শিষ্যের মনে অঙ্কুরিত হয়। আমি বলিতে পারি না। আমার এই প্রকারের সেবা কালেভদ্রে অতি অল্পক্ষণের জন্য সূচী বা লেখনী-কার্য্যমাত্রে নিবদ্ধ থাকিত। স্বামিজী বলিয়াছিলেন, "কন্যার কখনও এমনভাবে কাজ করা উচিত নয় যাহাতে লোকে মনে করে, যেন তাহার পিতৃগৃহে ভৃত্যের অভাব ছিল।" তথাপি আমার বিশ্বাস— কারণ কয়েকটী স্থলে আমি ইহার সত্যতার প্রমাণ পাইয়াছি— প্রীতির সহিত গুরুজনদিগের সেবা দ্বারা তাঁহাদের সহিত আমাদের মানসিক ও আধ্যাত্মিক আদানপ্রদান-সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। উহা আমাদিগের জীবনে অপূর্ব্ব ও সুন্দর ফল প্রসব করে।

পাশ্চাত্ত্যে কতক সম্প্রদায়ের লোক ধর্ম্মচক্রের (church) প্রতি যে পূর্ণ বিশ্বাস ও ভক্তির ভাব পোষণ করে, প্রাচ্য শিষ্যকে তাহাই গুরুর প্রতি প্রদর্শন করিতে হয়। শিষ্যের পশ্চাতে গুরু এবং তাঁহার সাধনাই শক্তিরূপে বর্ত্তমান থাকে। এই ঋণ অস্বীকার করাই মহাপাপ— সে পাপের আর মার্জ্জনা নাই। প্রত্যেকেই নিজ নিজ রুচি অনুযায়ী ভক্তি প্রকাশ করিয়া থাকেন। তিনিই শ্রেষ্ঠ গুরু, যিনি শিষ্যের স্বাধীনতা গভীরভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন। কিন্তু শিষ্যের গুরুর প্রতি একান্ত ভক্তি থাকা প্রয়োজন। যে ব্যক্তি নিজের শক্তির উপরই ধর্ম্মোপলব্ধিকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চায়, তাহার ধর্ম্মজীবন 'ঘুণধরা' কাষ্ঠের ন্যায় অচিরেই নিঃসার হইয়া যায়।

পাঠক স্মরণ রাখিবেন, আমরা এই কালে এমন সঙ্গমধ্যে বাস করিতাম, যেখানে নির্জ্জনতাই আত্মোন্নতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া বিবেচিত হইত। স্বামিজী বলিয়াছিলেন, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য চিন্তা-প্রণালীর পার্থক্য এই ঘটনা হইতেই সর্ব্বাপেক্ষা স্পষ্টরূপে বুঝা যায় যে, ইউরোপীয়েরা ভাবে যে, মানুষ কুড়ি বৎসর একাকী থাকিলে পাগল না হইয়া যায় না, আর ভারতীয় ধারণা এই যে, মানুষ কুড়ি বৎসর একাকী না থাকিলে তাহাকে প্রকৃতিস্থই বলা যায় না। বৈপরীত্যটী কতকটা অতিরঞ্জিত ভাষায় প্রকাশিত হইলেও মূলতঃ সত্য। হিন্দু-মতে শুধু মৌন ও নির্জ্জনবাসের দ্বারাই আমরা আত্মানন্দরস আকণ্ঠ পান করিতে পারি, এবং তাহার ফলে যেন ভিতর হইতে নূতন কিছু উদ্গত হইয়া আমাদের ক্ষুদ্র আমিত্বের বন্ধুর অংশগুলি মসৃণ করিয়া দেয়। এইহেতু আমরা দেখিতে পাই, নির্ব্বাণাবস্থাপ্রাপ্ত বুদ্ধমূর্ত্তি-গুলির মুখমণ্ডল সদাই প্রশান্ত। যে দিক দিয়াই দেখা যাউক না

কেন, জগৎ ও জাগতিক সম্বন্ধনিচয় চিন্তাস্রোতকে শিশুর মত বাধা দেয় মাত্র। সকল জিনিসের পশ্চাতেই সেই অনির্ব্বচনীয় পূর্ণতার অনুভব, দৃষ্ট বস্তু যাহার অতি তুচ্ছ ও বিকৃত বহিঃপ্রকাশ মাত্র। যাঁহারা সকল মানবীয় সম্পর্কের প্রাণস্বরূপ সেই মূল কারণ ব্রহ্মে অবগাহন করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে ঐসকল ক্ষীণ সম্পর্ক আর প্রলোভিত করিতে পারে না। আর স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ভারতে প্রেম বা দয়া বা শূরতা এই মূল কারণ নহে—যদিও এই সকলগুলিই তথায় পৌছিবার মার্গস্বরূপ—কিন্তু শুধু একমেবা-দ্বিতীয়ং বস্তুর সাক্ষাৎকারই এই মূল কারণ বলিয়া বিবেচিত হয়। আমার বরাবর ধারণা যে, এই জন্যই হিন্দুমতে নিষ্ঠা, নির্জ্জনবাস ও অহং-নাশ মুখ্য গুণ বলিয়া বিবেচিত, আর পাশ্চাত্যে অপেক্ষাকৃত ক্রিয়াশীল ও প্রভবিষ্ণু (aggressive) গুণগুলিই আদৃত হইয়া থাকে। ভারতীয় মতে, আমরা দেহধারী হইয়াও দেহবুদ্ধি হইতে যতটুকু ঠিক ঠিক দূরে থাকিতে পারি ততটুকুই লাভ।

এইসকল চিন্তার প্রভাবে, ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের সেই অপূর্ব্ব গ্রীষ্ম ঋতুতে আমাদের সকলেরই ইহা স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া মনে হইয়াছিল যে, সাকাররূপধারী মুক্তিদাতৃগণ অপেক্ষা যাঁহারা অব্যক্ত ব্রহ্মতত্ত্বে চিরকালের মত লীন হইয়া গিয়াছেন, আর সংসারে ফিরিয়া আসিবেন না, তাঁহারাই শতগুণে শ্রেষ্ঠ। স্বামিজী মধ্যে মধ্যে বলিতেন, "দেহের কথা চিন্তা করাও পাপ।" অথবা বলিতেন, "শক্তি বা সিদ্ধি লোকের সামনে প্রকাশ করা ভাল নয়।" বুদ্ধের দয়ার ভিতরেও ব্যক্তিত্বের স্মৃতি বর্ত্তমান ছিল। ঈশার পবিত্রতার মধ্যেও শক্তিপ্রদর্শনের ভাব ছিল।

শেষোক্ত চিন্তাটী, অর্থাৎ শক্তিপ্রকাশের নিন্দনীয়তা, ভারতীয় সাধুগণের মধ্যে খুব প্রচলিত বলিয়াই মনে হয়। একবার অদূর-দর্শিতাবশতঃ আমাদের তাঁবুগুলি যাত্রীদের তাঁবুগুলির নিকটেই ফেলা হইয়াছিল। আমাদিগকে উঠাইয়া দিবার জন্য শত শত লোক মহা কোলাহল করিয়া উঠিল। স্বামিজী তাঁবুগুলিকে যেমন আছে তেমনই রাখিবার জন্য প্রায় জিদ করিয়া বসিয়াছিলেন আর কি; এমন সময়ে একজন অদ্ভুত রকমের সাধু নিকটে আসিয়া তাঁহাকে মৃদুস্বরে বলিলেন, "স্বামিজী, আপনার এই শক্তি আছে সত্য, কিন্তু আপনার উহা প্রকাশ করা উচিত নহে।" স্বামিজীও তৎক্ষণাৎ তাঁবুগুলিকে অন্যত্র উঠাইবার আদেশ দিলেন।

অতীন্দ্রিয় সত্যসকল প্রত্যক্ষ করাইতে মৌন ও নির্জ্জনবাসের উপকারিতা-বিষয়ে বিচার করিবার আমরা বহু সুযোগ পাইয়াছিলাম। কারণ, স্বামিজী বার বার আমাদের মধ্য হইতে হঠাৎ চলিয়া যাইতেন, আবার হঠাৎ ফিরিয়া আসিতেন। সময়ে সময়ে মনে হইত যেন লোক-সঙ্গ তাঁহার পক্ষে দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণা। বহুসংখ্যক লোক তাঁহার মহতী খ্যাতিশ্রবণে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার নৌকায় প্রবেশ করিত এবং তাঁহার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া তাঁহাব কার্য্যকলাপ নিরীক্ষণ করিত। ফলে তিনি এতটুকু সময়ও একাকী থাকিতে পাইতেন না এবং অস্থির হইয়া উঠিতেন; সময়ে সময়ে মনে হইত, তিনি যেন ভস্মানুলিপ্ত পরিব্রাজক বা নিভৃতবাসী মুনির জীবনকে, প্রেমিক যেরূপ তাহার প্রেমাস্পদকে চিন্তা করে, সেইভাবে চিন্তা করিতেন। যদি কেহ হঠাৎ আসিয়া আমাদিগকে বলিত, তিনি অদ্য বা কল্য চিরদিনের মত আমাদিগের নিকট বিদায় লইয়া যাইবেন,

আর আমরা আজ এই শেষ দিন তাঁহার কণ্ঠস্বর শ্রবণ করিতেছি, তাহা হইলে আমরা এতটুকুও বিস্মিত হইতাম না। তিনি এবং সঙ্গে সঙ্গে যে যে বিষয় তাঁহার উপর নির্ভর করিত সেইসকল বিষয়ে আমরাও যেন ভগবদিচ্ছারূপ সুরতরঙ্গিনীর স্রোতে ভাসমান তৃণ-স্বরূপ ছিলাম। যে কোন মুহূর্ত্তে এই ইচ্ছা মৌনরূপে আত্মপ্রকাশ করিতে পারিত। যে কোন মুহূর্ত্তে তাঁহার সংসারে বাস ফুরাইয়া যাইতে পারিত।

এই যে মতলব আঁটিয়া কাজ না করা—ইহা একটী আকস্মিক ব্যাপার নহে। এই সময়ের দুই বৎসর পরে একদিন তিনি একখানি পত্র আনিয়া আমায় দেখিতে দিয়াছিলেন। আমি তাহার উত্তরে কি লিখিতে হইবে, তদ্বিষয়ে তাঁহাকে একটু অযাচিত সাংসারিক উপদেশ দিতে গিয়াছিলাম। ইহাতে তিনি এরূপ বিরক্তিভরে আমায় উত্তর দিলেন যে, আমি তাহা কখনও ভুলিতে পারিব না। তিনি ক্রোধে বলিয়া উঠিলেন, "মতলব! মতলব আঁটা! এই জন্য পাশ্চাত্ত্যবাসী তোমরা কোন কালে একটা ধর্ম্ম সৃষ্টি করিতে পার না। যদি তোমাদের মধ্যে কেহ কখনও করিয়া থাকে ত সে জন কয়েক ক্যাথলিক সাধু—যাঁহারা মতলব আঁটিয়া কাজ করিতে জানিতেন না। যাহারা মতলব আঁটিয়া কাজ করে, তাহাদের দ্বারা কোন কালে ধর্ম্মপ্রচার হয় নাই, হইতে পারে না।"

বাস্তবিকই সেই রমণীয় নৈদাঘযাত্রাটীতে আমরা সর্ব্বদা ভৃত্যগণের নিকট হইতে এই শুনিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতাম যে, স্বামিজীর নৌকা একঘণ্টা পূর্ব্বে নোঙ্গর তুলিয়া চলিয়া গিয়াছে এবং সেদিন আর প্রত্যাবর্ত্তন করিবে না। প্রকৃতপক্ষে তিনি একদিন কি বহুদিন

অনুপস্থিত থাকিবেন তাহার কিছুই স্থিরতা থাকিত না। কিন্তু যখনই তিনি এইসকল নির্জ্জন স্থান হইতে ফিরিতেন, তখনই দেখা যাইত তিনি জ্যোতির্ময় ও শান্তিমণ্ডিত হইয়া আসিয়াছেন, আর গভীর, অতি গভীর জ্ঞানের কথাসকল তাঁহার মুখ হইতে উচ্চারিত হইত। শ্রীরামকৃষ্ণের সকল শিষ্যই, যেসকল ধর্ম্মানুষ্ঠান অপরের বিশ্বাসপূত, তাহাদিগকে পরম অর্থবান বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন বলিয়াছিলেন যে তিনি রোমের 'পবিত্র সোপানরাজি' (Scala Santa)*-দর্শনে অতীব মুগ্ধ হইয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন নিষ্ঠাবান ভক্তগণের মত সকল অনুষ্ঠান-গুলিতে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যোগদান করাই এই সঙ্ঘের আদর্শ। স্বামিজীর সম্বন্ধে দেখিয়াছি, তীর্থদর্শনকালে তাঁহার আশেপাশে অতি সাধারণ স্ত্রীলোকেরা যে পায়স-ভোগ দিতেছেন বা যেরূপে মালাজপ করিতেছেন, তিনিও ঠিক সেইরূপেই করিতেছেন। এই-সকল স্থলে তিনি ঐহিক পারত্রিক সর্ব্ববিধ আচারই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পালন করিতেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, তিনি স্বীয় মহোচ্চ ভূমিতে আরোহণ করিবার পূর্ব্বে সাধারণ লোকদিগের সহিত আপনাকে এক করিয়া ফেলিয়াছিলেন।

---

* Scala Santa or Pilate's Staircase—রোমের 'ল্যাটারন প্যালেস' নামক প্রাসাদের অন্তর্গত সেণ্ট জনের গীর্জ্জার উত্তর দিকের বিখ্যাত সিঁড়ি। কথিত আছে, ইহার আটাশটী মার্ব্বেল পাথরের ধাপ এক কালে জেরুজেলেমে খৃষ্টের বিচারক পাইলেটের বাড়ীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই সিঁড়ি দিয়া মধ্যযুগে নির্ম্মিত পোপগণের পূজাগৃহে উঠা যায়, এবং লোকে হামাগুড়ি দিয়া এই সিঁড়ি আরোহণ করিবার ব্রত গ্রহণ করিয়া থাকে।

কাশ্মীরের দুইটী স্থান অতীব পবিত্র বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। একটী ক্ষীরভবানী নামক প্রস্রবণ, যথায় জগন্মাতার পূজা হইয়া থাকে; অপরটী অমরনাথ নামক একটী পর্ব্বতগুহা, যেখানে তুষারময় শিবলিঙ্গ বিরাজমান। এই গ্রীষ্মকালে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তন্মধ্যে কাশ্মীরে উক্ত স্থানদ্বয়-দর্শনই সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। আমরা খুব উচ্চ উচ্চ আশা পোষণ করিতাম। আমরা রীতিমত ধ্যান করিতে শিখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলাম, এবং কোন নির্জ্জনস্থানে কিছুকাল বাস করিবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিলাম—যথায় আমরা কয়েক ঘণ্টা করিয়া মৌনী থাকিতে এবং নিয়মিত শিক্ষাধীন থাকিয়া ধ্যানের চেষ্টা করিতে পারিব। এই জন্য কয়েকটী তাঁবু আনা হইল, এবং সেপ্টেম্বর মাসের প্রথমে এক সপ্তাহের জন্য আচ্ছাবল নামক একটী স্থানে একটী বনের এক প্রান্তে তাঁবু ফেলিলাম। অমরনাথযাত্রা আগস্ট মাসের প্রথমে হইয়াছিল, আর ৩০শে সেপ্টেম্বর স্বামিজী আমাদিগকে ছাড়িয়া ক্ষীরভবানী দর্শন করিতে গমন করেন। অবশেষে ১২ই অক্টোবর আমরা বারামুল্লায় তাঁহার নিকট বিদায়গ্রহণ করিলাম। আমাদের যাত্রাও পরিসমাপ্ত হইল।

এইসকল মহান্ উপলব্ধি ও সত্য-সাক্ষাৎকার ব্যতীত, যে সমুজ্জ্বল জীবনের সংস্পর্শে আমরা বাস করিতাম, তাহার কিরণচ্ছটা কিছুক্ষণের জন্য প্রায়ই আমাদের উপর আসিয়া পড়িত। একবার তিনি কয়েক দিন অন্যত্র বাসের পর সবেমাত্র প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন এবং ভক্তি সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা কহিতেছেন, এমন সময়ে একজন ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, খাবার প্রস্তুত। কিন্তু আমরা

দেখিতে পাইলাম, ভগবৎপ্রেমরূপ গিরিচূড়ায় যিনি বাস করিতেছেন, তাঁহার নিকট আহারের চিন্তা পর্য্যন্ত কত অসহ্য হইয়া উঠে! আর একদিন সন্ধ্যার স্তিমিত আলোকে আমরা কয়েকজন স্ত্রীলোক মিলিয়া স্থিরামাতার নৌকায় বসিয়া (আমরা সে দিন তাঁহার অতিথি) আস্তে আস্তে গল্পগুজব করিতেছিলাম, এমন সময় হঠাৎ স্বামিজী কয়েক মিনিট আমাদের সহিত গল্প করিয়া কাটাইবার জন্য আসিলেন। ইউরোপযাত্রার দিন সন্নিকট হইয়া আসিতেছিল। তাহারই প্রসঙ্গ উঠিল। কিন্তু উহা শীঘ্রই শেষ হইয়া গেল। তৎপরে একজন, যাঁহাকে একাকী ভারতবর্ষে থাকিতে হইবে বলিয়া একরূপ স্থির ছিল, তিনি বলিলেন যে, তিনি অপর সকলের অভাব বিলক্ষণ অনুভব করিবেন। স্বামিজী অদ্ভুত কোমলতার সহিত তাঁহার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "কিন্তু এ কষ্ট এত গুরুতর মনে করছ কেন? হাসিমুখে তাঁদের বিদায় দাও না কেন? পাশ্চাত্ত্য-বাসী তোমরা বড় শীঘ্র মন খারাপ করে বস। তোমরা দুঃখের পূজা কর। তোমাদের সারা দেশে এই আমি দেখেছি। প্রতীচ্যে লোকে পরস্পর কিভাবে মেশে জান? ওর উপরটা যেন হাস্যমুখরিত, কিন্তু ভিতরে গভীর মর্ম্মব্যথা। ওটা শীঘ্রই কান্নায় পরিণত হয়। আমোদপ্রমোদ যা কিছু, সব উপরে—আসলে তা গভীর দুঃখে ভরা। কিন্তু এদেশে শুধু বাইরের দিকটাই দুঃখপূর্ণ ও নিরানন্দ, কিন্তু ভিতরে নিশ্চিন্ত ভাব ও উল্লাস।

"তোমরা জান আমাদের মধ্যে একটা মত আছে, যাতে ঈশ্বর শুধু খেলার জন্য আপনাকে জগৎরূপে বিকাশ করেছেন বলে কল্পনা করা হয়। অবতারাদি শুধু লীলার জন্যই এখানে এসে বাস

করে থাকেন। খেলা—সব খেলা। খৃষ্ট ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন কেন?—শুধু লীলা। জীবন সম্বন্ধেও তাই। ভগবানের সঙ্গে শুধু খেলা করে যাও। বল, এ সব লীলা, লীলা। তুমি কিছু করেছ কি?" তার পরেই আর একটী কথাও না কহিয়া তিনি উঠিয়া নক্ষত্রালোকে বাহির হইয়া পড়িলেন এবং নিজের নৌকায় চলিয়া গেলেন। আমরাও নদীর নিস্তব্ধতার মধ্যে পরস্পরের নিকট রাত্রির মত বিদায় লইলাম।

নির্জ্জনবাসের সপ্তাহে আমরা একদিন সন্ধ্যার সময় নদীতীরবর্তী প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাছগুলির নীচে বসিয়াছিলাম, এবং স্বামিজী নেতৃত্ব সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন। তিনি প্রথমেই তদানীন্তন দুইটী প্রসিদ্ধ সমাজের কথা পাড়িলেন। তন্মধ্যে একটী উহার প্রবর্ত্তকের জীবদ্দশাতেই দিন দিন সংখ্যা ও আয়তনে বাড়িয়া উঠিতেছিল, অপরটী ক্রমশঃ খণ্ড খণ্ড হইয়া যাইতেছিল। শেষে তিনি বলিলেন, "আমার বিশ্বাস, এক জীবনে নেতা গড়ে ওঠে না। নেতা জন্মায়। কারণ, শৃঙ্খলাস্থাপন ও আদর্শনির্ব্বাচনই শক্ত কাজ নয়; নেতার প্রকৃত লক্ষণ এই যে, তিনি অত্যন্ত ভিন্নমতাবলম্বী লোকদের সাধারণ সহানুভূতিসূত্রে বাঁধতে পারেন। আর এটী শুধু স্বভাবদত্ত ক্ষমতা থেকে আপনিই হয়ে যায়, চেষ্টা করে এটা করা যায় না।"

এইরূপ কথা হইতে হইতে ক্রমশঃ প্লেটোর কথা উঠিল, এবং একজন প্লেটোর ideas বা 'ভাববস্তু'সম্বন্ধীয় মতবাদের ব্যাখ্যা শুনিতে চাহিলেন। স্বামিজী ব্যাখ্যা করিয়া প্রসঙ্গের উপসংহার-মুখে উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে একজনকে বিশেষভাবে সম্বোধন

করিয়া বলিলেন, "সুতরাং দেখছ, আমরা যা কিছু দেখছি সবই সেই মহান্‌ভাববস্তুগুলির ক্ষীণ বিকাশ মাত্র; সেই ভাব-বস্তুগুলিই শুধু সত্য ও সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন। কোন এক জায়গায় একটা আদর্শ স্বং-পদার্থ রয়েছে, আর এই জগতে তুমি শুধু সেইটাকেই নাশ করতে চেষ্টা করছ! চেষ্টা অনেক বিষয়ে আদর্শের কাছে যেতে পারছে না। তথাপি এগিয়ে যাও। কোন-না-কোন দিন তুমি আদর্শকে ধরতে পারবে।"

আর একবার জীবনের বন্ধনগুলি ছেদন করা সম্বন্ধে তাঁহার কোন কথার উত্তরে একজন বলিয়াছিল, "হিন্দুগণ এই জীবনের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবাব জন্য যে আকাঙ্ক্ষা বোধ করেন, আমি তা অনুভব করতে পারি না। আমার মনে হয়, আমি নিজের মুক্তিসাধনের চেয়ে বরং যেসকল মহৎ কাজ আমার প্রীতিকর, তাতে সহায়তা করবার জন্য আবার জন্মগ্রহণ করাই বহুগুণে পছন্দ করি।" স্বামিজী তৎক্ষণাৎ এই তীব্র উত্তর দিলেন, "তার কারণ তুমি ক্রমোন্নতির ধারণাটাকে জয় করতে পাব না। কিন্তু কোন বাহ্যবস্তুই ভাল হয় না। তারা যেমন আছে তেমনি থাকে। তাদের ভাল করতে গিয়ে আমরাই ভাল হয়ে যাই।"

এই শেষ বাক্যটী আমার নিকট বেদের ন্যায় সারবান বলিয়া মনে হয়—"তাদের ভাল করতে গিয়ে আমরাই ভাল হয়ে যাই।" এইরূপ আমার মনে আছে, আমাদেব আলমোড়ায় বাসকালে জনৈক প্রৌঢ়বয়স্ক নিরীহপ্রকৃতির লোক স্বামিজীর নিকট আসিয়া তাঁহাকে কর্ম্ম সম্বন্ধে একটী প্রশ্ন করেন। প্রশ্নটী এই—যদি কেহ কর্ম্মের ফেরে বলবানকে দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচাব করিতে দেখে, তবে তাহার কি

করা উচিত? স্বামিজী বিস্মিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে প্রত্যুত্তর দিলেন, "কেন, বলবানকে উত্তম মধ্যম প্রহার দেওয়া—এর আর কথা কি আছে? এই কর্ম্মের বিষয়ে তুমি তোমার নিজের কর্ত্তব্যটুকু ভুলে যাচ্ছ।—অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার অধিকার যে তোমার চিরকালই রয়েছে।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ

অমরনাথ

আচ্ছাবলের মোগলবাগে একদিন আমরা বাহিরে ভোজনে বসিয়াছি, এমন সময়ে স্বামিজী হঠাৎ প্রকাশ করিলেন যে, তিনি যাত্রীদিগের সহিত অমরনাথ গমন করিবেন এবং তাঁহার কন্যাকেও (লেখিকাকেও) সঙ্গে লইয়া যাইবেন। সকলেই এই সংবাদে এত উল্লসিত হইলেন এবং উক্ত শিষ্যার সৌভাগ্যে এত আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন যে, তাঁহার গমন-বিষয়ে কেহ কোন আপত্তিই উত্থাপন করিলেন না। তাঁহাদিগের সম্মতিক্রমে এবং উক্ত যাত্রার অধ্যক্ষপদে বৃত সরকারী কর্ম্মচারী মহাশয়ের আনুকূল্যে এই অভিনব তীর্থদর্শনের জন্য আয়োজনাদি চলিতে লাগিল।

সেই কয় সপ্তাহে কাশ্মীর তীর্থযাত্রীতে পূর্ণ বলিয়া মনে হইতেছিল। আমরা শেষ বন্দোবস্তের জন্য আচ্ছাবল পরিত্যাগ করিয়া ইসলামাবাদে আমাদের নৌকায় ফিরিয়া আসিলাম। সকল স্থানেই দেখিলাম, ক্রমাগত নূতন নূতন যাত্রীর দল চলিয়াছে। সমস্তই বেশ নিস্তব্ধ, সুন্দর ও সুশৃঙ্খলভাবে নিষ্পন্ন হইতেছে। দুই-তিন সহস্র লোক একটী মাঠে ছাউনী ফেলিয়া আবার সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই উহা ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছে—উনানের ছাই ব্যতীত তাহাদের উক্ত-স্থানে রাত্রিবাসের চিহ্নমাত্র দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। তাহারা সঙ্গে

বাজার লইয়া চলিয়াছে; আর প্রত্যেক বিশ্রামস্থানে তাঁবুখাটান ও দোকানসাজানর কার্য্য অসম্ভব ক্ষিপ্রতার সহিত সম্পাদিত হইতেছে। সঙ্ঘবদ্ধভাবে কার্য্য করা যেন তাহাদের স্বভাবসিদ্ধ। ছাউনীর এক অংশের মাঝখান দিয়া একটী চওড়া রাস্তা চলিয়াছে, তথায় শুখান ফল, দুধ ও চালডাল কিনিতে পাওয়া যায়। তহশীলদারের তাঁবুটী—তাহার একপার্শ্বে স্বামিজীর ও অপর পার্শ্বে আমার তাঁবু—সাধারণতঃ এমন এক স্থানে খাটান হইত, যেখানে সন্ধ্যা-কালে অনায়াসে অগ্নি প্রজ্বলিত করা যাইতে পারে। এইরূপে স্বামিজীর সান্নিধ্যবশতঃ তথায় পরস্পরের মিলিবার মিশিবার বেশ একটী স্থান হইয়া উঠিল।

যাত্রীদের মধ্যে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের শত শত সাধু ছিলেন। তাঁহাদের তাঁবুগুলি গেরুয়া রং-এর; তাহাদের মধ্যে কতকগুলি আবার আকারে এক একটী বড় ছাতার মত। এই সাধুর উপর স্বামিজীর অসাধারণ প্রভাব ছিল। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা অপেক্ষাকৃত বিদ্বান ছিলেন, তাঁহারা প্রত্যেক বিশ্রামস্থানে তাঁহাকে ঘিরিয়া ধরিতেন। তাঁহার তাঁবু লোকে ভরিয়া যাইত, এবং যতক্ষণ দিবালোক থাকিত, এই সাধুগণ কথাবার্ত্তায় মগ্ন হইয়া থাকিতেন। স্বামিজী পরে আমাদিগকে বলিয়াছিলেন যে, ইঁহাদের কথাবার্ত্তা সব শিববিষয়ক ছিল, আর তিনি মাঝে মাঝে জোর করিয়া বাহ্যজগতের প্রতি তাঁহাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিলে তাঁহারা তাঁহাকে গম্ভীরভাবে ভৎর্সনা করিতেন। তাঁহারা বার বার বলিতেছিলেন যে, বিদেশীরাও ত 'মানুষ'। তবে স্বদেশ-বিদেশ লইয়া এত তফাৎ করা কেন? আবাব তাঁহাদের মধ্যে

অনেকে স্বামিজীর মুসলমান ধর্ম্মের প্রতি প্রেম ও সহানুভূতির অর্থ বুঝিতে পারিতেন না। যে পরলোকচিন্তার ফলে তাঁহারা স্বদেশ-বিদেশকে অভিন্ন জ্ঞান করিতেন, সেই চিন্তার ফলেই এইসকল সরলান্তঃকরণ ব্যক্তি—হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই যাহার অন্যোন্যস্পর্দ্ধী অঙ্গবিশেষ, এমন একটী একত্বের সম্যক ধারণা করিতে অক্ষম হইয়াছিলেন। তাঁহারা তর্ক করিতে লাগিলেন যে, পঞ্চনদের ভূমি যাঁহারা ধর্ম্মের জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছেন, এমন বহু লোকের শোণিতে প্লাবিত হইয়াছে। অন্ততঃ এইখানে যেন স্বামিজী আচারের অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যেই নিবদ্ধ থাকেন। ইহার উত্তরে স্বামিজী সেই সময়ের জন্য এমন কতকগুলি আচরণে বিরত রহিলেন, যাহাতে ভ্রাতৃস্থানীয় সাধুমণ্ডলীর প্রতি তাঁহার প্রীতির পরিচয় পাওয়া গেল এবং তাঁহার আসল মতগুলি আরও দৃঢ় ও গভীরভাবে তাঁহাদের মনে অঙ্কিত হইয়া গেল। এইরূপ আচরণ তাঁহার উপযুক্তই হইয়াছিল—তিনি যে একজন ভাবী যুগের লোক, কোনক্রমে এক পূর্ব্ববর্ত্তী যুগে আসিয়া পড়িয়াছিলেন! যাহা হউক, তিনি যখন এইসকল তীব্র বাদ-প্রতিবাদের বর্ণনা করিতেছিলেন, তখন পাশ্চাত্ত্যবাসী আমরা এই একটী মস্ত অসংলগ্নতা দেখিয়া হাস্য সংবরণ করিতে পারি নাই যে, তহশীলদার স্বয়ং এবং এই যাত্রা-সংক্রান্ত বহু কর্ম্মচারী ও ভৃত্য মুসলমান ছিলেন, আর ইঁহারা অবশেষে উক্ত তীর্থে উপস্থিত হইলে, ইঁহাদের গুহাপ্রবেশে যে কোন আপত্তি হইতে পারে, একথা কাহারও মনে স্বপ্নেও উদিত হয় নাই। আবার তহশীলদারজী ও তাঁহার কতিপয় বন্ধু পরে স্বামিজীর নিকট যথাবিধি শিষ্যত্বগ্রহণের

জন্য আগমন করিয়াছিলেন ; এই ব্যপারও কাহারও কিছু বিসদৃশ বা বিস্ময়কর ঠেকিয়াছিল বলিয়া বোধ হইল না।

ইসলামাবাদ পরিত্যাগ করিয়া আমরা পথিমধ্যে একস্থানে যাত্রীদিগের সহিত আসিয়া মিলিত হইলাম এবং তাহাদেরই সঙ্গে সেই রাত্রির জন্য পাওয়ান নামক স্থানে তাঁবু ফেলিলাম। পাওয়ান অনেকগুলি পুণ্য উৎসের জন্য বিখ্যাত। সেদিন সন্ধ্যাকালে দীর্ঘিকার নির্ম্মল কালজলে দীপমালার উজ্জ্বল প্রতিচ্ছায়াগুলি এখনও আমার মনে পড়িতেছে। আর সেই অসংখ্য যাত্রিকুলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলবদ্ধ হইয়া মন্দির হইতে মন্দিরান্তরে গমনের কথা মনে পড়িতেছে।

পহলগামে একাদশী করিবার জন্য যাত্রিদল একদিন বিশ্রাম করিল। ইহা একটী মেষপালকগণের গ্রাম। অদূরে দুইটী ক্ষুদ্র পাহাড়ের সন্ধিস্থলে একটী পার্ব্বত্য তটিনী ; তাহার প্রস্তর-সংঘর্ষে খনিত গর্ভে অনেকগুলি ছোট ছোট বালুকাময় দ্বীপ। সুন্দর দৃশ্য। ইহার ঢালু পার্শ্বদ্বয় সরল (pine) গাছে ছাইয়া গিয়াছে, আর সন্ধ্যার সময় ইহার শিরোদেশের পর্ব্বতটীর উপর দিয়া অপূর্ণাবয়ব নিশানাথ দৃষ্টিগোচর হইতেছিলেন। সুইজর্লণ্ড অথবা নরওয়ে দেশের সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর ও মনোরম দৃশ্যগুলি এইরূপ। এইখানে আমরা শেষ মনুষ্যবসতি-চিহ্ন দেখিতে পাইলাম— একটি পুল, একখানি খামার বাড়ী ও তাহার কর্ষিত ক্ষেত্র, আর কতকগুলি দেওদার-কাষ্ঠনির্ম্মিত কুটীর। যখন শেষ পথটুকু অতিক্রম করিবার জন্য আমরা যাত্রা করিলাম, তখন দেখিলাম, অবশিষ্ট যাত্রিগণের তাঁবুগুলি তখনও এখানেই, একটী শষ্পাচ্ছাদিত বর্ত্তুলাকার পাহাড়ের উপর রহিয়াছে।

স্বামিজীকে যেরূপ দেখিয়াছি

অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্যময় দৃশ্যাবলীর মধ্য দিয়া আমরা তিন সহস্র লোক পুরোবর্ত্তী উপত্যকাটীতে আরোহণ করিতে লাগিলাম। প্রথম দিন আমরা একটী সরল গাছের বনে তাঁবু ফেলিলাম; পরদিন আমরা চিরতুষাররেখা অতিক্রম করিয়া একটী নদীর ধারে তাঁবু খাটাইলাম—নদীটী জমিয়া গিয়াছে। সেদিন রাত্রে ছাউনীর সুবৃহৎ অগ্নি জুনিপার-কাষ্ঠ দ্বারা প্রজ্বালিত হইয়াছিল; এবং পরদিন সন্ধ্যায়, উক্ত ভূভাগ আবও উচ্চ ছিল বলিয়া ভৃত্যগণকে এই বিরল ইন্ধনের অনুসন্ধানে অনেক ক্রোশ পথ ঘুরিতে হইয়াছিল। অবশেষে, এতদিন আমরা যে ভাল রাস্তা দিয়া চলিতেছিলাম, তাহা ফুরাইয়া গেল, এবং আমবা পগ্‌ডাণ্ডি (অতিশয় উঁচু-নীচু পথ) দিয়া কষ্টেস্থষ্টে খাড়া খাড়া পাহাড় চড়াই উতরাই করিতে লাগিলাম। অবশেষে আমবা যে গিরিসঙ্কটে অমরনাথ-গুহা অবস্থিত, তথায় উপস্থিত হইলাম। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথর চারিদিকে ছড়ান রহিয়াছে। এই স্থানে উঠিবার সময় আমরা দেখিতে পাইলাম, সম্মুখে তুষারশৃঙ্গগুলি একটী সদ্য-পতিত শ্বেত অবগুণ্ঠনে আবৃত রহিয়াছে। আর দেখিলাম, গুহাভ্যন্তরে, যথায় সূর্য্যকিরণ কখনও প্রবেশ করে নাই, এমন একটী গভীর অংশে মহান তুষারলিঙ্গটী বিরাজমান রহিয়াছে। যেসকল কৃষক সর্ব্বপ্রথম এই লিঙ্গের দর্শনলাভ করিয়াছিল, তাহাদিগের নিকট সাক্ষাৎ ভগবানই তথায় অবস্থান করিতেছেন বলিয়া নিশ্চয়ই বোধ হইয়া থাকিবে।

আসিবার পথে স্বামিজী এই যাত্রার প্রত্যেক বিধানটী পালন করিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি মালাজপ করিতেন, উপবাস

করিতেন এবং পর পর পাঁচটী নদীর বরফের মত ঠাণ্ডা জলে স্নান করিয়াছিলেন ;—এই কঙ্করময় নদীগর্ভগুলি আমরা যাত্রার দ্বিতীয় দিনে অতিক্রম করিয়াছিলাম। আর এখন গুহা প্রবেশ করিয়া তাঁহার বোধ হইল, যেন মহাদেব সশরীরে তাঁহার সম্মুখে বিদ্যমান! অসংখ্য যাত্রী কোলাহল করিয়া দলে দলে গুহাপ্রবেশ করিতেছে, এবং মাথার উপর পারাবতকুল ঝট্ পট্ শব্দ করিয়া উড়িতেছে, ইত্যবসরে তিনি অলক্ষিতে ভূমিষ্ঠ হইয়া দুই-তিন বার প্রণাম করিয়া লইলেন ; তৎপরে পাছে ভাবাবেশে আত্মহারা হইয়া পড়েন, এই ভয়ে তিনি উঠিয়া দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেলেন। পরে তিনি বলিয়াছিলেন যে, এই কয়টী ক্ষণস্থায়ী মুহূর্ত্তে তিনি মহাদেবের নিকট ইচ্ছামৃত্যুবর পাইয়াছিলেন। তাঁহার মনে আশৈশব এই অস্ফুট ধারণা বদ্ধমূল ছিল যে, পর্ব্বতমধ্যস্থ কোন শিবমন্দিরে তাঁহার মৃত্যু হইবে। সম্ভবতঃ তাহা এইরূপেই ব্যর্থ, অথবা সার্থক হইয়াছিল।

গুহার বহির্দ্দেশে অসহায় লোকদের উপর পাণ্ডার জুলুম ছিল না। আড়ম্বরবিহীন ও প্রকৃতির বিশেষ অনুগামী বলিয়া অমরনাথেব প্রসিদ্ধি আছে। আবার রাখিবন্ধনের পুণ্যদিবসেই এই যাত্রার শ্রেষ্ঠ উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। অনেকে আমাদের হাতে রক্ত ও পীত রাখি বাঁধিয়া দিয়া গেল। তৎপরে আমরা কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামান্তে নদীর ধারে কয়েকখানি প্রকাণ্ড উঁচু পাথরের উপর ভোজন সম্পন্ন করিলাম এবং পরিশেষে তাঁবুতে ফিরিয়া আসিলাম।

স্বামিজী এই স্থানের মাহাত্ম্যে ভরপুর হইয়া গিয়াছেন।

তাঁহার বোধ হইতে লাগিল যেন তিনি এমন সুন্দর আর কিছু কখনও দেখেন নাই। তিনি অনেকক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিলেন। তারপর স্বপ্নাবিষ্টের মত বলিলেন, "কিরূপে এই গুহাটী প্রথম আবিষ্কৃত হয়, তা আমি বেশ কল্পনা করতে পারি। গ্রীষ্ম-কালের কোন এক দিনে একদল মেষপালক তাদের নিরুদ্দিষ্ট ভেড়াগুলির সন্ধানে ঘুরতে ঘুরতে এইখানে এসে পড়ে থাকবে। তারপর তারা তাদের উপত্যকাস্থ ঘরে ফিরে এসে বন্ধুদের কাছে, কিকরে তারা হঠাৎ মহাদেবের দর্শনলাভ করেছে, তারই বর্ণনা করে থাকবে।"

আমাদের গুরুদেবের নিজের সম্বন্ধে অন্ততঃ এইরূপ কথা বলা চলে। এই তুষারলিঙ্গের পবিত্রতা ও ধবলতা তাঁহাকে বিস্মিত, মুগ্ধ করিয়াছিল। গুহাটী তাঁহার নিকট কৈলাসের রহস্য উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিয়াছিল। তিনি যাবজ্জীবন মনে রাখিয়াছিলেন, কিরূপে তিনি একটী পর্ব্বতগুহায় প্রবেশ করিয়া স্বয়ং শ্রীভগবানকে প্রত্যক্ষ-ভাবে সাক্ষাৎকার করিয়াছিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ

ক্ষীরভবানী

অমরনাথযাত্রার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আমাদের জীবনের প্রত্যেক ঘটনা শিববিষয়ক চিন্তার সহিত জড়িত ছিল; প্রতিপদবিক্ষেপে মনে হইতেছিল যেন আমরা সেই চিরতুষারমণ্ডিত মহান পর্ব্বতমালার সমীপবর্ত্তী হইতেছি, যাহা একাধারে তাঁহার প্রতিরূপ এবং আবাস-স্থল। সায়াহ্নে যখন তুষারময় গিরিসঙ্কটের ও দোদুল্যমান সরল-গাছগুলির উপর দিয়া বালশশী নয়নপথে পতিত হইত, তখন মহাদেবের কথা যেন জোর করিয়া স্মরণপথে উদিত হইত। সর্ব্বোপরি, যে ধ্যানরাজ্যের অব্যবহিত বহির্দ্দেশে আমরা বাস করিতেছিলাম, তাহার মর্ম্ম ও কেন্দ্রস্থলে ধ্যানমগ্ন, নির্ব্বাক, গুণাতীত, মনোবুদ্ধির অগোচর সেই দেবদেবই বিরাজ করিয়া থাকেন। একথা নিঃসন্দেহ যে, মানুষ ঈশ্বরকে প্রজ্ঞাসহায়ে যতদূর জানিতে সমর্থ হইয়াছে, তাহার চরম সীমা হিন্দুগণের এই শিববিষয়ক ধারণা। তিনিই সর্ব্বোপাধিবিবর্জ্জিত ঈশ্বর, আবার তাঁহাকে অন্তরে হৃদয়কন্দরে লাভ করা যায়।

ইহা খুব সম্ভব যে, চরম জ্ঞানের অন্বেষণে, অব্যক্ত সত্তাকে এইরূপে ব্যক্তিজ্ঞানে চিন্তা করার পরই ইহার অপর দিকটী—অর্থাৎ ঈশ্বরকে স্থূলজগতের অন্তরালে অবস্থিত শক্তিরূপে চিন্তা করা—

অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। অন্ততঃ ইহা সহজেই বুঝা যায় যে, যিনি এতদুভয়ের গভীরতম তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন তিনি, মানুষ ঈশ্বরকে যত রকম প্রতীকসহায়ে ধারণা করিতে চেষ্টা করে, সে সমুদায়ের অর্থবোধ করিতে সমর্থ, কারণ, সকল প্রতীকই শিব ও শক্তি, এই দুই প্রতীকের কোন-না-কোনটীর অন্তর্ভুক্ত হইবেই। যদি মানুষ পরব্রহ্মকে আদৌ চিন্তা করে, তবে তাহাকে হয় অনাদি অনন্ত সত্তারূপে, নয় অনাদি অনন্ত শক্তিরূপে তাঁহাকে চিন্তা করিতে হইবে। এই ব্যাপারটীর অন্তরালে কোন প্রাকৃতিক নিয়ম আছে কি-না, চিরকাল তদ্বিষয়ে মতভেদ থাকিবে। যাহাই হউক, আগস্ট মাসে কোন অজ্ঞাত কারণে স্বামিজীব চিত্ত শিব হইতে শক্তির প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল বলিয়া বোধ হইয়াছিল। তিনি সর্ব্বদাই রামপ্রসাদের গানগুলি গাহিতেছিলেন—যেন তিনি আপনাকে শিশু বলিয়া কল্পনা করিতে করিতে সেইভাবে মগ্ন হইয়া যাইবেন। তিনি একবার আমাদের কয়েক জনকে বলিয়াছিলেন যে, যেদিকেই তিনি দৃষ্টিপাত করিতেন, তিনি জগন্মাতার উপস্থিতি অনুভব করিতেন—যেন তিনি সাকাররূপে কক্ষমধ্যে বিরাজ করিতেছেন। তিনি সর্ব্বদা জগন্মাতা সম্বন্ধে অত্যন্ত সরল ও স্বাভাবিকভাবে কথা কহিতে অভ্যস্ত হইয়াছিলেন। আর, আমাদের মধ্যে যাঁহারা একটু প্রবীণ ছিলেন, তাঁহারাও এই ধরনে কথা কহিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কাজেই, যখন কোন চিরপোষিত উদ্দেশ্য পরিত্যাগ করিবার প্রয়োজন হইত, তখন তাঁহারা, "মার যা ইচ্ছা, মা সব জানেন," এইরূপ বলিয়া মনকে প্রবোধ দিতেন।

কিন্তু ক্রমে স্বামিজীর তন্ময়ভাব আরও গভীর ভাব ধারণ

করিল। তিনি খেদের সহিত বলিতে লাগিলেন যে, তিনি চিন্তা-ব্যাধিগ্রস্ত হইয়াছেন—যে চিন্তায় মানুষকে দগ্ধ করিতে থাকে, তাহাকে নিদ্রা বা বিশ্রাম করিবার অবসর দেয় না এবং অনেক সময় ঠিক মনুষ্যকণ্ঠের ন্যায় ক্রমাগত উত্তেজনা করিতে থাকে, আদৌ ছাড়িতে চাহে না। তিনি সর্ব্বদাই আমাদিগের নিকট সুখ-দুঃখ, ভাল-মন্দ প্রভৃতি দ্বন্দ্বের অতীত হওয়া-রূপ আদর্শটী বুঝাইবার চেষ্টা করিতেন—যে ধারণায় হিন্দুগণের পাপবোধ-সমস্যার সমাধান নিহিত; কিন্তু এখন যেন তিনি জগতের মধ্যে যাহা কিছু ঘোররূপ, যন্ত্রণাদায়ক ও দুর্ব্বোধ্য, তাহারই উপর সমগ্র মনঃসংযোগ করিতে লাগিলেন। এই পথ দিয়াই তিনি এখন প্রপঞ্চের পশ্চাতে যে অদ্বয় ব্রহ্ম রহিয়াছেন, তাঁহাকে লাভ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তাঁহার কাশ্মীরযাত্রার উদ্দেশ্য বিফল হওয়ায়* ভীষণের পূজাই এখন তাঁহার মূল মন্ত্র হইয়া দাঁড়াইল। রোগ ও যন্ত্রণা দেখিলেই তাঁহার মনে পড়িত, "তিনিই যথায় বেদনা অনুভূত হইতেছে সেই স্থান, তিনিই যন্ত্রণা এবং তিনিই যন্ত্রণাদাতা। কালী! কালী! কালী!" একদিন তিনি বলিলেন, তাঁহার মাথায় কতকগুলি চিন্তা খুব প্রবল হইয়াছে, এবং তিনি উহাদিগকে লিপিবদ্ধ না

---

* তিনি একটী মঠ ও সংস্কৃত কলেজ-স্থাপনোপযোগী এক ভূমিখণ্ড মনোনীত করিবার জন্য কাশ্মীর মহারাজের বিশেষ নিমন্ত্রণে আসিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাকে উক্ত জমি মনোনীত করিতে দেওয়া হউক, কাউন্সিলে এই প্রস্তাব দুইবার উত্থাপিত হইলে তদানীন্তন রেসিডেন্ট সার অ্যাডালবার্ট ট্যালবট দুইবারই উহা কাউন্সিলের কার্য্যতালিকা হইতে উঠাইয়া দেন। সুতরাং তাহার আলোচনা পর্য্যন্ত হইতে পারে নাই।

করিয়া থাকিতে পারিতেছেন না। সেইদিন সন্ধ্যাকালেই আমরা একটী স্থানদর্শনান্তে বজরায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দেখিলাম, তাঁহার হস্ত-লিখিত 'Kali the Mother' ('মৃত্যুরূপা মাতা') শীর্ষক কবিতাটী আমাদিগের জন্য রহিয়াছে। তিনি সেদিন তথায় আসিয়া কবিতাটী রাখিয়া গিয়াছেন। আমরা পরে শুনিলাম, দিব্যভাবের আবেশে লিখিতে লিখিতে লেখা সমাপ্ত হইবামাত্র তিনি আবেশের তীব্রতায় ক্লান্ত হইয়া মেজের উপর পড়িয়া গিয়াছিলেন। কবিতাটী এই :

মৃত্যুরূপা মাতা

নিঃশেষে নিবেছে তারাদল, মেঘ এসে আবরিছে মেঘ,
স্পন্দিত, ধ্বনিত অন্ধকার, গরজিছে ঘূর্ণ-বায়ুবেগ!
লক্ষ লক্ষ উন্মাদ পরাণ বহির্গত বন্দিশালা হতে,
মহাবৃক্ষ সমূলে উপাড়ি, ফুৎকারে উড়ায়ে চলে পথে!
সমুদ্র সংগ্রামে দিল হানা, উঠে ঢেউ গিরিচূড়া জিনি,
নভস্তল পরশিতে চায়! ঘোররূপা হাসিছে দামিনী।
প্রকাশিছে দিকে দিকে তার, মৃত্যুর কালিমা মাখা গায়
লক্ষ লক্ষ ছায়ার শরীর! দুঃখরাশি জগতে ছড়ায়,
নাচে তারা উন্মাদ তাণ্ডবে; মৃত্যুরূপা মা আমার আয়!
করালি! করাল তোর নাম, মৃত্যু তোর নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে;
তোর ভীম চরণ-নিক্ষেপ প্রতিপদে ব্রহ্মাণ্ড বিনাশে!
কালী তুই প্রলয়রূপিণী, আয় মাগো, আয় মোর পাশে।

সাহসে যে দুঃখ দৈন্য চায়, মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহুপাশে,
কাল-নৃত্য করে উপভোগ, মাতৃরূপা তারি কাছে আসে।*

এই সময়ের কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে তিনি তাঁহার নৌকাখানিকে আমাদিগের নিকট হইতে দূরে সরাইয়া রাখাইয়াছিলেন, এবং শুধু একজন ব্রাহ্ম ডাক্তার, তিনি কোথায় আছেন তাহা জানিতে এবং তাঁহার দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতে পারিতেন। ডাক্তারটী সেই গ্রীষ্মঋতুতে কাশ্মীরে বাস করিতেছিলেন। তাঁহার স্বামিজীর প্রতি সদয় ও ভক্তিপূর্ণ ব্যবহারের একমুখে প্রশংসা করা যায় না। পরদিন সন্ধ্যাকালে ডাক্তার বাবু যেমন প্রত্যহ গিয়া থাকেন, তেমনি তাঁহার নিকট গমন করিলেন; কিন্তু তাঁহাকে ধ্যানমগ্ন দেখিয়া কথা না কহিয়া ফিরিয়া আসিলেন। দেখা গেল, পরদিন ৩০শে সেপ্টেম্বর স্বামিজী ক্ষীর-ভবানী নামক কুণ্ডদর্শনে যাত্রা করিয়াছেন এবং বলিয়া গিয়াছেন, যেন কেহ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ তথায় গমন না করে। সেই দিন হইতে ৬ই অক্টোবর পর্য্যন্ত তিনি অনুপস্থিত ছিলেন।

* * *

এই দিন অপরাহ্নে আমরা দেখিলাম, তিনি আমাদিগের নিকট নৌকা করিয়া ফিরিয়া আসিতেছেন। নৌকা নদীর উজান দিকে আসিতেছে। তিনি এক হস্তে নৌকার ছাদের বংশনির্ম্মিত খুঁটি ধরিয়া এবং অপর হস্তে কতকগুলি হরিদ্রাবর্ণের ফুল লইয়া নৌকার সম্মুখভাগে দাঁড়াইয়া আছেন। তিনি আমাদের বজরায় প্রবেশ করিলেন। তাঁহার আকৃতি যেন বদলাইয়া গিয়াছে। তিনি নীরবে

* শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত-কৃত অনুবাদ

গাঁদাফুলের মালাছড়াটী আমাদের মস্তকে স্পর্শ করাইয়া আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে একে একে আমাদের সকলের নিকট আগমন করিলেন। অবশেষে মালাছড়াটী আমাদের মধ্যে একজনের হাতে দিয়া বলিলেন, "ইহা আমি মাকে নিবেদন করিয়াছিলাম।" তৎপরে তিনি উপবেশন করিলেন এবং হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আর 'হরিঃ ওঁ' নহে, এবার 'মা, মা' !"

আমরা সকলে নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছি। যাহাতে চিন্তা-স্রোত প্রশমিত করে, এমন কিছুতে স্থানটী এরূপ ভরপুর হইয়া গিয়াছিল যে, আমরা কথা কহিতে চেষ্টা করিলেও পারিতাম না। তিনি পুনরায় কথা কহিলেন, বলিলেন, "আমার সব স্বদেশ-প্রেম ভাসিয়া গিয়াছে। আমার যাহা কিছু ছিল, সব গিয়াছে। এখন কেবল 'মা ! মা' !"

আবার একটু নীরব থাকিয়া তিনি এইমাত্র বলিলেন, "আমার খুব অন্যায় হইয়াছে। মা আমাকে বলিলেন, 'যদিই বা ম্লেচ্ছরা আমার মন্দিরে ঢুকে আমার প্রতিমা অপবিত্র করে, তোর তাতে কি? তুই আমাকে রক্ষা করিস্? না আমি তোকে রক্ষা করি?' স্নুতরাং আমার আর স্বদেশপ্রেম বলে কিছুই নেই। আমি এখন ছোট শিশুটী !"

তারপর তিনি নানা বিষয়ে কথা কহিতে লাগিলেন। বলিলেন, তিনি অবিলম্বে কলিকাতা যাত্রা করিবেন। আবার, গত সপ্তাহের নানাবিধ মানসিক দুশ্চিন্তার ফলে তাঁহার যে শারীরিক অসুস্থতা উপস্থিত হইয়াছিল, তাহারও দুই এক কথায় উল্লেখ করিলেন। তিনি সস্নেহে বলিলেন, "এখন আমি এর চেয়ে বেশী বলতে

পারব না ; বলতে নিষেধ আছে।" তারপর আমাদিগের নিকট বিদায় লইবার পূর্ব্বে আবার বলিলেন, "কিন্তু আধ্যাত্মিক অংশে আমি কোনরকম প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই নি!"

পরবর্ত্তী কয়দিনে আমরা স্বামিজীকে অতি অল্পই দেখিয়াছিলাম। তবে পরদিন প্রাতরাশের পূর্ব্বে আমাদের মধ্যে দুইজন অতি অল্পক্ষণের জন্য তাঁহার সহিত নদীতীরে উপস্থিত ছিলাম, এমন সময়ে নাপিতকে আসিতে দেখিয়া তিনি বলিলেন, "এইসব আর থাকবে না!" এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন, এবং আধ ঘণ্টা পরে একেবারে মুণ্ডিত হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। কিরূপ কঠোর সাধনা দ্বারা স্বামিজী গত সপ্তাহে এরূপ অলৌকিক দর্শনলাভ করিয়াছিলেন, তাহার বিশেষ বিবরণ আমরা মধ্যে মধ্যে তাঁহার কথা বা কার্য্যদ্বারা অনুমান করিয়া লইতাম—সেসকল কথা ও কার্য্য এখন স্মরণ করিয়া বর্ণনা করা অসম্ভব বলিলেই হয়। আমরা কল্পনানেত্রে তাঁহার উপবাস, কুণ্ডে প্রত্যহ পায়স ও বাদাম ভোগ দেওয়া এবং জনৈক পণ্ডিত ব্রাহ্মণের শিশু-কন্যাকে প্রতিদিন প্রাতঃকালে কুমারী উমারূপে পূজা করা—এইসকল দেখিতে পাইতাম। আবার, এইসকল অনুষ্ঠান তিনি এরূপ পূর্ণ নিরভিমানিতার সহিত সম্পন্ন করিয়াছিলেন যে, ইহাতে তাঁহার যতই শারীরিক অনিষ্ট হউক না কেন, তাঁহার মনে তজ্জন্য এতটুকু প্রতিক্রিয়া উৎপন্ন হয় নাই।

একদিন এক ব্যক্তি একটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছিলেন। স্বামিজীও মুণ্ডিতমস্তকে এবং সন্ন্যাসীর পরিচ্ছদে সেই সময়েই উপস্থিত হইয়াছিলেন। "ন্যায়ের সমর্থন করিতে গিয়া মৃত্যুও শ্রেয়ঃ,—না, গীতার

উপদেশমত,* যাহাতে কোন কিছুরই প্রতিক্রিয়া না করিতে হয়, তাহাই শিক্ষা করা উচিত ?" তাঁহাকে এই সমস্যার সমাধান করিতে দেওয়া হইয়াছিল। স্বামিজী অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "আমি কোন প্রতিক্রিয়ার পক্ষপাতী নহি।" তৎপরে আবার বলিলেন, "এটী সন্ন্যাসীদের জন্য। গৃহস্থদের পক্ষে আত্মরক্ষাই বিহিত।"

স্বামিজীর অন্তর্মুখ ভাব ক্রমশঃ গভীর ও প্রবল হইতে লাগিল। একবার তিনি এই সময়টীকে 'তাঁহার জীবনের একটী সঙ্কট-মুহূর্ত্ত' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন। আবার, তিনি যেন জগন্মাতার শিশুসন্তান, তাঁহার ক্রোড়ে বসিয়া আছেন এবং মা তাঁহাকে আদর করিতেছেন—এইরূপে নিজেকে বর্ণনা করিয়াছিলেন। আর আমাদেরও স্বতঃই মনে হইল যে, হয়ত জগন্মাতার এই আদর মানবের স্নায়ুমণ্ডলী ও মনে দুঃসহ যন্ত্রণারূপে প্রকাশ পায়; তথাপি মানুষ উহা তাঁহারই স্নেহপ্রসূত বলিয়া বুঝিতে পারে এবং সোল্লাসে বরণ করিয়া লয়। তিনিই না বলিয়াছিলেন, "তীব্র যন্ত্রণার মধ্যেও পরম আনন্দ থাকিতে পারে ?"

সকল বন্দোবস্ত ঠিক হইয়া যাইবামাত্র আমরা বারামুল্লা যাত্রা করিলাম এবং ১১ই, অক্টোবর মঙ্গলবার সন্ধ্যার সময় তথায় পৌছিলাম। স্থির হইয়াছিল যে, তিনি পরদিন অপরাহ্নে লাহোর যাত্রা করিবেন, এবং আমরা আরও কিছুদিন বারামুল্লাতেই অবস্থান করিব। নদীবক্ষে আসিতে আসিতে আমরা তাঁহাকে অতি অল্পই

---

* এখানে ইহা বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, আমার নিজের কথা ধরিতে গেলে, আমি কোনক্রমে বুঝিতে পারি নাই, কিরূপে এই ব্যক্তি এই বিশেষ উপদেশটী গীতা হইতে সংগ্রহ করিলেন।

দেখিতে পাইয়াছিলাম। তিনি প্রায় সর্ব্বদা মৌনীই থাকিতেন এবং একাকী নদীতীরে অনেকদূর ভ্রমণ করিতেন—আমাদের বজরায় মুহূর্ত্তের জন্য পদার্পণ করিতেন না বলিলেও চলে। ভারত-প্রত্যাবর্ত্তনের পর তিনি যে দীর্ঘকালব্যাপী পরিশ্রম করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার স্বাস্থ্য একেবারে ভগ্ন হইয়া গিয়াছিল। আবার, সম্প্রতি তাঁহার যে মহান উপলব্ধি ঘটিয়াছিল, তাহার ফলে তাঁহার শরীর নিশ্চয়ই এত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল যে, তিনি নিজে তাহা বুঝিতে পারেন নাই। কারণ, যন্ত্রণা একটী নির্দ্দিষ্ট মাত্রা অতিক্রম করিলে যেমন তাহার আর উপলব্ধি হয় না, তেমনি শরীরও দীর্ঘকাল ধরিয়া মাত্রাতিরিক্ত আধ্যাত্মিক ভাব সহ্য করিতে পারে না। এইসকল কারণেই বোধ হয় আমাদের মনে হইতেছিল, কে জানে কত দিনের জন্য আমরা তাঁহার নিকট বিদায় লইতেছি। আর সম্ভবতঃ এইরূপ ভাবিয়াই তিনি বুধবার প্রাতে আমাদের জলযোগ শেষ হইলে আমাদের নিকট আগমন করেন এবং কথাবার্ত্তা কহিবার জন্য অনেকক্ষণ অবস্থান করেন।

সে দিন সকালে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথাবার্ত্তায় কাটিয়া গেল। এখানে তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দেওয়া অপেক্ষা, মোটামুটি উহা আমাদের মনে কিরূপ প্রভাব রাখিয়া গেল, তাহাই বলা সহজ। কথা শুনিতে শুনিতে আমরা যেন এক অন্তরতম পবিত্র রাজ্যে প্রবেশ করিলাম। মাঝে মাঝে তিনি কোন ধর্ম্মভাবোদ্দীপক গীতের একাংশ গাহিয়া তাহার অনুবাদ করিয়া দিতেছিলেন—সমস্তই জগন্মাতা-বিষয়ক। তিনি বারবার অনেকক্ষণ ধরিয়া, "শ্যামা মা উড়াচ্ছ ঘুড়ি (ভবসংসার-বাজার মাঝে)···ঘুড়ি লক্ষের

দুটো-একটা কাটে, হেসে দাও মা হাতচাপড়ি”—এই গানটী গাইতেছিলেন। গানগুলি শুনিতে শুনিতে ভক্তজন-হৃদ্বিহারিণী শ্যামা মায়ের মূর্ত্তি আমাদের মনে উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছিল।

তিনি নিজের কবিতা হইতে আবৃত্তি করিলেন—

“দুঃখরাশি জগতে ছড়ায়,

নাচে তারা উন্মাদ তাণ্ডবে ; মৃত্যুরূপা মা আমার আয় !

করালি, করাল তোর নাম, মৃত্যু তোর নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে ;

তোর ভীম চরণ-নিক্ষেপ প্রতিপদে ব্রহ্মাণ্ড বিনাশে।”

আবার মাঝখানে থামিয়া বলিলেন, “দেখেছিলাম তা সব সত্য —বর্ণে বর্ণে সত্য !”—

“সাহসে যে দুঃখ দৈন্য চায়, মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহুপাশে,

কাল-নৃত্য করে উপভোগ, মাতৃরূপা তারি কাছে আসে।”

“মা সত্যসত্যই তাহার কাছে আসেন। আমি নিজ জীবনে এটী প্রত্যক্ষ করেছি। কারণ, আমি মৃত্যুকে সাক্ষাৎভাবে আলিঙ্গন করেছি !”

তিনি ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কথা কহিলেন। বলিলেন, “আমার আর কোন কামনা নাই। আমি শুধু গঙ্গাতীরে মৌনী কৌপীনমাত্রধারী পরিব্রাজকের জীবন যাপন করতে চাই। আমার কিছুরই প্রয়োজন নাই। ‘স্বামিজী’ চিরদিনের মত মরেছে। আমি কে যে জগৎকে শিক্ষা দিবার ভার যেন আমারই বলে মনে কবছি ? এ ত কেবল আস্ফালন ও বৃথা অহঙ্কার। জগন্মাতার আমাকে প্রয়োজন নাই —আমারই জগন্মাতাকে প্রয়োজন আছে। যিনি এই অবস্থা উপলব্ধি করছেন, তাঁর কাছে নিষ্কাম কর্ম্মও মায়া বই আর কিছুই নয়।

"প্রেমই একমাত্র পথ। যদি লোকে আমাদের প্রতি দুর্ব্ব্যবহার করে, তা হলেও আমাদের তাদিকে ভালবেসেই যেতে হবে। এইরকম করতে করতে শেষে তারা এই ভালবাসায় বশ না হয়ে থাকতে পারবে না। এই আর কি।"

তথাপি এই কথাগুলি লিপিবদ্ধ করিতে করিতে আমি বেশ বুঝিতেছি যে, ইহা যে বিশাল হৃদয়ের ভাষা, তাহার বিন্দুমাত্র আভাস আমি দিতে পারিব না। জগতের যেকোন লোকের অতি সামান্য কষ্টও যেন আমাদের গুরুদেবের হৃদয়কে স্পর্শ না করিয়া যাইত না; আর কোন যন্ত্রণাই, এমন কি মৃত্যুযন্ত্রণাও, যেন তাঁহার মুখ হইতে প্রেম ও আশীর্ব্বাদ ভিন্ন অন্য কিছু বাহির করিতে পারিত না।

তিনি আমাদিগকে বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের গল্প বলিলেন; কিরূপে বশিষ্ঠের শতপুত্র বিশ্বামিত্র কর্ত্তৃক বিনষ্ট হওয়ায় ঋষিকে পুত্রশোক-ভারাক্রান্ত জীবন যাপন করিতে হইয়াছিল, তাহাও বলিলেন। তৎপরে স্বামিজী চন্দ্রালোকে তরুরাজিমধ্যস্থ কুটীরখানির শোভা বর্ণনা করিলেন—বশিষ্ঠ ও তাঁহার স্ত্রী অরুন্ধতী কুটীরের ভিতর আছেন। ঋষি তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিরচিত একখানি অমূল্য গ্রন্থ নিবিষ্টচিত্তে পাঠ করিতেছেন, এমন সময়ে অরুন্ধতী নিকটে আসিয়া মুহূর্ত্তের জন্য নত হইয়া তিনি কি করিতেছেন দেখিয়া বলিলেন, "দেখ, আজ চন্দ্রের কি উজ্জ্বল শোভা!" ঋষি পুস্তক হইতে মস্তক না উঠাইয়াই বলিলেন, "প্রিয়ে, বিশ্বামিত্রের প্রতিভা এর চেয়েও দশহাজারগুণে উজ্জ্বল!"

সব ভুলিয়া গিয়াছেন! শতপুত্রের নিধন, তাঁহার নিজের অপমান ও ক্লেশ—সমস্ত বিস্মৃত হইয়া তিনি তাঁহার শত্রুর প্রতিভার প্রশংসায় তন্ময় হইয়া গিয়াছেন! স্বামিজী বলিলেন, আমাদের প্রেমও ঐরূপ

হওয়া চাই, বিশ্বামিত্রের প্রতি বশিষ্ঠের যেমন ছিল—তাহাতে ব্যক্তিগত ইষ্টানিষ্টের স্মৃতির লেশমাত্র থাকিবে না।

এই সময়ে এক কৃষক কতকগুলি পল্লবসমেত নাশপাতি ফুল আনিয়া আমরা যে টেবিলে বসিয়াছিলাম, তাহার উপর রাখিয়া দিল। আমাদের মধ্যে একজন সেগুলি তুলিয়া লইয়া বলিলেন, "স্বামিজী, পূজার জন্যই এগুলির সৃষ্টি হয়েছে, কারণ এদের ফল হবে না।" কিন্তু তিনি সস্মিতমুখে তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন মাত্র, আর তিনিও স্বামিজীর গাঢ়ভাবের অপনয়ন করিতে না পারায়, ইচ্ছা থাকিলেও ফুলগুলি তাঁহাকে নিবেদন করিতে পারিলেন না।

স্বামিজী সত্যই চলিয়া গেলেন। চাকর, মাঝি, বন্ধু, শিষ্য, পিতামাতা ও সন্তান—সকলে মিলিয়া আমরা তাঁহার নিকট বিদায় লইবার জন্য বড় রাস্তার উপর টাঙ্গা পর্য্যন্ত যাইলাম। আমাদের সর্দ্দার মাঝির চার বৎসরের একটী ছোট শক্ত-সমর্থ কাল মেয়ে মাথায় করিয়া তাঁহার রাস্তায় ব্যবহারের জন্য এক বারকোশ ফল লইয়া, দৃঢ়চিত্তে ছোট ছোট পা ফেলিয়া তাঁহার পাশে পাশে চলিল এবং হাসিমুখে তাঁহাকে বিদায় দিয়া দাঁড়াইয়া, তাঁহার গাড়ী চলিয়া গেল দেখিতে লাগিল! আমরাও এই ক্ষুদ্র শিশু অপেক্ষা কম অভিভূত না হইলেও, চিন্তা ও অনুভূতির বয়োবৃদ্ধিজনিত জটিলতাহেতু তাহার ও আমাদের নিঃস্বার্থতায় আকাশ পাতাল তফাৎ ছিল। আবার কবে তাঁহার সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইবে, তাহা আমরা কেহই জানিতাম না, কিন্তু আমরা ইহা বুঝিতে পারিলাম যে, সেদিন আমরা এমন কয়েকটী ঘণ্টা তাঁহার সঙ্গে কাটাইয়াছি, যাহার উজ্জ্বল বিভায় আমাদের সমগ্র ভবিষ্যৎ জীবন অতিবাহিত হইবে।

দশম পরিচ্ছেদ

কলিকাতা ও স্ত্রীভক্ত-পরিবার

স্বামিজীর একটী অদ্ভুত বিশেষত্ব ছিল। তাঁহার প্রভাবে তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তগণকে মহান দেখাইত। তিনি উপস্থিত থাকিলে, তাঁহাদের মহৎ উদ্দেশ্যসকল কেহ না বলিয়া দিলেও লোকে আপনা হইতে ধরিতে ও বুঝিতে পারিত। আর যদি কেহ তাঁহাদের দোষ ও ত্রুটীগুলিও দেখিতে পাইত, তাহা হইলে মনে হইত যেন সেগুলিও দোষাবহ নহে—সেগুলিরও যথেষ্ট কারণ আছে। ইহা বলাই বাহুল্য যে, বস্তুজ্ঞান সম্বন্ধে মানুষে মানুষে অনেক পার্থক্য থাকে। কেহ মানুষের শুধু বাহ্য অবয়ব ও ক্রিয়াকলাপই দেখে ও বুঝে। কেহ বা তাহার গঠনপরীক্ষা দ্বারা উহা মোটামুটি কোন্ শ্রেণীভুক্ত, তাহা নির্দ্দেশ করে এবং ঐ বাহ্য অবয়বে নানা জটিল ভাবপ্রবাহের ঘাত-প্রতিঘাতেরই চিহ্ন দেখিতে পায়। কিন্তু অপর কতকগুলি লোক আছেন, যাঁহারা মানবজীবনের পশ্চাতে সংখ্যাতীত কারণপরম্পরার সমাবেশ দেখিতে পান—এক-একটী জীবন যাহাদের খণ্ড পরিণাম মাত্র। আমাদের কথা ও কার্য্যসকল কতটা জ্ঞানের ফলস্বরূপ, তাহা আমরা নিজেরাই বুঝিয়া উঠিতে পারি না।

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসের প্রথমেই কলিকাতায় আসিয়া স্বামিজীর শিষ্যারূপে আমি যে জগতের মধ্যে প্রবেশ করিলাম, তৎসম্বন্ধে

আমার ক্রমলব্ধ অভিজ্ঞতাও কতকটা পূর্ব্বোক্ত প্রকারের। ঐ দিন হইতে পরবর্ত্তী জুলাই মাস পর্য্যন্ত আমি তাঁহাকে সর্ব্বদা তাঁহার স্বদেশবাসিগণের মধ্যেই দেখিতে পাইতাম। তথায় কোন ভক্ত ইউরোপীয় পরিবারের ব্যবধানটুকু পর্য্যন্ত ছিল না। আমিও তাঁহাদেরই একজন হইয়া গেলাম এবং তাঁহাদেরই সহিত স্বামিজীর প্রতিভাস্পৃষ্ট অনুকূল পরিবেশের মধ্যে বাস করিতে লাগিলাম। এইরূপে, প্রতিপদে তাঁহারই ভাবরাজি দ্বারা পরিবৃত ও তাঁহারই প্রগাঢ় স্বদেশপ্রেমের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া আমি যেন কোন দেবলোকের স্নিগ্ধ জ্যোতির মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলাম, যথায় নরনারীসকলের আকৃতি যেন স্বভাবের অপেক্ষা বড় দেখাইতে লাগিল।

প্রথম হইতেই ইহা স্থির সিদ্ধান্ত ছিল যে, যত শীঘ্র সুবিধা হয় আমি কলিকাতায় একটী বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিব। আর ইহা স্বামিজীর অবলম্বিত প্রণালীর বিশেষত্ব ছিল যে, তিনি আমাকে এই কার্য্যারম্ভের জন্য তাড়া না দিয়া, আমায় ভ্রমণ করিবার ও মনে মনে ঐ কার্য্যের জন্য প্রস্তুত হইবার যথেষ্ট অবসর দিয়াছিলেন। আমি বেশ জানিতাম যে, বিদ্যালয়টী খোলা হইলে উহা দ্বারা প্রথমে শুধু ইহাই পরীক্ষা হইবে, কিরূপ গঠন প্রদান করিলে উহা নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবে। বালিকাগণের অভাব কি, তাহা আমায় প্রথমে জানিতে হইবে, পারিপার্শ্বিক অবস্থাসমূহের মধ্যে আমার নিজের স্থান কোথায়, তাহা নির্দ্ধারণ করিতে হইবে, এবং যে সমাজের উন্নতি-কল্পে আমার সমুদয় চেষ্টা প্রয়োগ করিব, তাহাকেও তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে হইবে। একটীমাত্র জিনিস আমি জানিতাম—তাহা এই

যে, সকল শিক্ষা-ব্যাপারের মূলভিত্তি শিক্ষার্থীর বিদ্যাবুদ্ধি-অনুযায়ী হওয়া চাই ; সে যেন উহা দ্বারা তাহার নিজের নির্দ্দিষ্ট মার্গে উন্নতি-লাভ করিতে পারে। কিন্তু ঠিক এই প্রকার করিতে হইবে, আমার এমন কোন নির্দ্দিষ্ট সঙ্কল্প ছিল না বা কোন নির্দ্দিষ্ট আশাও ছিল না ; কেবল এইটুকু মনে ছিল যে, শিক্ষাবিষয়ক এমন একটী উপায় আবিষ্কার করিতে হইবে, যাহা ভারতীয় নারীকুলের আধুনিক শিক্ষার পক্ষে যথার্থ উপযোগী হয় এবং সকল অবস্থায় খাটে।*

সম্ভবতঃ আবার অনেকে এ বিষয়ে আমার অপেক্ষা অধিক চিন্তা করিয়াছিলেন ; তাঁহাদের মুখে আমি প্রায়ই শুনিতে পাইতাম যে, সাম্প্রদায়িকতার গণ্ডীব বাহিরে থাকাই আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর। কিন্তু একদিন সন্ধ্যাকালে কাশ্মীরে বেরনাগ বনের তাঁবুতে এইসকল প্রশ্নের শেষ মীমাংসা হইয়া গেল। আমরা সকলে একখানা জ্বলন্ত গুঁড়ির চারিধারে বসিয়াছিলাম। এমন সময়ে স্বামিজী আমার দিকে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিদ্যালয়টী সম্বন্ধে বর্ত্তমানে কি

---

* এখানে ইহা বলা আবশ্যক যে, উক্ত বিদ্যালয়টী আমি যেরূপ মনে করিয়াছিলাম, তদপেক্ষাও অস্থায়ী রকমের হইয়াছিল। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দের শরৎকালে সিস্টার কৃস্টীন নামক স্বামিজীর জনৈক আমেরিকান শিষ্যা ভারতীয় স্ত্রীশিক্ষা-কার্য্যটীর সমগ্র ভার গ্রহণ করিয়া উহাকে প্রণালীবদ্ধভাবে পরিচালিত করিতে থাকেন। এবং একমাত্র তাঁহার চরিত্র, একনিষ্ঠতা ও উদ্যম আজ ইহার ঈদৃশ উন্নতির কারণ। ১৮৯৮ হইতে ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পরীক্ষার উদ্দেশ্যে আমি যে ভাবে উক্ত বিদ্যালয় চালাইয়াছিলাম, তাহাতে শুধু আমার নিজেরই শিক্ষালাভ হইয়াছিল।

করবে স্থির করেছ?" আমি সাগ্রহে উত্তর দিলাম, "আমি চাই, আমার যেন কোন সহকারী না থাকেন। আমি অতি সামান্যভাবে এই কাজ আরম্ভ করব এবং ছেলেরা যেমন বানান করে করে পড়তে শেখে, তেমনি একটু একটু করে নিজের প্রণালী নিজে বেছে নেব। আর সকলের ওপর, আমি এই শিক্ষাকে একটী নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মভাবে অনুরঞ্জিত করতে চাই। আমার মতে সাম্প্রদায়িক ভাব বিশেষ উপকারী।"

স্বামিজী এইসকল কথা মনোযোগ সহকারে শুনিলেন এবং সত্য বলিয়া গ্রহণ করিলেন। আমার কোন ইচ্ছাকেই তিনি কখনও বাধা প্রদান করিতেন না। এস্থলেও তাহাই হইল। অতঃপর তিনিই যেন শিষ্য এবং আমি যেন তাঁহার শিক্ষক হইলাম! ভারতীয় নারীগণের যে শিক্ষাকার্য্য তাঁহার নামে প্রসিদ্ধিলাভ করিবে, তাহাকে আমি যত ইচ্ছা সাম্প্রদায়িক করিতে পারি, ক্ষতি নাই। আমার উক্তির এই অংশের উত্তরে তিনি শুধু ইহাই বলিয়াছিলেন, "তুমি সাম্প্রদায়িকতার ভেতর দিয়ে অসাম্প্রদায়িকতায় পৌঁছুতে চাও।" একজন মহিলা আমার কার্য্যে সাহায্য করিবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন; আমি তাঁহাকে লওয়া সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ করিবা-মাত্র স্বামিজী সে নাম প্রত্যাহার করিয়া লইলেন। শুধু একটী বিষয়ে তিনি অচল অটল রহিলেন—আমি ইহার পূর্ব্বেই আর অল্প যে কয়-জনের সহিত পরিচিত হইয়াছিলাম, তাঁহাদের সহায়তা গ্রহণ করিবার প্রস্তাব উত্থাপন করিলে তিনি কোনমতে তাহা সমর্থন করিলেন না। ভারতীয় চরিত্ররূপ মহাসাগরের গভীরতা-পরিমাপক কোন যন্ত্র আমার এখনও ছিল না, এবং গোড়া হইতেই ভুল করিয়া বসা

অপেক্ষা কাহারও সাহায্য না লইয়া অগ্রসর হওয়াও তিনি শতগুণে নিরাপদ বিবেচনা করিয়াছিলেন।

এই সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিবার জন্যই আমি নভেম্বর মাসের প্রথমে একাকী কলিকাতায় পৌঁছিলাম। স্টেশন হইতে নগরের উত্তর প্রান্তে আমি রাস্তা চিনিয়া যাইতে সমর্থ হইলাম। দ্বীপে যাঁহাদের বাস তাঁহারা স্বভাবতঃই কতকটা সামাজিক কঠোরতার পক্ষপাতী। সেই কারণেই বোধ হয় আমি কলিকাতার উত্তরপ্রান্তে পৌঁছিয়া, স্ত্রীলোকদিগের সহিত একত্র বাস করিব, এই বলিয়া জেদ করিতে লাগিলাম। দৈবক্রমে সেই সময়ে স্বামিজী কলিকাতায় এক বিশিষ্ট ভক্তের গৃহে অবস্থান করিতেছিলেন। সুতরাং তাঁহারই সাহায্যে এ সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। শ্রীরামকৃষ্ণের সহ-ধর্ম্মিণী ভক্তগণের পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী নিকটেই স্ত্রীভক্ত-গণ সহ বাস করিতেন। সেইদিনই আমি তাঁহার গৃহে একটী খালি ঘরে বাস করিবার অনুমতি পাইলাম। আমাদের জীবনে এমন কতকগুলি ঘটনা আসে, যাহাদের দিকে পশ্চাদ্দৃষ্টি করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, আমাদের তৎকালীন সাহস শুধু আমাদের অজ্ঞতারই ফল। ইহা বিধাতারই কৃপা বলিতে হইবে। তাহা না হইলে অন্য কিরূপে এরূপ সমস্যাগুলির সমাধান হইতে পারিত, তাহা ত ভাবিয়া পাই না; আবার একটা কিছু সমাধান না করিলেও গত্যন্তর ছিল না। তথাপি, যদি আমি এই সময়ে বুঝিতাম, আমার এই হঠ-কারিতায় শুধু আমার নিরপরাধা আশ্রয়দাত্রীর নহে, তাঁহার দূর-গ্রামস্থিত জ্ঞাতিকুটুম্বগণেরও কতটা সামাজিক গোলযোগের সৃষ্টি হইবে, তাহা হইলে আমি কখনই সেইরূপ করিতে পারিতাম না।

তাহা হইলে আমি যেমন করিয়াই হউক ঐ সঙ্কল্প হইতে নিবৃত্ত হইতাম। কিন্তু তাহা না হওয়ায়, আমি মনে করিলাম, জাতিভেদ বুঝি নির্ব্বোধ লোকদের ব্যক্তিগত কুসংস্কারমাত্র—বিদেশী লোকেরা নিশ্চয়ই অনাচারী হইবে, এইরূপ ভ্রান্ত ধারণাই উহার কারণ, এবং প্রকৃত সত্য উদ্‌ঘাটিত হইলে উহা আপনিই চলিয়া যাইবে। এইরূপে, সমস্ত অজ্ঞতাটুকু তাঁহারই, হৃষ্টচিত্তে এইরূপ ধারণা করিয়া, আমি জোর করিয়া এই ভারতীয় মহিলার গৃহে অতিথি হইলাম।

সৌভাগ্যক্রমে এবিষয়ে স্বামিজীর প্রভাব সর্ব্ববিজয়ী হইল—সমাজ আমাকে গ্রহণ করিলেন। আট-দশ দিনের মধ্যেই খুব নিকটে আমার জন্য একটী বাড়ী মিলিল। কিন্তু তখনও আমি প্রতি অপরাহ্ণ শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর ঘরেই কাটাইতাম। তারপর গ্রীষ্ম আসিলে তাঁহার বিশেষ আদেশে আমি তাঁহার গৃহেই শয়ন করিতে লাগিলাম। তথায় অপেক্ষাকৃত ভাল বন্দোবস্ত ছিল। তখন আর আমার জন্য কোন পৃথক কক্ষ নির্দ্দিষ্ট ছিল না, অপর সকলে যে ঠাণ্ডা সাদা-সিধা ঘরটীতে শয়ন করিতেন, আমিও তথায় শয়ন করিতাম। লাল সুরকির পালিশ-করা মেঝের উপর সারি সারি মাদুর বিছান, তাহার উপর এক-একটী বালিস ও মশারি—ইহাই ঘরটীর শয়নের আসবাব।

এখন আমি যে পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হইলাম, তাহা এক অদ্ভুত রকমের। নীচের তলায়, প্রবেশপথের উভয় পার্শ্বের ঘর দুইটীর একটীতে এক সাধু থাকিতেন। তিনি বাল্যকাল হইতেই এরূপ উৎকট তপস্যা করিয়া আসিতেছিলেন যে, যৌবন অতিক্রম করিতেই ক্ষয়রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হইবার উপক্রম করিয়াছিলেন।

তাঁহার ঘরে আমি বাঙ্গালা শিখিতে যাইতাম। পিছনের রান্নাঘরে তাঁহারই এক শিষ্য এবং এক ব্রাহ্মণ পাচক কাজকর্ম্ম করিতেন। সমস্ত উপর তলা—ছাদ ও বারান্দা সমেত, আমাদের—মেয়েদের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। অদূরেই গঙ্গা; উপর তলা হইতে গঙ্গাদর্শন হইত।

আমাদের ক্ষুদ্র সংসারটীর যিনি কর্ত্রী ছিলেন, তাঁহার সম্বন্ধে কিছু বলিতে যাওয়াই যেন ধৃষ্টতা বলিয়া মনে হয়। তাঁহার কথা সকলেই জানেন। তাঁহার পঞ্চম বর্ষ বয়সে বিবাহ হয়, কিন্তু বিবাহের পর তাঁহার অষ্টাদশ বর্ষ বয়স পর্য্যন্ত তাঁহার স্বামী তাঁহার কথা ভুলিয়া যান। পরে তিনি মাতার অনুমতি লইয়া তাঁহার পল্লীগ্রামের গৃহ হইতে হাঁটিয়া গঙ্গাতীরবর্ত্তী দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে স্বামীর সকাশে উপস্থিত হন। পতির দাম্পত্য-বন্ধনের কথা স্মরণ হইল; কিন্তু তিনি যে জীবন অবলম্বন করিয়াছেন, তাহার কি আদর্শ তাহা বলিতে লাগিলেন। পত্নীও প্রত্যুত্তরে তাঁহার ঐ পথে সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণ কামনা করিয়া শুধু শিষ্যার ন্যায় তাঁহার নিকট শিক্ষালাভ করিবার প্রার্থনা জানাইলেন। তাঁহার জীবনের এইসকল ঘটনা সম্বন্ধে আমরা অনেকবার শুনিয়াছি। সেই সময় হইতে তিনি স্বামীর নিকট সেই বাগানেরই একটী বাড়ীতে বহু বৎসর যাবৎ বিশ্বস্তভাবে বাস করেন। তিনি একাধারে সন্ন্যাসিনী ও ধর্ম্মপত্নী ছিলেন, এবং শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যগণের মধ্যে বরাবরই সর্ব্বশ্রেষ্ঠা ছিলেন। যখন তাঁহার শিক্ষা আরম্ভ হয় তখন তিনি অল্পবয়স্কা ছিলেন; পরে কথা-প্রসঙ্গে তিনি কখনও কখনও শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষা কত বিভিন্নমুখী ছিল, তাহার বর্ণনা করিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ সব জিনিস গুছাইয়া রাখার অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিলেন এবং অতি তুচ্ছ বিষয়ে,

যেমন প্রদীপ জ্বালিবার সাজসরঞ্জামগুলি দিনের বেলায় কোথায় রাখিতে হইবে, তদ্বিষয়ে পর্য্যন্ত তাঁহাকে উপদেশ দিতেন। তিনি কোন বিষয়ে কৃপণতা দেখিতে পারিতেন না এবং উগ্র কঠোরতা সত্ত্বেও লালিত্য, সৌন্দর্য্য ও চালচলনের ধীর গম্ভীর ভাব খুব পছন্দ করিতেন। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর সম্বন্ধে এই সময়ে একটী গল্প শুনা যায়। তিনি একদিন হর্ষোৎফুল্ল শিশুর ন্যায় আগ্রহ ও গর্ব্বভরে এক-ঝুড়ি ফলমূল শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট আনয়ন করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ গম্ভীর ভাবে উহার দিকে চাহিয়া দেখিয়া বলিলেন, "কিন্তু এত বেশী বেশী কেন?" সহসা বিফল-মনোরথ হইয়া বালিকা-পত্নীর সমস্ত আনন্দ কোথায় অন্তর্হিত হইল। "অন্ততঃ এ আমার জন্য নয়"—শুধু এই বলিয়াই তিনি ফিরিয়া নীরবে অশ্রুপূর্ণলোচনে চলিয়া গেলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ইহা দেখিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। কাছে যে বালকগুলি বসিয়াছিল, তাহাদের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "তোদের মধ্যে একজন কেউ গিয়ে ওকে ফিরিয়ে আন। ওকে কাঁদতে দেখলে আমার ঈশ্বরভক্তি পর্য্যন্ত উড়ে যাবে।"

তিনি তাঁহার এত প্রিয় ছিলেন! তথাপি শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর একটী প্রধান গুণ এই যে, তিনি তাঁহার আরাধ্য পতির বিষয়ে কথা কহিবার সময় নিজে যেন কেহই নহেন, এই ভাবে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক করিয়া রাখেন। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রত্যেক কথাটী যে সত্য হইবে, তদ্বিষয়ে তিনি সম্পদে বিপদে 'অচল, অটল, সুমেরুবৎ'—তাঁহার সকল ভক্তই এ কথা বলিয়া থাকেন। কিন্তু তিনি তাঁহাকে 'গুরুদেব' বলিয়া উল্লেখ করেন, এবং তাঁহার কথাবার্ত্তায় এমন একটী কথাও থাকে না যাহাতে 'আমি তাঁহার অমুক' এই বলিয়া এতটুকু আত্ম-

গরিমা প্রকাশ পায়। যে তাঁহার পরিচয় জানে না, সে তাঁহার কথাবার্ত্তা হইতে ঘুণাক্ষরেও অনুমান করিতে পারিবে না যে, উপস্থিত অপর সকলের অপেক্ষা তাঁহার শ্রীরামকৃষ্ণের উপর অধিক স্বত্ব আছে বা তাঁহাদের অপেক্ষা তাঁহার সম্বন্ধ নিকটতর। মনে হয় যেন তাঁহার 'তিনি পতি, আমি পত্নী'—এই ভাব বহুকাল চলিয়া গিয়াছে। তৎস্থলে আছে শুধু 'তিনি গুরু, আমি শিষ্যা'—এই ভাব; পত্নীর ন্যায় নিষ্ঠাটুকু পূর্ব্বভাবের পরিচয় দিতেছে মাত্র। তথাপি তাঁহার ভক্তগণ তাঁহাকে এরূপ প্রগাঢ় ভক্তি করিয়া থাকেন যে, তাঁহাদের মধ্যে একজনও তাঁহার সহিত একত্র ভ্রমণকালে রেলগাড়ীতে তাঁহার বেঞ্চির উপরের বেঞ্চিতে স্থানগ্রহণ করিবেন না। এস্থলে একটীমাত্র দৃষ্টান্ত উল্লিখিত হইল। তাঁহার উপস্থিতিই তাঁহাদের নিকট পরম পবিত্রতাস্বরূপ।

আমার বরাবর এইরূপ মনে হইয়াছে যে, ভারতীয় নারীকুলের আদর্শ সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের শেষ কথা তিনিই। কিন্তু তিনি কি এক প্রাচীন আদর্শের শেষ উদাহরণস্থল, অথবা এক নূতন আদর্শের প্রথম উদাহরণস্থল? অত্যন্ত সরল স্ত্রীলোকদের মধ্যে যে প্রগাঢ় জ্ঞান ও মাধুর্য্যের বিকাশ দেখা যায়, তাহা তাঁহাতে পরিলক্ষিত হয়। তথাপি আমার চক্ষে তাঁহার সাধুত্ব যেরূপ অসাধারণ বলিয়া বোধ হয়, তাঁহার সম্ভ্রান্তকুলোচিত নিষ্ঠাচার ও মহদুদার মনও প্রায় সেইরূপ অসাধারণ বলিয়াই বোধ হয়। যত নূতন বা জটিল প্রশ্নই তাঁহাকে করা হউক না কেন, আমি তাঁহাকে কখনও উদার ভাবের মতপ্রকাশে ইতস্ততঃ করিতে দেখি নাই। সারা জীবন ধরিয়া তিনি নীরবে অবিশ্রান্তভাবে প্রার্থনা করিয়াই আসিতেছেন। তাঁহার যত

কিছু অভিজ্ঞতা, সকলের মূলে বিধাতার মঙ্গলময় বিধানে বিশ্ব রহিয়াছে। তথাপি তিনি সকল ক্ষেত্রে উপযুক্ত ব্যবস্থা দিতে সদাই তৎপর। তাঁহার পরিবারস্থ কেহ যদি দুষ্টামি দ্বারা তাঁহাকে উত্যক্ত করে, তাহা হইলে এক অদ্ভুত শান্ত ও প্রগাঢ় ভাবমাত্র তাঁহার আননে প্রকাশ পায়। যদি কেহ তাঁহার বুদ্ধির অতীত, নূতন কোন সামাজিক পাকচক্রে বিপদে পড়িয়া বা কষ্ট পাইয়া তাঁহার নিকটে আসে, তাহা হইলে তিনি অভ্রান্ত অন্তর্দৃষ্টিবলে তৎক্ষণাৎ ঐ বিষয়ের সমস্ত তথ্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া প্রশ্নকর্ত্তাকে ঐ বিপদ হইতে উদ্ধার হইবার পথ বলিয়া দেন। যদি এমন কোন ঘটনা ঘটিয়া থাকে, যাহার জন্য তাঁহাকে কঠোর হইতে হইবে, তাহা হইলে অনর্থক ভাবপ্রবণতার বশবর্ত্তী হইয়া তিনি কদাপি তদ্বিষয়ে ইতস্ততঃ করেন না। যে ব্রহ্মচারীকে তিনি ভিক্ষা করিয়া এত বৎসর কাটাইতে হইবে বলিয়া আদেশ দিবেন তাহাকে সেই ঘণ্টার মধ্যেই সে স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে হইবে! তাঁহার চক্ষে যে ব্যক্তি শ্লীলতা ও সাধুতার সীমা উল্লঙ্ঘন করিয়াছে, সে আর কদাপি তাঁহাকে মুখ দেখাইতে পারিবে না। এইরূপ অপরাধে অপরাধী এক ব্যক্তিকে শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, "দেখছ না যে তুমি ওর ভেতরকার নারীত্বকে আঘাত করছ? এরকম করা মহা হানিকর।"

তথাপি তাঁহার জনৈক শিষ্যা, তাঁহার গীত-শক্তি সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া যাহা বলিয়াছিলেন, বাস্তবিকই তাঁহার সমস্ত প্রকৃতিই সেইরূপ 'সঙ্গীতে ভরপুর' ছিল। তাঁহার কোমলতা ও কৌতুকপ্রিয়তা অসাধারণ ছিল। তিনি যে ঘরটীতে পূজাপাঠাদি করেন তাহা মাধুর্য্যে পূর্ণ হইয়া থাকে।

মা পড়িতে জানেন এবং তাঁহার অধিকাংশ সময় রামায়ণপাঠে ব্যয়িত হয়। তিনি কিছু লিখেন না। তথাপি কেহ যেন ইহা মনে না করেন যে তিনি একজন অশিক্ষিতা রমণী। তিনি যে শুধু দীর্ঘকাল ধরিয়া কিরূপে সংসার চালাইতে হয়, কি করিলে প্রকৃষ্ট ধর্ম্মলাভ হয়, ইত্যাদি বিষয়েই কঠোর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন, তাহা নহে; তিনি ভারতবর্ষের অধিকাংশ স্থান ভ্রমণ এবং প্রধান প্রধান তীর্থগুলির অধিকাংশ দর্শনও করিয়াছেন। ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, শ্রীরামকৃষ্ণের সহধর্ম্মিণীরূপে তিনি মানুষের ভাগ্যে যতদূর চরিত্রোৎকর্ষ লাভ করা সম্ভব, তাহা করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। প্রতি মুহূর্ত্তে তিনি অজ্ঞাতসারে এই মহাপুরুষ-সংসর্গের পরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন। কিন্তু কোন অভিনব ধর্ম্মভাবকে তৎক্ষণাৎ সম্যকরূপে বুঝিয়া লইবার ক্ষমতাতে ইহার যেরূপ সুস্পষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়, এমন আর কিছুতেই নহে।

শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর এই শক্তির প্রথম পরিচয় আমি কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তিনি একবার ঈস্টারের (Easter) দিন অপরাহ্নে যখন আমাদিগের গৃহে পদার্পণ করেন, সেই সময়ে প্রাপ্ত হই। তৎপূর্ব্বে আমি যখনই তাঁহার নিকট গিয়াছি, তখনই আমি, তিনি জীবনে যে আদর্শ প্রতিফলিত করিয়াছেন, তাহাই আয়ত্ত করিবার চেষ্টায় অত্যন্ত ব্যস্ত থাকিতাম; সুতরাং তাঁহাকে ইহার বিপরীত কোন অবস্থায় লক্ষ্য করিবার কথা আমার মনেই উঠে নাই। যাহা হউক, যেদিনকার কথা বলিতেছি, সেদিন শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী ও তাঁহার সঙ্গিনীগণ আমাদের সমস্ত বাড়ীখানি ঘুরিয়া দেখিবার পর ঠাকুরঘরটীতে বসিয়া খ্রীষ্টানদিগের এই উৎসব সম্বন্ধে দুই-চারিটী

কথা শুনিবার আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। তারপর আমাদের ছোট ফরাসী অর্গ্যানটীর সহযোগে ঈস্টারদিবসোচিত গীত ও বাদ্য হইল। খ্রীষ্টের পুনরুত্থান সম্বন্ধীয় এইসকল স্তোত্র বিদেশীয় ও অপরিজ্ঞাত হইলেও মা অক্লেশে উহাদিগের মর্ম্ম বুঝিয়া লইলেন এবং তৎপ্রতি প্রগাঢ় সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর এই মর্ম্মানুধাবন ও সহানুভূতি হইতেই আমরা সর্ব্বপ্রথম তাঁহার ধর্ম্মরাজ্যে অসাধারণ উন্নতিলাভের একটী অতীব হৃদয়গ্রাহী চিত্র দেখিতে পাইলাম। তাঁহার অন্তরঙ্গ স্ত্রীভক্তগণের মধ্যে যাঁহারা শ্রীরামকৃষ্ণের স্পর্শলাভে ধন্য হইয়াছিলেন, তাঁহাদের সকলের মধ্যেই এই শক্তির অল্প বিস্তর পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁহাতে এই শক্তির সেইরূপ একটা জোর ও নিশ্চয়তা দেখা যাইত, যাহা কোন উচ্চদরের সুগভীর পাণ্ডিত্যে দেখা যায়।

আর একদিন সন্ধ্যাকালে আমরা তাঁহার এই গুণের বিকাশ দেখিতে পাইয়াছিলাম। তিনি অল্প কয়েকজন অন্তরঙ্গ স্ত্রীভক্ত পরিবৃত হইয়া বসিয়াছিলেন, এমন সময়ে আমাকে ও আমার গুরু-ভগিনীকে ইউরোপের বিবাহপদ্ধতির বর্ণনা করিতে বলিলেন। যথেষ্ট হাস্যকৌতুকসহকারে আমরা তাঁহার কথামত একবার 'পুরোহিতের' অংশ পরক্ষণেই বরকন্যার অংশ, অভিনয় করিয়া দেখাইতে লাগিলাম। কিন্তু বিবাহের শপথটী শুনিয়া মাতাঠাকুরাণীর মনে যে ভাবোদয় হইল, আমাদের উভয়ের কেহই সেরূপ হইবে বলিয়া অনুমান করিতে পারি নাই।

"সম্পদে বিপদে, ঐশ্বর্য্যে দারিদ্র্যে, রোগে স্বাস্থ্যে—যাবৎ মৃত্যু আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন না করে"—এই কথাগুলি শুনিয়া উপস্থিত

সকলেই আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কিন্তু মা যেমন ঐ কথাগুলির প্রশংসা করিলেন, এমন আর কেহই নহে। তিনি বারংবার ঐ কথাগুলি আবৃত্তি করাইলেন এবং বলিলেন, "আহা, কি অপূর্ব্ব ধর্ম্মভাবপূর্ণ কথা!"

যেসকল রমণী এই সময়ে প্রায় সর্ব্বদা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর গৃহে বাস করিতেন—গোপালের মা, যোগীন মা, গোলাপ মা, লক্ষ্মী দিদি প্রভৃতি কয়েকজন তাঁহাদের অন্যতম। ইঁহারা সকলেই বিধবা; গোপালের মা এবং লক্ষ্মী দিদি আবার বালবিধবা ছিলেন। ইঁহারা সকলেই শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ শিষ্যা ছিলেন, তিনি যে সময় দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে বাস করিতেন সেই সময়কার শিষ্যা; লক্ষ্মী দিদি ত তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রীই ছিলেন এবং এখনও তাঁহার বয়স তেমন অধিক হয় নাই। অনেকে তাঁহার নিকট দীক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ করিয়া থাকেন। তিনি একজন বহুগুণশালিনী রমণী, এবং সকলেই তাঁহার গুণে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার কথাবার্ত্তা শুনিতে চান। কখনও তিনি কোন যাত্রার পালা হইতে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা কোন ধর্ম্মভাবমূলক কথোপকথন আবৃত্তি করিয়া থাকেন, কখনও বা দেবদেবীসকলের বিভিন্ন মূর্ত্তিগুলির নকল করিয়া নীরব গৃহটীকে হাস্যমুখরিত করিয়া তুলেন। একবার কালীমূর্ত্তির, পরক্ষণেই সরস্বতীমূর্ত্তির, কখনও বা জগদ্ধাত্রীর, আবার কখনও বা কদম্বতলে শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তির নকল করিতেন, এবং উহাতে নাটকীয় উপাদান অল্প থাকিলেও তিনি উহা হইতে বেশ আসর জমাইয়া লইতেন।

শুনা যায়, এই প্রকারের আমোদপ্রমোদে শ্রীরামকৃষ্ণেরও বিশেষ অভিমত ছিল। স্ত্রীভক্তগণের মুখে শুনিয়াছি, তিনি নিজেই

ধর্ম্মভাবোদ্দীপক কোন নাটক ঘণ্টার পর ঘণ্টা আবৃত্তি করিয়া যাইতেন, পর্য্যায়ক্রমে প্রত্যেক পাত্রের ভূমিকা অভিনয় করিয়া কবিতাকারে গ্রথিত সেইসকল স্তবপূজাদির গূঢ় মর্ম্ম সমবেত ভক্তমণ্ডলীকে হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিতেন।

গোপালের মা অতি বৃদ্ধা ছিলেন। পনের-কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে যখন তিনি তাঁহার কামারহাটীর গঙ্গাতীরস্থ কুটীরখানি হইতে একদিন মধ্যাহ্নে পদব্রজে দক্ষিণেশ্বর উদ্যানে শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রথম দর্শন করিতে আসেন, তখনই তিনি বৃদ্ধা হইয়াছিলেন। শুনা যায় শ্রীরামকৃষ্ণ নিজ কক্ষের দ্বারদেশে দণ্ডায়মান থাকিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন, যেন তিনি তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। গোপালের মা দীর্ঘকাল যাবৎ বালগোপাল-মূর্ত্তির উপাসক ছিলেন; তিনি নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র যেন ধ্যাননেত্রে দেখিলেন, তাঁহার ইষ্টমূর্ত্তি সম্মুখে বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার এই বিষয়ের নিষ্ঠা চিরকাল অপরিসীম ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে এখন হইতে মাতা জ্ঞান করিতে লাগিলেন, এবং ইহার পর গোপালের মা যতদিন জীবিতা ছিলেন, সেই দীর্ঘকালের মধ্যে তিনি কদাপি শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রণাম করেন নাই। আমিও তাঁহাকে কখনও শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর উল্লেখকালে 'বউমা' ছাড়া অন্য কোন শব্দ প্রয়োগ করিতে শুনি নাই।

যে কয়মাস আমি শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী ও তাঁহার স্ত্রীভক্তগণসঙ্গে কাটাইয়াছিলাম, গোপালের মা কখনও কলিকাতায় থাকিতেন, কখনও বা কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া কামারহাটীতেই বাস করিতেন। এক পূর্ণিমা-রজনীতে আমরা কয়েকজন তাঁহাকে তথায় দর্শন করিতে যাই। ক্ষুদ্র নৌকাখানি যখন মন্থর গতিতে অগ্রসর হইতে লাগিল,

তখন গঙ্গাবক্ষে কি অপরূপ শোভা বিরাজ করিতেছিল! এক দীর্ঘ সোপানশ্রেণী জলমধ্য হইতে উত্থিত হইয়া উন্নত ঘাট অতিক্রম করিয়া শষ্পাবৃত প্রাঙ্গণে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তাহাও কি সুন্দর দেখাইতেছিল! তাহারই দক্ষিণে বারান্দা। এই বারান্দার একপ্রান্তের একটী ছোট ঘরে গোপালের মা বহুবর্ষ ধরিয়া বাস ও ধ্যানজপ করিয়াছেন। তাহারই পার্শ্বে এক বৃহৎ অট্টালিকা; এই অট্টালিকারই কোন কর্ম্মচারীর জন্য এই ছোট ঘরটী প্রথমতঃ নির্ম্মিত হইয়া থাকিবে। অট্টালিকা এখন শূন্য। গোপালের মার ছোট ঘরখানিতেও আসবাবপত্রের নামগন্ধ নাই। প্রস্তরময় ঘরের মেঝেই তাঁহার শয্যা। আর অতিথিগণকে তিনি যে মাতুরে বসিতে দিলেন, তাহাও তাকের উপরে গুটান ছিল; নামাইয়া লইতে হইল। যে একমুঠা খই-বাতাসা তাঁহার একমাত্র সম্বল ছিল, এবং যাহা ব্যতীত অন্য কিছু দ্বারা তিনি অতিথিগণকে সংবর্দ্ধনা করিতে পারিলেন না, তাহা একটী শিকায় ঝুলান মাটির পাত্র হইতে লওয়া হইল। কিন্তু স্থানটীতে এতটুকু ময়লা নাই; তিনি নিজে কষ্ট করিয়া গঙ্গাজল আনিয়া উহা সর্ব্বদা ধৌত করিয়া থাকেন। তাঁহার হাতের কাছে একটী কুলুঙ্গীতে একখানি পুরাতন রামায়ণ, তাঁহার বৃহৎ জীর্ণ চশমাখানি ও তাঁহার হরিনামের ঝুলিটী রক্ষিত ছিল। এই মালা জপ করিয়াই গোপালের মা সিদ্ধা হইয়াছিলেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন, বহু বৎসর যাবৎ তিনি দিবারাত্র ঐ মালাজপে তন্ময় হইয়া থাকিতেন।

শুভ্রোজ্জ্বল চন্দ্রালোকে বাহিরের গাছপালা ও ফুলগুলিকে দেখিয়া মনে হইতেছিল, যেন এক শ্বেতমর্ম্মরের স্বপ্নরাজ্যে কতকগুলি কাল-

ছায়ামূর্ত্তি নড়িতেছে ও ফিস্ ফিস্ করিয়া কথা কহিতেছে। কিন্তু আমাদের এই সদাব্যস্ত জগতের মধ্যে গোপালের মার নীরব গভীর শান্তির স্মৃতিমণ্ডিত এই ছোট ঘরখানি যেসকল চিন্তার উদয় করিয়া দেয়, তাহাদের ন্যায় কোন কিছুই স্বপ্নবৎ প্রতীয়মান হইতে পারে না। আমাদের এই স্থান-দর্শনের কথা শ্রবণ করিয়া স্বামিজী বলিয়াছিলেন—"আহা! তোমরা যা দেখেছ, তাই প্রাচীন ভারত—যখন লোকে সজলনয়নে প্রার্থনাপরায়ণ থাকত, যখন রাত্রিজাগরণ ও উপবাস লোকের নিত্যকার ব্যাপার ছিল। সে ভারত ক্রমশঃ লোপ পাচ্ছে, আর কখনও ফিরে আসবে না।"

কলিকাতার বাড়ীতে একজন ইউরোপীয় রমণী থাকার জন্য গোপালের মার আশী বৎসরের সংস্কারে যে একটা আঘাত লাগিয়াছিল, তাহাতে অস্বাভাবিক কিছুই নাই, হয়ত অন্যের অপেক্ষা তাঁহার এই বিষয়টা একটু বেশী চক্ষে ঠেকিয়াছিল। কিন্তু একবার এই ভাবটীকে জয় করিবার পর তিনি বদান্যতার প্রতিমূর্ত্তিস্বরূপা ছিলেন। রক্ষণশীল তিনি বরাবরই ছিলেন, কিন্তু জিদ করিয়া কোন কুসংস্কারকে কদাপি ধরিয়া রাখিতেন না। যেভাবে আমাদের প্রত্যহ দিন কাটিত, তাহাতে তাঁহার গঙ্গাতীরস্থ নিজ আশ্রম ও মাতাঠাকুরাণীর বাড়ীর পূজার্চ্চনাদি কর্ম্মের মধ্যে তিনি বিশেষ কোন পার্থক্য দেখিতে পাইবেন, এরূপ সম্ভাবনা ছিল না। দিবারাত্র শান্তি ও মধুরতা বিরাজ করিত। সূর্য্যোদয়ের অনেক পূর্ব্বেই এক এক করিয়া সকলে নীরবে গাত্রোত্থান করিতেন এবং মাদুরের উপর হইতে চাদর ও বালিশ সরাইয়া ফেলিয়া মালা লইয়া দেওয়ালের দিকে

মুখ ফিরাইয়া জপ করিতে বসিতেন। তৎপরে ঘর ঝাঁট দেওয়া ও স্নান আরম্ভ হইত। কোন পর্ব্বদিনে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী ও অপর একজন পাল্কী করিয়া গঙ্গাস্নানে গমন করিতেন, এবং ততক্ষণ পর্য্যন্ত রামায়ণপাঠে সময় অতিবাহিত হইত।

তারপর শ্রীশ্রীমা নিজের ঘরে পূজা আরম্ভ করিতেন। অল্পবয়স্কা রমণীগণ সকলেই সেই সময়ে দীপ জ্বালিয়া দেওয়া, ধূপ-ধুনা দেওয়া, গঙ্গাজল আনা এবং পুষ্প-নৈবেদ্যাদি সাজাইয়া দেওয়া ইত্যাদি কর্ম্মে ব্যস্ত থাকিতেন। গোপালের মা পর্য্যন্ত এই সময়টীতে ফল-মূলাদি ছাড়াইয়া সাহায্য করিতেন। পরে মধ্যাহ্নভোজন সম্পন্ন হইত। অপরাহ্লটীতে সকলে বিশ্রাম করিতেন। তৎপরে সন্ধ্যা হইবামাত্র ঝি ঘরে ঘরে প্রদীপ দেখাইয়া যাইত, অমনি আমাদের গল্পগুজব বন্ধ হইয়া যাইত। সমবেত সকলেই উঠিয়া পড়িতেন, এবং আমাদের প্রত্যেকেই দেবমূর্ত্তি বা চিত্রের সম্মুখে প্রণাম করিতেন, এবং গোপালের মার ও শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর চরণবন্দনা করিতেন। অথবা শ্রীশ্রীমার সঙ্গে ছাদে তুলসীতলায় যেখানে প্রদীপ দেওয়া হইয়াছে, সেই স্থানে গমন করিতেন। আর যিনি ইহার পর কন্যার ন্যায় মাতাঠাকুরাণীর সান্ধ্যধ্যানকালে তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া তাঁহার গুরুপ্রণাম শ্রবণ করিতে পাইতেন, তিনি যে পরম ভাগ্যবতী, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। প্রত্যেক পূজার আদিতে ও অন্তে তিনি এই গুরুপ্রণাম করিতেন।

ভারতের পরিবারমাত্রই আপনাকে সর্ব্বদা আচাররূপ মনোহর স্তোত্রগানে রত বলিয়া মনে করে। তাহার নিকট গৃহস্থালীর প্রত্যেক খুঁটিনাটী ব্যাপার ও দৈহিক শুচিতার অভ্যাসও যেন

অনির্ব্বচনীয় মূল্যবান ও পবিত্র; উহা যেন জাতির একটী চিরন্তন রত্ন, সুদূর অতীত হইতে পুরুষানুক্রমে রক্ষিত হইয়া আসিতেছে, যেন উহাকে বেদাগ অবস্থায় ভাবী বংশধরদিগের নিকট সমর্পণ করিয়া যাইতে হইবে। এই চিন্তাপ্রণালীই আদর্শ পবিত্রতার জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা ও মাতৃত্বের পূজা রূপ দুইটী বস্তুর সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত হইয়া সমগ্র ভারতীয় চরিত্রের সঞ্চালিনী ও সংযমনী শক্তিরূপে পরিণত হইয়াছে। প্রাচ্য সরলতার উপাসক, এবং কোন ইতরজনোচিত ভাব যে প্রাচ্য জাতির মধ্যে স্থান পাইতে পারে না, তাহার একটী প্রধান কারণ ইহাই।

কিন্তু কেহই ঠিক তাহার প্রয়োজনমুহূর্ত্তে এরূপ একটী রহস্য আবিষ্কার করিতে পারে না; তাহার অতি সহজ কারণ এই যে, কেহই নিজেকে নিজের মনের গণ্ডীর এতটা বাহিরে লইয়া যাইতে পারে না, যেখান হইতে সে দেখিতে পায় যে, অপরে শুধু যে পৃথক পৃথক সংস্কারসমষ্টি লইয়া জন্মিয়াছে তাহাই নহে, অধিকন্তু ঐসকল সংস্কারের মূল্য সম্বন্ধে তাহাদের জন্মগত এক একটা পৃথক ধারণা আছে। সৌভাগ্যক্রমে স্বামিজীকে উত্তমরূপে লক্ষ্য করিয়া এবং তাঁহাতে তাঁহার অজ্ঞাতসারে যেসকল পরস্পর-বিরোধী ভাবের সমাবেশ লক্ষিত হইত, সেইগুলি লইয়া মাথা ঘামাইয়া আমি এই তথ্যটী আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম, এবং তাহাতে অনেক জিনিস আমার নিকট সহজ হইয়া গিয়াছিল। অন্য সকলের অপেক্ষা তিনি পরিষ্কারভাবে জানিতেন যে, চরিত্রই সব, অথবা তাঁহার ভাষায় "দেশাচার কিছুই নয়"; তথাপি যে-সকল আচার-ব্যবহারাদির সহিত তিনি সম্যক পরিচিত ছিলেন,

তাহাদের শ্রেষ্ঠতা ও অর্থবত্তা বর্ণনা করিতে করিতে কেহই তাঁহার ন্যায় আত্মহারা হইয়া যাইতে পারিতেন না। তাঁহার স্বদেশ-বাসিগণের আচার-ব্যবহার তিনি কবির চক্ষে ও ভবিষ্যদ্দর্শীর কল্পনা-সহায়ে দেখিতেন। "দেশাচার যে কিছুই নয়," তাহা তিনি সেই সময়ে উপলব্ধি করিয়াছিলেন, যখন তিনি দেখিয়াছিলেন যে, যেসকল জাতির মধ্যে স্ত্রীলোকদিগের বহুবিবাহপ্রথা প্রচলিত, তাহাদিগের মধ্যেও আদর্শ নারীচরিত্র ও নিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়, এবং দেখিয়াছিলেন যে, পাশ্চাত্যের সান্ধ্য পরিচ্ছদগুলিতেও লজ্জা-সরমের যথেষ্ট চিহ্ন বিদ্যমান। কিন্তু এইসকল দেখিয়াও তাঁহার স্বদেশের লোকাচারগুলির প্রতি শ্রদ্ধার হ্রাস হয় নাই। বিধবার নিরাভরণ শ্বেত অবগুণ্ঠন তাঁহার নিকট শুধু শোকের চিহ্ন বলিয়া নহে, পবিত্রতার চিহ্ন বলিয়াও বোধ হইত। সন্ন্যাসীর গৈরিক কৌপীনধারণ, মেজের উপর মাদুরমাত্রে রচিত শয্যা, থালার পরিবর্তে কলাপাতায় আহার, হাতে করিয়া গ্রাস মুখে তোলা এবং জাতীয় পরিচ্ছদ-পরিধান—এ গুলিকে তিনি যেন সত্যসত্যই মহাপবিত্র ব্যাপার বলিয়া জ্ঞান করিতেন। এই-গুলির প্রত্যেকটীতে তিনি আধ্যাত্মিক শক্তির বা মানব-হৃদয়ের কোমলতার কোন-না-কোন রহস্যের ইঙ্গিত পাইতেন। আর, তিনি এইসকলের প্রতি এরূপ প্রগাঢ় নিষ্ঠার ভাব পোষণ করিতেন যে, সাধ্য হইলে তিনি যেন সমগ্র জগৎকে জয় করিয়া উহাদের পদানত করিয়া দিতে প্রস্তুত ছিলেন, আর তাহাতে অক্ষম হইলে যেন মনে করিতেন যে, উহাদের পরাজয়ে ভাগী হওয়াই ইহজীবনে স্বর্গসুখভোগ।

সত্য বটে, এইরূপে তিনি আমাকেও এই মধুর সঙ্গীত গাহিতে শিখাইয়াছিলেন ক্ষীণ ও কম্পিতকণ্ঠে, কিন্তু তথাপি এই মহান্ সঙ্গীতের অপরাপর গায়কগণের সহিত কতকটা এক সুরে। তাঁহাদের সহিত ঐ সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে আমি উহার মধ্য দিয়া একটী জাতির আদর্শ ও হৃদয়-সম্বন্ধীয় কি রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয়, তাহাই নিবিষ্টচিত্তে লক্ষ্য করিতাম।

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর হইতে ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের জুন পর্য্যন্ত এই কয় মাসের মধ্যে অনেকগুলি ঘটনা বেশ আনন্দ দান করিয়াছিল। আমার ক্ষুদ্র বিদ্যালয়টী কালীপূজার দিনে আরম্ভ হইয়াছিল। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী স্বয়ং আসিয়া প্রতিষ্ঠাকালীন পূজাদি সম্পন্ন করিলেন। পূজান্তে তিনি অতি মৃদুস্বরে বিদ্যালয়ের ভাবী ছাত্রীগণকে আশীর্ব্বাদ করিলেন; গোলাপ-মা তাহা সকলকে শুনাইয়া দিলেন। বলিলেন, "শ্রীশ্রীমা প্রার্থনা করিতেছেন, যেন এই বিদ্যালয়ের উপর জগন্মাতার আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হয়, এবং এখান হইতে শিক্ষাপ্রাপ্ত বালিকাগণ যেন আদর্শ বালিকা হইয়া উঠেন।" কেন তাহা জানি না, কিন্তু শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর উচ্চ মন ও হৃদয়ে যে আমাদের এই অনুষ্ঠানটীর স্মৃতি বর্ত্তমান থাকিয়া তাঁহাকে উহার কল্যাণার্থ প্রার্থনায় প্রবৃত্ত করে, এইটুকু জানাই আমার নিকট অপূর্ব আশীর্ব্বাদ বলিয়া বোধ হয়, উহাতে হৃদয় ভরিয়া যায়। ভবিষ্যতের শিক্ষিতা হিন্দু স্ত্রীজাতির পক্ষে শ্রীশ্রীমার আশীর্ব্বাদ অপেক্ষা কোন মহত্তর শুভ লক্ষণ আমি কল্পনা করিতে পারি না।

স্বামিজী সচরাচর কলিকাতা হইতে তিন-চার মাইল দূরে

গঙ্গার অপর পারে অবস্থিত মঠে বাস করিতেন। কিন্তু তিনি প্রায়ই কলিকাতায় আসিতেন এবং প্রতিবারই আমাকে হয় মধ্যাহ্নে কিংবা সন্ধ্যায় তাঁহার সহিত ভোজন করিতে ডাকিয়া পাঠাইতেন, এবং যাঁহারা আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিতেন, তাঁহাদিগকে তিনি সর্ব্বদাই নিমন্ত্রণ করিয়া বেলুড় মঠে লইয়া যাইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেন।

তাঁহার অতি সামান্য কার্য্যগুলিতেও অনেক সময় এমন অর্থ নিহিত থাকিত, যাহা নূতন লোকের চক্ষে পড়ে না। একদিন যখন তিনি আমার নিকট আসিয়া আমাকে তাঁহার জন্য কোন পথ্য প্রস্তুত করিয়া দিতে বলিলেন, তখন আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই যে, এই অনুরোধের বিশেষ কোন উদ্দেশ্য ছিল। তারপর যখন আমি শুনিলাম যে, উহা তাঁহার নিকট উপস্থিত করা হইলে, তিনি উহার অতি অল্পই নিজে গ্রহণ করিয়া অবশিষ্টাংশ অপর সকলের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিয়াছেন, তখন আমি দুঃখিতই হইয়াছিলাম। আমি তখন বুঝি নাই যে, এই ব্যাপারের একটা ধর্ম্মানুগত অভিপ্রায় আছে। কি গভীর দৃষ্টি ও দয়ার সহিত তিনি, এবং তাঁহার পক্ষ হইয়া শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীও, সর্ব্বদা আমাকে হিন্দু-সমাজে (আমি ত একজন বিদেশী) আশ্রয় দিবার জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন, তাহা বুঝিবার শক্তি লাভ করিতে আমার অনেক মাস লাগিয়াছিল! তিনি আমায় কাশ্মীরে ঠিকই বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার সারা জীবনের উদ্দেশ্য "খৃষ্টীয় ও ইসলাম ধর্ম্মের ন্যায় হিন্দুধর্ম্মকে অপর মতের উপর প্রভবিষ্ণু (aggressive) করা," আর যে-সকল উপায়ে তিনি ঐ উদ্দেশ্য সফল করিবার প্রয়াস করিতেন, এইটী তাহার অন্যতম।

শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের উদ্দেশ্য তিনি যে ভাষায় নিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহাতেও তাঁহার ঐ অভিপ্রায় প্রকাশ পাইয়াছে—"প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের শ্রেষ্ঠ আদর্শগুলির আদান-প্রদান সজ্ঘটন ও উহাদিগকে কার্য্যক্ষেত্রে প্রতিফলিত করা।" এই সংজ্ঞাটী কত উৎকৃষ্ট ও ভারতের বর্ত্তমান অবস্থার কিরূপ উপযোগী, তাহা যত দিন যাইতেছে ততই বুঝা যাইতেছে। তাঁহার মতে হিন্দু-ধর্ম্মকে নিজ মতবাদ লইয়া চুপচাপ বসিয়া থাকিলে চলিবে না; উহাকে দেখাইতে হইবে যে, সমগ্র আধুনিক উন্নতিটাকেই আলিঙ্গন ও বরণ করিয়া লইবার ক্ষমতা তাহার আছে। তাঁহার মতে হিন্দুধর্ম্ম কতকগুলি খণ্ড খণ্ড সম্প্রদায়ের জোড়াতাড়া দেওয়া সমষ্টিমাত্র নহে, উহা অখণ্ড, সজীব এবং সকল ধর্ম্মের মাতৃস্থানীয়; মাতার ন্যায় হিন্দুধর্ম্ম তাঁহার সকল সন্তানকেই স্বীকার করিয়া থাকেন, নূতনগুলি হইতে ভয় পান না; তিনি তাঁহার সকল দেশের সকল সন্তানেরই ভালবাসার জন্য লালায়িতা, প্রাজ্ঞ, দয়াবতী। তিনি নিজেই নিজেকে পরিচালিত করেন; তিনি সকলকে পরস্পরের সহিত সখ্যসূত্রে আবদ্ধ করেন। সর্ব্বোপরি তাঁহার নিজের একটী সুস্পষ্ট উপলব্ধি আছে, জগতের জাতিসমূহের নিকট প্রচার করিবার জন্য তাঁহার একটী বিশেষ বার্ত্তা আছে। কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের গুণ এইরূপে প্রতিপন্ন করিবার জন্য তিনি চরিত্রবল ব্যতীত অন্য কোন শক্তির উপরই নির্ভর করিতেন না। সত্য বটে, তাঁহার ধর্ম্মমতরূপ মন্দিরটী নির্ম্মাণ করাই আসল জিনিস; কিন্তু তজ্জন্য অনন্তকাল পড়িয়া রহিয়াছে, এবং জগতের স্বাভাবিক গতিও উহার অনুকূল। তাঁহার নিজের এ বিষয়ে দায়িত্ব শুধু উত্তম ইষ্টক বাছিয়া

লওয়া। আর এই নির্ব্বাচন, তিনি যাঁহাদিগকে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের বুদ্ধি বা আকর্ষণী শক্তি বা বলের পরিমাণ দেখিয়া করেন নাই; তিনি সর্ব্বদা একটা নির্দ্দিষ্ট মাত্রায় সরল একনিষ্ঠতার জন্য, এবং যতদূর বোধ হইত, একমাত্র তাহারই জন্য উহাদিগকে নির্ব্বাচন করিতেন। একবার তাহাদিগকে গ্রহণ করিবার পর, তিনি সকলের সম্মুখে একই আদর্শ স্থাপন করিতেন—মুক্তি নহে, ত্যাগ; আত্মানুভূতি নহে, আত্মত্যাগ। আবার ইহাও অনেকটা মানুষের পক্ষ হইতে—ভগবানের প্রীত্যর্থ বলিস্বরূপে নহে। যাহা কিছু কর, মানুষের জন্য কর—শিষ্য ও শিষ্যাগণের নিকট তিনি এই কথাই বার বার বলিতেন। ইঁহাদিগের মধ্যে একজন শিষ্যা যেন কদাপি মঠে একদিনকার পুণ্য অনুষ্ঠানের কথা বিস্মৃত না হন —যেদিন তাঁহার জীবনের প্রথম উন্মেষস্বরূপেই যেন স্বামিজী তাঁহাকে শিবপূজা করিতে শিখান, এবং তৎপরে ভগবান বুদ্ধের চরণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করাইয়া ঐ শুভ কর্ম্ম সমাধা করেন। একজনকে উপলক্ষ্য করিয়া তিনি যেন, তাঁহার নিকট যে-কেহ উপদেশ লইতে আসিবে, সকলকেই সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, "যাও, যিনি বুদ্ধত্বলাভের পূর্ব্বে পাঁচশত বার অপরের জন্য জন্মগ্রহণ ও প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন, সেই বুদ্ধকে অনুসরণ কর!"

একাদশ পরিচ্ছেদ

শক্তিপূজা ও স্বামিজী

স্বামিজীর জীবনের এই অংশের যে কিছু কিছু পরিচয় আমি লাভ করিয়াছি, তাহার বিবরণ তাঁহার শক্তিপূজার উল্লেখ ব্যতীত নিতান্তই অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। আধ্যাত্মিক হিসাবে বলিতে গেলে, তাঁহার মন যে দ্বিবিধ উপাদানে গঠিত ছিল, ইহা আমি সর্ব্বদা অনুভব করিয়াছি। তিনি যে আজন্ম ব্রহ্মজ্ঞানী ছিলেন, একথা নিঃসন্দেহ; শ্রীরামকৃষ্ণ ত ইহা পুনঃ পুনঃ বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিয়াই গিয়াছেন। স্বামিজী যখন আট বৎসরের বালক মাত্র, তখনই তিনি খেলা করিতে বসিয়া সমাধিস্থ হইবার শক্তি লাভ করিয়াছিলেন। ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহার মনের স্বাভাবিক গতি অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও দার্শনিক ভাবগুলির দিকে ছিল; সচরাচর যেসকল ভাবকে 'পৌত্তলিক' আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে, উহা তাহাদের ঠিক বিপরীত ছিল। যৌবনে, এবং খুব সম্ভবতঃ শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনাদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হইবার অন্ততঃ কিছুকাল পরে, তিনি যথারীতি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সদস্যশ্রেণীভুক্ত হইয়াছিলেন। ইংলণ্ড ও আমেরিকায় তিনি এমন কিছুই প্রচার করেন নাই, যাহা মূর্ত্তিবিশেষের উপর প্রতিষ্ঠিত। ব্রহ্মসাক্ষাৎকারই তাঁহার একমাত্র আদেশ, অদ্বৈতদর্শন তাঁহার একমাত্র মতবাদ, এবং বেদ ও উপনিষদ্ তাঁহার একমাত্র প্রামাণ্য ধর্ম্মগ্রন্থ ছিল।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আবার ইহাও সত্য যে, ভারতবর্ষের জগজ্জননী-বোধক 'মা' শব্দটী তাঁহার মুখে সর্ব্বদা লাগিয়াই থাকিত। আমরা যেমন আমাদের পরিবারের মধ্যে সুপরিচিত কাহারও সম্বন্ধে কথা কহিয়া থাকি, তিনিও জগদম্বার সম্বন্ধে সেইভাবে কথাবার্ত্তা কহিতেন। তিনি দিবারাত্র তাঁহারই ভাবে তন্ময় হইয়া থাকিতেন। অন্য সন্তানগণের ন্যায় তিনি সকল সময়ে শান্তশিষ্ট ছিলেন না। কখনও কখনও তিনি দুষ্ট ও বিদ্রোহভাবাপন্ন হইয়া উঠিতেন, কিন্তু সে কেবল তাঁহারই প্রতি। ভালমন্দ যাহাই ঘটুক না কেন, তিনি সমস্তই জগন্মাতারই হাত বলিয়া জ্ঞান করিতেন। কোন এক শুভকার্য্য উপলক্ষ্যে তিনি জনৈক শিষ্যকে একটী মাতৃ-প্রার্থনা শিখাইয়া দেন, যাহা তাঁহার নিজ জীবনে যেন মন্ত্রশক্তির ন্যায় কার্য করিয়াছিল। তারপর হঠাৎ অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে শিষ্যের দিকে ফিরিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, "আর দেখ, শুধু প্রার্থনা করা নয়, তাঁকে জোর করে ওটা পূরণ করাতে হবে। মার কাছে ওসব দীন-হীন ভাব চলবে না! দেখো!" মাঝে মাঝে প্রায়ই তিনি হঠাৎ কোন নূতন বর্ণনার আংশিক অবতারণা করিতেন। যেমন, মায়ের দক্ষিণহস্ত অভয়দানের নিমিত্ত উত্তোলিত হইয়াছে, আবার বামহস্তে খড়্গ শোভা পাইতেছে। তন্ময়ভাবে দীর্ঘকাল চিন্তা করিতে করিতে হয়ত তিনি হঠাৎ, "তাঁর শাপই বর," এই কথা বলিয়া উঠিতেন। অথবা ভাবাবেগে তিনি যেন কবির ভাষাতেই বলিয়া উঠিতেন, "অন্তরঙ্গ ভক্তগণের নিভৃত হৃদয়-কন্দরে মায়ের রুধিররঞ্জিত অসি ঝকমক করে থাকে। এঁরা আজন্ম মায়ের অসি-মুণ্ড-বরাভয়করা মূর্ত্তির উপাসক!" আমি এই সময়ে

'মাতার বাণী' ('Voice of the Mother')-শীর্ষক যে ক্ষুদ্র স্তোত্রটী লিখিয়া প্রকাশ করিয়াছিলাম, তাহার প্রায় প্রতি ছত্র ও প্রতি বর্ণ তাঁহারই শ্রীমুখ হইতে এইরূপ মুহূর্ত্তগুলিতে সংগৃহীত হইয়াছে। তিনি সর্ব্বদাই বলিতেন, "আমি ঘোর-রূপের উপাসক!" এবং একবার বলিয়াছিলেন, "সকলেই যে সুখের আশায় কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, এরকম মনে করা ভুল। যত লোক সুখ চায়, ঠিক আবার ততগুলি লোকই আজন্ম দুঃখ খোঁজে। এস, আমরা নিষ্কামভাবে মায়ের ভয়ঙ্করা মূর্ত্তির উপাসনা করি।"

কোন কিছু লইয়া অনর্থক খুঁতখুঁত করাকে তিনি সর্ব্বান্তঃ-করণে ঘৃণা করিতেন। একবার আমি মন্দিরে পশুবলি দেওয়া সম্বন্ধে আমার সন্দেহগুলির নিরসনের জন্য তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াছিলাম। তিনি দুই-এক কথাতেই উহার জবাব দিয়া নিরস্ত হইলেন। তিনি অনায়াসেই বলিতে পারিতেন যে, আমরা বলিদানের বিরুদ্ধে ঘোরতর আপত্তি করা সত্ত্বেও নিজেদের রসনাতৃপ্তির জন্য পশুহত্যায় তিলমাত্র সঙ্কুচিত হই না। তাহা তিনি করিলেন না। তিনি তর্কচ্ছলে অনায়াসে, আধুনিক প্রথার ফলে কসাইদের ও কসাই-খানার যে দুর্গতি হইয়াছে, তাহার উল্লেখ করিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি তাহাও করিলেন না। আমার আপত্তিগুলির উত্তরে তিনি স্পষ্টভাবে শুধু এইটুকু বলিলেন, "ছবিখানা নিখুঁত করবার জন্য হলই বা একটু রক্তপাত!" তারপর তাঁহার এবং সমীপে উপবিষ্ট শ্রীরামকৃষ্ণের অপর একজন শিষ্যের নিকট হইতে উচ্চাঙ্গের কালীপূজার প্রকৃত তথ্যগুলি সংগ্রহ করিতে আমাকে বিলক্ষণ বেগ পাইতে হইয়াছিল। সে পূজা এতদপেক্ষা কৃচ্ছ্রসাধ্য, এবং উহাতে

জীবহিংসার নামগন্ধও নাই। কিন্তু তিনি আমাকে বলিলেন যে, মা-কালীর অনুচর ভূতপ্রেতগণের উদ্দেশে যে জীব-হত্যা করা হইয়া থাকে, উহা তাঁহার সম্পূর্ণ অনভিপ্রেত। তাঁহার মতে ইহা ভূতোপাসনা ব্যতীত আর কিছুই নহে, এবং তিনি উহাকে আদৌ সমর্থন করেন না। নিজ মন হইতে ভয় ও দুর্ব্বলতা সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত করিয়া দেওয়া এবং যাহা মধুর ও সুখকর, তাহাতে যেমন আপনা হইতেই জগন্মাতার প্রকাশ দেখা যায়, ঠিক সেভাবে পাপ, ভয়, দুঃখ ও বিনাশের মধ্যেও তাঁহাকে চিনিতে শিখা—ইহাই সর্ব্বদা তাঁহার চেষ্টা ছিল। এইহেতুই, কেহ সেই মহান্ আদর্শকে কোনরূপে খাট করিয়া ফেলিবে, ইহা তিনি সহিতে পারিতেন না। একদিন ভীমা মূর্ত্তির পূজা ও উহার সহিত তাদাত্ম্যলাভ সম্বন্ধে কথা কহিতে কহিতে তিনি বলিয়া উঠিলেন, "'মুণ্ডমালা পরায়ে তোমায়, ভয়ে ফিরে চায়, নাম দেয় দয়াময়ী।' মূর্খ তারা!" তিনি এই কথা বলিবামাত্র শ্রোতৃবর্গ স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন যে, যে পূজা শুধু দয়াবান ঈশ্বরের প্রতি প্রযুক্ত, পালনকর্ত্তা ও সান্ত্বনাদাতা ঈশ্বরের প্রতি প্রযুক্ত, যে পূজায় ভূকম্পন বা অগ্ন্যুৎপাতরূপে প্রকাশিত ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসার লেশমাত্র নাই, তাহার মূলে অহংজ্ঞান বর্ত্তমান। তাঁহারা বুঝিলেন যে, এরূপ পূজা ভিতরে ভিতরে হিন্দুগণ যাহাকে 'দোকানদারী' বলেন, তাহা ব্যতীত আর কিছুই নহে। সকলেই বুঝিতে পারিলেন যে, যে মত শিক্ষা দেয়, মঙ্গলের মধ্যেও ঈশ্বরের যেমন প্রকাশ, অমঙ্গলের মধ্যেও ঠিক তেমনই প্রকাশ, তাহা পূর্ব্বোক্ত মতের তুলনায় লক্ষগুণ নির্ভীক ও যথার্থবাদী। আমরা দেখিলাম যে, কাঁচা আমির গণ্ডী পার হইতে হইলে মানুষকে প্রবল

ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন হইতে হইবে, তাহাকে সত্যসত্যই (স্বামিজীর কঠোর ভাষায়) দৃঢ়চিত্তে 'জীবন না চাহিয়া মৃত্যুকে অনুসন্ধান করিতে হইবে, আপনাকে তরবারিমুখে নিক্ষেপ করিতে হইবে, চিরকালের মত ভীমা মূর্ত্তির সহিত একীভাব অবলম্বন করিতে হইবে !'

স্বামিজী কখনও তাঁহার নিজের ধারণাগুলি শিষ্যদের উপর চাপাইতে চেষ্টা করিতেন না। সেরূপ করিলে, তিনি স্বাধীনতা বলিতে যাহা বুঝিতেন, তাহার সম্পূর্ণ বিপরীতাচরণ করা হইত। কিন্তু আমার অতীত জীবনের শিক্ষকতাকার্য্যের সমগ্র অভিজ্ঞতার ফলে আমি এই সময়ে ইহাই স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিলাম যে, আমাকে ভারতীয়ভাবে ভাবিত হইতে হইবে। ঐ ভাবধারায় বিভিন্ন উপাসনাপ্রণালীর বিশিষ্ট স্থান লক্ষ্য করিয়া আমি কতটা বিস্ময়বিমূঢ় হইয়াছিলাম, তাহা অমরনাথযাত্রার স্মৃতির সহিত অবিস্মরণীয় ভাবে গ্রথিত হইয়া আছে। এইহেতু আমি, লোকে যেমন কোন নূতন ভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করে, অথবা ইচ্ছাপূর্ব্বক কোন নূতন জাতির মধ্যে জন্মগ্রহণ করা সম্ভবপর হইলে যেরূপ করিতে হয়, সেইরূপে কালীপূজার রহস্য বুঝিতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম। এইরূপ করিয়াছিলাম বলিয়াই আমি আচার্য্যদেবের জীবন ও চিন্তাপ্রণালী কতকটা বুঝিতে পারিয়াছিলাম। ধীরে ধীরে একটু একটু করিয়া আমি বুঝিতে লাগিলাম। বলা বাহুল্য, ধর্ম্মসংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ে তিনি যেন শিক্ষক হইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন—তিনি নিজে এ বিষয়টী ধরিতে পারুন বা নাই পারুন। যে চিন্তা এখনও সম্যক্ পরিস্ফুট হইয়া উঠে নাই, উঠিবার চেষ্টা করিতেছে, সেরূপ চিন্তাকে তিনি

কথনও বাধা দিতেন না। একদিন আমি তাঁহার নিকটে বসিয়া ছিলাম, এমন সময়ে তথায় একখানি কালীপ্রতিমা আনা হইল। প্রতিমাখানিতে কোন একটী ভাব চকিতের মত লক্ষ্য করিয়া আমি সহসা বলিয়া উঠিলাম, "স্বামিজী, হয়ত মা কালী সদাশিবেরই ধ্যানযোগে উপলব্ধ মূর্ত্তিবিশেষ। তাই কি ?" তিনি আমার দিকে মুহূর্ত্তের জন্য চাহিলেন। পরে স্নেহভরে বলিলেন, "বেশ, তাই হোক, তোমার নিজের ভাবেই ওটী প্রকাশ কর !"

আর একদিন তিনি আমাকে সঙ্গে লইয়া প্রবীণ মহর্ষি দেবেন্দ্র-নাথকে দর্শন করিতে যাইতেছিলেন। মহর্ষি তখন কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অবসর লইয়া তাঁহার জোড়াসাঁকোর বাটীতে অবস্থান করিতেছিলেন। পূর্ব্বরাত্রে আমি একজনের জীবনের অন্তিম অভিনয় প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম। যাত্রা করিবার পূর্ব্বে স্বামিজী আমাকে তদ্বিষয়েই প্রশ্ন করিলেন। উত্তরে আমি আগ্রহসহকারে বলিলাম যে, আমি এই উপলব্ধি করিয়াছি যে, প্রত্যেক ধর্ম্ম যেন এক একটী ভাষা, আর আমাদের প্রত্যেক ব্যক্তির সহিত তাহার নিজের ভাষাতেই কথা কহা উচিত। শুনিবামাত্র তাঁহার বদনমণ্ডল আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তিনি বলিয়া উঠিলেন, "একমাত্র শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসই এ কথা শিক্ষা দিয়ে গেছেন। একমাত্র তিনিই সাহস করে বলে গেছেন যে, আমাদের সকল লোকের সঙ্গে তাদের নিজ নিজ ভাষায় কথা কওয়া উচিত।"

তথাপি এমন একদিন আসিল, যখন তিনি শক্তিপূজা সম্বন্ধে তাঁহার নিজের মতটী কি, তাহা সুস্পষ্টরূপে জানাইয়া দিবার প্রয়োজন অনুভব করিলেন। আমার কালীঘাটে বক্তৃতা দিবার

কথা ছিল। তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বে তিনি আমার নিকট আসিয়া আমাকে বলিলেন যে, যদি কোন বিদেশীয় বন্ধু তথায় উপস্থিত থাকিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে অন্য সকল শ্রোতার ন্যায় জুতা খুলিয়া যাইতে হইবে এবং মেজেয় বসিতে হইবে। সেই মহাপীঠে যেন কাহারও জন্য এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম না হয়। তিনি আমাকে এই বিষয়টী দেখিবার ভার দিলেন।*

কিন্তু এইসকল বলিয়া তিনি যাইবার পূর্ব্বে আরও কিছুক্ষণ রহিলেন। তৎপরে কর্ণেল হের (Colonel Hay) 'রক্ষাকারী দেবতানিচয়' (Guardian Angels)-শীর্ষক কবিতার উল্লেখ করিয়া বলিলেন, "ব্রহ্ম ও দেবদেবীগণ সম্বন্ধে আমারও ঠিক ঐ মত! আমি ব্রহ্ম ও দেবদেবীগণেই বিশ্বাস করি, অন্য কিছুতে আমার বিশ্বাস নাই!"

স্পষ্টই বুঝা গেল যে, তিনি আশঙ্কা করিয়াছেন যে, তাঁহার নিজের যেখানে খট্‌কা লাগিয়াছিল, আমারও সেখানেই লাগিবে—কোন এক বিশেষ অঙ্গের পূজাকেই সার জানিয়া তাহাতে নিষ্ঠাবান হওয়া এবং বেদান্তের চরম ব্রহ্মবাদ, এই দুইটীকে কিরূপে খাপ-খাওয়ান যাইতে পারে, ইহাই সমস্যা। তিনি বুঝেন নাই যে, তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তগণের নিকট তিনি নিজেই এইসকল বিপরীত লক্ষণাক্রান্ত ধর্ম্মের সমন্বয়স্থল এবং তাহাদের প্রত্যেকটীই যে সত্য, তাহার সাক্ষিস্বরূপ। সুতরাং এই বিষয়টী চিন্তা করিতে করিতে তিনি

* কোথাও কোন দেবস্থানেই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম হইতে দেওয়া উচিত নহে। যে ব্যক্তি নিজের দেবস্থানের পবিত্রতা ও মাহাত্ম্য-রক্ষার জন্য বদ্ধপরিকর না হয়, সে সকলেরই অশ্রদ্ধার পাত্র।

কিছুক্ষণ ধরিয়া যেন কতকটা আপন মনেই কথা কহিয়া যাইতে লাগিলেন; কথাগুলি কতকটা অসংলগ্ন, যেন তিনি কতকগুলি প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন, নিজের মতটী বিশদ করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন, তথাপি যেন নিজের ভিতরে কিছু দেখিয়া তাহাতেই অর্দ্ধমগ্ন হইয়া রহিয়াছেন, চেষ্টা করিয়াও উহার ঝোঁক কাটাইয়া উঠিতে পারিতেছেন না।

তিনি বলিলেন, "ওঃ! মাকালী ও তাঁর লীলাসকলকে আমি কি ঘৃণাই করতুম! ছ বছর ধরে আমি ঐ নিয়ে ধ্বস্তাধ্বস্তি করেছি, কিছুতেই তাঁকে মানব না। কিন্তু শেষে আমাকে মানতেই হল! শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস আমাকে তাঁর কাছে উৎসর্গ করেছিলেন, আর এখন আমি বিশ্বাস করি যে, অতি সামান্য সামান্য কাজেও সেই মা-ই আমাকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন, আমাকে নিয়ে যা ইচ্ছে তাই করছেন! ... তবু আমি বহুদিন ধরে তাঁকে মানব না বলে জেদ করেছিলাম। আমি ঠাকুরকে ভালবাসতুম কিনা, তাই ছাড়তে পারতুম না। আমি তাঁর অদ্ভুত পবিত্রতা প্রত্যক্ষ করলাম। তাঁর অসাধারণ ভালবাসা প্রাণে প্রাণে বুঝলাম। ... তিনি যে কত বড় ছিলেন, তা তখনও আমার ধারণা হয় নি। ... সেসব পরে হয়—যখন আমি বশ্যতা স্বীকার করেছি। সে সময়ে আমি তাঁকে এক মাথাপাগলা কচি ছেলে বলে মনে করতুম—কেবল কি কতকগুলো খেয়াল দেখছেন! আমি এসব ঘৃণা করতুম। কিন্তু শেষে আমাকেও মা কালীকে মানতেই হল!

"কেন যে আমি এরকম করলাম, সেটা গুহ্য ব্যাপার, তা আমি

জীবনে কাকেও বলব না। আমার তখন অতি দুঃসময় পড়েছে। ... মা সুবিধা পেলেন। ... তিনি আমায় গোলাম করে ফেললেন। ঠাকুরের নিজ মুখের কথা, 'তুই মায়ের গোলাম হবি।' ঠাকুর আমাকে মার হাতে সমর্পণ করে দিলেন। ... আশ্চর্য্য ব্যাপার! ঐ ঘটনার পর তিনি মাত্র দু বছর জীবিত ছিলেন; তার অধিকাংশ সময়ই আবার তিনি অসুখে ভুগেছিলেন। ছ মাস যেতে না যেতেই তাঁর স্বাস্থ্যভঙ্গ হল—সে প্রফুল্লতা কোথায় চলে গেল!

"গুরু নানকেরও ঐরকম হয়েছিল। কে সেই একমাত্র শিষ্য, যার মধ্যে তিনি নিজ শক্তি সঞ্চারিত করে যাবেন, তিনি তাই অনুসন্ধান করতে লাগলেন। তিনি নিজের পরিবারবর্গকে উপেক্ষা করে গেলেন —তাঁর সন্তানগণ তাঁর কাছে যেন কিছুই নয়! অবশেষে তিনি সেই বালকের সন্ধান পেলেন, যাকে তিনি ঐ শক্তিগ্রহণের অধিকারী বিবেচনা করলেন। তাকে ঐ শক্তি দান করে তবে তিনি নিশ্চিন্ত হয়ে মরতে পেরেছিলেন।

"ভবিষ্যদ্বংশীয়েরা শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসকে মা-কালীরই অবতার বলবে, এরকম মনে করছ? হাঁ। আমারও মনে হয়, এ কথা নিঃসন্দেহ যে, মা তাঁর নিজ প্রয়োজন-সিদ্ধির জন্যই শ্রীরামকৃষ্ণের শরীরে আবির্ভূতা হয়েছিলেন।

"দেখ, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, কোথাও এমন এক মহাশক্তি আছেন, যিনি নিজেকে প্রকৃতি-সত্তা বলে মনে করেন। তাঁরই নাম কালী, তাঁরই নাম মা। ... আবার আমি ব্রহ্মেও বিশ্বাস করি। ... এইরকম সচরাচর হয় না কি? জীবশরীরের অসংখ্য কোষগুলি (cells) মিলেই একটী ব্যক্তি সৃষ্টি করে না কি? বহু মস্তিষ্ককোষ মিলিত

হয়েই মনের সৃষ্টি করে, একটী মাত্র কোষ নয়। বহুত্বের মধ্যে একত্ব—এই আর কি! তবে ব্রহ্মের বেলায় এর অন্যথা হবে কেন? ব্রহ্মই একমাত্র সৎপদার্থ, তিনি অদ্বিতীয়, কিন্তু তিনিই আবার দেবদেবী হয়েছেন!"

আর একবার কাশ্মীর-তীর্থযাত্রা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, "এইসকল দেবদেবী কেবলমাত্র মন-গড়া জিনিস নয়! ভক্তেরা যেসকল ঈশ্বরীয় রূপ প্রত্যক্ষ করেছেন, সেইগুলিই দেবদেবীর মূর্ত্তি বলে গৃহীত হয়েছে।" শ্রীরামকৃষ্ণের সম্বন্ধেও শুনা যায় যে, তিনি কখনও কখনও সমাধি-অবসানে, কে তাঁহার শরীরমনাশ্রয়ে প্রকাশ পাইতেছেন, তদ্বিষয়ে এরূপ বলিতেন, "যিনি রাম, যিনি কৃষ্ণ-রূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তিনিই এক্ষণে (নিজ শরীর দেখাইয়া) এই শরীরে আবির্ভূত হয়েছেন।" -তৎপরে তাঁহার প্রধান শিষ্যের দিকে চাহিয়া হাসিতে হাসিতে বলিতেন, "নরেন, তা বলে তোর বেদান্তের দিক্ দিয়ে নয়!"

বিভিন্ন সময়ে উপলব্ধ সত্যসমূহের পরস্পরের মধ্যে কি সম্বন্ধ এবং তাহাদিগকে কিরূপে একসূত্রে গ্রথিত করিতে হইবে, ইহা লইয়া মহাপুরুষগণের মনে যে আন্দোলন চলিয়া থাকে, পূর্ব্বোক্ত ঘটনা-সমূহ হইতে আমরা তাহার কথঞ্চিৎ আভাস প্রাপ্ত হই। এক দিকে জগন্মাতা, অন্যদিকে ব্রহ্ম। বহুদিন পূর্ব্বে স্বামিজীর মুখে যাহা শুনিয়াছিলাম, তাহাই এক্ষণে মনে পড়িতেছে, "ইন্দ্রিয়জন্য-জ্ঞানের আলো-আঁধারের মধ্য দিয়ে দেখলে নির্গুণ ব্রহ্মই সগুণ হয়ে পড়েন।" প্রকৃতপক্ষে এই দুইটী ভাবকে একসঙ্গে খাপ-খাওয়ান যায় কি-না সন্দেহ। দুইটী ধারণাই এক সময়ে সমভাবে সত্য হইতে পারে না।

ইহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না যে, অনুভূতির রাজ্যে, হয় শক্তিকে ব্রহ্ম হইতে হইবে, নতুবা ব্রহ্মকে শক্তি হইতে হইবে। এতদুভয়ের মধ্যে একটীকে অপরটীর আকার ধারণ করিতেই হইবে। কোন্‌টী কাহার আকার ধারণ করিবে, তাহা বিশেষ বিশেষ সাধকের অদৃষ্ট ও প্রাগ্‌জন্মসংস্কাররাশির উপর নির্ভর করিতেছে।

আমার নিজের কথা বলিতে গেলে, পূর্ব্বোক্ত কথোপকথন হইতে আমার জীবনে একটী নূতন যুগের সূত্রপাত হইয়াছে। সেইদিন হইতে আমি আচার্য্যদেবের ক্রিয়াকলাপে যেন ইহাই লক্ষ্য করিয়াছি যে, তিনি যেন কতকটা অপর কাহারও নিকট হইতে দায়স্বরূপে প্রাপ্ত কোন গুরু কার্য্যভার বহন করিয়া আসিতেছেন। যখনই তাঁহাকে কালীমূর্ত্তির ব্যাখ্যা করিতে বলা হইত, তখনই তিনি বলিতেন—মা যেন একখানি মহাগ্রন্থ ; মানব উহা পাঠ করিয়া অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে ; আর পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা উল্টাইয়া যাইতে যাইতে অবশেষে সে দেখে যে, উহাতে কিছুই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। আমার মনে হয়, ইহাই চরম ব্যাখ্যা। মা-কালীই ভারতের ভাবী বংশধরগণের একমাত্র উপাস্য হইবেন। তাঁহার নাম লইয়া মাতৃভক্ত সন্তানগণ নানা অভিজ্ঞতার শেষ সীমায় পৌছিতে সমর্থ হইবেন। তথাপি সর্ব্বশেষে তাঁহাদের হৃদয়ে সেই সনাতন জ্ঞানজ্যোতির বিকাশ ঘটিবে। তখন প্রত্যেক মানব নিজ নিজ শুভমুহূর্ত্তোদয়ে দেখিবে যে, তাহার সমগ্র জীবন স্বপ্নমাত্র ছিল।

"ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সংন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥"

—কর্ম্মের আরম্ভমাত্র না করিয়া কোন ব্যক্তিই নৈষ্কর্ম্ম্য লাভ করিতে

পারে না। শুধু কর্ম্মত্যাগ করিলাম বলিলেই সিদ্ধি করতলগত হয় না।

গীতার এই বেদগম্ভীর বাক্য কাহার না স্মৃতিপথে উদিত হয়? সেইরূপ আমরাও ইহা স্থিরনিশ্চিত বলিয়া মনে করিতে পারি যে, এই অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া না যাইলে অন্তে সত্যবস্তুর সাক্ষাৎকার ঘটে না। শক্তির মধ্য দিয়া ব্রহ্মে উপনীত হইতে হইবে—নূতন জীবন, নব নব জ্ঞান ও বহু পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া, দুদিনের দ্বন্দ্বসঙ্ঘাত ও জয়-পরাজয়ের মধ্য দিয়া, আমরা সেই আত্মারূপী চিরশান্তিধামে উপনীত হইব, যথায় সকলই সমরস, একাকার এবং শান্তিময়। যে আচার্য্যশ্রেষ্ঠের পদাঙ্ক আমরা অনুসরণ করিয়াছিলাম, তাঁহার জীবনের প্রতি যতই গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করিতেছি, দিনের পর দিন আমরা ততই স্পষ্টতরভাবে দেখিতেছি যে, তিনি নিজে অভিজ্ঞতারূপ মহাগ্রন্থের এক এক করিয়া পৃষ্ঠা উল্টাইয়া যাইতে-ছিলেন, এবং যখন তিনি শেষ কথাটী পর্য্যন্ত পড়িয়া ফেলিলেন, তখনই শ্রান্ত শিশুর ন্যায় মাতৃক্রোড়ে শয়ন করিয়া মহাসমাধিতে মগ্ন হইয়া পড়িলেন। তখনই তাঁহার জ্ঞান হইল যে, এই অনন্ত বৈচিত্র্যময় জীবন স্বপ্নমাত্র!

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

অৰ্দ্ধ পৃথিবী অতিক্রম

১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের ২০শে জুন আমি স্বামিজী ও তাঁহার গুরুভ্রাতা স্বামী তুরীয়ানন্দের সহিত এক স্টীমারে লণ্ডন যাত্রা করিলাম। ৩১শে জুলাই প্রাতঃকালে আমরা লণ্ডন পৌঁছিলাম। পৌঁছিবার কয়েক সপ্তাহ পরে স্বামিজী ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিয়া আমেরিকা যাত্রা করেন। সেপ্টেম্বর মাসের শেষভাগে তথায় আমি তাঁহার সাক্ষাৎ পাই। এখানে তাঁহার সহিত একই ভবনে অতিথিরূপে যে পাঁচ-ছয় সপ্তাহ কাল কাটাইয়াছিলাম, এবং পর বৎসর (১৯০০ খৃষ্টাব্দে) ব্রিটানিতে (Brittany) যে একপক্ষ কাল অতিবাহিত করিয়াছিলাম, তাহার পর আর আমার ভাগ্যে তাঁহার সহিত দীর্ঘ কাল একত্র বাসের সুযোগ ঘটে নাই। ১৯০০ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে তিনি ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, কিন্তু আমি ১৯০২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পাশ্চাত্ত্য দেশেই ছিলাম। তারপর যখন আমি ভারতবর্ষে আসিয়া পৌঁছিলাম, তখন তাঁহার জীবননাট্যের শেষ দৃশ্যের অভিনয় হইতেছে—সেই দৃশ্য দর্শন এবং তাঁহার শেষ আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিবার জন্যই যেন আমি উপস্থিত হইয়াছিলাম। এই দেড়মাসকালব্যাপী সমুদ্র-যাত্রাটীকেই আমি আমার জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঘটনা বলিয়া মনে করি। এইকালে স্বামিজীর সহিত মিশিবার যে-কোন সুযোগ উপস্থিত

হইয়াছে তাহার সকলগুলিই আমি গ্রহণ করিয়াছি, এবং অন্য কাহারও সহিত একপ্রকার মিশিতাম না বলিলেই হয়। একাকী লেখা এবং সূচীকর্ম্ম লইয়াই অবশিষ্ট সময় অতিবাহিত করিতাম। এইরূপে আমি দীর্ঘকাল ধরিয়া অবিচ্ছিন্নভাবে তাঁহার অপূর্ব্ব চরিত্র-মনের সংস্পর্শ-লাভে ধন্য হইতে পারিয়াছিলাম। এ সম্পদের কি আর তুলনা হয়?

এই সমুদ্রযাত্রার প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত নানাবিধ ভাব ও গল্পের একটা অবিরাম স্রোত চলিয়াছিল। কেহই জানিত না, কখন সহসা স্বামিজীর উপলব্ধির দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইয়া যাইবে এবং তাহার ফলে আমরা নূতন নূতন সত্যের জ্বলন্ত ভাষায় বর্ণনা শুনিতে পাইব। প্রথম দিন অপরাহ্ণে আমরা ভাগীরথীবক্ষে জাহাজে বসিয়া গল্প করিতেছি, এমন সময়ে তিনি সহসা বলিয়া উঠিলেন, "যতই দিন যাচ্ছে ততই আমি স্পষ্ট দেখছি যে, মানুষ হওয়াই (manliness) জীবনের সার বস্তু। এখন আমি এই কথাই প্রচার করছি। পাপ করবে, তাও মানুষের মত কর। যদি দুষ্টই হতে হয়, তবে একটা বড় রকমের দুষ্ট হও।" কথাগুলি লিপিবদ্ধ করিতে করিতে আর এক দিনের ঘটনা মনে পড়িতেছে। সে দিন আমি তাঁহাকে বলিতেছিলাম যে, ভারতে অপরাধীর সংখ্যা খুব অল্প। তৎক্ষণাৎ তিনি দুঃখিতান্তঃকরণে উত্তর দিলেন, "ঈশ্বরের ইচ্ছায় যদি আমাদের দেশে এর বিপরীত হত, তা হলে পরম মঙ্গল হত; কারণ, প্রকৃত-পক্ষে এ ধর্ম্মভীরুতা যে মৃত্যুর লক্ষণ!" শিবরাত্রির গল্প, পৃথ্বীরাজের গল্প, বিক্রমাদিত্যের বত্রিশ সিংহাসনের গল্প, বুদ্ধ ও যশোধরার গল্প, এবং আরও শত শত গল্প স্বামিজী আমাদিগকে প্রায়ই শুনাইতেন। আবার একটী বিষয় সকলেই লক্ষ্য করিতেন যে, একই গল্প কেহ

কথনও দুইবার শুনেন নাই। স্বামিজী জাতিবিভাগের ক্রমাগত আলোচনা করিতেন; দিবারাত্র নানাবিধ চিন্তার বিশ্লেষণ করিয়া উহাদিগকে নূতন নূতন ভাষায় প্রকাশ করিতেন; অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের নিষ্কাম কর্ম্ম সম্বন্ধে নানা কথা বলিতেন; এবং সর্ব্বোপরি আপামর সাধারণ মানবের পক্ষসমর্থন করিতেন;—তিনি এই কার্য্যে কদাপি বিরত হইতেন না, কথনও দোষ উদ্‌ঘাটন করিয়া তাহাদিগকে আরও দুর্ব্বল করিয়া ফেলিতেন না। যাহাদিগকে সমর্থন করিবার কেহই নাই, স্বামিজী অগ্রসর হইয়া তাহাদিগের স্বপক্ষে যাহাকিছু বলিবার আছে বলিয়া দিতেন, এবং দুর্ব্বল ব্যক্তি বা জাতিসমূহের শতমুখে গুণ বর্ণনা করিতেন! আমাদের আচার্য্যদেবের আবির্ভাব ও তিরোভাব দুই-ই আজি অতীতের ঘটনা; কিন্তু তিনি তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তগণের হৃদয়ে যে অমূল্য স্মৃতিসম্ভার রাখিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে তাঁহার এই বিশ্বমানবের প্রতি প্রেমই যে উজ্জ্বলতম রত্ন, তাহা আমরা অসঙ্কোচে নির্দ্দেশ করিতে পারি।

একদিন তিনি কোন ইউরোপীয়ের মুখে নরমাংসভোজন কোন কোন জাতির মধ্যে নিত্যকার ব্যাপার, এইরূপ উক্তি শুনিয়া যেরূপ ক্রোধ প্রকাশ করেন তাহা আমি কথনও ভুলিতে পারিব না। লোকটীর সমস্ত বক্তব্য শুনিবার পর তিনি বলিলেন, "এটা সত্য নয়। ধর্ম্মভাবের প্রেরণায়—পূজাদেওয়া বলিস্বরূপে, অথবা যুদ্ধে—প্রতিহিংসাবশে, এই দুই স্থল ছাড়া কোথাও কোন জাতি নরমাংস ভোজন করে না। বুঝতে পাচ্ছনা, ওটা যে দলবদ্ধ বা সমাজবদ্ধ জীবদের রীতিই নয়। এরকম করলে যে সামাজিক জীবনেরই মূলোচ্ছেদ করা হবে!" এই কথাগুলি যথন বলা হয়, তথন ক্রপট্‌কিনের

(Kropotkin) 'পরস্পরের সাহায্য' (Mutual Aid) সম্বন্ধীয় মূল্য-বান পুস্তকখানি বাহির হয় নাই। স্বামিজীর বিশ্বমানবের প্রতি প্রেম এবং প্রত্যেক ব্যক্তিকে দেশ-কাল-অবস্থা অনুসারে বিচার করিবার স্বাভাবিক ইচ্ছাই তাঁহাকে এরূপ গভীর অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করিয়াছিল।

আবার লোকের ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সম্বন্ধে আলোচনা করিতে করিতে তিনি বলিয়া উঠিলেন, "স্ত্রী-পুরুষের পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ এবং বংশবৃদ্ধির ইচ্ছা—এ দুটীই অধিকাংশ ধর্ম্মের মূলে। ভারতবর্ষে এ মতের নাম বৈষ্ণবধর্ম্ম, পাশ্চাত্ত্যে খৃষ্টধর্ম্ম। মৃত্যুকে, মা-কালীকে উপাসনা করতে অতি অল্প লোকেই সাহসী হয়েছে! এস, আমরা মৃত্যুর উপাসনা করি। এস, আমরা ভয়ঙ্করকে ভয়ঙ্কর বলেই আলিঙ্গন করি, তাঁকে কোমল হবার জন্য প্রার্থনা করে নয়। এস, আমরা দুঃখকে দুঃখ বলেই বরণ করে নেই!"

যখন আমরা সাগরসঙ্গমে উপস্থিত হইলাম, তখন কেন সমুদ্রকে 'কালাপানি' (কাল জল) আর নদীকে সাদাপানি বলে তাহা আমরা স্পষ্টই বুঝিতে পারিলাম। স্বামিজী বুঝাইয়া দিলেন যে, হিন্দুগণের সাগরের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তিই এত শতাব্দী ধরিয়া সমুদ্রযাত্রাকে জাতিচ্যুত হইবার মত অপরাধ বলিয়া গণ্য করিয়া আসিয়াছে, কারণ উহাকে লঙ্ঘন করিলে যে অপবিত্র করা হয়। তারপর যেমন জাহাজ-খানি নদীর সীমা অতিক্রম করিয়া প্রথম সাগর স্পর্শ করিল, অমনি স্বামিজী বলিতে লাগিলেন, "নমঃ শিবায়! নমঃ শিবায়! ত্যাগবৈরাগ্য-ভূমি পরিত্যাগ করে ভোগৈশ্বর্য্যভূমিতে পদার্পণ করতে চললাম!"

সচরাচর দেখা যায়, যে বড় হইতে চায়, তাহাকে অনেক কষ্ট সহিতে হয়, এবং ইহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও অদৃষ্ট এরূপ যে

তাহাদের ইহ-জগতের সকল সুখ জ্বলিয়া পুড়িয়া ছাই হইয়া যায়—এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া স্বামিজী বলিলেন, "সারা জীবনটাই দুঃখের বিনিময়ে অল্প সুখভোগ! কখনও ভুলো না—'সিংহ মর্ম্মান্তিক আঘাত পেলে তবে সব চেয়ে ভীষণভাবে গর্জ্জন করে; সাপের মাথায় আঘাত লাগলে তবে সে ফণা তুলে দাঁড়িয়ে ওঠে; আত্মার মহিমাও তেমনি লোকে দারুণ মর্ম্মবেদনা পেলে তবে প্রকাশ পায়।'"

এই তিনি অসীম ধৈর্য্যসহকারে কোন এক প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন, এই আবার ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক কল্পনা-জল্পনা লইয়া আনন্দে সময়ক্ষেপ করিতেছেন। ভারতীয় ইতিহাস সম্যকরূপে বুঝিতে হইলে উহার বৌদ্ধযুগকে বিশেষভাবে অধ্যয়ন করিতে হইবে—এই জন্যই তাঁহার মন ঘুরিয়া ফিরিয়া বার বার ঐ যুগের প্রতিই আকৃষ্ট হইত।

এক দিন তিনি বলিলেন, "বৌদ্ধধর্ম্মের তিনটী যুগ-বিভাগ আছে—পাঁচ শ বছর বুদ্ধোক্ত বিধিসমূহের পালন, পাঁচ শ বছর মূর্ত্তি-পূজা, এবং পাঁচ শ বছর তন্ত্রপ্রাধান্য। কখনও মনে করো না যে, ভারতে কোন কালে বৌদ্ধধর্ম্ম নামে একটী পৃথক ধর্ম্ম ছিল, আর তার নিজস্ব মন্দির ও পুরোহিতাদি বর্ত্তমান ছিল! মোটেই নয়। বৌদ্ধ-ধর্ম্ম চিরকাল হিন্দুধর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কেবল এক সময়ে বুদ্ধের প্রভাব একাধিপত্য লাভ করেছিল, এবং তারই ফলে সমগ্র জাতিটী সন্ন্যাসমার্গ অবলম্বন করেছিল।" বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুদয়ে কাশ্মীরের নাগগণ (যেসকল মহাসর্প কুণ্ডের অভ্যন্তরে বাস করে বলিয়া লোকে বিশ্বাস করিত) দেবত্বপদবী হইতে বলপূর্ব্বক বিচ্যুত হয়। পরবর্ত্তী

শীতকালে ভীষণ ঠাণ্ডা পড়ে। তখন তাহারাই আবার বৌদ্ধসম্প্রদায়ের সিদ্ধপুরুষ হিসাবে বৌদ্ধধর্ম্মের অঙ্গীভূত হইয়াছিল কি না, স্বামিজী এই বিষয়টী লইয়া আলোচনা করিতেছিলেন।

প্রসঙ্গক্রমে সোমলতার কথা উঠিল। 'হিমালয়'-যুগের (Himalayan Period) সহস্র বৎসর পর পর্য্যন্ত ঐ লতা কিরূপে ভারতের গ্রামে গ্রামে প্রতি বৎসর রাজার ন্যায় অভ্যর্থনা লাভ করিত এবং কিরূপে এক নির্দ্দিষ্ট দিনে গ্রামবাসিগণ সকলে মিলিয়া গ্রামের বাহিরে গিয়া মহাসমারোহে উহাকে গ্রামের ভিতর আনয়ন করিত, এইসকল কথা তিনি মনোহরভাবে বর্ণনা করিতে লাগিলেন। আর এখন লোকে উহাকে চিনিতেও পারে না!

আবার শের শা সম্বন্ধে কথা হইতে লাগিল—যিনি হুমায়ুনের রাজত্বে ত্রিশবৎসরব্যাপী এক বিচ্ছেদ ঘটাইয়া দিয়াছিলেন। তিনি প্রথমেই এই বলিয়া বিষয়টী আরম্ভ করিলেন, "বাল্যকালে শের শা বাঙ্গলার রাস্তায় রাস্তায় দৌড়াদৌড়ি করতেন।" এই কথা বলিতে বলিতে তিনি যেরূপ উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাহা আমার আজও মনে পড়িতেছে। প্রসঙ্গটী শেষ করিবার সময় তিনি আমাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন যে, চট্টগ্রাম হইতে পেশোয়ার পর্য্যন্ত বিস্তৃত গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক নামক রাজপথ, ডাকবিভাগের বন্দোবস্ত এবং সরকারী ব্যাঙ্কস্থাপন —এসকল শের শারই কীর্ত্তি। তারপর কয়েক মিনিট চুপ করিয়া থাকিয়া তিনি গুরুগীতা হইতে আবৃত্তি করিতে লাগিলেন—

"গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্ব্বিষ্ণুর্গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ॥"

* * *

"গুরুরাদিরনাদিশ্চ গুরুঃ পরমদৈবতঃ।
গুরোঃ পরতরং নাস্তি তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥"

তিনি মনে মনে কোন একটী বিষয় লইয়া আলোচনা করিতেছিলেন, এইসকল যদৃচ্ছাক্রমে উচ্চারিত শ্লোক সেই চিন্তার সহিত কোনরূপে সংশ্লিষ্ট ছিল। ক্ষণকাল পরে সহসা সেই গভীর চিন্তা নিশ্চয়ই ভঙ্গ হইল। তিনি বলিলেন, "হাঁ, বুদ্ধ ঠিকই বলেছেন। কার্য্যকারণসম্বন্ধই সমুদয় কর্ম্মের মূল। পৃথক ব্যক্তিগত সত্তা বলে আমরা যা দেখছি, তা নিশ্চয়ই ভ্রমাত্মক।" পরদিন প্রাতঃকালে তিনি চেয়ারে হেলান দিয়া আছেন—আমি মনে করিতেছি, তিনি তন্দ্রাবিষ্ট হইয়াছেন—এমন সময় তিনি হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, "দেখ দেখি! এক জীবনের স্মৃতিই যেন লক্ষ লক্ষ বৎসরব্যাপী কারাবাস বলে মনে হয়; লোকে আবার পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের স্মৃতি জাগিয়ে তুলতে চায়! এই জন্মেরই ধাক্কা কে সামলায় তার ঠিকানা নাই, আবার অন্য জন্ম!"

একদিন প্রাতঃকালে চা খাইবার পূর্ব্বে তিনি আমাকে ডেকের উপর দেখিতে পাইয়া বলিলেন, "এইমাত্র আমি তুরীয়ানন্দের সঙ্গে রক্ষণশীল (Conservative) ও উদারনীতিক (Liberal) ভাব সম্বন্ধে কথা কইছিলুম।" তারপরই তিনি বিষয়টীকে গভীরভাবে আলোচনা করিতে আরম্ভ করিলেন।

"রক্ষণশীল ব্যক্তির একমাত্র আদর্শ বশ্যতাস্বীকার; তোমাদের আদর্শ সংগ্রাম। সুতরাং আমরাই জীবনের সুখটুকু ভোগ করে থাকি; তোমরা তা কখনও পার না। তোমরা রাতদিনই তোমাদের আদর্শটাকে বদলে একটা নূতন কিছু করবার চেষ্টা

করছ, আর ঐ পরিবর্ত্তনের লক্ষাংশের একাংশ ঘটবার আগেই তোমরা ইহলোক পরিত্যাগ কর। পাশ্চাত্ত্যবাসীর আদর্শ—উন্নতির জন্ম একটা কিছু কর; প্রাচ্যবাসীর আদর্শ—নির্ব্বিবাদে সয়ে যাও; সর্ব্বাঙ্গসুন্দর জীবন সেইটা, যাতে দুরকম পথেরই অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য থাকবে। কিন্তু তা হওয়া অসম্ভব।

"আমাদের ধর্ম্ম এটা মেনেই নেয় যে, মানুষের সব বাসনা পূর্ণ হতে পারে না। জীবনে অনেক অপ্রীতিকর জিনিসকে সংযত করে যেতে হবে। এটা অত্যন্ত অপ্রীতিকর ব্যাপার সন্দেহ নেই, কিন্তু তবু এতে সুফলই ফলে থাকে। উদারনীতিক মশায়রা এর কেবল খারাপের দিকটাই দেখেন, এবং একে ভেঙ্গেচুরে ফেলতে চান। কিন্তু এর পরিবর্ত্তে তাঁরা যা প্রবর্ত্তন করেন, তাও তেমনি দোষযুক্ত, এবং ঐ নূতন রীতিনীতির সাহায্যে অগ্রসর হয়ে এর যেটুকু ভাল অংশ তাতে পৌঁছতে, আমাদের পুরানো নিয়মগুলির বেলায় যতদিন লেগেছিল ঠিক ততদিনই সময় লাগে।

"পরিবর্ত্তনের দ্বারা ইচ্ছাশক্তির বলবৃদ্ধি হয় না, বরং সেটা আরও দুর্ব্বল ও পরমুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে। আমাদের চাই ক্রমাগত সব জিনিস নিজের ভিতর টেনে নেওয়া—নিজেদের করে নেওয়া (absorption)। এরকম করলে ইচ্ছাশক্তি আরও প্রবল হয়ে ওঠে। আর জ্ঞাতসারে হোক বা অজ্ঞাতসারে হোক, জগতে ইচ্ছাশক্তিই একমাত্র জিনিস, যার আমরা আদর করে থাকি। জগতের চক্ষে সহমরণপ্রথা এত বড় জিনিস কেন?—ওতে ইচ্ছাশক্তির বিকাশ হয় বলে।

"আমাদের স্বার্থপরতা বিসর্জ্জন দিতে শিখতে হবে! আমি দেখতে পাই যে, যখনই আমি জীবনে কোন ভুল করেছি, তার একমাত্র কারণ—তাতে স্বার্থগন্ধ মিশ্রিত ছিল। যেখানে স্বার্থের সংশ্রব নেই, সেখানে আমার বিচারবুদ্ধি কখনও একচুল লক্ষ্য-ভ্রষ্ট হয় নি।

"এই স্বার্থ না থাকলে জগতে কোন ধর্ম্মমতই থাকত না। যদি মানুষ নিজের জন্য কোন কিছু না চাইত, তা হলে তুমি কি মনে কর, সে এসব প্রার্থনা, পূজা, আরাধনাদি কখনও করত? কখনও না। সে ঈশ্বর সম্বন্ধে চিন্তাই করত না বললে হয়। একটু আধটু যা করত, তা হয়ত কদাচ কখনও একটা সুন্দর স্বাভাবিক দৃশ্য বা আর কিছু দেখে একটু স্তুতিবাদ করা মাত্র। ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের কেবল ঐরকম সম্বন্ধ হওয়াই উচিত—শুধু গুণগান ও কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন। যদি আমরা নিঃস্বার্থ হতে পারি তবেই এরূপ সম্ভব, নচেৎ নয়।"

তিনি আবার বলিলেন, "তোমরা মনে কর বুঝি লড়াই করাটা শ্রীবৃদ্ধির লক্ষণ। এটা সম্পূর্ণ ভুল। নিজের অঙ্গীভূত করে নেওয়াই (absorption) প্রকৃত উন্নতির লক্ষণ। হিন্দুধর্ম্ম এ ব্যাপারে সিদ্ধহস্ত। আমরা কোন কালে যুদ্ধবিগ্রহের ধার ধারি নি। অবশ্য গৃহপরিজনের রক্ষার জন্য কখনও কখনও উত্তম-মধ্যম প্রহার দেওয়া—সে ক্ষমতা আমাদের ছিল। তাতে কোন দোষ হত না। কিন্তু আমরা কখনও শুধু লড়াইয়ের জন্যই লড়াই করার পক্ষপাতী ছিলাম না। প্রত্যেককে সেটী শিক্ষা করতে হত। সুতরাং এসব আগন্তুক জাতি আসুক, এবং নিজের নিজের পথে চলতে

থাকুক। কালচক্রের আবর্ত্তনে তারা শেষে হিন্দুধর্ম্মেরই অঙ্গীভূত হয়ে যাবে।"

যখনই তিনি তাঁহার মাতৃভূমির কথা, বা যে হিন্দুধর্ম্মের ক্রোড়ে তিনি লালিত, তৎসম্বন্ধে চিন্তা করিতেন, তখনই তিনি ইঁহাদিগকে মহাপ্রভাবশালী না ভাবিয়া থাকিতে পারিতেন না। কোন নির্দ্দিষ্ট কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে চিন্তা করিতে করিতে তিনি বারবার তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ খেয়ালী ভাষায় বলিয়া উঠিতেন, "হাঁ, এ কথা ঠিক। যদি ভারতে কোন ইউরোপীয় পুরুষ বা নারীকে কাজ করতে হয়, তা হলে তাঁকে কালা ভারতবাসীর অধীনে থেকেই তা করতে হবে।"

সমগ্র জাতিটী মিলিয়া কি কি মহাকার্য্য সাধন করিয়াছে তৎসম্বন্ধে তিনি যথেষ্ট চিন্তা করিতেন। তিনি মাঝে মাঝে বলিতেন, "দেখ, আমরা একটা জিনিস করেছি, যা আর কোন জাতি কখনও পারে নাই। আমরা একটা সমগ্র জাতিকে দু-একটী ধারণার বশবর্ত্তী করেছি—যেমন গোমাংস-বর্জ্জন। কোন হিন্দু গোমাংস খাবে না।" সহসা একজনের দিকে ফিরিয়া তিনি বলিলেন, "না, না। এটা ইউরোপীয়দের বিড়ালের মাংস বর্জ্জনের মত নয়, কারণ গোমাংস প্রাচীন কালে এ দেশের খাদ্য ছিল।"

আমরা একদিন তাঁহার জনৈক প্রতিপক্ষের বিষয়ে আলোচনা করিতেছিলাম। আমি বলিলাম, "তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে তাঁর দেশের উর্দ্ধে স্থাপন করছেন না কি?" স্বামিজী সানন্দে উত্তর দিলেন, "সেটা এশিয়ারই লক্ষণ, এবং বড় উঁচু জিনিস। শুধু, এ ব্যাপারটাকে ঠিক ঠিক দেখবার মত মাথা তাঁর নেই, আর তাঁর

অপেক্ষা করবার ধৈর্য্য নেই।” ইহা বলিয়াই তিনি আপন মনে মা-কালীর বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন।

তিনি আবৃত্তি করিলেন—

“মুণ্ডমালা পরায়ে তোমায়, ভয়ে ফিরে চায়,
নাম দেয় দয়াময়ী।

*　　　　*　　　　*

চূর্ণ হোক স্বার্থ সাধ মান, হৃদয় শ্মশান, নাচুক তাহাতে শ্যামা।”

তিনি বলিলেন, “যারা এরকম করে, আমি তাদের দলে নই। আমি ভয়ঙ্করকে ভয়ঙ্কর বলেই ভালবাসি, নৈরাশ্যকে তার নিজের জন্যই ভালবাসি, দুঃখদারিদ্র্যকে সে দুঃখস্বরূপ বলেই ভালবাসি। ক্রমাগত লড়াই কর। লড়াই করতেই থাক; প্রতিপদেই পরাজয় হয়, ক্ষতি নেই। ঐটেই আদর্শ—ঐটেই আদর্শ।”

একবার তিনি বলিয়াছিলেন, “শুধু মানবাত্মার নয়, সকল আত্মার সমষ্টিই সগুণ ঈশ্বর। এই বিরাটের যে ইচ্ছা তাকে কোন শক্তিই রোধ করতে পারে না। শিব, কালী, ইত্যাদির অর্থই তাই।”

জগতের কতকগুলি শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য্যময় দৃশ্য আমার নিকট আরও সুন্দর বলিয়া বোধ হইয়াছে; তাহার কারণ—ঐসকল স্থানে আমি স্বামিজীর এইরূপ দীর্ঘ কথোপকথনসকল শ্রবণ করিবার সুযোগ-লাভ করিয়াছি।

যখন আমরা সিসিলি দ্বীপের নিকটবর্ত্তী হইলাম তখন সূর্য্যদেব সবেমাত্র অস্তমিত হইয়াছেন, পশ্চিম গগনে তপনের শেষ লোহিত আভা তখনও রহিয়াছে, এবং তাহারই সম্মুখে এটনা আগ্নেয়গিরি হইতে অল্প অল্প ধূম নির্গত হইতেছে। আমরা মেসিনা প্রণালীতে

প্রবেশ করিবামাত্র চন্দ্রোদয় হইল। আমি ডেকের উপর স্বামিজীর সঙ্গে পায়চারী করিয়া বেড়াইতেছি। তিনি বুঝাইতেছেন যে, সৌন্দর্য্য বাহিরের জিনিস নহে, উহা পূর্ব্ব হইতেই আমাদের মনের মধ্যে রহিয়াছে। একদিকে ইটালীর উপকূলের ধূসরবর্ণ পাহাড়গুলি যেন চোক রাঙ্গাইতেছিল, অন্যদিকে সিসিলি রজতকৌমুদীধারায় যেন হাসিতেছিল। স্বামিজী বলিলেন, "মেসিনাই আমাকে ধন্যবাদ দেবে, কারণ আমিই তাকে ঐ অতুল সৌন্দর্য্য দিয়েছি!"

তারপর তিনি বাল্যকালে তাঁহার মনে ভগবানলাভের জন্য যে তীব্র আকাঙ্ক্ষা জন্মিয়াছিল, তাহারই কথা বলিতে লাগিলেন। বলিলেন যে তিনি একাসনে বসিয়া কোন একটী মন্ত্র উদয়াস্ত জপ করিতেন। আমি তাঁহাকে তপস্যা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছিলাম। তাহারই উত্তরে তিনি তপস্যার কি অর্থ, তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছিলেন। তিনি পঞ্চতপা হওয়ার কথা বলিলেন। ইহা একটী প্রাচীন প্রথা। সাধক চারিপাশে চারিটী অগ্নি প্রজ্বলিত করেন, আর মাথার উপরে সূর্য্য অনল বর্ষণ করিতে থাকেন—এই অবস্থায় সাধক মন স্থির করিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসিয়া থাকেন। স্বামিজী এইসকল বলিয়া অবশেষে বলিলেন, "ভীষণের পূজা কর। মৃত্যুকে পূজা কর। আর যা কিছু সব বৃথা। চেষ্টা, সঙ্ঘর্ষ (struggle) সব বৃথা। এইটাই শেষ শিক্ষা। কিন্তু এ কাপুরুষের মৃত্যুকে ভালবাসা নয়, দুর্ব্বলের বা আত্মঘাতীর মৃত্যুকে ভালবাসা নয়। এ হল বলশালী ব্যক্তির মৃত্যুকে সাদর সম্ভাষণ—যে সকল জিনিস তন্ন তন্ন করে শেষ পর্য্যন্ত পরীক্ষা করে দেখেছে এবং জানে যে এ ছাড়া আর গত্যন্তর নেই।"

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

মহাপুরুষদর্শন-প্রসঙ্গে

স্বামিজী একদিন আমার সহিত, তিনি যেসকল মহাপুরুষ দর্শন করিয়াছেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। সম্ভবতঃ নাগ মহাশয়ের কথা লইয়াই ঐ প্রসঙ্গের অবতারণা হয়। নাগ মহাশয় এই সময়ের কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে (১৮৯৯ খৃঃ) স্বামিজীকে বেলুড় মঠে দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। স্বামিজী বহুবার বলিয়াছেন, "নাগ মহাশয় ঠাকুরের এক অসাধারণ কীর্ত্তি।" ভক্তির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে নাগ মহাশয়ের জ্বলন্ত বিশ্বাসের কথা স্বামিজী আমাদিগের নিকট বর্ণনা করিলেন এবং বলিলেন যে তিনি "এখনও ঈশ্বরকে ভালবাসতে পারলাম না, এ শরীরকে আবার কি আহার দেব?" —এই বলিয়া নিজের জন্ম ও ভাগ্যকে ধিক্কার দিয়া অন্নজল ত্যাগ করিয়াছিলেন। স্বামিজী আমাকে আরও বলিয়াছিলেন যে, নাগ মহাশয় একবার অতিথির জন্য রন্ধন করিবার কাঠের অভাবে নিজের ঘরের খুঁটী পর্য্যন্ত কাটিয়া ফেলিয়া তাহাই ইন্ধনরূপে ব্যবহার করিয়াছিলেন।

ইহার পরেই সম্ভবতঃ সেই যুবকের কথা উঠিয়াছিল, যাঁহাকে শ্রীরামকৃষ্ণ স্পর্শ করিয়া দিয়াছিলেন এবং যিনি তাহার পর শুধু 'প্রিয়ং' এই কথাটী ছাড়া অন্য কোন কথাই বলিতেন না। ঐ

ঘটনার পর তিনি দশ-বার বৎসরকাল বাঁচিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার মুখে অবিরত ভগবানকে ঐরূপে সম্বোধন ছাড়া কেহ অন্য কথা শুনিতে পায় নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণপদাশ্রিত সন্ন্যাসিগণ এমন অনেক লোকের কথা জানিতেন, যাঁহারা তাঁহাদের গুরুদেবের জীবদ্দশায় দক্ষিণেশ্বরে আগমন করিয়া তাঁহার কৃপাস্পর্শলাভে তৎক্ষণাৎ সমাধি-অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অনেক স্থলে কেবল এইরূপ ঘটনাগুলি ব্যতীত এই-সকল ব্যক্তির জীবনের আর কোন সন্ধানই কেহ জানিত না। একজন স্ত্রীলোক সম্বন্ধে একথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। ইনি গাড়ী করিয়া দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে আসিয়াছিলেন। ইঁহাকে দেখিবামাত্র শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন যে, ইঁহার বিদ্যাশক্তির অংশে জন্ম। তিনি ইঁহাকে জগন্মাতাজ্ঞানে ধূপধুনা ও পুষ্পচন্দনাদি দ্বারা পূজা করিবা-মাত্র ইনি গভীর সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। ইহাতেও হয়ত লোকে তত বিস্মিত হইত না, কিন্তু যখন তাঁহার ঐ সমাধি কিছুতেই ভাঙ্গে না, তখন সকলেই যারপরনাই চমৎকৃত হইলেন। দুই-তিন ঘণ্টা পরে তবে তাঁহার সমাধিভঙ্গ হয়। শুনা যায়, তখন তাঁহার সমগ্র ভাবভঙ্গী, লোকে কিছু পূর্ব্বে মাতাল হইয়া থাকিলে যেরূপ হয়, ঠিক সেইরূপ হইয়াছিল। ব্যাপারটী এইরূপে ভালয় ভালয় মিটিল দেখিয়া সকলেই বিশেষ আশ্বস্ত হইল। কারণ, সকলেই ভয় করিয়াছিল যে তাঁহার সমাধি আরও অধিকক্ষণ স্থায়ী হইতে পারে, এবং তাহা হইলে তাঁহার আত্মীয়স্বজনগণের (তাঁহারা যেখানেই থাকুন না কেন) চিন্তিত হইবার যথেষ্ট কারণ থাকিবে। তখন সকলে মিলিয়া ব্যবস্থা করিয়া তাঁহাকে কালীবাড়ী হইতে গৃহে

পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহার নাম কি, বা তাঁহার বাড়ী কোথায়, এ সম্বন্ধে একটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার কথা কাহারও মনে উদিত হয় নাই। তিনি আর কখনও তথায় আসেন নাই। সুলক্ষণা, সাধ্বী, পুত্রবৎসলা রমণীকে শ্রীরামকৃষ্ণ কিরূপে মাতৃজ্ঞানে পূজা করিতেন, তাহারই পরিচায়ক এক মনোহর উপাখ্যানের মত, তাঁহার স্মৃতি রামকৃষ্ণসঙ্ঘের নিকট চিরকাল সমাদৃত হইয়া রহিয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণ ত বলিয়াইছিলেন, এই রমণীর বিদ্যাশক্তির অংশে জন্ম!

আমি ধর্ম্মকর্ম্ম সম্বন্ধে একপ্রকার অজ্ঞ ছিলাম বলিয়াই আদ্যাশক্তির এই নামধামহীন সন্তানদিগের বিষয়ে আরও জানিবার জন্য আমার মন সাতিশয় ব্যগ্র হইত; তাঁহারা যে সুদূরবর্ত্তী নক্ষত্ররাজির ন্যায় নিজ নিজ কক্ষে বিদ্যমান থাকিয়াই দীপ্তি পাইবেন এবং আমাদের এই জগতের সহিত কোন সম্পর্কই রাখিবেন না, ইহাতে আমার মন কেমন করিত। তাঁহাদিগের জীবন অনিন্দ্যসুন্দর হইলেও, সেই দূর অতীতের একদিনের মহতী অনুভূতির কথা হয়ত বা তাঁহারা ভুলিয়া গিয়া থাকিবেন; হয়ত বা তাঁহাদের নিকটও আচার্য্যশ্রেষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাস্পর্শের কথা বহু অতীতের কোন ঘটনার মত বা স্বপ্নাবস্থায় শ্রুত কোন গল্পের মত স্মৃতিপট হইতে বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে—যেমন তাঁহাদিগের দক্ষিণেশ্বর আগমনের কথা যাঁহারা সেই সময়ে তথায় উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদিগের মন হইতে প্রায় মুছিয়া গিয়াছে; এইসকল কথা আমি জানিতে ইচ্ছা করিতাম। অর্থাৎ আমি সকল ব্যাপারেই পরস্পর কে কাহার উপর কতটা প্রভাব বিস্তার করিল, তাহা জানিতে চাহিতাম; সে সময়ে আমার ইহা মোটেই ধারণা হয় নাই যে, এবংবিধ ঘটনাসকল হিন্দুগণের নিকট দৈনন্দিন ব্যাপার—

হিন্দুমাত্রই এসকল কথা অনায়াসে বুঝিতে পারে। কিন্তু স্বামিজী আমার মনের এইরূপ আধ-আলো আধ-অন্ধকার অবস্থার কথা বুঝিতে পারেন নাই। তিনি বলিলেন, "শ্রীরামকৃষ্ণ যে কৃপা করে কাকেও স্পর্শ করে দিয়েছেন, এ কি তামাসার কথা? এরকম ক্ষণকালের স্পর্শেই এসকল নরনারী যে তৎক্ষণাৎ নূতন জীবন লাভ করেছে—একথা কি আবার বলে বুঝাতে হবে?" এই কথা বলিয়াই তিনি এক এক করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের বিভিন্ন শিষ্যের জীবনের ঘটনা-সমূহ বলিতে লাগিলেন। বলিলেন, একজন ক্রমাগত তাঁহার নিকট আসা-যাওয়া করিত এবং সত্যবস্তু-ধারণার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিত। কিছুদিন এইরূপ হইবার পর একদিন ঠাকুর হঠাৎ তাহাকে বলিলেন, "এখন যাও, গিয়ে কিছু টাকা উপার্জ্জন কর, তারপর আবার এস!" ফলে সে ব্যক্তি আজ জগতে বেশ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছে, কিন্তু ঠাকুরের প্রতি তাহার সেই ভালবাসা এখনও তেমনই উজ্জ্বল রহিয়াছে। এই ঘটনার বর্ণনকালে স্বামিজী এই ব্যক্তির বা অপর কাহারও কি দোষ ছিল না ছিল, তাহার বিন্দুমাত্র উল্লেখ করিতেন না। ইঁহাদের প্রত্যেকের জীবনের যেটুকু সৎসাহস ও মহত্ত্বের পরিচায়ক, তাঁহার বর্ণনায় শ্রোতৃবর্গের নিকট শুধু সেই-টুকুই ফুটিয়া উঠিত। সকল লোকই জোর করিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করিবে কেন? শুধু তাহাই নহে, লোকের অপরবিধ কর্ম্মগুলি সমাপ্ত না হইলে তাহার সন্ন্যাসগ্রহণ করা সম্ভবই নয়। কিন্তু শেষে তাহার কোন ভুল হইবে না। তখন সে প্রকৃত কর্ম্মত্যাগের অধিকারী হইবে।

মহাপুরুষগণ সম্বন্ধেও স্বামিজী অতি আগ্রহের সহিত আমাদিগকে

নানা কথা শুনাইতেন। যখন যাঁহার কথা কহিতেন তখন এমন প্রাণ-ঢালিয়া ঐরূপ করিতেন যে শ্রোতৃবর্গের সে সময়ে মনে হইত বুঝি ইঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ আর কেহ নাই। পওহারী বাবা সম্বন্ধে তিনি সব কথা এত খুঁটাইয়া বলিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন যে, তাহার পর আর তদ্বিষয়ে কোন অনির্দ্দিষ্ট প্রশ্ন করাই ভদ্রতাবিরুদ্ধ বলিয়া মনে হইতেছিল। সেই মহাত্মার দেহত্যাগকালে যাঁহারা স্বামিজীর নিকট ছিলেন, তাঁহারা জানিতেন যে তিনি পওহারী বাবাকে শ্রীরামকৃষ্ণের নিম্নেই আসন প্রদান করিতেন; তাঁহারা আরও জানিতেন যে, পওহারী বাবার ভালবাসাকে স্বামিজী যত মূল্যবান জ্ঞান করিতেন, এমন আর কোন কিছুকে নহে।

তারপর একঘণ্টা কাল ধরিয়া তিনি আরও যে দুই-এক জন মহাপুরুষ দেখিয়াছিলেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে গল্প করিতে লাগিলেন। ত্রৈলঙ্গ স্বামীকে যখন তিনি দেখেন তখন তিনি অত্যন্ত বৃদ্ধ হইয়াছেন —দেখিলে একশত বৎসরের অধিক বয়স বলিয়া বোধ হয়। তিনি মৌনী ছিলেন। কাশীতে এক শিবমন্দিরে পড়িয়া থাকিতেন— শিবলিঙ্গের উপর পা দিয়াই শুইয়া আছেন! হঠাৎ দেখিলে পাগল বলিয়া ভ্রম হইত। কিন্তু দর্শকগণের কাহারও কোন প্রশ্ন থাকিলে তাঁহারা তাহা লিখিয়া তাঁহাকে দেখাইতেন। তাহাতে তিনি কোন আপত্তি করিতেন না, এবং খেয়াল হইলে এক-আধটীর উত্তর সংস্কৃতে লিখিয়া দিতেন। ইনি কিছুদিন পূর্ব্বে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন।

স্বামিজী যখন রঘুনাথ দাসের আশ্রমে উপস্থিত হন তখন ঐ মহাপুরুষ দুইমাস হইল দেহরক্ষা করিয়াছেন। তিনি পূর্ব্বে

ইংরেজরাজের সৈনিক বিভাগে কার্য করিতেন এবং শিবির-রক্ষক প্রহরীর কার্য্যে সৎ ও বিশ্বাসী লোক বলিয়া তিনি উপরিতন কর্ম্মচারিগণের বিশেষ স্নেহভাজন হইয়াছিলেন। এইরূপে দিন যায়, এমন সময়ে একদিন রাত্রে তিনি দেখিতে পাইলেন, একদল লোক রামনামসঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে চলিয়াছে। তিনি নিজ কর্ত্তব্য পালন করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেন, কিন্তু "বোল রাজা রামচন্দ্রকী জয়!"—এই কথা শুনিবামাত্র তিনি উন্মত্তপ্রায় হইলেন। অস্ত্রশস্ত্র ও সৈনিকের বেশভূষা ছুড়িয়া ফেলিয়া তিনি সঙ্কীর্ত্তনে যোগদান করিলেন।

কিছুকাল এইরূপে চলিতে লাগিল, অবশেষে কর্ণেল সাহেবের নিকট তাঁহার নামে অভিযোগ উপস্থিত হইল। কর্ণেল রঘুনাথ দাসকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এসকল খবর সত্য কি, এবং এর কি শাস্তি তা জান কি?"

রঘুনাথ উত্তর দিলেন, "হাঁ, জানি। বন্দুকের গুলিতে আমার প্রাণ যাবে।"

কর্ণেল বলিলেন, "দেখ, এবারের মত তোমায় ক্ষমা করলাম। যাও, আমি এ কথা কাকেও বলব না। কিন্তু যদি আবার এরকম কর, তবে তোমার শাস্তি অনিবার্য্য।"

সেই রাত্রেই আবার সেই রামনামসঙ্কীর্ত্তনের দল প্রহরী রঘুনাথের নয়নগোচর হইল। তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সে আকর্ষণ সামলাইতে পারিলেন না। অবশেষে সব ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া তিনি সমস্ত রাত্রি সেই সঙ্কীর্ত্তনদলের সহিত অতিবাহিত করিলেন।

এদিকে কর্ণেলের রঘুনাথ দাসের উপর এমন বিশ্বাস যে, তিনি

তাঁহাকে নিজ মুখে অপরাধ স্বীকার করিতে শুনিয়াও তাহা যেন বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। ব্যাপারটী স্বচক্ষে দেখিবার জন্য তিনি রাত্রিযোগে শিবিরসন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন রঘুনাথ দাস নিজস্থানে দণ্ডায়মান আছেন এবং তাঁহার সহিত তিনবার সঙ্কেতবাক্য আদানপ্রদান করিলেন। তখন কর্ণেল নিশ্চিন্ত হইয়া নিজ আবাসে ফিরিয়া আসিলেন এবং নিদ্রা যাইলেন।

প্রাতঃকালে রঘুনাথ দাস নিজের অপরাধ জ্ঞাপন করিবার জন্য আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং অস্ত্রশস্ত্র সমর্পণ করিয়া দণ্ডগ্রহণের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। কর্ণেল তাঁহার সেসকল কথা শুনিলেন না এবং নিজে যাহা দেখিয়া ও শুনিয়া আসিয়াছেন তাহাই বর্ণনা করিলেন।

বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া রঘুনাথ কোনপ্রকারে চাকরী হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য জিদ করিতে লাগিলেন। এ যে প্রভু রামচন্দ্র তাঁহার ভৃত্যের জন্য এইরূপ করিয়াছেন! এখন হইতে তিনি আর কাহারও দাসত্ব করিবেন না, প্রতিজ্ঞা করিলেন।

স্বামিজী বলিলেন, "তিনি সরস্বতী নদীর তীরে বৈরাগী সাধুর জীবন যাপন করতে লাগলেন। লোকে তাঁকে অজ্ঞ মনে করত, কিন্তু আমি তাঁর ক্ষমতা জানতাম। তিনি প্রত্যহ হাজার হাজার লোককে খাওয়াতেন। কিছুদিন পরে হয়ত গমওয়ালা এসে তার প্রাপ্য চাইত। রঘুনাথ দাস বলতেন, 'হুঁ, কত, হাজার টাকা? দাঁড়াও, দেখি। কই, মাস খানেকের ভেতর ত কিছু টাকাকড়ি পাই নি। এ টাকাটা কাল আসবে মনে হয়।' টাকা ঠিক সেই দিনই আসত—তার একটুও অন্যথা হত না।"

একজন রঘুনাথ দাসকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, এই রামনাম সঙ্কীর্ত্তনদলের গল্পটী সত্য কি-না।

তদুত্তরে তিনি বলিলেন, "এসকল খবর জেনে লাভ কি?"

প্রশ্নকর্ত্তা বলিলেন, "আমি কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করছি না। আমি শুধু জানতে চাই এসকল ব্যাপার ঘটা সম্ভব কি-না।"

রঘুনাথ দাস উত্তরে বলিলেন, "ভগবানের ইচ্ছায় সকলি সম্ভব।" . . .

স্বামিজী তৎপরে বলিতে লাগিলেন, "আমি হৃষীকেশে অনেক মহাপুরুষ দেখেছি। একজনের কথা আমার মনে আছে। তাঁকে দেখে পাগল বলে বোধ হয়েছিল। তিনি উলঙ্গ হয়ে রাস্তা দিয়ে আসছিলেন, আর কতকগুলো ছেলে তাঁর পিছু পিছু পাথর ছুড়তে ছুড়তে আসছিল। তাঁর মুখ ও ঘাড় থেকে দরদর ক'রে রক্ত পড়ছে, তবুও তিনি হেসে কুটিকুটি হচ্ছেন। আমি তাঁকে এনে ক্ষতগুলি ধুয়ে দিলুম এবং রক্তপাত বন্ধ করবার জন্য নেকড়া পুড়িয়ে সেখানে লাগিয়ে দিলুম। যতক্ষণ আমি এসকল কাজে ব্যস্ত ছিলুম, তিনি উচ্চ হাস্য করতে করতে ছেলেদের পাথর ছোড়াছুড়ি নিয়ে তিনি কি অপূর্ব্ব আনন্দ উপভোগ করছিলেন, তাই আমাকে বলছিলেন। বললেন, 'জগৎপিতা এভাবেই খেলা করে থাকেন।'

"এঁদের মধ্যে অনেকে লোকসঙ্গ থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যে লুকিয়ে থাকেন; লোকজন তাঁদের কাছে উৎপাতের হেতুমাত্র। একজন তাঁর গুহার চতুর্দ্দিকে মানুষের হাড় ছড়িয়ে রেখেছিলেন এবং লোকের নিকট রটিয়ে দিয়েছিলেন যে তিনি শবমাংসভোজী।

আর একজন পাথর ছুড়তেন। তাঁরা এরকম নানা উপায় অবলম্বন করে থাকেন। . . .

"কখনও কখনও তাঁদের হঠাৎ চৈতন্যোদয় হয়। একটা ঘটনা বলছি। একটী ছোকরা অভেদানন্দের কাছে উপনিষদ্ পড়তে আসত। একদিন সে জিজ্ঞেস করল, 'মশায়, এসব কি বাস্তবিকই সত্য ?'

"অভেদানন্দ বললেন, 'নিশ্চয়ই! এসকল অবস্থা লাভ করা শক্ত হতে পারে, কিন্তু এসব নিশ্চয়ই সত্য!'

"পরদিনই সেই বালক নগ্ন সন্ন্যাসীর বেশে মৌনব্রত অবলম্বন করে কেদারনাথদর্শনে যাত্রা করল!

"তাঁর কি হ'ল, জিজ্ঞেস করছ ? সে মৌনী হয়ে গেল!

"কিন্তু সন্ন্যাসীদের আর পূজা, তীর্থযাত্রা বা তপস্যাদি করতে হয় না। তবে কেন তাঁরা তীর্থ থেকে তীর্থান্তরে দেবদর্শনাদি করে বেড়ান এবং নানারকম কঠোর তপশ্চরণ করেন ? তাঁরা এভাবে পুণ্য অর্জ্জন করে সেই পুণ্য জগৎকে দান করেন।"

তারপর হয়ত শিবিরানার গল্প হইল। বর্ণনান্তে স্বামিজী বলিলেন, "এইসব গল্পই আমাদের জাতির হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশ অধিকার করে রয়েছে। কখনও ভুলো না যে, সন্ন্যাসী দুটী ব্রত গ্রহণ করেন। একটী সত্যোপলব্ধি, অপরটী জগতের হিত—'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায়চ।' আর তাঁর সব চেয়ে কঠোরভাবে পালনীয় ব্রত এই যে, তিনি স্বর্গাদি কামনা একেবারে বর্জ্জন করবেন।"

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

ভারতের অতীত ও ভবিষ্যৎ

যদি গুরুর সহিত ভূ-প্রদক্ষিণও করা যায়, তাহা হইলে উহাই তীর্থযাত্রা হইয়া দাঁড়ায়। একদিন লোহিতসাগরে সন্ধ্যার কিছু পরে আমি স্বামিজীর নিকট একটী ব্যক্তিগত সমস্যা লইয়া উপস্থিত হইলাম। অপরকে সাহায্য করিবার প্রকৃত উপায় কি, ইহাই প্রশ্ন ছিল। এই প্রকারের প্রশ্নগুলির উত্তর তিনি প্রায়ই কোন শাস্ত্রোক্তি-অবলম্বনে দিতেন। এইরূপ করার জন্য তাঁহার নিকট আমরা পরে আপনাদিগকে কতই না কৃতজ্ঞ বোধ করিয়াছি! আমরা তাঁহার নিজের মত কি তাহাই জানিতে চাহিতাম; কিন্তু তিনি কোন শাস্ত্রবাক্যের ব্যাখ্যাস্বরূপে ঐ মত প্রকাশ করায় উহা আমাদের মনে দৃঢ়াঙ্কিত হইয়া যাইত, এবং অসহিষ্ণু প্রশ্নকর্ত্তার অভিপ্রায়মত তিনি তৎক্ষণাৎ একটা কিছু জবাব দিয়া দিলে যেরূপ হইত, তদপেক্ষা অনেক অধিক দিন ধরিয়া আমরা ঐ বিষয়ে চিন্তা ও আলোচনা করিতে পারিতাম।

ঐরূপে একদিন আমি তাঁহাকে যাহারা কোন ব্রত গ্রহণ করিয়া তাহাতে সিদ্ধিলাভ করিতে না পারে, তাহাদিগের কি গতি হয়, তদ্বিষয়ে প্রশ্ন করিলে, তিনি সোজাসুজি উত্তর না দিয়া কয়েকটী সুন্দর সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া উহার উত্তর দিলেন। এখনও

তাঁহার সেই অপূর্ব্ব কণ্ঠস্বর আমার কানে বাজিতেছে। তিনি অর্জ্জুনের প্রশ্নটী আবৃত্তি করিলেন—

"অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতো যোগাচ্চলিতমানসঃ।
অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি॥
কচ্চিন্নোভয়বিভ্রষ্টশ্ছিন্নাভ্রমিব নশ্যতি।
অপ্রতিষ্ঠো মহাবাহো বিমূঢ়ো ব্রহ্মণঃ পথি॥" —গীতা ৬।৩৭, ৩৮

—অর্থাৎ হে কৃষ্ণ, যেসকল ব্যক্তি শ্রদ্ধার সহিত কোন যোগ অভ্যাস করিতে আরম্ভ করিয়া উহাতে সিদ্ধিলাভ করিতে না পারে, তাহাদের গতি কি হয়? হে মহাবাহো, ব্রহ্মমার্গে অবস্থান করিতে না পারিয়া তাহারা কি একূল ওকূল দুকূল হারাইয়া বায়ুতাড়িত মেঘের ন্যায় খণ্ড খণ্ড হইয়া বিনাশপ্রাপ্ত হয়?

পরক্ষণেই তিনি শ্রীকৃষ্ণের নির্ভীক সগর্ব্ব উত্তর আবৃত্তি করিলেন—

"পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে।
ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্দুর্গতিং তাত গচ্ছতি॥" —গীতা, ৬।৪০

অর্থাৎ—হে পার্থ, ইহলোকে বা পরলোকে তাহাদের কদাপি বিনাশ নাই। হে তাত, যে ব্যক্তি কোন কল্যাণকর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহার কোনকালে দুর্গতি হয় না।

তারপর তিনি প্রসঙ্গক্রমে এমন একটী কথোপকথন আরম্ভ করিলেন যাহা আমি জীবনে কখনও ভুলিব না। প্রথমে তিনি বুঝাইয়া দিলেন যে, শরীর, মন ও বাক্যের সম্পূর্ণ সংযমই একমাত্র প্রকৃত কাজ, তদ্ভিন্ন যাহা-কিছু সব ইন্দ্রিয়-সেবা মাত্র। তৎপরে বলিলেন যে, সিদ্ধিলাভে অসমর্থ সাধক কখনও কখনও রাজপুত্র হইয়া

জন্মগ্রহণ করে এবং ঐ জন্মে, যে বাসনায় তাহার পতন ঘটিয়াছে, সেই বাসনাটীকে চরিতার্থ করে। স্বামিজী আরও বলিলেন, "অনেক সময় দেখা যায় যে, রাজাদের মনের মধ্যে পূর্ব্বজন্মের সাধুজীবনের একটা অস্পষ্ট স্মৃতি বর্ত্তমান থাকে। পূর্ব্বজন্মের এরূপ একটা অস্পষ্ট স্মৃতি থাকা মহত্ত্বের একটী লক্ষণ বলে গণ্য হয়ে থাকে। আকবরের এই স্মৃতি ছিল। তিনি মনে করতেন যে, তিনি পূর্ব্বজন্মে ব্রহ্মচারী ছিলেন, কোনও কারণে তাঁর পতন হয়েছে; কিন্তু তিনি আরও অনুকূল অবস্থার মধ্যে আবার জন্মাবেন এবং সেই বারে সিদ্ধিলাভ করবেন।" এইসকল কথা বলিয়া স্বামিজী নিজ জীবনের কিছু কিছু ঘটনা আমাদের বলিলেন। এরূপ তিনি কদাচিৎই করিতেন। পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি সম্বন্ধে কথা কহিতে কহিতে তিনি অন্যমনে ক্ষণকালের জন্য নিজ অতীত জীবনের আবরণ কিঞ্চিৎ উন্মোচন করিয়া ফেলিলেন: হঠাৎ আমার দিকে ফিরিয়া এবং আমাকে নাম ধরিয়া ডাকিয়া বলিলেন, "তুমি যাই ভাব না কেন, আমারও এরকম একটা স্মৃতি আছে! যখন আমার বয়স দু বৎসর, তখন আমি আমাদের সহিসের সঙ্গে ছাইমাখা, কৌপীনপরা বৈরাগী সেজে খেলা করতাম। আর যদি কোন সাধু ভিক্ষা করতে আসত, তাহলে বাড়ীর লোকে আমাকে ওপরতলায় দোর বন্ধ করে রাখত, পাছে আমি তাকে খুব বেশী দিয়ে ফেলি। আমি প্রাণে প্রাণে অনুভব করতাম যে, আমিও কখনও সাধু ছিলাম, কোন অপরাধবশতঃ শিবের কাছ থেকে বিতাড়িত হয়েছি। অবশ্য আমার বাড়ীর লোকেরা এই ভাবটাকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল, কারণ যখন আমি দুষ্টুমি করতাম, তখন তারা বলত, 'হায়, হায়! এত জপতপ করে কোথায়

এক পুণ্যাত্মাকে পুত্ররূপে লাভ করব, তা নয় শেষে শিব কিনা এই ভূতটা আমাদের পাঠিয়ে দিয়েছেন।' অথবা আমি অত্যন্ত দুরন্তপনা করলে তারা আমার মাথার উপর 'শিব! শিব!' বলতে বলতে এক বাল্‌তি জল ঢেলে দিত। আর আমিও তৎক্ষণাৎ শান্ত হয়ে যেতুম—কখনও এর অন্যথা হত না। এখন পর্য্যন্ত যখন আমার মনে কোন দুষ্টবুদ্ধি জাগে, ঐ কথা আমার মনে পড়ে যায়, অমনি আমি শান্ত হয়ে যাই। মনে মনে বলি, 'না, না, এবার আর নয়!'"

যাহা হউক, বর্ত্তমান ক্ষেত্রেও স্বামিজী তাঁহার প্রথামত গীতার মতটী উদ্ধৃত করিলেন। তিনি আমাকে বলিলেন, "তিন রকমের দান আছে—তামসিক, রাজসিক ও সাত্ত্বিক। তামসিক দান—যা লোকে শুধু ঝোঁকের মাথায় করে। এতে ভ্রমপ্রমাদ হয়েই থাকে। দাতা নিজের দান করবার ঝোঁক ছাড়া আর কিছুই চিন্তা করেন না। রাজসিক দান—যা লোকে নিজের নাম-যশের জন্য করে। আর সাত্ত্বিক দান—যা দেশ-কাল-পাত্র বিচার করে দেওয়া হয়।" তৎপরে আমার প্রশ্নটী যে ঘটনাপ্রসূত, সেই ঘটনাটীর উল্লেখ করিয়া তিনি বলিলেন, "আমার মনে হয়, তোমার দানটা তামসিক রকমেরই হয়েছে। সাত্ত্বিক দানের কথা ভাবতে গেলে আমার একজন মহানুভবা পাশ্চাত্ত্য রমণীর কথা দিন দিন দৃঢ়ভাবে মনের মধ্যে উদিত হয়; দেখেছি তাঁরই দানে কোন আড়ম্বর নেই, দেশ-কাল-পাত্রের যথেষ্ট বিচার আছে এবং কোন ভ্রম-প্রমাদও নেই। আমার নিজের কথা বলতে গেলে, আমি দিন দিন শিক্ষা করছি যে, দানেরও একটা নির্দ্দিষ্ট মাত্রা থাকা চাই, নতুবা ওতে বিপরীত ফল হয়।"

তাঁহার কণ্ঠস্বর ক্রমে মৃদু হইতে মৃদুতর হইয়া অবশেষে একেবারে মিলাইয়া গেল। আমরা নক্ষত্রালোকদীপ্ত সমুদ্রের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিলাম। তারপর তিনি আবার বলিতে লাগিলেন, "যত বয়স বাড়ছে, ততই আমি দেখছি যে, আমি ছোট ছোট কাজে মহত্ত্বের বিকাশ দেখতে চাই। বড় লোকদের সম্বন্ধে আমি জানতে চাই, তারা কি খায়, কি পরে, চাকর-বাকরদের সঙ্গে কিরকম কথা কয়—এইসব। আমি দেখতে চাই, স্যার ফিলিপ সিড্‌নীর মত ছোট-খাট কাজে মহত্ত্বের নিদর্শন! মৃত্যুক্ষণেও পরের তৃষ্ণানিবারণের কথা যাঁদের মনে আসে, এরকম লোক অতি বিরল।

"কিন্তু উচ্চপদে আরূঢ় হলে যে-কোন লোক মহতের ন্যায় আচরণ করতে পারে। থিয়েটারে ফুটলাইটের আলোয় অতি বড় ভীরুও সাহসী হয়ে ওঠে—জগৎশুদ্ধ লোক যে চেয়ে আছে! তখন কার না হৃদয় নেচে উঠবে, কার না শিরায় রক্তস্রোত দ্রুততর বইতে থাকবে? তখন কেউ কি তার সম্পূর্ণ শক্তির বিকাশ না করে থাকতে পারে?

"নগণ্য কীটের মত কাজ করে যাওয়াই দিন দিন আমার কাছে প্রকৃত মহত্ত্ব বলে বোধ হয়। পোকা যেমন নীরবে অবিচলিত-ভাবে, পলের পর পল, ঘণ্টার পর ঘণ্টা অবিশ্রান্ত কর্ত্তব্য কাজ করে যায়, সেইরকম করা।"

স্বামিজীর অপূর্ব্ব কথোপকথনের স্মৃতিবিজড়িত থাকায় মান-চিত্রের কত স্থানই না আমার নিকট এক নূতন সৌন্দর্য্যে শোভমান বলিয়া বোধ হইয়াছে! ইটালীর উপকূল অতিক্রম করিবার সময় আমরা বিবিধ খৃষ্টীয় ধর্ম্মমত সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। বণিফেসিও

প্রণালীর মধ্য দিয়া যাইতে যাইতে যখন কর্সিকাদ্বীপের দক্ষিণ উপকূল আমাদের নয়নগোচর হইতেছিল, স্বামিজী সসম্ভ্রমে অতি মৃদুস্বরে 'সেই সংগ্রামদেবতার জন্মভূমি' সম্বন্ধে কত কথা বলিতে লাগিলেন, এবং ক্রমশঃ ফরাসীদেশের কথার অবতারণা করিয়া রোবস্‌পিয়ারের ক্ষমতা সম্বন্ধে, অথবা তৃতীয় নেপোলিয়নের প্রতি ভিক্টর হিউগোর ঘৃণা ও তদ্ব্যঞ্জক 'তুমিও নেপোলিয়ন!' বাক্য প্রভৃতি সম্বন্ধে বর্ণনা করিতে লাগিলেন।

জিব্রাল্‌টার প্রণালীর মধ্য দিয়া যাইবার সময়, আমি প্রাতঃকালে ডেকের উপর আসিতেই তিনি আমাকে এই বলিয়া সাগ্রহে সম্ভাষণ করিলেন, "তুমি তাদের দেখেছ কি? তাদের দেখেছ কি? ওখানে জাহাজ থেকে নামছে, আর 'দীন! দীন!' রবে গগন ফাটাচ্ছে!" এই বলিয়া অর্দ্ধঘণ্টা ধরিয়া তিনি মুরদিগের বারংবার স্পেন-আক্রমণের জ্বলন্ত বর্ণনা দ্বারা আমাকে একেবারে অভিভূত করিয়া ফেলিলেন। আবার হয়ত কোন রবিবারের সন্ধ্যায় তিনি অনেকক্ষণ ধরিয়া বুদ্ধদেবের গল্প করিতেন। বুদ্ধ-জীবনের সাধারণ ইতিহাস-বর্ণিত নীরস ঘটনাগুলি তাঁহার মুখে যেন নবভাবে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিত। ভগবান বুদ্ধের নিকট মহাভিনিষ্ক্রমণ-ব্যাপারটী যেরূপ বোধ হইয়াছিল, স্বামিজী সেইভাবেই ঐ ঘটনাটীকে বর্ণনা করিতেন।

কিন্তু তাঁহার সকল কথোপকথনই যে চিত্তবিনোদন করিত বা শিক্ষাসংক্রান্ত হইত, এমন নহে। মাঝে মাঝে তিনি প্রায়ই জ্বলন্ত উৎসাহের সহিত তাঁহার জীবনের মহান উদ্দেশ্যের বর্ণনা করিতেন। আর যখনই তিনি এইরূপ করিতেন, তখনই আমি অতি মনোযোগ

সহকারে উহা শ্রবণ করিতাম—তাঁহার শ্রীমুখের প্রতি কথাটী যাহাতে আমি সংগ্রহ করিয়া রাখিতে পারি, ইহাই আমার ঐকান্তিক চেষ্টা ছিল। কারণ, আমি জানিতাম যে, আমি এস্থলে, তিনি এবং তাঁহার যে অসংখ্য অন্তরঙ্গ ভক্ত ভবিষ্যতে জন্মগ্রহণ করিয়া তাঁহার স্বপ্নগুলি কার্য্যে পরিণত করিবেন, এতদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী বার্ত্তাবাহী যন্ত্র (transmitter) বা সেতুস্বরূপ ছিলাম।

আমরা যখন এডেনের কাছাকাছি পৌঁছিয়াছি, সেই সময়ে এইরূপ একটী সুযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। সেদিন প্রাতঃকালে আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "ভারতের কল্যাণের জন্য আপনি যেসকল উপায় নির্দ্ধারণ করেছেন, এবং অপরে তৎসম্বন্ধে যেসকল উপায় নির্দ্দেশ করে, এ দু-এর মধ্যে মোটামুটি কি কি বিষয়ে পার্থক্য আছে বলে আপনি মনে করেন?" দেখিলাম এ বিষয়ে তাঁহার মনের কথা টানিয়া বাহির করা অসম্ভব। ববং তিনি অন্যমতাবলম্বী নেতাদের কাহারও কাহারও চরিত্রের এবং কার্য্যপ্রণালীর প্রশংসাই করিলেন। আমিও ঐ প্রশ্নটা চুকিয়া গেল মনে করিলাম। হঠাৎ সন্ধ্যার সময় তিনি আপনা হইতেই বিষয়টীর পুনরুত্থাপন করিলেন।

তিনি বলিলেন, "যেসব লোক তাদের নিজ নিজ কুসংস্কার-গুলোকে আমার দেশবাসীদের মধ্যে ঢুকিয়ে দিচ্ছে, আমি তাদের কারও সঙ্গে একমত নই। যারা মিসরদেশের পুরাতত্ত্ব-আলোচনায় ব্যস্ত থাকে, তাদের যেমন ঐ দেশের প্রতি একটা স্বার্থজড়িত অনুরাগ থাকে, তেমনি কারও কারও ভারতের প্রতিও এমন একটা অনুরাগ থাকতে পারে, যার সবটাই স্বার্থজড়িত। এরকম

অনুরাগলাভ শক্ত কথা নয়! লোকের স্বতঃই ইচ্ছা হতে পারে যে, নানা বইয়ে, পড়াশুনায় এবং কল্পনারাজ্যে, যে ভারতের চিত্র তার মনের মধ্যে রয়েছে, সেই অতীতযুগের ভারতকেই সে আবার প্রত্যক্ষ দেখতে পায়। আমার ইচ্ছা, সেই প্রাচীন ভারতের যেসকল সদ্‌গুণ, সেগুলো ফের বেঁচে উঠুক, এবং সেইসঙ্গে বর্ত্তমানযুগের যেসকল ভাল জিনিস, তা-ও থাকুক; কেবল এই মিশ্রণব্যাপারটী বেশ স্বাভাবিকভাবে সম্পন্ন হওয়া চাই। নূতন ভারতকে আপনা আপনি ধীরভাবে গড়ে উঠতে হবে—বাইরের কোন শক্তির সাহায্যে নয়।

"সেজন্য আমি শুধু উপনিষদ্‌ই প্রচার করি। ভাল করে দেখলে দেখতে পাবে, আমি উপনিষদ্ ছাড়া অন্য কিছু থেকে প্রমাণ প্রয়োগ করি নি। আবার উপনিষদের মধ্য থেকেও একমাত্র বলের—শক্তির—ভাবটুকুই গ্রহণ করেছি। ঐ একটীমাত্র শব্দে বেদ-বেদান্ত প্রভৃতি সকল শাস্ত্রের সার নিহিত। বুদ্ধ অহিংসা প্রচার করেছিলেন। কিন্তু আমার মনে হয়, 'শক্তি' কথাটা দ্বারা ঐ ভাবটীই আরও উত্তমরূপে প্রকাশ পায়; কারণ ঐ অহিংসার পেছনে একটা মারাত্মক দুর্ব্বলতা রয়েছে। দুর্ব্বলতা হতেই হিংসার ভাব—বাধা দেওয়ার ভাব—আসে। একবিন্দু সাগরজল ছিটকাইয়া গায়ে লাগলে আমি তাতে ভয় পেয়ে পালিয়েও যাই না, বা তাকে শাস্তি দেবার কথাও মনে আসে না। আমি ওকে গ্রাহ্যই করি না, কিন্তু মশার কাছে ঐটুকুই বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়ায়। আমি চাই, যে যতই শত্রুতা দেখাক না কেন, আমরা সব তুচ্ছ জ্ঞান করব। বল ও নির্ভীকতা! আমার নিজের আদর্শ সেই অদ্ভুতকর্ম্মা সাধু, যাঁকে

সিপাহী-বিদ্রোহের সময় সৈন্যেরা মেরে ফেলে, কিন্তু যিনি মর্ম্মান্তিক ছুরিকাঘাত পেয়েও চিরাভ্যস্ত মৌন ভঙ্গ করে শুধু এই বলেছিলেন, 'তবু তুমিও সেই—তত্ত্বমসি !'

"জিজ্ঞেস করতে পার—এই প্রাচীন-আধুনিকের সম্মিলন-ব্যাপারে শ্রীরামকৃষ্ণের স্থান কোথায় ?

"তিনিই ওর পন্থাস্বরূপ—সেই অদ্ভুত, অহংজ্ঞানরহিত পন্থা ! তিনি নিজেকেই নিজে জানতেন না। তিনি ইংলণ্ড বা ইংরেজদের সম্বন্ধে শুধু এইটুকু জানতেন যে, তারা এক অদ্ভুত রকমের লোক—দূরে, মহাসমুদ্রের ওপারে বাস করে। কিন্তু তিনি সেই অসাধারণ জীবন যাপন করে গেছেন—আমি তার ব্যাখ্যাকার মাত্র। তিনি কখনও কারও নিন্দা করতেন না। একবার আমি আমাদের দেশের বীভৎস-আচারবিশিষ্ট কোন সম্প্রদায়ের তীব্র সমালোচনা করছিলাম। তিন ঘণ্টা আমি বকে চলেছি, আর তিনিও চুপ করে শুনছেন। আমার কথা সব শেষ হলে তিনি শুধু বললেন, 'হাঁ, সব বাড়ীরই একটা করে মেথর ঢুকবার দুয়ার থাকে ! এও সেই-রকম আর কি !'

"এতদিন আমাদের দেশের ধর্ম্মের মহাদোষ কি ছিল জান ? সে ধর্ম্ম মাত্র দুটী কথা জানত—ত্যাগ ও মুক্তি। এ জগতে শুধু কি মুক্তিই দরকার ? গৃহস্থদের জন্ম কিছুই চাই না ?

"কিন্তু এই সকল লোককেই আমি বিশেষকরে সাহায্য করতে চাই। সব আত্মাই স্বরূপতঃ এক নয় কি ? সকলেরই গম্যস্থান এক নয় কি ?

"শিক্ষার ভেতর দিয়ে এ জাতির মধ্যে বল সঞ্চারিত হবে—এইটীই উপায়।"

আমার সে সময় মনে হইল, এবং পরেও যত ভাবিয়াছি ততই অধিকতর মনে হইয়াছে যে, আচার্যদেবের শ্রীমুখ হইতে এই একটী মাত্র কথোপকথন শুনিবার জন্য সমস্ত সাগরপথ অতিক্রম করাও সার্থক।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

হিন্দুধর্ম্ম

স্বামিজী সর্ব্বদাই হিন্দুধর্ম্মকে এক অখণ্ড ধর্ম্মরূপে চিন্তা করিতেন, এবং যখনই বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রসঙ্গ উঠিত, তখনই এই বিষয়টী সকলেই লক্ষ্য করিতেন। সন্ন্যাসী হিসাবে তাঁহার নিজের কল্পনারাজ্যে হয়ত শৈবধর্ম্মের ভাবসমূহই সমধিক আধিপত্য বিস্তার করিত। কিন্তু বৈষ্ণবধর্ম্মে তাঁহার চিরকাল অনুরাগ ছিল, এবং উহাকে বিশ্লেষণ করিতে তিনি কখনও বিরত হইতেন না। তাঁহার নিজের অভিজ্ঞতা ছিল অদ্বৈতবাদের সত্যতা বিষয়ে। তিনি দুই আকারে ইহাকে প্রচার করিতে প্রয়াস পাইতেন—একটী সন্ন্যাসাদর্শ, অপরটী ভীষণের পূজা। কিন্তু এ সত্যলাভ ত শুধু বীরের পক্ষেই সম্ভব। ইহার দ্বারা একদল যোদ্ধা গঠন করা যাইতে পারে। জগতের অধিকাংশ লোকই ঈশ্বরকে দয়াবান, রক্ষাকর্ত্তা, পালনকর্ত্তা বলিয়াই সর্ব্বদা চিন্তা করিবে। এইপ্রকারের বিশ্বাস এবং সর্ব্বোচ্চ অদ্বৈতদর্শন—এতদুভয়ের মধ্যে একটী সম্বন্ধ আছে বলিয়া সাধারণে বিশ্বাস করিয়া থাকে। কিরূপে ঐ বিশ্বাসকে আরও দৃঢ়মূল করিতে পারা যায়—ইহাই প্রকৃত বিবেচ্য বিষয়। পাশ্চাত্ত্য দেশসমূহে ত এই সংযোগস্থাপনের সেতুটীকে নূতন করিয়াই গড়িতে হইবে। তথায় প্রথমেই অদ্বৈতবাদের ব্যাখ্যা ও প্রচার আবশ্যক। কিন্তু

ভারতবর্ষে এ কার্য্য বহুকাল পূর্ব্বে সাধিত হইয়াছে। ভারতে এ-সকল ব্যাপার সকলেই সত্য বলিয়া জানে। এখন শুধু আর একবার ঐগুলিকে উপলব্ধি-সহায়ে দৃঢ় করিতে হইবে—সকল ভারতবাসীকে স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে যে, হিন্দুধর্ম্মের বিভিন্ন অবয়বগুলি পরস্পর সম্বন্ধবিশিষ্ট। এই বিষয়টী ভাল করিয়া পুনঃ পুনঃ বোধগম্য করাইয়া দিতে হইবে—যে তর্কযুক্তিবলে বৈষ্ণবধর্ম্ম ও অদ্বৈতবাদ অবিসংবাদিরূপে অন্যোন্য-সাপেক্ষ বলিয়া প্রমাণিত হয়, তাহার কোথাও যেন কোন ছিদ্র না থাকে।

এইরূপে তিনি হিন্দুধর্ম্মের ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশের বিস্তারিত বর্ণনা করিতে ভালবাসিতেন। যেখানেই কোন একটী ঘটনা ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, সেইখানেই তিনি তাহার পশ্চাতে কোন্ মহাশক্তির প্রেরণা রহিয়াছে, সর্ব্বদা তাহাই অন্বেষণ করিতেন। একদিকে যেমন তিনি কোন্ ধর্ম্মসংস্থাপকের পিছনে কোন্ চিন্তা-শীল মনীষী বর্ত্তমান রহিয়াছেন, তাহার অনুসন্ধান করিতেন, অন্যদিকে আবার তেমনি কাহার মহাপ্রাণতা দ্বারা কোন্ বিশেষ মনীষীর চিন্তারাশি পূর্ণতালাভ করিল, তাহারও তত্ত্ব লইতেন। বুদ্ধ তাঁহার রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান নামক পঞ্চতত্ত্বের দর্শনাংশ মহর্ষি কপিলের নিকট প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু যে প্রেম ঐ দর্শনকে সজীব করিয়া তুলিল, তাহা বুদ্ধের নিজস্ব। কপিল বলিয়াছিলেন, এই পাঁচটীর কোনটীর সম্বন্ধেই কিছু নির্দ্দেশ করা যায় না। কারণ, প্রত্যেকেই নাই। উহা এই ছিল কিন্তু আর নাই। "প্রত্যেকেই জলরাশির উপরে লহরীর খেলামাত্র। হে মানব, জেনে রাখ তুমিই সেই জলধিস্বরূপ।"

আবার সর্ব্বজনবোধ্য হিন্দুধর্ম্মের প্রচারক ও সৃষ্টিকর্ত্তা হিসাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি স্বামিজীর এমন একটী ভাব ছিল, যাহা ভগবান্ বুদ্ধের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তিভাব অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন ছিল না। শ্রীকৃষ্ণে যেরূপ বহুভাবের একত্র সমাবেশ, তাহার তুলনায় বুদ্ধের সন্ন্যাস ত একরূপ দুর্ব্বলতা বলিলেই হয়। গীতা কি অদ্ভুত গ্রন্থ! বাল্যকালে গীতা পড়িতে পড়িতে স্বামিজী মাঝে মাঝে প্রায়ই—

"সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জিতঃ॥ (১২।১৮)

এইরূপ কোন গম্ভীরার্থ বাক্য দেখিয়া থামিয়া যাইতেন; উহা বহুদিন ধরিয়া দিবারাত্র তাঁহার মস্তিষ্ককে আলোড়িত করিতে থাকিত। আর সেই আসন্ন যুদ্ধের বর্ণনা—যুদ্ধও আবার যেমন তেমন যুদ্ধ নহে—এবং শ্রীকৃষ্ণের "ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতত্ত্বয্যুপপদ্যতে" (গীতা, ২।৩) ইত্যাদি বাক্যে অর্জ্জুনকে প্রবোধন—এসকল কি মহান্, কি তেজঃপূর্ণ! ইহা ছাড়া, গীতা আবার কি অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের খনি! বৌদ্ধগ্রন্থসকলের পর গীতা পাইয়া লোকে যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। বুদ্ধ সর্ব্বদাই বলিতেন, "আমি সাধারণ লোকদের জন্য আসিয়াছি!" অমনি বৌদ্ধেরা তাঁহার নামে ললিতকলা ও বিদ্যাচর্চ্চায় যাহা কিছু গৌরবের সামগ্রী ছিল, সমস্ত পদদলিত, চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া ফেলিল। বৌদ্ধধর্ম্ম এই মহা ভুল করিল যে, উহা যাহা কিছু প্রাচীন, সমস্ত ধ্বংস করিয়া ফেলিল।

কারণ, বৌদ্ধ পুস্তকগুলি পড়া একপ্রকার যন্ত্রণা। অজ্ঞ লোকদের জন্য রচিত হওয়ায় এক একখানা বৃহৎ পুস্তকে মাত্র

দুই-একটী উচ্চভাব দেখিতে পাওয়া যায়।* এই অভাব পূরণ করিবার জন্যই পুরাণগুলির সৃষ্টি। ভারতে মাত্র একজন মনীষীই এই অভাব পূর্ব্ব হইতেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন—তিনি শ্রীকৃষ্ণ। বোধ হয় তাঁহার ন্যায় মহাপুরুষ আর জন্মগ্রহণ করেন নাই। তিনি অবিচারিতভাবে সাধারণ লোকদের কি অভাব, তাহা বুঝিয়া উহা দূর করিতে বদ্ধপরিকর, এবং তিনি জাতির মধ্যে যাহা কিছু পূর্ব্বে সঞ্চিত হইয়াছে, সেসমস্ত সংরক্ষণের পক্ষপাতী। শুধু গোপীভাগবত ও গীতার (গীতায় পুনঃ পুনঃ স্ত্রী ও শূদ্রগণের প্রসঙ্গ আছে) সাহায্যেই তিনি সাধারণ লোকদের মধ্যে ধর্ম্মপ্রচার করেন নাই। কারণ, সমস্ত মহাভারতখানি তাঁহারই, তাঁহার ভক্তগণ কর্ত্তৃক রচিত, এবং ইহা গোড়া হইতেই ঘোষণা করিতেছে যে, ইহা সাধারণ লোকদের জন্য লিখিত।

"এরকম একটী ধর্ম্মের সৃষ্টি হল, যার পরিণতি বিষ্ণুপূজায়। ওতে জীবনের সংরক্ষণ ও ভোগ দ্বারা ঈশ্বরলাভের চেষ্টা হয়ে থাকে। আমাদের দেশের শেষ ধর্ম্মান্দোলন—শ্রীচৈতন্যপ্রচারিত ধর্ম্ম—যে ভোগরূপ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত,† একথা বোধ হয়

---

* কেহ মনে করিবেন না স্বামিজী এখানে 'ধম্মপদ'কে উদ্দেশ করিতেছেন। 'ধম্মপদ'কে তিনি গীতার সঙ্গে সমান আসন দিতেন। বোধ হয়, স্বামিজী এখানে জাতকশ্রেণীর পুস্তকগুলির কথাই বলিতেছিলেন। Trubner's Oriental Seriesএ উক্ত গল্পগুলি দুই খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে।

† স্বামিজী এখানে শুধু ধর্ম্মমতটীর লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতেছেন, শ্রীচৈতন্যের নিজ জীবনের কঠোর সন্ন্যাসব্রতের কথা বলিতেছেন না। সেরূপ কঠোরতা জগতে আর কেহ দেখিয়াছেন কিনা সন্দেহ।

তোমাদের জানা আছে। আবার দেখ, জৈনধর্ম্ম তার ঠিক বিপরীত ভাবটা প্রচার করছে—স্বেচ্ছায় দুঃসহ কষ্ট স্বীকার করে শরীরটাকে ধীরে ধীরে পাত করা। সুতরাং দেখছ, জৈনধর্ম্মকে সংস্কার করে নিয়েই বৌদ্ধধর্ম্মের সৃষ্টি। বুদ্ধের সেই পাঁচজন কঠোর তপস্বীর সঙ্গত্যাগের অর্থই এই। ভারতবর্ষে প্রত্যেক যুগেই এমন কতকগুলি ক্রমবিন্যস্ত সম্প্রদায় থাকে, যাতে চরম শারীরিক ক্লেশ-স্বীকার থেকে আরম্ভ করে চূড়ান্ত ভোগ পর্য্যন্ত সকলপ্রকারের বাহ্য সাধনাই দেখতে পাওয়া যায়। আবার ঐ সময়েই ঐরকম ক্রমবিন্যস্ত কতকগুলি মানসিক সাধনাবলম্বী সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়ে থাকে, যাতে ইন্দ্রিয়গুলোকে সাধনার সহায়রূপে গ্রহণ করা থেকে আরম্ভ করে ওগুলোর বিনাশ পর্য্যন্ত সবরকম উপায়েই ঈশ্বরোপলব্ধির চেষ্টা হয়ে থাকে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, হিন্দুধর্ম্ম চিরকালই যেন দুটী spiral বা পেঁচের দ্বারা গঠিত—তাদের বেষ্টনগুলি বিপরীতদিক্‌গামী ; তারা একই মেরুদণ্ড আশ্রয় করে আছে, এবং প্রত্যেকেই অপরটীর পূর্ণতা বিধান করে।

"বৈষ্ণবধর্ম্ম বলে, 'এই যে পিতা, মাতা, ভ্রাতা, স্বামী বা পুত্রের জন্য উৎকট ভালবাসা, এ সব ঠিক! শুধু তোমাকে এইটুকু ভাবতে হবে যে, কৃষ্ণ ঐ পুত্র হয়েছেন, এবং যখন তাকে খাবার দাও, মনে করো তুমি কৃষ্ণকে খাওয়াচ্ছ।' এইটাই শ্রীচৈতন্যের উপদেশ ছিল—'ঈশ্বরকে ইন্দ্রিয়গুলির সহায়তা নিয়ে পূজা কর!' বেদান্তের 'ইন্দ্রিয়গণকে নিগ্রহ কর, ওগুলোকে দমন কর'—এ আদেশের পরিবর্ত্তে তিনি ঐরকম প্রচার করেছিলেন।

"বর্ত্তমান সময়ে আমরা মতভেদে জাতীয় ধর্ম্মের তিনটী বিভিন্ন রূপ

দেখতে পাই—প্রাচীনপন্থী ধর্ম্ম, আর্য্যসমাজ ও ব্রাহ্মসমাজ। প্রাচীনপন্থী ধর্ম্ম মহাভারতীয় যুগের বৈদিক হিন্দুগণ যে পথে চলতেন, সেই পথ অবলম্বন করেছে। আর্য্যসমাজ জৈনধর্ম্মের স্থান অধিকার করেছে, এবং ব্রাহ্মসমাজ বৌদ্ধধর্ম্মের স্থান গ্রহণ করেছে।

"আমি দেখতে পাচ্ছি যে, ভারত অন্য সকল চেতন পদার্থের মত সজীব, কিন্তু এখনও চরম পরিণতি লাভ করে নি। ইউরোপও সজীব এবং অপরিণত। এদের কেউই এমন অবস্থায় পৌঁছায় নি যে, এদের অনুষ্ঠানগুলোকে নিরাপদে সমালোচনা করা চলে। এরা যেন দুটী বিরাট পরীক্ষাব্যাপার—তার কোনটীই এখনও সম্পূর্ণ হয় নি। ভারতবর্ষে সকলকেই সমাজের অধীনে থেকে সুখস্বচ্ছন্দতা বণ্টন করে নিতে হয় (Social Communism), আর অদ্বৈতজ্ঞানের আলো ওর ওপরে এবং আশেপাশে বিকীর্ণ হচ্ছে। অদ্বৈতজ্ঞানকে আধ্যাত্মিক ব্যক্তিতন্ত্রতা (Spiritual Individualism) বলতে পারা যায়। ইউরোপে সামাজিক ব্যাপারে তোমরা সব স্ব-স্ব-বাদী, অর্থাৎ ব্যক্তিতন্ত্রতার পক্ষপাতী (Social Individualism), কিন্তু চিন্তারাজ্যে তোমরা দ্বৈতের পক্ষপাতী; অর্থাৎ আধ্যাত্মিক ব্যাপারে তোমরা নিজের নিজের মত চালাও না, সকলে মিলে কোন এক সাধারণ মতকে মেনে চল (Spiritual Communism)। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, একটীর (অর্থাৎ ভারতের) যা কিছু অনুষ্ঠান, সব সমাজতন্ত্র, কিন্তু চিন্তার স্বাধীনতার দ্বারা পরিরক্ষিত; আর অপরটীর অনুষ্ঠানগুলো ব্যক্তিতন্ত্র, কিন্তু এক সাধারণচিন্তার প্রভাবে সুনিয়ন্ত্রিত।

"এখন আমাদের ভারতীয় পরীক্ষা-ব্যাপারটীকে তার নিজের

ভাবেই সাহায্য করতে হবে। যেসকল আন্দোলনে কোন ব্যক্তি বা কাজকে সাহায্য করতে গিয়ে তাদের নিজেদের ভাবটী বজায় রাখবার চেষ্টা না করা হয়, সেসকল আন্দোলন ঐ হিসেবে নিরর্থক। যেমন, ইউরোপে আমি বিবাহ ও ব্রহ্মচর্য্যকে সমান শ্রদ্ধার চোখে দেখি। কখনও ভুলো না যে, লোকে শুধু গুণ থাকার জন্যেই বড় ও পূর্ণচরিত্র হয় না, দোষও তাতে তার সমানভাবে সহায় হয়—দোষগুণ একত্র মিলে তাকে ঐ উচ্চপদ প্রদান করে। সুতরাং কোন জাতিব চরিত্রের সবটাই দোষযুক্ত, এরকম প্রমাণ করা সম্ভব হলেও ঐ জাতির উন্নতি করতে গিয়ে তার জাতীয়ত্বটুকু অপহরণ করবার যেন কখনও চেষ্টা না করা হয়।”

তিনি ব্যক্তিগত প্রাধান্য (Individualism) বলিতে কি বুঝিতেন, তৎসম্বন্ধে তাঁহার বিলক্ষণ স্পষ্ট ধারণা ছিল। কতবার তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন, “তোমরা এখনও ভারতবর্ষকে বোঝ না। যাই বল, ভারতবাসী আমরা মানুষের উপাসনা করে থাকি। আমাদের ঈশ্বর মানুষ, অর্থাৎ মানুষদেহধারী।” এস্থলে তিনি আত্মদর্শী মানবের কথা বলিতেছিলেন—যেমন বুদ্ধ, শ্রীকৃষ্ণ, গুরু বা মহাপুরুষ। কিন্তু আর একবার তিনি ‘মানব’ শব্দটীকে এক সম্পূর্ণ পৃথক অর্থে ব্যবহার করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, “এই মানবের উপাসনার[১] ভাবটী বীজাকারে ভারতবর্ষেও আছে, কিন্তু এটী কখনও পুষ্টিলাভ করে নি। তোমাদের এটীকে বাড়িয়ে তুলতে হবে। একে কাব্যে, ললিতকলায় পরিণত কর। মধ্যযুগের ইউরোপের

---

১ অর্থাৎ মানবমাত্রের উপাসনা—মানবত্বের উপাসনা; ব্যক্তিবিশেষকে তাহার উন্নত মন বা চরিত্রের জন্য পূজা না করিয়া সকল মানুষকে গুণনির্ব্বিশেষে পূজা করা।

মত আবার ভিক্ষুকদের পা পূজা করার প্রথা চালাও। কতকগুলি নরোপাসকের সৃষ্টি কর।"

আবার, প্রতিমাপূজার উপকারিতা সম্বন্ধেও তাঁহার ঐরূপ স্পষ্ট ধারণা ছিল। তিনি বলিতেন, "তোমরা সব সময়েই বলতে পার যে প্রতিমাই ঈশ্বর। কিন্তু দেখো যেন ঈশ্বরকে প্রতিমা ভেবে বসো না—এটী একটী ভুল।" একবার কতকগুলি লোক তাঁহার মুখে হোটেণ্টটদিগের জড়োপাসনার নিন্দা শুনিতে চাহেন। তিনি উত্তর দিলেন, "আমি জড়োপাসনা কাকে বলে জানি না।"

তখন তাঁহার নিকট তাড়াতাড়ি এইরূপ একটী বিকট চিত্রের বর্ণনা করা হইল—তাহারা পূজার্হ বস্তুটীকে প্রথমে পূজা, তারপর প্রহার এবং আবার ধন্যবাদজ্ঞাপন—ক্রমান্বয়ে এইরূপ করিতে থাকে। তিনি তদুত্তরে সবিস্ময়ে বলিলেন, "আমি এর নিন্দা করব!" পরক্ষণেই যাহারা সমাজে নিম্নপদস্থ, তাহাদিগের প্রতি অসাক্ষাতে এরূপ অন্যায় আচরণ দেখিয়া অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া তিনি বলিতে লাগিলেন, "দেখছ না, এটা জড়োপাসনা নয়? তোমাদের হৃদয় কি পাষাণ! তোমরা দেখতে পাও না যে ছোটছেলেরা ঠিকই করে! তারা সবই চৈতন্যময় দেখে। ঐহিক জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে আমাদের ঐ বালকসুলভ দৃষ্টি চলে যায়। কিন্তু শেষে এক উচ্চতর জ্ঞানের দ্বারা আমরা আবার ঐ অবস্থায় পৌঁছাই। ছোটছেলেরা গাছপালা, ইট, কাঠ, পাথর, সব জিনিসে একটা জীবন্ত শক্তি দেখতে পায়। আর সত্যই কি এদের পেছনে এক জীবন্ত শক্তি বর্ত্তমান নেই? এ প্রতীকোপাসনা, জড়োপাসনা নয়। দেখতে পাচ্ছ না?"

কিন্তু একদিকে যেমন প্রত্যেক ব্যক্তির আন্তরিক মনের ভাবকে

তিনি পবিত্র জ্ঞান করিতেন, অপরদিকে তেমনি তিনি হিন্দুধর্ম্মের দর্শনাংশের মাহাত্ম্য কদাপি বিস্মৃত হইতেন না। যেসকল শুষ্কতর্ক শুধু আইনজ্ঞদিগেরই বোধ্য, সে-সকলকে উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দিতে দিতে তিনি কবিত্বের কি অনন্ত উৎসই খুলিয়া দিতেন! কি প্রীতিসহকারে তিনি মীমাংসাদর্শনের ব্যাখ্যা করিতেন! তিনি সগর্ব্বে শ্রোতৃবর্গকে স্মরণ রাখিতে বলিতেন যে, হিন্দুমতে সমস্ত জগৎ শুধু পদার্থময় ("পদের অর্থ")! আগে পদ, তারপর বস্তুটা। সুতরাং অর্থ বা ভাবটাই সব!" বাস্তবিকই তাঁহার ঐ বিষয়েব ব্যাখ্যা শুনিতে শুনিতে আমাদের মনে হইতেছিল যে, মীমাংসকদিগের অতি সাহসপূর্ণ তর্কপ্রণালী, তাঁহাদের নির্ভীকভাবে কতকগুলি বিষয় স্বীকার করিয়া লওয়া এবং দৃঢ়তার সহিত অনুমান করা—এগুলি হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃত গৌরবস্থল। যে জাতি বলিতে পারেন, 'আমরা প্রতিমাপূজা করি বটে, কিন্তু প্রতিমা আমাদের চিন্তার একটী অবলম্বনমাত্র'; যাঁহারা বলেন যে, প্রার্থনা যত একাগ্রতার সহিত করা যাইবে, ততই উহার শক্তি বাড়িবে; যাঁহাদের মতে দেবতাদিগের অস্তিত্ব শুধু মনে, কিন্তু সেইজন্যই আরও জোর করিয়া বলা যায় যে, তাঁহারা আছেন—যে জাতি এরূপ বলিতে পারেন, তাঁহারা যে তর্কের যে-কোন মীমাংসাই নিঃসঙ্কোচে গ্রহণ করিবেন, একথা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। এরূপ চিন্তাপ্রণালীর কথা শুনিলেই মনে হয় যেন উহা মূর্ত্তিবিদ্বেষী কালাপাহাড়দিগের সর্ব্বধ্বংসকারী আক্রমণ বই আর কিছুই নহে। তথাপি উহাই আবার একটী মতস্থাপনার অনুকূলে প্রযুক্ত হইতেছিল।

একদিন তিনি সত্যভামার তুলাপুরুষদানের গল্প করিতে করিতে

বলিলেন যে, একটী তুলসীপত্রে শ্রীকৃষ্ণের নাম লিখিয়া তুলাদণ্ডের একদিকের পাল্লায় দেওয়াতে, অপর দিকে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ উপবিষ্ট থাকিলেও, ঐ নাম তাঁহার অপেক্ষা গুরুভার হইল। তিনি বলিতে লাগিলেন, "প্রাচীনপন্থী হিন্দুধর্ম্ম 'শ্রুতি' বা শব্দকেই সর্ব্বেসর্ব্বা মনে করে থাকে; 'বস্তুটা' পূর্ব্বে থেকেই বর্ত্তমান সনাতন ভাবেরই একটী ক্ষীণ প্রতিচ্ছায়া মাত্র। সুতরাং ভগবানের 'নাম'ই সব; ভগবান নিজে বিরাট মনের সেই ভাবের একটী বাহ্য অভিব্যক্তি মাত্র। তোমার নিজের নামও এই যে সান্ত তুমি রয়েছ, তোমার চেয়ে অনন্তগুণে পূর্ণতর। ঈশ্বরের চেয়ে ঈশ্বরের নামের মাহাত্ম্য বেশী। অতএব সাবধানে বাক্যপ্রয়োগ করবে।" তাঁহার কথা শুনিতে শুনিতে আমরা বুঝিলাম যে, এই সমস্ত ব্যাপারটী প্রাচ্য-মহাদেশবাসিগণের মনের এই অন্তর্নিহিত, স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাসের উপর স্থাপিত যে, ধর্ম্ম উপলব্ধির বস্তু, মতমতান্তরের বস্তু নয়; স্বামিজী নিজেই যেমন অন্যত্র বলিয়াছিলেন, উহা একটী ক্রমিক অবস্থান্তর-প্রাপ্তি—ধর্ম্মের প্রভাবে মানুষ উত্তরোত্তর নূতন এবং উচ্চতর জীবন লাভ করে। যদি একথা সত্য হয় যে, এই উপায়ে মানব বহুত্বের ধারণা হইতে ক্রমে সেই একমেবাদ্বিতীয়ং তত্ত্বের ধারণায় উপনীত হইবেই, তাহা হইলে ইহাও নিশ্চিত সত্য যে, যাহা কিছু আমরা দেখি শুনি, সমস্তই মনে; বাহ্য জগৎ মনের কল্পনারই স্থূল রূপমাত্র। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, প্লেটো-প্রচারিত গ্রীকদর্শন হিন্দুদিগের মীমাংসাদর্শনের অন্তর্ভুক্ত, এবং ইউরোপীয়দিগের মুখে যাহা শুধু ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞান বলিয়া মনে হয়, ভারতবাসিগণের নিকট তাহার একটা বিচারসম্ভূত কারণ দেখিতে পাওয়া যায়। ঠিক এইরূপেই

তিনি আর একদিন, লোকে কোন স্বতঃসিদ্ধ সত্য সম্বন্ধে যেভাবে বলিয়া থাকে, সেইভাবে বলিলেন, "আমি গ্রীক দেবতাদেরও পূজা করব না, কারণ তাঁরা মানুষ হতে স্বরূপতঃ ভিন্ন ছিলেন! তাঁদেরই পূজা করা উচিত, যাঁরা আমাদেরই মত, কিন্তু মহত্তর। আমার ও দেবতাদের মধ্যে যে প্রভেদ, তা শুধু পরিমাণগত হওয়া চাই—আমি ছোট, তাঁরা বড়, এইমাত্র।"

কিন্তু তাঁহার দর্শনসম্বন্ধীয় আলোচনাসমূহ সকল সময়েই যে এই-রূপ একটু আধটু চাটনীর মত হইত, এরূপ যেন কেহ মনে না করেন। সাধারণতঃ তিনি চাহিতেন যে, সকলেই বিচারশক্তির পূর্ণমাত্রায় বিকাশ করুক—এ বিষয়ে তিনি কাহারও প্রতি মায়াদয়া দেখাইতেন না। সময়ে সময়ে তিনি প্রাচীন মতবাদসকল ব্যাখ্যা করিতে করিতে তুই ঘণ্টাকাল কাটাইয়া দিতেন; তাঁহার শ্রোতৃবর্গ যে পণ্ডিত নহেন, এবং তাঁহাদের বিরক্তিবোধ হইতেছে বা বুঝিতে কষ্ট হইতেছে, একথা তাঁহার মনেই উঠিত না। এইসকল সময়ে ইহাও সকলে লক্ষ্য করিতেন যে, তিনি বিচারটী মনে মনে অপর এক ভাষায় অনুধাবন করিতেছেন, কারণ পারিভাষিক শব্দগুলির অনুবাদ করিতে গিয়া তিনি মাঝে মাঝে ভিন্ন ভিন্ন শব্দ প্রয়োগ করিতেছেন।

এইরূপে তিনি বৈশেষিক মতে যে ছয়টী পদার্থের বিচার দ্বারা জগতের উৎপত্তি নির্ণয় করিতে পারা যায়, তাহাদের উল্লেখ করিতেন। উহাদের নাম—দ্রব্য,[১] গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, এবং সমবায় বিশেষ। ইহাদের সহিত তিনি বৌদ্ধদিগের পাঁচটী তত্ত্বের তুলনা করিতেন—রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান। বৌদ্ধেরা রূপকে অন্য

১ বৈশেষিক মতে দ্রব্য নয়টী—পঞ্চভূত, কাল, দিক, আত্মা ও মন।

চারিটী তত্ত্বের ফলস্বরূপ বলেন, উহা নিজে কিছুই নহে। সুতরাং বৌদ্ধধর্ম্মের মতে লক্ষ্যবস্তু বিজ্ঞানের পারে অবস্থিত—উহা পাঁচটী তত্ত্বেরই বহির্ভূত। ইহাদের সঙ্গে আবার তিনি বেদান্তের (এবং ক্যাণ্টেরও) দেশ, কাল, নিমিত্ত, এই তিনটী প্রাতিভাসিক বস্তুর উল্লেখ করিতেন—উহারাই নামরূপাকারে প্রকাশ পায়। নামরূপই মায়া—অর্থাৎ উহা সৎও নহে, অসৎও নহে। সুতরাং স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, এইমতে, দৃশ্য জগতের কোন স্থায়ী সত্তা নাই—বরং উহা এক নিত্য পরিবর্ত্তনশীল প্রক্রিয়া। যাহা সৎ তাহা এক, কিন্তু প্রক্রিয়াবশতঃ উহা নানারূপে প্রতিভাত হইতেছে। ক্রমাভিব্যক্তি ও ক্রমসঙ্কোচ—এই উভয় ব্যাপারই মায়ার অন্তর্গত। সদ্বস্তুর অভিব্যক্তি বা সঙ্কোচ কিছুই হয় না, উহা সর্ব্বদা একরূপই থাকে।

যে মার্গ অনুসরণ করিয়া হিন্দুজাতি বর্ত্তমান অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, তাহার পুনঃপ্রতিষ্ঠারূপ এই মহৎ ব্যাপারপ্রসঙ্গে স্বামিজী পাশ্চাত্ত্য চিন্তার ফলাফলসমূহকেও বিস্মৃত হন নাই। কারণ, তাঁহার মন এরূপ উপাদানে গঠিত ছিল যে, উহা মানবের অনুসন্ধিৎসা কোন্ পথ অনুসরণ করিয়া অগ্রসর হইয়াছে, শুধু তাহাই লক্ষ্য করিত; প্রাচীন ও আধুনিকের মধ্যে কোন কৃত্রিম প্রভেদ করিত না। পাশ্চাত্ত্য দেশে যাহাকে Syllogism বলে, তাহার বিশ্লেষণ করিয়া তিনি উহার সহিত প্রাচীন ভারতীয় 'পঞ্চাবয়ব'[১]

---

১ পঞ্চাবয়ব—প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় ও নিগমন। যথা, (১) প্রতিজ্ঞা—"এই পর্ব্বত বহ্নিযুক্ত;" (২) হেতু—"যেহেতু ইহাতে ধূম রহিয়াছে"; (৩) উদাহরণ—"যে যে স্থলে ধূম থাকে, সেই সেই স্থলে অগ্নিও থাকে, যেমন রন্ধনশালা"; (৪) উপনয়—"এই পর্ব্বতও সেইরূপ অর্থাৎ ধূমবান"; (৫) নিগমন—"যেহেতু এই পর্ব্বত ধূমবিশিষ্ট, সেইহেতু ইহা অবশ্যই বহ্নিবিশিষ্ট।"

ন্যায়ের' অদ্ভুত সাদৃশ্য দেখাইতেন। তৎপরেই হয়ত ন্যায়শাস্ত্রের চতুর্ব্বিধ প্রমাণের আলোচনা করিতেন। উহাদের নাম—প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান এবং শব্দ। এই ন্যায়ানুসারে আজিকালিকার Induction ও Deduction স্বীকৃত হইত না। এই মতে অনুমানমাত্রেই দুইপ্রকার—অধিক পরিজ্ঞাত বস্তু হইতে অল্প পরিজ্ঞাত বস্তু-আবিষ্কার এবং অল্প পরিজ্ঞাত বস্তু হইতে অধিক পরিজ্ঞাত বস্তু-আবিষ্কার। প্রত্যক্ষজ্ঞান হইতে যে অনুমান, তাহা ত্রিবিধ—প্রথম, যাহাতে কারণদৃষ্টে কার্য্য অনুমিত হয় (ইহাকে ন্যায়ের ভাষায় 'পূর্ব্ববৎ' কহে); দ্বিতীয়, যাহাতে কার্য্যদৃষ্টে কারণ অনুমিত হয় ('শেষবৎ') ; এবং তৃতীয়, যাহাতে আনুষঙ্গিক অবস্থাসকল পর্য্যালোচনা করিয়া অনুমান করা হয় ('সামান্যতোদৃষ্ট')। আবার অনুমানের প্রণালী পাঁচ প্রকার—সাধর্ম্ম্য দ্বারা, বৈধর্ম্ম্য দ্বারা, সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্য উভয় দ্বারা, আংশিক সাধর্ম্ম্য এবং আংশিক বৈধর্ম্ম্য দ্বারা। শেষোক্ত দুইটীকে কখনও কখনও একত্র পারিশেষ্য নামে অভিহিত করা হয়। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, ইহাদিগের মধ্যে কেবল তৃতীয়টী হইতেই সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ অনুমান করা চলে, অর্থাৎ "অন্বয় ও ব্যতিরেক উভয় ভাবেই প্রমাণ করিলে তবে ঠিক ঠিক প্রমাণ করা হয়।" নৈয়ায়িকেরা অনুমান-প্রমাণবলে ঈশ্বরাস্তিত্ব সিদ্ধ করিয়াছেন ; বৈদান্তিকেরা কিন্তু শ্রুতি বা শব্দপ্রমাণকেই ঈশ্বরাস্তিত্বসাধনের মূল প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিয়া অনুমানকে তাহার সহকারী প্রমাণমাত্র বলেন।

"আবার ব্যাপ্তি বলে একটী ব্যাপার আছে। একখানি পাথর পড়্‌ল—তাতে একটী কীট মারা গেল। এ থেকে আমরা অনুমান

করি যে, সকল পাথরই পড়লে কীট বিনাশ করে। একটী প্রত্যক্ষ ঘটনাকে আমরা অন্য একস্থলে এইভাবে কিছুমাত্র সন্দেহ না করে প্রয়োগ করি কেন? কেউ কেউ বলবেন, 'ওটা অভিজ্ঞতারই ফল।' কিন্তু ধর ওটা প্রথমবারই ঘটল। একটী শিশুকে শূন্যে ছুড়ে দাও দেখি, অমনি সে কাঁদবে। অতীত জন্মের অভিজ্ঞতা বলছ? কিন্তু ভবিষ্যতে প্রযুক্ত হয় কেন? তার কারণ এই যে, কতকগুলি জিনিসের মধ্যে একটী প্রকৃত সম্বন্ধ আছে—ব্যাপ্তিসম্বন্ধ। শুধু আমাদের এইটুকু লক্ষ্য রাখতে হবে যে, ওতে অতিব্যাপ্তি বা অব্যাপ্তি-দোষ না ঘটে। এই বিচারটুকুর ওপরই সমস্ত মানবীয় জ্ঞান নির্ভর করছে।

"হেত্বাভাস বা ভ্রান্ততর্ক সম্বন্ধে এটী স্মরণ রাখতে হবে যে, প্রত্যক্ষ অনুভবও কেবল তখনই প্রমাণস্বরূপে গণ্য হতে পারে, যখন সেই অনুভবের ইন্দ্রিয়, যে উপায়ে ঐ অনুভব হচ্ছে, সেটা এবং ঐ অনুভবের অবিচ্ছিন্নভাবে স্থিতি—এগুলি নির্দোষ হয়। পীড়া বা ভাবের আবেশ থাকলে ব্যাপারটী ঠিক ঠিক লক্ষ্য করা চলবে না। সুতরাং প্রত্যক্ষ অনুভবও এক রকমের অনুমান বললেই হয়। সেজন্য মানবীয় জ্ঞানমাত্রেই অনিশ্চিত এবং ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ হতে পারে। প্রকৃত দ্রষ্টা কে? তিনিই প্রকৃত দ্রষ্টা, যাঁর কাছে আলোচ্য বিষয়টী প্রত্যক্ষ ব্যাপার। সেজন্যই বেদ সত্য, কারণ বেদ আপ্ত ব্যক্তিগণের সাক্ষ্য। কিন্তু এই দর্শন বা অনুভবশক্তি কারও বিশেষ সম্পত্তি কি? না। ঋষিমাত্রেরই, আর্য্যই হউন আর ম্লেচ্ছই হউন—সকলেরই, এই ক্ষমতা আছে। আধুনিক বাঙ্গালীরা বলেন যে, আপ্তবাক্য এক বিশেষ প্রত্যক্ষমাত্র,

এবং উপমান ও সাদৃশ্যমূলক বিচার অপকৃষ্ট অনুমানমাত্র, সুতরাং প্রকৃত প্রমাণ মাত্র দুটী—প্রত্যক্ষ ও অনুমান।

"দেখছ, একদল লোক বাহ্য বিকাশটাকেই মুখ্য বলে মনে করে, আর একদল ভিতরের ভাব বা ধারণাটাকে। কোন্‌টী আগে? পাখী আগে, তারপর ডিম—না ডিম আগে, তারপর পাখী? পাত্রাধার তৈল, না তৈলাধার পাত্র? এ সমস্যার মীমাংসা নেই। এসব বিচার ছেড়ে দাও। মায়ার হাত থেকে নিষ্কৃতিলাভ কর।"

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

পাশ্চাত্ত্যদেশে স্বামিজীর সহিত কয়েকটী দিন

আমরা ৩১শে জুলাই লণ্ডন পৌঁছিলাম, এবং যে সমুদ্র-যাত্রাটী আমার নিকট এত চিরস্মরণীয় হইয়াছিল, তাহারও অবসান হইল। স্বামিজী উইম্ব্‌লডনে কয়েক সপ্তাহ অতিবাহিত করিলেন, কিন্তু বৎসরের এই সময়ে তাঁহার বন্ধুবর্গের অধিকাংশই লণ্ডনে ছিলেন না। এদিকে আমেরিকা হইতে তাঁহার নিকট ক্রমাগত নিমন্ত্রণপত্র আসিতেছিল। এইহেতু অল্পদিন পরেই তিনি ঐসকল নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া আমেরিকা যাত্রা করিলেন। উদ্দেশ্য—সেখানে হাড্‌সন্ নদীতীরবর্ত্তী একখানি রমণীয় পল্লীনিবাসে অবস্থান করিয়া তাঁহাকে অতঃপর কোথায় কার্য্য করিতে হইবে, এই বিষয়ে ভগবানের ইঙ্গিতের প্রতীক্ষা করিবেন। এই ইঙ্গিত যে আসিবেই, ইহা তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। একমাস পরে আমি সেই ভবনেই অতিথি হইলাম, এবং ৫ই নভেম্বর পর্যন্ত, অর্থাৎ ছয়-সাত সপ্তাহ কাল প্রত্যহ তাঁহার দর্শনলাভ করিতাম। ঐ তারিখে আমরা সকলে পরস্পরের নিকট বিদায়গ্রহণ করিলাম, এবং স্বামিজী তৎপরে নিউইয়র্ক ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী কয়েকটী স্থান দর্শন করিতে লাগিলেন। ঐ মাসের শেষে তিনি শিকাগো হইয়া কালিফোর্নিয়া গমন কবিলেন —তখন আমি শিকাগোতেই ছিলাম। পরবর্ত্তী জুন মাসে (১৯০০ খৃঃ)

আমি পুনরায় নিউইয়র্কে তাঁহার সাক্ষাৎ পাইলাম। তথায় কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া এবং পরে প্যারিসে ঐরূপ সময়ের জন্য আমি তাঁহার ঘন ঘন সাক্ষাৎ পাইতাম ; শেষে সেপ্টেম্বর মাসে, ব্রিট্যানিতে আমি তাঁহার সহিত একই ভবনে আমেরিকাবাসী বন্ধুগণের অতিথিরূপে একপক্ষ কাল অতিবাহিত করি। কয়েক বৎসর ধরিয়া তাঁহার শ্রীমুখ হইতে শিক্ষালাভের যে অমূল্য স্মৃতি আমার মনোমধ্যে বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহার পরিসমাপ্তি এইখানেই। কারণ, ইহার পর যখন আমি আচার্য্যদেবকে ভারতবর্ষে ১৯০২ খৃষ্টাব্দের প্রথমার্দ্ধে দেখি, সে শুধু তাঁহার শেষ আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিবার এবং অন্তিম বিদায় লইবার জন্য।

শিষ্যমাত্রকেই নিজে একটা কিছু না করিয়া সর্ব্বদা শান্ত-সংযতভাবে গুরুর আদেশ পালন করিয়া যাইতে হয় ; কিন্তু যখন গুরু স্থানান্তরে গমন করেন, তখন ঐ শিষ্যকেই আবার তৎক্ষণাৎ যথাশক্তি উদ্যম ও কার্য্যকারিতা প্রকাশ করিতে হয়। এই শেষোক্ত-রূপ আচরণই, স্বামিজী তাঁহার শিষ্যগণের নিকট সর্বদা প্রত্যাশা করিতেন। তিনি একবার বলিয়াছিলেন যে, যখনই কোন ছোকরা সাধু, কয়েক সপ্তাহ বা কয়েক মাস মঠবাসের পর, এখনও কিছু শিখিলাম না বলিয়া অভিযোগ করিত, তখনই তিনি তাহাকে কিছুদিনের জন্য তাহার পূর্ব্বাশ্রমে পাঠাইয়া দিতেন ; সেখানে গেলেই সে দেখিতে পাইত, বাস্তবিক সে কতটা জিনিস অজ্ঞাতসারে আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছে। তাঁহার নিকট বিদায় লওয়ার অর্থই যেন এই ছিল যে, তিনি সেই শিষ্যের হস্তে একটী যুদ্ধপতাকার ভার অর্পণ করিলেন। একবার এক অল্পবয়স্কা রমণী, যে ব্যক্তির সহিত

তাঁহার বিবাহসম্বন্ধ স্থির হইয়াছে, তাঁহাকে বিদায় দিবার সময় ভাবের আবেগে কাঁদিয়া ফেলিবার উপক্রম করিতেছিলেন, এমন সময়ে স্বামিজী চুপে চুপে তাঁহাকে বলিলেন, "বীরহৃদয় রাজপুতরমণীরা নিজ নিজ পতিকে হাসিমুখে বিদায় দিতেন; তুমিও তাঁদের মত হও।" কথাগুলি তৎক্ষণাৎ মন্ত্রশক্তিবৎ কার্য্য করিল। শিকাগো নগরে অল্পকাল সাক্ষাতের পর যখন আমি তাঁহার নিকট বিদায় লই, তখন তাঁহার শেষ কথা এই ছিল, "মনে রেখো, ভারত চিরকালই ঘোষণা করছে—আত্মা প্রকৃতির জন্য নয়, প্রকৃতিই আত্মার জন্য!"

১৯০০ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে যখন আমি ব্রিট্যানি হইতে তাঁহার নিকট বিদায় লই, তখন আমি একাকী ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসিবার উদ্যোগ করিতেছিলাম; ইচ্ছা, তথায় ভারতবর্ষীয় কার্যের জন্য সহায় ও অর্থ মিলে কিনা, চেষ্টা করিয়া দেখিব। কতদিন আমি তথায় থাকিব, তখনও তাহার কিছুই স্থিরতা ছিল না। আমি কোন কার্য্যপ্রণালী পূর্ব্ব হইতে স্থির করিয়া রাখি নাই। সম্ভবতঃ এই চিন্তাও স্বামিজীর মনে উদিত হইয়া থাকিবে যে, পুরাতন সম্পর্কগুলা বিদেশে নূতন সম্বন্ধস্থাপনের পক্ষে প্রবল অন্তরায়স্বরূপ হইয়া থাকে। তিনি এত লোককে কথা দিয়া কার্য্যের সময় পশ্চাৎপদ হইতে দেখিয়াছিলেন যে, মনে হইত তিনি যেন অন্য যে-কেহও ঐরূপ করিতে পারে, তজ্জন্য সদাই প্রস্তুত ছিলেন। যাহা হউক, তাঁহার এই শিষ্যাটীর পক্ষে সে সময়টী একটী সঙ্কটমুহূর্ত্ত ছিল, এবং তিনিও ইহা বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। আমার ব্রিট্যানি অবস্থানের শেষ দিন সন্ধ্যার পর আমার লতাপাদপমণ্ডিত ক্ষুদ্র পাঠাগারের দ্বারদেশে সহসা আমি তাঁহার কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম।

তখন রাত্রিকালীন আহার সমাপ্ত হইয়াছে এবং একটু রাত্রিও হইয়াছে। তিনি আমাকে উদ্যানে যাইবার জন্য ডাকিতেছিলেন। আমি বাহিরে আসিয়া দেখিলাম, তিনি জনৈক বন্ধু সমভিব্যাহারে তাঁদের উভয়ের জন্য নির্দ্দিষ্ট কুটীরে যাইতেছেন—আমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া যাইবেন বলিয়া দাঁড়াইয়া আছেন।

তিনি আমাকে দেখিয়া বলিলেন, "এক অদ্ভুত রকমের মুসলমান সম্প্রদায় আছে; লোকে বলে, তারা এত গোঁড়া যে, কোন শিশু জন্মিবামাত্র তারা তাকে এই কথা বলে রাস্তায় ফেলে দেয়, 'যদি আল্লা তোমাকে সৃষ্টি করে থাকেন, তবে মর, আর যদি আলি তোমাকে সৃষ্টি করে থাকেন, তবে বেঁচে থাক।' তারা শিশুর প্রতি যা বলে থাকে, আজ রাতে আমি তোমাকে তাই বলছি, কিন্তু ঠিক উল্টোভাবে—'সংসারক্ষেত্রে প্রবেশ কর, এবং যদি আমি তোমায় সৃষ্টি করে থাকি, তবে সেখানে বিনাশপ্রাপ্ত হও! আর যদি মা ব্রহ্মময়ী তোমাকে সৃষ্টি করে থাকেন, তবে বেঁচে থাক।'"

তথাপি তিনি পুনরায় পরদিন প্রাতঃকালে, সূর্য্যোদয়ের একটু পরেই আমাকে বিদায় দিবার জন্য আসিলেন। ইউরোপ ভূখণ্ডে ইহাই আমার তাঁহাকে শেষ দেখা। এই দিনটীর কথা স্মরণ করিতে গিয়া আবার আমি সেই কৃষকগণের পণ্যবাহী শকটখানি হইতে পশ্চাদ্দৃষ্টি করিয়া প্রভাত-গগনের সম্মুখভাগে তাঁহার মূর্ত্তি দেখিতে পাইতেছি—দেখিতেছি, তিনি আমাদের ল্যানিয়নস্থ কুটীরের বহির্দ্দেশে যে রাস্তা ছিল, তাহার উপর দাঁড়াইয়া হাত তুলিয়া অভিনন্দন করিতেছেন। প্রাচ্যদেশীয়গণের নিকট উহা অভিবাদন এবং আশীর্ব্বাদ, দুই-ই।

স্বামিজীকে যেরূপ দেখিয়াছি

স্বামিজী এই কয়মাস কাল ইউরোপ ও আমেরিকায় যেভাবে জীবনযাপন করিতেন, তাহা হইতে লোকের সর্ব্বাপেক্ষা ইহাই অধিক মনে হইয়াছিল যে, তিনি তাঁহার আশপাশের জগৎকে মোটেই গ্রাহ্যের মধ্যে আনিতেন না বলিলেই হয়। সচরাচর লোকে জিনিসকে যে চক্ষে দেখিয়া থাকে, তিনি তৎপ্রতি আদৌ খেয়াল করিতেন না। অত্যধিক সফলতা লাভ করিয়াও তিনি কদাপি এতটুকু চমকিত বা সন্দিহান হইতেন না। বিস্মিত না হইবার কারণ —যে মহাশক্তি তাঁহার মধ্য দিয়া কার্য্য করিতেছিল, তাহার মাহাত্ম্য তিনি অতি গভীর ভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। কিন্তু কোন কার্য্যে বিফলমনোরথ হইলেও তিনি হতাশ হইয়া পড়িতেন না। জয় পরাজয় উভয়ই আসিবে এবং চলিয়া যাইবে; তিনি তাহাদের সাক্ষিমাত্র। তিনি একবার বলিয়াছিলেন, "যদি জগৎটাই অদৃশ্য হয়, তাতেই বা আমার কি? আমার দর্শনের মতে সেটা ত একটা চমৎকার জিনিস হবে।" পরক্ষণেই সহসা গম্ভীর ভাব ধারণ করিয়া বলিলেন, "কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, যা কিছু আপাততঃ আমার প্রতিকূলে রয়েছে, সমস্তই শেষে আমার স্বপক্ষে আসবে। আমি কি তাঁর (মহামায়ার) সৈনিক নই?"

পাশ্চাত্ত্যের বিলাসিতার মধ্য দিয়া তিনি নির্ভীক ভাবে এবং কিছুমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া বিচরণ করিতেন। ভারতে আমি যেমন তাঁহাকে অবিচলিত ভাবে সাধারণ লোকদের মত বস্ত্র ও উত্তরীয়মাত্রে আচ্ছাদিত হইয়া মেজেয় বসিয়া হাতে করিয়া গ্রাস মুখে তুলিতে দেখিয়াছি, ঠিক তেমনই ভাবে কিছুমাত্র সন্দেহ বা সঙ্কোচ না করিয়া তিনি আমেরিকা ও ফ্রান্সের নানা ভোগবহুল

জীবনকেও গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, "সাধু ও রাজা একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ মাত্র। জগতের সব শ্রেষ্ঠ বস্তু ভোগ করা এবং সে সব ত্যাগ করা—এ দুয়ের মধ্যে অতি অল্পই ব্যবধান। অতীত যুগে ভারত নির্ধনতাকেই সকল গৌরবে মণ্ডিত করে তুলেছিল। ভবিষ্যতে সম্পদকেও কতকটা গৌরব দান করতে হবে।"

কিন্তু যাঁহারা বিদেশে লোকের দ্বারে দ্বারে আতিথ্য গ্রহণ করিয়া বেড়ান, তাঁহাদের অদৃষ্টে দ্রুত অবস্থা-বিপর্য্যয় অবশ্যম্ভাবী। মনে হইত, তিনি এই সকল অবস্থা-বিপর্য্যয়কে গ্রাহ্যই করিতেন না। কোন সম্প্রদায়ের গণ্ডী বা কোন পারিপার্শ্বিক অবস্থাই তাঁহাকে সহৃদয় মানবমাত্রের সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত করিতে পারিত না। প্রত্যেক মনুষ্যের অভ্যন্তরে ঈশ্বরীয় সত্তা বিরাজমান রহিয়াছে, একথা তিনি প্রায়ই বলিতেন; সেই ঈশ্বরীয় সত্তায় তাঁহার এরূপ পূর্ণ বিশ্বাস ছিল, এবং তিনি সকল লোককেই ঐ সত্তার বিষয়ে এমন প্রত্যক্ষভাবে স্মরণ করাইয়া দিতেন যে, কি প্রভুত্বপ্রয়াসী উচ্চকুলশীলাভিমানী ব্যক্তিগণের এবং আমেরিকার ধনকুবেরদিগের সহিত কথা কহিবার সময়ে, কি অত্যাচার-উৎপীড়নে জর্জ্জরিতপ্রায় দীনদুঃখী লোকদের সহিত বাক্যালাপকালে, তাঁহার এবিষয়ে কোন বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইত না। কিন্তু তাঁহার প্রেম ও সৌজন্য দানদরিদ্রদিগের প্রতিই শতধারে প্রবাহিত হইত।

আমেরিকায় ভ্রমণকালে যখন দক্ষিণ অঞ্চলের কোন কোন শহরে লোকে তাঁহাকে কাফ্রি মনে করিয়া হোটেলে ঢুকিতে দেয় নাই, তখন তিনি কখনও একথা বলেন নাই যে, তিনি আফ্রিকা মহাদেশে জন্মগ্রহণ করেন নাই। পরে যখন স্থানীয়

বড়লোকেরা, এইরূপ আচরণ দ্বারা তাঁহার প্রতি অপমান করা হইয়াছে, বিবেচনা করিয়া অত্যন্ত দুঃখিতান্তঃকরণে ক্ষমাপ্রার্থী হইয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া ধরিয়াছিলেন, তখন যেমন তিনি নীরবে এবং কৃতজ্ঞহৃদয়ে তাঁহাদের আতিথ্যগ্রহণ করিয়াছিলেন, কৃষ্ণকায় কাফ্রিজাতি তাঁহাকে স্থান দান করিতে উদ্যত হইলে, তাঁহাদের আতিথ্যও তিনি ঠিক তেমনি নীরবে ও কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে গ্রহণ করিয়াছিলেন। বহুদিন পরে এক ব্যক্তি বিস্ময়সহকারে তাঁহার এই জাতিগোপন করার বিষয়ে উল্লেখ করিলে তাঁহাকে আপন মনে বলিতে শুনা গেল, "কি! আর একজনকে খাটো করে তবে বড় হতে হবে! আমি সেজন্যে এ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করি নি।" সন্ন্যাসীর এটা চাই, ওটা চাই বলিয়া জোর করিবার অধিকার নাই; তিনি সকল অবস্থাকেই নির্ব্বিকারে গ্রহণ করিয়া থাকেন। এই সময়ে অনেক কৃষ্ণকায় ব্যক্তি বিশ্বস্তচিত্তে তাঁহার নিকট, শ্বেতকায় জাতিগণ তাহাদিগকে অধিকার হইতে কিরূপ বঞ্চিত রাখিয়াছে, তৎসম্বন্ধে অনেক কথা বলিত। স্বামিজী উত্তরকালে প্রায়ই সেই-সকল করুণ কাহিনীর উল্লেখ করিতেন। একটী ঘটনায় তিনি যেরূপ আনন্দ পাইয়াছিলেন, এমন আনন্দ তিনি অতি অল্প ঘটনাতেই পাইয়াছিলেন। একবার তিনি একটী স্টেশনে অপেক্ষা করিতেছিলেন, এমন সময়ে রেলের একজন কাফ্রি ভৃত্য তাঁহার নিকট আসিয়া বলিল, "আমি শুনেছি যে আমাদেরই জাতির মধ্য থেকে একজন বিলক্ষণ খ্যাতিপ্রতিপত্তি অর্জ্জন করেছেন—সে আপনি। আমি আপনার সঙ্গে করমর্দ্দন করতে চাই।" যাক্ সেসকল কথা; তাঁহার সম্মুখে কোন শ্বেতকায় ব্যক্তি নিজেদের সামাজিক উচ্চতা

লইয়া ইতরজনোচিত উল্লাস দেখাইতে পারিত না। অমনি তিনি তাহাকে শাসাইয়া দিতেন। ইহার এতটুকু আভাস পাইলেই তিনি কি কঠোর ভাব ধারণ করিতেন! কি তীব্রভাবে তাহাকে তিরস্কার করিতেন! সর্ব্বোপরি, এইসকল মানবসন্তান ভবিষ্যতে কখনও হয়ত অপর সকলকে অতিক্রম করিয়া সমগ্র মানবসমাজের নেতৃত্বপদ গ্রহণ করিবে—এই বিষয়ে তিনি এক অতি উজ্জ্বল চিত্র অঙ্কিত করিতেন। অধিকারপ্রাপ্ত জাতিসমূহ নিজেদের উৎপত্তির যে অসত্য বিবরণ প্রদান করেন, তিনি ঘৃণাভরে উহার প্রতিবাদ করিতেন। তিনি বলিতেন, "যদি আমি আমার শ্বেতকায় আর্য্য পূর্ব্বপুরুষগণের কাছে কৃতজ্ঞ থাকি, তবে আমার পীতকায় মোঙ্গলীয় পূর্ব্বপুরুষগণের কাছে অনেক বেশী কৃতজ্ঞ, আর সবচেয়ে বেশী কৃতজ্ঞ—কৃষ্ণকায় কাফ্রিজাতির কাছে।"

তাঁহার নিজের শারীরিক গঠনের মধ্যে, তিনি তাঁহার 'মোঙ্গলীয়-দিগের মত' চোয়ালের জন্য যারপরনাই গর্ব্ব অনুভব করিতেন। তিনি উহাকে 'বুলডগের লক্ষণ—কিছুতেই লক্ষ্যভ্রষ্ট না হওয়ার চিহ্ন' বলিয়া জ্ঞান করিতেন। তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, মোঙ্গলীয়দিগের এই বিশেষ গুণটী আর্য্যজাতির সকল শাখা-প্রশাখায় অনুস্যূত হইয়া আছে। ইহার উল্লেখ করিয়া তিনি একদিন বলিয়া উঠিয়াছিলেন, "দেখছ না? —তাতার জাতিই যে আর্য্যজাতির প্রাণশক্তিসঞ্চারিণী মদিরাস্বরূপ! তাতার জাতিই সকলের রক্তে শক্তি ও বল সঞ্চারণ করেছে!"

কেন তিনি পারিপার্শ্বিক অবস্থাসমূহকে গ্রাহ্য করিতেন না, তাহার গূঢ় কারণ অনুসন্ধান করিতে হইলে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, তিনি সর্ব্বদাই আবিষ্কার করিতে চেষ্টা করিতেন—কোথায় সর্ব্বাপেক্ষা

উত্তম চিন্তার সহায়তা হয়। প্রত্যেক পরিবারকে, গৃহস্থালীর প্রত্যেক মুখ্য উপকরণটীকে তিনি ততটুকু মূল্যবান জ্ঞান করিতেন, যতটুকু তাহারা উচ্চতম চিন্তাশীল জীবনগঠনের পক্ষে চিত্তের এবং ভাবের আবশ্যকীয় স্থৈর্য্য প্রদান করিতে পারিত। ১৯০০ খৃষ্টাব্দের মাইকেলমাস* দিবসে কয়েকজন লোক স্বামিজীর সহিত সেণ্ট মিশেল পাহাড় (Mont Saint Michel) দর্শন করিতে যান। তাঁহাদের মধ্যে একজন স্বামিজীর নিকটেই ছিলেন—স্বামিজী সে সময়ে মধ্যযুগের কয়েদীদের জন্য যেসকল অন্ধকার, খাঁচার মত ঘর নির্দ্দিষ্ট থাকিত, তাহাই দেখিতেছিলেন। ভদ্রলোকটী শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন—স্বামিজী অনুচ্চস্বরে বলিতেছেন, "আহা, কি চমৎকার ধ্যানের জায়গা!" যাঁহারা তাঁহাকে ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে শিকাগোয় আতিথ্যদানে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে এখনও কেহ কেহ বর্ত্তমান আছেন। পাশ্চাত্ত্য দেশে প্রথম পদার্পণ করিয়া সর্ব্বদাই গভীর চিন্তামগ্ন হইয়া পড়ার অভ্যাসটী দূর করিবার জন্য স্বামিজীকে কত বেগ পাইতে হইয়াছিল, তাহা তাঁহারা বর্ণনা করেন। তিনি ট্রাম গাড়ীতে উঠিয়া চিন্তাবিশেষে এমন তন্ময় হইয়া যাইতেন যে, কখন তিনি তাঁহার গন্তব্যস্থানে পৌঁছিয়াছেন, তাহার হুঁশই থাকিত না; ফলে তাঁহাকে কোন একটী জায়গায় যাইবার জন্য হয়ত দুই-তিন বার সমস্ত রাস্তাটীর ভাড়া দিতে হইত। যেমন বৎসরের পর বৎসর কাটিতে লাগিল এবং বন্ধুগণ তাঁহার সহিত মধ্যে মধ্যে সাক্ষাৎ করিতে লাগিলেন, তাঁহারা দেখিলেন, তিনি ক্রমশঃ কতকটা তৎপরতা ও লৌকিক ব্যবহার আয়ত্ত করিয়া

* ২৯শে সেপ্টেম্বর।

লইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার স্বভাবের এইরূপ পরিবর্ত্তনগুলি অত্যন্ত ভাসাভাসা হইয়াছিল। ভিতরে তাঁহার সেই পূর্ব্বেরই ন্যায় জ্বলন্ত ইচ্ছাশক্তি বিরাজ করিত, এবং মন সর্ব্বদা ভাবমুখে অবস্থান করিত। মনে হইত যেন কোন প্রতিকূল শক্তি তাঁহাকে 'বল ছোড়ার মত এক স্থান হইতে অপর স্থানে নিক্ষেপ করিতেছে, আর ঐরূপে তাঁহাকে ধীরে ধীরে শান্ত করিয়া আনিতেছে'—ইহা তাঁহার নিজমুখের অলঙ্কারময়ী ভাষা। একবার তিনি আবেগভরে বলিয়া উঠিয়াছিলেন, "আমি জানি যে আমি সারা পৃথিবী ঘুরেছি, কিন্তু ভারতে আমি শুধু একটী ধ্যান করবার গুহাই খুঁজে বেড়িয়েছি, আর দ্বিতীয় বস্তু নয়!"

ইহা সত্ত্বেও কিন্তু তিনি সর্ব্বদাই সকল বস্তুর প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতেন। তিনি আগ্রহের সহিত যাদুঘর, বিশ্ববিদ্যালয়, নানাবিধ শিক্ষাসংস্থা, স্থানীয় ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ের তথ্য লইতেন। তবে কোন স্থানেরই রীতিনীতি, আচারব্যবহার প্রভৃতি সাধারণ লোকের দৃষ্টিতে দেখিতেন না। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের মধ্যে যে বিপুল পার্থক্য, তাহা অনুভব করিয়া তদনুযায়ী ব্যবহার করিতে তাঁহার ন্যায় দক্ষ ব্যক্তি আর দ্বিতীয় ছিলেন না বলিলেই হয়। প্রত্যেক জিনিসটী যে ভাবরাশি অভিব্যক্ত করিতে প্রয়াস পাইতেছে, তদ্দ্বারাই তিনি উহাকে বুঝিতে চেষ্টা করিতেন। ইংলণ্ড যাত্রাকালে তিনি একদিন গাঢ় নিদ্রার পর ডেকের উপর আসিলেন এবং আমাকে বলিলেন যে, তিনি স্বপ্নে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যদেশের বিবাহসম্বন্ধীয় আদর্শগুলি লইয়া বিচার করিতেছিলেন এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, উহাদের উভয়ের মধ্যেই এমন কিছু কিছু জিনিস আছে, যাহা জগতের

কল্যাণের জন্য একান্ত আবশ্যক। তাঁহার শেষবার আমেরিকা হইতে প্রত্যাগমনের পর তিনি আমাকে বলিলেন, "পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার প্রথম পরিচয় পেয়ে আমি তার প্রতি বিশেষভাবেই আকৃষ্ট হয়েছিলুম, কিন্তু এখন আমি প্রধানতঃ তার অর্থলিপ্সা ও ক্ষমতাই দেখতে পাচ্ছি। অপর সকলের মত আমিও না ভেবে চিন্তে ধরে নিয়েছিলুম যে, কলকব্জা দ্বারা কৃষিকার্য্যের মহা উন্নতি হবে, কিন্তু আমি এখন দেখছি যে, কলকব্জা দ্বারা আমেরিকার জমিদারের সুবিধা হতে পারে, কারণ তাঁকে বহু বর্গমাইল জমি চাষ করতে হয়, কিন্তু ভারতীয় চাষীদের ছোট ছোট জমিব পক্ষে এতে লাভের চেয়ে যেন ক্ষতিই অধিক হবে। ভারতের সমস্যা ও আমেরিকার সমস্যা যে সম্পূর্ণ পৃথক, অন্ততঃ এ বিষয়ে আমার অনুমাত্র সন্দেহ নেই।" তিনি সকল বিষয়েই—সকল লোকের মধ্যে ধনের সংবিভাগরূপ সমস্যাটী সম্বন্ধেও—যাহা দুর্ব্বল বা দরিদ্র শ্রেণীসমূহের সমূলে উচ্ছেদ সাধন করিতে চাহে, এমন সব তর্কের প্রতি সন্দিগ্ধভাবে কর্ণপাত করিতেন। অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় এবিষয়েও তিনি, অজ্ঞাতসারে হইলেও, সম্পূর্ণরূপে যেন প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতারই প্রতিমূর্ত্তিস্বরূপ ছিলেন। দলবদ্ধ হইবার প্রবল অভ্যাস কোন জাতির মধ্যে দেখিলে তিনি উহার প্রশংসা করিতে জানিতেন, কিন্তু হিংস্রপ্রকৃতি বৃকযূথের দলবদ্ধ হওয়ার মধ্যে কেহ কি কোন সৌন্দর্য্য দেখিতে পান?

তিনি বিদেশে ভারতের অভাব বা সমস্যাসমূহের আলোচনা করার ঘোর বিরুদ্ধে ছিলেন, এবং তাঁহার সম্মুখে ঐরূপ করা হইলে আপনাকে অত্যন্ত অপমানিত বোধ করিতেন। পক্ষান্তরে, আবার তিনি কোন স্বদেশবাসীকে, সমগ্র জগৎ বিপক্ষে থাকিলেও, সাহায্য

করিতে কখনও পশ্চাৎপদ হইতেন না। যদি কোন ভারতবাসী বিষয়-বিশেষে অনুসন্ধান দ্বারা কোন এক সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে বিরুদ্ধমতাবলম্বী ইউরোপীয়দিগের শত যুক্তিতর্কও তাঁহার নিকট ভাসিয়া যাইত। বালকের ন্যায় সরলভাবে তিনি স্পষ্টাস্পষ্টি এই উত্তর দিতেন, "আশা করি আপনি আরও সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করবেন এবং আরও নিখুঁত-ভাবে মাপজোখ করবেন, যাতে আপনার প্রতিপাদ্য বিষয়টী প্রমাণিত হতে পারবে।"

এইরূপে, যদিও অপর সকলে তাঁহাকে সমগ্র জগতেরই তত্ত্বজিজ্ঞাসু ছাত্র এবং দেশবিশেষের না হইয়া সমগ্র বিশ্বেরই অধিবাসী নামে অভিহিত করিয়া গর্ব্ব অনুভব করিতেন, তথাপি তিনি নিজে সর্ব্বদা ভারতভূমে জন্মগ্রহণের জন্যই আপনাকে গৌরবান্বিত জ্ঞান করিতেন। আর রাজোচিত পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও নানা সুযোগের মধ্যে অবস্থিত থাকিলেও, তিনি যে সন্ন্যাসী, লোকের নিকট দিন দিন তাহাই স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতরভাবে প্রকাশ পাইত।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

স্বামিজী-প্রচারিত মতসমূহের সমষ্টিভাবে আলোচনা

খৃষ্টের জন্মের কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে বুদ্ধের আবির্ভাব দ্বারা দুইটী প্রয়োজন সাধিত হইয়াছিল। একদিকে, তিনি এমন একটী শক্তি-প্রবাহ সঞ্চারিত করিয়াছিলেন, যাহা ভারত হইতে বহির্গত হইয়া দূর দূরান্তরের দেশসমূহকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিয়াছিল। ভারতবর্ষ তাঁহার বাণী সমগ্র প্রাচ্য জগতে ছড়াইয়া দিয়া দেশ দেশান্তরে নানা জাতি, নানা ধর্ম্মসম্প্রদায়, নানা সাহিত্য, এবং বহুবিধ কলাবিদ্যা ও বৈজ্ঞানিক চর্চ্চার সৃষ্টি করিল। কিন্তু ভারতের চতুঃসীমার ভিতর উক্ত মহাপুরুষের জীবনই জাতিগঠনের প্রথম উপায়স্বরূপ হইল। উপনিষৎ-নিহিত আর্য্য শিক্ষা-দীক্ষাকে আপামর সাধারণের মধ্যে প্রচার করিয়া বুদ্ধ সাধারণ ভারতীয় সভ্যতার একটী আদর্শ স্থাপন করিলেন, এবং ভাবী যুগের এক অখণ্ড ভারতীয় মহাজাতির সূত্রপাত করিলেন।

যে মহাপুরুষের সহিত আমি পরিচিত হইয়াছিলাম, তাঁহার জীবন দ্বারাও যে এইরূপ দ্বিবিধ প্রয়োজন সাধিত হইয়াছে, ইহাই আমার স্থির বিশ্বাস। প্রথম—সমগ্র জগতের মধ্যে একটী আন্দোলন উপস্থিত করা; দ্বিতীয়—একটী মহাজাতি গঠন করা। ভারতেতর দেশসমূহের কথা বলিতে গেলে স্বামী বিবেকানন্দই পাশ্চাত্ত্য জাতিসমূহের

নিকট বেদ ও উপনিষদের ভাবরাশির প্রথম এবং প্রামাণিক ব্যাখ্যা করেন। তাঁহার নিজের কোন ধর্ম্মমত প্রচার করিবার ছিল না। তিনি বলিয়াছিলেন, "বেদ ও উপনিষদ্ ছাড়া অন্য কোন গ্রন্থ থেকে আমি কিছু উদ্ধৃত করি নি, আবার তাদের মধ্য থেকেও শুধু তেজের ভাবটাই গ্রহণ করেছি।" তিনি স্বর্গের পরিবর্ত্তে মুক্তি প্রচার করিতেন, পরিত্রাণের পরিবর্ত্তে জ্ঞানলাভ শব্দ ব্যবহার করিতেন, ঈশ্বরের পরিবর্ত্তে সর্ব্বভূতে অবস্থিত ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার করিতে উপদেশ দিতেন, এবং কোন একটী বিশেষ ধর্ম্মের মাহাত্ম্য ঘোষণা না করিয়া সকল ধর্ম্মেরই সত্যতা ঘোষণা করিতেন।

পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ সময়ে সময়ে দেখিয়া বিস্মিত এবং বিরক্তও হইতেন যে, তাঁহারা ধৈর্য্যসহকারে বহু গবেষণার ফলে যেসকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা এই প্রচারক ধর্ম্মব্যাখ্যাতার স্বভাবসিদ্ধ ওজস্বিতার সহিত জীবন্ত সত্যরূপে অনর্গল বলিয়া যাইতেছেন। কিন্তু তাঁহারা যত প্রকার পরীক্ষাই উপস্থিত করুন না কেন, স্বামিজীর পাণ্ডিত্য সে সকলে অনায়াসে উত্তীর্ণ হইত। তাঁহার প্রচারিত মতবাদ বিদ্যালয়ে অধিগত দর্শনচর্চ্চামাত্র ছিল না যে, উহা শুধু একটী ইতিহাস-প্রথিত ও প্রাচীনভাষা-নিবদ্ধ বস্তু বলিয়া লোকের চিত্তাকর্ষক হইবে, কিন্তু উহা এমন এক জীবন্ত মহা-জাতির হৃদয়ের চিরপোষিত বিশ্বাস ছিল—যাহা পঞ্চবিংশতি শতাব্দী ধরিয়া জীবনে মরণে ঐ সত্য উপলব্ধি করিবার জন্য ক্রমাগত চেষ্টা করিয়া আসিয়াছে। ধর্ম্মগ্রন্থসকল তাঁহার নিকট জ্ঞানভাণ্ডারের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেয় নাই; উহারা তাঁহার নিকট শুধু এক মহান্ জীবনের টীকা ও ব্যাখ্যাস্বরূপ ছিল, যাহার অত্যুজ্জ্বল ছটা

ঐসকল পুস্তকের সহায়তা ব্যতীত তাঁহার চক্ষুকে প্রতিহত করিয়া ফেলিত এবং তাঁহার বিশ্লেষণশক্তি অপহরণ করিত। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনই তাঁহার মনে এই ধারণা বদ্ধমূল করিয়া দেয় যে, শঙ্করাচার্য-প্রচারিত অদ্বৈতবাদই সর্ব্বোচ্চ অবস্থায় একমাত্র সত্য। পরমহংসদেবের জীবনই তাঁহার নিজের অনুভূতি-সহায়ে দৃঢ়ীকৃত হইয়া তাঁহাকে হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দেয় যে, বিশিষ্টা-দ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ প্রভৃতি যেসকল মতবাদ সেই একমেবাদ্বিতীয়ম্ অবস্থায় সম্পূর্ণরূপে পৌঁছিতে না পারিলেও প্রায় উহার সমীপবর্ত্তী হইয়াছে, তাহারাও যে অদ্বৈতাবস্থারূপ এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অনুভূতিরই নিম্নতর অবস্থাসমূহের কথা বলিতেছে, অবশেষে ইহাই প্রমাণিত হইবে।

কিন্তু এই চরম আদর্শের এক একটী প্রকাশ হিসাবে প্রত্যেক লোকের আন্তরিক বিশ্বাসই সত্য। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, "যেখানে বহু লোকে উপাসনা করে, সে স্থানকে প্রণাম ও পূজা করবে, কারণ লোকে যে রূপে তাঁকে উপাসনা করে, তিনি সেই রূপেই তাকে দেখা দেবেন—এটা ধ্রুব সত্য।" স্বামিজী বলিলেন, "পৃথিবী ও সূর্য্যের মধ্যে যে ব্যবধান, তার প্রতি পদক্ষেপে যদি আমরা কল্পনার সাহায্যে সূর্য্যের এক একটী ফটোগ্রাফ নিই, তা হলে এই ছবিগুলির কোন দুটীই পরস্পরের অবিকল অনুরূপ হবে না, তবু ওগুলির কোন্‌টীকে তুমি অসত্য বলতে পার?" এই সকল উক্তির তাৎপর্য্য এই যে, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন ধর্ম্মমতের মধ্যে বিরোধ থাকিলেও উহাদিগের সমন্বয় করা চলে। কিন্তু যখন আমরা দেখি যে, দক্ষিণেশ্বরের সেই আচার্য্যশ্রেষ্ঠ সাধনা দ্বারা

আবিষ্কার করিলেন যে, স্ত্রীলোকদিগের পক্ষেও উচ্চতম জ্ঞানলাভ সম্ভব, তখন আমাদের মনে হয়, তিনি যেন আমাদিগকে দেখাইয়া দিলেন যে, সচরাচর আমরা যেসকল ব্যবহারকে সামাজিক ও সাংসারিক বলিয়া হেয় জ্ঞান করিয়া থাকি, সেসকল তুচ্ছ নহে, তাহাদিগকেও পবিত্রজ্ঞানে যথোচিত সমাদর করিতে হইবে। যে জগতে রূপকের এত প্রভাব, যেখানে শত শত বস্তু প্রতীকরূপে ব্যবহৃত হইয়া ঈশ্বরভাবের উদ্দীপনা করিয়া দিতেছে, সেই জগতে তিনি নিঃসংশয়ে দেখাইয়া দিলেন যে, মন্দিরাদিতে পূজা-অর্চ্চনা দ্বারা যেমন ভগবানলাভ হয়, গৃহকর্ম্মের সম্যক অনুষ্ঠানেও ঠিক তেমনি ভগবানলাভ হয়; মন্দিরে পুরোহিত দেবোদ্দেশে ভোগ নিবেদন করিয়া দেবতার যে আশীর্ব্বাদ লাভ করেন, গৃহে জননী বা জায়া অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া পরিবারস্থ সকলকে পরিবেশন করিয়া দিয়া তদপেক্ষা কোন অংশে কম ফল লাভ করেন না। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, "সবই মায়ার ভেতরে—ঈশ্বরের নাম পর্য্যন্ত। কিন্তু এই মায়ার কতক অংশ জীবকে মুক্তির দিকে নিয়ে যায়; বাকী অংশ শুধু বন্ধনের ওপর বন্ধন এনে দেয়।" আমার মনে হয়, সাধ্বী কুল-বধূর প্রাত্যহিক জীবনও যে এইরূপে ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদলাভে ধন্য হইয়া থাকে, গৃহও যে মন্দিরস্বরূপ এবং শিষ্টাচার, অতিথি-সেবা ও সাংসারিক কর্ত্তব্যপালন প্রভৃতি ব্যাপারগুলিকে যে এক দীর্ঘকাল-ব্যাপী পূজার অঙ্গস্বরূপে পরিণত করা যাইতে পারে—এইসকল স্পষ্টভাবে দেখাইয়া দিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ উত্তরকালে তাঁহার স্বনামখ্যাত শিষ্যের একটী মুখ্য চিন্তার মূলপত্তন ও প্রমাণ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছিলেন।

ইহার পরে যখন স্বামিজী কয়েক বৎসর ধরিয়া ভারতবর্ষ ভ্রমণ করেন, সেই সময়ে তিনি উহার পৃথক পৃথক ধর্ম্মমতবিশিষ্ট অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়গুলিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছিলেন। দেখিয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহার গুরুদেবের চরিত্রে যে ধর্ম্মজ্যোতির পূর্ণ বিকাশ দেখিতে পাইয়াছিলেন, ঐ সকলে তাহারই সামান্য একটু-আধটু প্রকাশমাত্র রহিয়াছে। কিন্তু যখন ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে তিনি ভারতবহির্ভূত দেশসকল দেখিতে আরম্ভ করিলেন, তখন জাতীয়তা ও দেশাত্মবোধসূত্রে একতাবদ্ধ জনসঙ্ঘসমূহ তাঁহার চক্ষে পড়িতে লাগিল। তাঁহার স্বদেশের বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়গুলিতে যেমন, এই-সকল জনসমষ্টিতেও তেমনি তিনি মানবের অন্তর্নিহিত ব্রহ্মভাবেরই লীলাবিলাস অনুভব করিতে লাগিলেন। অনেক বৎসর ধরিয়া এই ব্যাপারটী তাঁহার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারেই চলিয়া আসিতেছিল; তথাপি তাঁহার বিভিন্ন জাতিসমূহের প্রধান প্রধান গুণগুলি আবিষ্কার করিবার আগ্রহ ও চেষ্টা তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তমাত্রকেই আকৃষ্ট ও মুগ্ধ করিয়াছিল।

একদিন আমাদের ইংলণ্ডযাত্রার পথে যখন তিনি অত্যন্ত আনন্দ-সহকারে আমাকে তুর্কীদের নাবিকের কার্য্যে দক্ষতা ও অপূর্ব্ব সৌজন্যের কথা বলিতেছিলেন, তখন আমি তাঁহাকে বলিলাম যে, তিনি ঐ বিষয়ে যেরূপ উৎসাহ প্রকাশ করিতেছেন, তাহা অতি বিস্ময়কর। সম্ভবতঃ তিনি জাহাজের খালাসিদের কথা ভাবিতে-ছিলেন, তাঁহার প্রতি তাহাদের বালকবৎ প্রীতিপূর্ণ ব্যবহারে তিনি বিশেষভাবে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। আমি যেন তাঁহার একটী দোষ দেখাইয়া দিয়াছি, এইভাবে তিনি শুধু বলিলেন, "কি জান, আমি

আমাদের মুসলমানদের ভালবাসি!" আমি উত্তরে বলিলাম, "বুঝলাম, কিন্তু আমি জানতে চাই, আপনার এই যে প্রত্যেক জাতিকে তাদের শ্রেষ্ঠ গুণগুলোর দিক থেকে বুঝতে চেষ্টা করার অভ্যাস, এ আপনি কোথা থেকে পেলেন? আপনি কোন ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ব্যক্তির চরিত্রে এটী দেখতে পেয়েছিলেন কি? অথবা শ্রীরামকৃষ্ণের কাছ থেকে কোন সূত্রে পেয়েছেন?"

ধীরে ধীরে তাঁহার মুখের বিস্মিত, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ভাব অপনীত হইল। তিনি উত্তর দিলেন, "খুব সম্ভবতঃ এ শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে শিক্ষারই ফল। আমরা সকলে অল্পবিস্তর তাঁরই পথে চলেছিলাম। অবশ্য, তিনি নিজে যেসকল কঠোর সাধনার মধ্য দিয়ে গিয়েছিলেন, আমাদের ততদূর করতে হয় নি। তিনি যেসকল ব্যক্তির ভাব আয়ত্ত করতে চাইতেন, তাদের মত আহার করতেন ও পোষাক পরতেন, তাদের দীক্ষা গ্রহণ করতেন এবং তাদের ভাষায় কথাবার্ত্তা কইতেন। তিনি বলতেন, 'আমাদের যেন অপরের আত্মার ভেতর প্রবেশ করতে হবে।' এই যে পথ, এটী তাঁর নিজস্ব। ভারতবর্ষে কেউই এর পূর্ব্বে পরপর বৈষ্ণব, মুসলমান ও খৃষ্টান ধর্ম্ম গ্রহণ করে নি।"

এইরূপে স্বামিজীর চক্ষে প্রত্যেক জাতির জাতীয়ত্ব বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মমতের ন্যায় অতি পবিত্র বস্তু বলিয়া গণ্য হইত। তিনি মনে করিতেন, প্রত্যেকেই যেন আদর্শ মনুষ্যত্ব সম্বন্ধে নিজের সমগ্র ধারণাটুকু প্রকাশ করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে। একবার তিনি সহসা বলিয়া উঠিয়াছিলেন, "যত বয়স হচ্ছে, ততই আমার মনে হচ্ছে যে, এক 'মনুষ্যত্ব' কথাটীতেই জাতি বল, ধর্ম্ম বল—সবারই সার নিহিত।"

মনের একটী স্বাভাবিক নিয়মানুসারে, যতই তিনি অপরাপর জাতিসমূহের শ্রেষ্ঠ ও প্রীতিপ্রদ গুণগুলির সহিত পরিচিত হইতে লাগিলেন, ততই তিনি ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণের জন্য আপনাকে অধিকতর গৌরবান্বিত বোধ করিতে লাগিলেন; কারণ যেসকল গুণে তাঁহার জন্মভূমি অপর সকল দেশকে অতিক্রম করিয়াছিল, সেইগুলি এখন দিন দিন তাঁহার চক্ষে পড়িতে লাগিল। যুগসকলের ন্যায় জাতিসকলকেও তিনি ক্রমান্বয়ে ভিন্ন ভিন্ন দিক হইতে আলোচনা করিতেন—তাহাদের বহুবিস্তৃত সত্তার একটী মাত্র দিকেই তাঁহার দৃষ্টিকে নিবদ্ধ রাখিতেন না। রোমক সাম্রাজ্যের বংশধর-গণকে তিনি সর্ব্বদাই নিষ্ঠুরপ্রকৃতি বলিয়া বিবেচনা করিতেন এবং জাপানীদিগের বিবাহসম্বন্ধীয় ধারণাকে অত্যন্ত ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। তথাপি তিনি কোন জাতির সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিতে হইলে তাহাদের সদ্‌গুণরাজির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই উহা করিতেন, কখনও তাহাদের দোষগুলি দেখিয়াই বিচার করিতেন না। এই সকল বিষয়ে তাঁহাকে শেষাশেষি যেসকল মন্তব্য প্রকাশ করিতে শুনিয়াছি, তাহার একটী এই, "যদি দেশভক্তি দেখতে চাও ত জাপানীদের দেখ; যদি পবিত্রতা চাও ত হিন্দুদের দেখ; আর যদি মনুষ্যত্ব দেখতে চাও ত ইউরোপীয়দের দেখ।" তারপর তিনি বিশেষভাবে জোর দিয়া বলিলেন, "কোন লোকের পক্ষে শ্রেষ্ঠ গৌরবের জিনিস কি, তা বুঝতে ইংরেজের সমান অপর দ্বিতীয় জাতি জগতে নেই।"

কয়েকজন পরিচিত ভক্তের সহিত কথোপকথনকালে স্বামিজী একদিন বলিয়াছিলেন যে, ভারতবর্ষের সম্বন্ধে তাঁহার বরাবর ইচ্ছা

ছিল "হিন্দুধর্ম্মকে অপরাপর ধর্ম্মের উপর প্রভাববিস্তারের সামর্থ্য দান করা।"

সনাতন ধর্ম্মকে ক্রিয়াশীল ও আত্মবিস্তারশীল হইতে হইবে; তাহাকে বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্যে স্থানে স্থানে প্রচারকদল-প্রেরণে সমর্থ হইতে হইবে; ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বিগণকে স্বমতে আনয়ন করিতে এবং তাহার নিজের যেসকল সন্তান কুহকে পড়িয়া ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়াছে, তাহাদিগকে স্বীয় ক্রোড়ে পুনরায় টানিয়া লইতে সমর্থ হইতে হইবে; পরিশেষে, জ্ঞাতসারে এবং ইচ্ছাপূর্ব্বক নূতন নূতন ভাবসমূহ নিজেব অঙ্গীভূত করিয়া লইবার শক্তি তাহার থাকা চাই। যে মুহূর্ত্তে কোন জাতি বা সম্প্রদায় আপনাকে জীবশরীরের ন্যায় সুসংহত এবং একতাবদ্ধ বলিয়া জানিতে পারে, সেই মুহূর্ত্তেই যে উহা অপর জাতি বা সম্প্রদায়সকলের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে আরম্ভ করে, এ কথা স্বামিজী জানিতেন কিনা বলিতে পারি না। আবার, তিনি নিজেই যে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের ধর্ম্মের মধ্যে এই স্বস্বরূপজ্ঞান পুনরুদ্বোধনে সহায়ক হইবেন, একথাও তিনি জানিতেন কিনা বলা কঠিন। যাহাই হউক না কেন, 'হিন্দুধর্ম্মের সাধারণ ভিত্তিগুলি আবিষ্কার করাই' প্রথম হইতে তাঁহার একমাত্র কার্য্য ছিল, ইহা তাঁহার নিজ মুখের উক্তি। তিনি স্বতঃই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, এইগুলিকে আবিষ্কার করিয়া পুনরায় ঘোষণা করাই জননীস্বরূপ হিন্দুধর্ম্মকে তাঁহার আয়ু ও বল যে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে, এই আনন্দজনক প্রত্যয় জন্মাইয়া দিবার একমাত্র পন্থা। বুদ্ধ ত্যাগ ও নির্ব্বাণ প্রচার করিলেন, অমনি তাঁহার দেহাবসানের দুই শত বৎসরের মধ্যেই ভারতবর্ষ এক শক্তিশালী সাম্রাজ্যে পরিণত হইল; কারণ

এইগুলি জাতীয় জীবনের সার বস্তু। স্বামিজীও সেইরূপ সারবস্তু-সকলের উপর নির্ভর করিয়া সেইগুলিই প্রচার করিবার সঙ্কল্প করিলেন—ফল যাহা হয় হউক।

তিনি বলিতেন যে, হিন্দুধর্ম্ম আপনাকে একমাত্র অতীন্দ্রিয় আধ্যাত্মিক সত্যরূপ প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া ঘোষণা করে এবং প্রত্যেক ব্যক্তিকে একমাত্র উহাকেই পথপ্রদর্শকরূপে গ্রহণ করিতে বলে। সকল শাস্ত্রের মূলে যেসকল জ্ঞানোৎপত্তিবিষয়ক নিয়ম বর্ত্তমান এবং যাহা হইতে সকল শাস্ত্রের উদ্ভব, হিন্দুধর্ম্মে 'বেদ' শব্দে প্রকৃতপক্ষে তাহাই বুঝায়। বেদ-নামধেয় গ্রন্থসমূহে উহার সন্তানগণের মধ্যে কেহ কেহ আস্থা স্থাপন করেন নাই—যেমন জৈনেরা। তথাপি জৈনেরাও যথার্থ হিন্দুপদবাচ্য। যাহা কিছু সত্য তাহাই বেদ, এবং জৈনেরাও যাহা সত্য বলিয়া বুঝিয়াছেন তাহাকেই পূর্ণরূপে মানিয়া চলিলেই হইল। স্বামিজী হিন্দুধর্ম্মের পরিধি যতদূর সম্ভব বিস্তৃত করিয়া দিবার পক্ষপাতী ছিলেন। পক্ষিণী যেমন তাহার ডানাদুটি দিয়া সকল শাবকগুলিকে আচ্ছাদন করিয়া রাখে, হিন্দুধর্ম্মও তাঁহার সকল শাখা-প্রশাখাকে সেইরূপ আচ্ছাদন করিয়া রাখুক, ইহাই স্বামিজীর মনোগত ভাব ছিল। প্রথম বার আমেরিকা যাত্রার পূর্ব্বে তিনি নিজের সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, "আমি এমন একটী ধর্ম্ম প্রচার করতে যাচ্ছি, বৌদ্ধধর্ম্ম যার বিদ্রোহী সন্তান-মাত্র এবং খৃষ্টধর্ম্ম, তার সকল আস্ফালন সত্ত্বেও, যার একটী দূরাগত প্রতিধ্বনি মাত্র।" 'বেদ' শব্দে যদি গ্রন্থগুলিকেই ধরা যায়, তথাপি স্বামিজী বলিতেন যে, বেদের মাহাত্ম্য ধর্ম্মেতিহাসে এক অতুলনীয় সামগ্রী। ইহা শুধু উহাদের অতি প্রাচীনত্বের জন্য নহে, কিন্তু

শতগুণে এইজন্য যে, জগতের যাবতীয় শাস্ত্রগ্রন্থের মধ্যে কেবল বেদই মানবকে সতর্ক করিয়া বলিতেছেন যে, তাহাকে সকল গ্রন্থের পারে যাইতে হইবে।*

এইরূপে, সত্যই হিন্দুধর্ম্মের সকল শাখা-প্রশাখার একমাত্র উদ্দেশ্য। এই সত্য আবার গ্রন্থনিবদ্ধ সত্য নহে যে উহাকে শুধু মানিয়া লইতে হইবে; উহা সকলেরই প্রাপ্য, সকলেই উহার অনুভূতি লাভ করিতে পারেন। এইসকল কারণে হিন্দুধর্ম্মে বিজ্ঞানসম্মত বিশ্বাস ও ধর্ম্মবিশ্বাস, এতদুভয়ের মধ্যে বাস্তব ও কাল্পনিক কোন প্রভেদ নাই। এই ঘটনাটী হইতেই স্বামিজী দেখিয়াছিলেন যে, আধুনিক যুগে বিজ্ঞানকে জ্ঞানরাজ্যের সর্ব্বত্র প্রয়োগ করিবার যে বিশেষ চেষ্টা দেখা যায়, ভারতবাসিগণ সেই ভাবগ্রহণের জন্য সম্পূর্ণরূপে উপযুক্ত হইয়াছে। ভারতের ধর্ম্মচর্চ্চানিরত মনীষিগণ কখনও কোন জ্ঞানবিস্তারে বাধা প্রদান করেন নাই। আরও গৌরবের কথা—হিন্দু যাজককুল প্রত্যেক ব্যক্তির সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে চিন্তা ও বিশ্বাস করিবার অধিকারের বিরুদ্ধে কখনও প্রতিবাদ করিয়াছেন বলিয়া শুনা যায় না। এই শেষোক্ত ঘটনাটী হইতেই ইষ্টনিষ্ঠারূপ মতের উদ্ভব—অর্থাৎ প্রত্যেকেই নিজ নিজ আত্মোন্নতির পথ নির্ব্বাচন করিয়া লইবেন, এবং এইটীকেই স্বামিজী হিন্দুধর্ম্মের একমাত্র সার্ব্বভৌম বিশেষত্ব বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন। ইহারই

---

* গ্রন্থমভ্যস্য মেধাবী জ্ঞানবিজ্ঞানতত্ত্বতঃ।
পলালমিব ধান্যার্থী ত্যজেদ্ গ্রন্থমশেষতঃ॥ —অমৃতবিন্দু উপনিষৎ
শাস্ত্রাণ্যধীত্য মেধাবী অভ্যস্য চ পুনঃ পুনঃ।
পরমং ব্রহ্ম বিজ্ঞায় উল্কাবৎ তান্যথোৎসৃজেৎ॥ —অমৃতনাদোপনিষৎ

বলে হিন্দুধর্ম্ম জগতের যতপ্রকার ধর্ম্ম ও মতমতান্তর থাকিতে পারে, সকলকেই শুধু সমানচক্ষে দেখা নহে, তাহাদিগকে নিজ অঙ্গীভূত করিয়া লইতে সমর্থ। এমন কি, সাম্প্রদায়িকতার ভাবও—যাহাতে সাধক স্বয়ং ঈশ্বরকে নিজ মতাবলম্বী বলিয়া বিশ্বাস করে, নিজের ক্ষুদ্র সম্প্রদায়টীকেই একমাত্র খাঁটি সম্প্রদায় বলিয়া মনে করে, এবং যাহাতে সময়ে সময়ে চরম গোঁড়ামি পর্য্যন্ত স্থান পাইয়া থাকে—তিনি দেখাইয়া দিয়াছিলেন যে, উহাও হিন্দুধর্ম্মের চক্ষে অসত্য বা সঙ্কীর্ণতার চিহ্ন না হইয়া শুধু অপরিণত বয়সেরই লক্ষণ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন বলিয়াছিলেন, উহা বিচারের বেড়া—চারাগাছের পক্ষে অত্যাবশ্যক, কিন্তু বড় গাছের পক্ষে অত্যন্ত হানিকর। যতক্ষণ আমরা 'এইরূপ হওয়া চাই বা চাই না' বলিয়া সকল জিনিসের একটা সীমা নির্দ্দেশ করিয়া দিতে পারি, ততক্ষণ স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, আমরা সসীম বস্তু লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছি। যখন পূর্ণ অভিজ্ঞতা লাভ হইবে, তখন আমাদের মন কেবল অনন্তের চিন্তাতেই ব্যাপৃত থাকিবে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, "সকলেই খানিকটা জমি বেড়া দিয়ে নিয়ে বলে থাকে, 'ওটা আমার জমি,' কিন্তু আকাশকে কে বেড়া দিয়ে ভাগ করতে পারে?"

যে বহু সম্প্রদায় ও মতমতান্তরের সমষ্টিতে হিন্দুধর্ম্ম গঠিত, তাহাদের প্রত্যেকে অপরোক্ষানুভূতিরূপ ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান, এবং অনন্ত উদারতা উহাদের সকলেরই একটী বিশিষ্ট লক্ষণ। যাজককুল যে, কিছু নিয়ম অবশ্য পালনীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, সে সমস্তই সামাজিক আচারব্যবহার লইয়া। ফলে ইহাতে আচারের খুব বাঁধাবাঁধির সৃষ্টি করিলেও, ইহাও বুঝা গিয়াছিল যে, তাঁহাদের

মতে মানবমন চিরকালই স্বাধীন। তথাপি ইহা অস্বীকার করিতে পারা যায় না যে, হিন্দুধর্ম্মের ভিতর চিন্তাশক্তির যতদূর প্রসারলাভ হইয়াছিল, তন্মধ্যে কয়েকটী বিশিষ্ট ভাবের সমাবেশ পরিলক্ষিত হয়। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের শিকাগো ধর্ম্মমহাসভায় এইগুলিই স্বামিজীর বক্তৃতার প্রধান বর্ণনীয় বিষয় ছিল।

ভারতবর্ষের অস্থিমজ্জাস্বরূপ এইসকল বিশিষ্ট ধারণার প্রথমটী এই যে, সৃষ্টিপ্রবাহ চক্রবৎ আবর্ত্তিত হইতেছে। সৃষ্টি থাকিলেই তাহার একজন স্রষ্টা থাকিবে, এবং স্রষ্টা বলিলেই সৃষ্টি বুঝাইয়া যায় —উভয়েই তুল্যরূপে পরস্পরের সাপেক্ষ। এই যে দ্বৈতমূলক সম্বন্ধ, তাহা আপেক্ষিক সত্য বই আর কিছুই নহে। হিন্দুধর্ম্মে এ সম্বন্ধে অনেক গভীর দার্শনিক বিচার আছে। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার সকল জিনিসকে পাকা করিয়া বুঝিয়া লইবার স্বাভাবিক ক্ষমতা-প্রভাবে উহা দুই-চারি কথায় প্রকাশ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। সাধারণ ভারতীয় চিন্তার আর একটী প্রকৃষ্ট উদাহরণস্বরূপ তিনি যে দ্বিতীয় মতটীর আলোচনা করিয়াছিলেন, তাহা পুনর্জ্জন্ম ও কর্ম্মবাদ, যাহার চরম পরিণতি মানবের অন্তর্নিহিত ব্রহ্মভাবের পূর্ণ বিকাশে। পরিশেষে, চিন্তা ও পূজার শত আকারভেদ সত্ত্বেও সত্য যে সকল সময়েই এবং সর্ব্বাবস্থায়ই এক, ইহা ঘোষণা করিয়াই তিনি হিন্দু ধর্ম্মের সকল গৌণ বিশেষত্ব-নির্দ্দেশের পরিসমাপ্তি করেন। কয়েকটী মাত্র প্রাঞ্জল বাক্যে তিনি হিন্দুধর্ম্মের একত্ব সর্ব্ববাদিসম্মতরূপে প্রমাণিত এবং উহার মুখ্য লক্ষণগুলিকে বর্ণনা করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্ত্যদেশে তাঁহার অবশিষ্ট যাহা কিছু কার্য্য, তাহা প্রধানতঃ সনাতন ধর্ম্মের অন্তর্গত মহাসত্যগুলিকে আধুনিক ও সর্ব্বজনোপযোগী

আকারে সকলের মধ্যে অকাতরে বিতরণ করা। ধর্ম্মাচার্য্যহিসাবে তাঁহার নিকট সমগ্র জগৎই ভারতবর্ষ, এবং সর্ব্বদেশের মানবই তাঁহার নিজ ধর্ম্মাবলম্বীদিগেরই অন্যতম, বলিয়া পরিগণিত হইত।

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে ভারতবর্ষে প্রত্যাগমনের পরই, স্বামিজী তাঁহার স্বদেশবাসিগণের চিন্তার পুষ্টিকল্পে তাঁহার নিজের যাহা দিবার কথা ছিল, তাহাই দার্শনিক আকারে প্রদান করেন। ভারতের সকল যুগপ্রবর্ত্তকগণকেই যে ঐরূপ করিতে হয়, তাহা অন্যত্র উক্ত হইয়াছে। এতাবৎকাল অদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ এবং দ্বৈতবাদ, এই তিনটী দর্শন জীবকে মুক্তির তিনটী পৃথক আদর্শ দেখাইতেছে, ইহাই বিবেচিত হইত। এইসকল মতবাদের পরস্পরের মধ্যে সমন্বয়স্থাপনের কোন চেষ্টাই ইতিপূর্ব্বে হয় নাই। কিন্তু ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজে পৌঁছিয়া স্বামিজী সাহসপূর্ব্বক ঘোষণা করিলেন যে, দ্বৈতবাদ ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের যে চরম অনুভূতি, তাহাও অদ্বৈতবাদেরই নিম্নতর সোপানমাত্র, এবং সকলের পক্ষেই চরম আনন্দ সেই একমেবাদ্বিতীয়ম্ সত্তায় বিলীন হওয়া। শুনা যায়, তাঁহার মধ্যাহ্নকালীন প্রশ্নোত্তর-ক্লাসে একদিন অনেক শ্রোতা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, "যদি এটাই সত্য হয়, তবে একথা কোন পূর্ব্বতন আচার্য্যই উল্লেখ করেন নি কেন?" উপস্থিত পণ্ডিতগণের মধ্যে যাঁহারা ইংরেজী জানিতেন না, তাঁহাদের সুবিধার জন্য ক্লাসে নিয়ম ছিল যে, ঐসকল প্রশ্নের উত্তর প্রথমে ইংরেজীতে দিয়া পরে সংস্কৃতে দেওয়া হইবে। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে, সেই বৃহৎ সভাস্থ সকলেই এই উত্তর শুনিয়া চমৎকৃত হইলেন, "যেহেতু আমি ঐ জন্যে জন্মেছি, এবং ওটা আমারই জন্যে নির্দ্দিষ্ট ছিল।"

স্বামিজী-প্রচারিত মতসমূহের সমষ্টিভাবে আলোচনা

ভারতবর্ষে হিন্দুধর্ম্মের অসংখ্য শাখা-প্রশাখাকে উহার গণ্ডীর বাহিরে রাখিবার কোন চেষ্টাই স্বামিজী আদৌ সহ্য করিতে পারিতেন না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে—কোন ব্যক্তিই ব্রাহ্ম বা আর্য্যসমাজভুক্ত হওয়াব জন্য তাঁহার নিকট অহিন্দু বলিয়া গণ্য হইতেন না। শিখদিগের বিখ্যাত খালসা সৈন্যদলের মত সঙ্ঘ অতি অল্পই দেখা যায়; উহা তাঁহার মতে হিন্দুধর্ম্মেরই সৃষ্টি এবং তাহারই অপূর্ব্ব বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। কি আগ্রহের সহিত তিনি আমাদিগের নিকট পুনঃপুনঃ গুরুগোবিন্দ সিংহের শিষ্যগণের প্রতি 'কে ধর্ম্মের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত আছ?'—এই আহ্বান ও তৎকালীন দৃশ্যের জলন্ত বর্ণনা করিতেন! স্বামিজী বলিতেন, হিন্দুধর্ম্মের তিনটী পৃথক স্তর আছে, দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম—প্রাচীন, ঐতিহাসিক, শাস্ত্রানুবর্ত্তী ধর্ম্ম। দ্বিতীয়—মুসলমান রাজত্বকালের ধর্ম্মসংস্কারকগণ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত সম্প্রদায়সমূহ। তৃতীয়—বর্ত্তমান কালের সংস্কারপ্রয়াসী সম্প্রদায়সমূহ। কিন্তু এই সকলগুলিই সমভাবে হিন্দুপর্য্যায়ভুক্ত। স্বদেশের ও স্বীয় ধর্ম্মের সমস্যাগুলিকে সমষ্টিভাবে আলোচনা করিবার তাঁহার নিজের যে ইচ্ছা ছিল, তাহা যে তাঁহার যৌবনে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজেব সদস্যশ্রেণীভুক্ত হওয়াতেই প্রথম পূর্ণতার পথে অগ্রসর হয়, ইহা তিনি কদাপি বিস্মৃত হন নাই। এই সদস্য হওয়ার কথা অস্বীকার করা দূরে থাকুক, তিনি বরং একদিন আগ্রহসহকারে বলিয়াছিলেন, "আমি তাঁদেরই একজন কি-না, একথা তাঁরাই বলুন! আমার নাম যদি তাঁরা কেটে না দিয়ে থাকেন, তবে সেটা আজও তাঁদের খাতায় রয়েছে!" এইরূপে, তাঁহার মতে, কোন ব্যক্তি নিজ হিন্দু আখ্যাকে আর্য্য, ব্রাহ্ম বা

সনাতনপন্থী—এইসকল বিশেষণে বিশেষিত করুন বা নাই করুন, তিনি হিন্দুই। জৈনদিগের হিন্দুধর্ম্মেরই অন্তর্ভুক্ত হওয়ার দাবী যে সত্য, সে কথা অতি সহজেই সামাজিক আচার-ব্যবহার ও ইতিহাসের সাহায্যে সপ্রমাণ করা যাইতে পারে। পশ্চিম ভারতের জৈনগণকে যদি বলা যায়, 'আপনারা হিন্দু কি-না, তদ্বিষয়ে বাস্তবিক সন্দেহ আছে,' তাহা হইলে তাঁহারা আজিও উত্তেজিত হইয়া উঠিবেন। এখন পর্য্যন্ত তাঁহারা বিবাহকালে হিন্দুদিগের সহিত সমান শ্রেণীতে কন্যা আদানপ্রদান করিয়া থাকেন, এবং অদ্যাপি তাঁহাদের মন্দিরে সময়ে সময়ে সাধারণ ব্রাহ্মণগণই পৌরোহিত্য করিয়া থাকেন। সকল ধর্ম্মের লোকের ভিতরই—মুসলমানগণের ভিতরও—স্বামিজীর শিষ্য ছিল, এবং তাঁহার কতিপয় জৈন বন্ধুর সহায়তায় তিনি এমন কতকগুলি জৈন ধর্ম্মগ্রন্থ পড়িতে পারিয়াছিলেন, যাহা অপর সম্প্রদায়ের লোকদিগকে সচরাচর দেখিতে দেওয়া হয় না। এই অধ্যয়নের ফলে তিনি জৈনদিগের ধর্ম্মমত ও পরম্পরাগত আচারসকলের প্রামাণিকতা বিষয়ে গভীরভাবে আস্থাবান হইয়াছিলেন, এবং ইহাও বুঝিয়াছিলেন যে, হিন্দুধর্ম্মের অভিব্যক্তিতে উক্ত ধর্ম্ম বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছে। হিন্দুধর্ম্মের দুইটী প্রবল এবং মুখ্য ভাব এই—বাক্‌শক্তিহীন ইতরজন্তুগণের ভিতরও সেই বিভু বর্ত্তমান বলিয়া তাহাদিগের প্রতিও সর্ব্বদা সদয় ব্যবহার এবং সাধুজীবনে আদর্শ ত্যাগ-তপস্যার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা। জৈনেরা এই দুইটী জিনিসকে পৃথক্ করিয়া লইয়া উহাদিগকে বিশেষভাবে প্রচার করিয়াছেন। আবার, জীবাণু-ঘটিত তত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহাদের স্পষ্ট উক্তিসকল হইতে এই ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতৃগণের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মভাবের

উন্নতির বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়—বিশেষতঃ আধুনিক বিজ্ঞান নানাবিধ পরীক্ষান্তে তাঁহাদের মতই সমর্থন করিয়াছে বলিয়া। স্বামিজী বলিতেন, "জৈনরা যে বলে থাকেন যে, তাঁদের মতসকল প্রথমে ঋষিদের দ্বারা প্রচারিত হয়েছিল, একথা অতি সত্য, এবং সহজেই বুঝা যায়।"

আজকাল ভারতের যেসকল জাতি খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে, তাহাদের সম্বন্ধে স্বামিজী আশা করিতেন যে, তাহারা রাজনীতিক্ষেত্রে যে জাতি প্রভুত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাদের ধর্ম্ম পরিগ্রহ করিয়া সামাজিক পদমর্য্যাদাদি বিষয়ে উন্নীত হইবে, এবং ভাবী যুগে লোকে যখন খৃষ্টধর্ম্মের কথা ভুলিয়া যাইবে, তখনও তাহারা ঐ উন্নতি বজায় রাখিতে সমর্থ হইবে। এইরূপে আমরা আশা করিতে পারি যে, ভবিষ্যতে লোকে ঊনবিংশ শতাব্দীকে আর ভেদকারিণী শক্তি বলিয়া মনে রাখিবে না, এবং উহা ভারতের সকল ব্যাপারেই স্থায়ী উন্নতিরূপ সুফল প্রসব করিবে। এরূপ উন্নতি যে সম্ভবপর, তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা আর্য্যাবর্ত্তে চৈতন্যদেবের কার্য্যের উল্লেখ করিতে পারি। তিনি তাঁহার পদানুবর্ত্তীদিগকে একটী বিলক্ষণ খ্যাতিপ্রতিপত্তিশালী সমাজে পরিণত করিয়া যাইতে সমর্থ হন নাই কি?

বর্ত্তমান সময়ে খৃষ্টধর্ম্ম যেভাবে কার্য্য করিতেছে, তাহাতে উহাকে সহজে ক্ষমা করা যায় না। হিন্দুধর্ম্মের অপর যে প্রতিযোগী ধর্ম্ম, অর্থাৎ মুসলমান ধর্ম্ম, উহা সেরূপ নহে। উক্ত ধর্ম্মের নাম-শ্রবণমাত্র আমাদের আচার্য্যদেবের মনে সর্ব্বদা একটী আগ্রহপূর্ণ ভ্রাতৃভাবের কথার উদয় হইত—যাহা সাধারণ লোকদিগকে সর্ব্ববিধ

স্বাধীনতা প্রদান করিয়া থাকে, এবং উচ্চপদস্থ লোকদিগকে সর্ব্ব-সাধারণের সহিত সমান পর্য্যায়ে রাখিয়া দেয়। মুসলমানগণ এদেশে অনধিকার-প্রবেশ করিলেও, তাঁহারা যে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ও রাজ্যশাসনপদ্ধতি, এই দুইটী বস্তু ঘাড় পাতিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, এবং উহা যে, যেসকল কারণ হইতে বর্ত্তমান ভারত গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাদের মধ্যে অন্যতম—স্বামিজী মুহূর্ত্তের জন্য একথা বিস্মৃত হইতেন না। আবার, নীচবংশোদ্ভবগণকে উচ্চ উচ্চ সামাজিক অধিকাব প্রদান করিয়াই ক্ষান্ত না হইয়া, তাহারা যে এই অতি শান্তস্বভাব জাতিটীর মধ্যে দলবদ্ধভাবে আত্মরক্ষার্থে উদ্যম ও বাধাপ্রদানরূপ আদর্শদ্বয়কে সংরক্ষণ ও পোষণ করিয়াছে—তাহাদিগের কৃত এই উপকারও স্বামিজীর নিকট উপেক্ষণীয় বস্তু ছিল না। তিনি সর্ব্বদাই দেখাইয়া দিতেন যে, মুসলমানগণের মধ্যে সৈয়দ, পাঠান, মোগল ও শেখ, এই চতুর্ব্বিধ শ্রেণী আছে, এবং ইহাদের মধ্যে শেখদিগেব ভারতের মৃত্তিকা ও অতীতকালীন স্মৃতিতে উত্তরাধিকারিস্বত্ব রহিয়াছে —সে স্বত্ব ঠিক হিন্দুদিগেরই মত প্রাচীন, ও তৎসম্বন্ধে কেহ কোন আপত্তি উঠাইতে পারেন না। অবিবেচনাপূর্ব্বক লিখিত একটী শব্দ-প্রসঙ্গে তিনি জনৈক শিষ্যকে বলিয়াছিলেন, "সাজাহান নিজেকে 'বিদেশী' নামে অভিহিত হতে শুনলে কবরের মধ্য থেকেও ফিরে দেখতেন, কে তাঁকে ঐরকম বলছে।" সর্ব্বশেষে, মাতৃভূমির কল্যাণকল্পে স্বামিজীর শ্রেষ্ঠ প্রার্থনা ছিল—মাতা যেন 'ইসলামীয় দেহ ও বৈদান্তিক হৃদয়'-রূপ দ্বিবিধ আদর্শের বিগ্রহস্বরূপ হয়েন।

এইরূপে, যদিও এবংবিধ ঘটনাসকলের রাজনীতিক গুরুত্বের সহিত তাঁহার কোনই সম্পর্ক ছিল না, তথাপি তিনি সমগ্র ভারতবর্ষকে

একতাসূত্রে আবদ্ধ জ্ঞান করিতেন। তলাইয়া দেখিলে ঐ একতা মনের মত না হউক, হৃদয়ের একতা বলিয়া উপলব্ধি হইবে। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, জগতে তাঁহার কার্য্য তাঁহার গুরুদেবের উপদেশসমূহ আচণ্ডালে বিতরণ করা। কিন্তু তাঁহার ব্যক্তিগত চেষ্টা ও ইচ্ছাসকল স্বদেশের কল্যাণসাধনের অদম্য কামনার সহিত বিশেষভাবে জড়িত ছিল। তিনি কখনও জাতীয়ত্ব প্রচার করেন নাই ; কিন্তু উক্ত শব্দে যাহা বুঝায়, তিনি স্বয়ংই তাহার জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি-স্বরূপ ছিলেন। পরস্পরের মধ্যে যে প্রগাঢ় প্রীতি ভারতের জাতীয় আদর্শ, আমাদের আচার্য্যদেব নিজ জীবন দ্বারা আমাদিগকে তাহাই দেখাইয়া দিয়াছিলেন।

মনে রাখিতে হইবে যে, ভারতের অতীতকে মাত্র পুনরুজ্জীবিত বা পুনঃস্থাপিত করা স্বামিজীর আদৌ অভিপ্রেত ছিল না। যাঁহারা ঐরূপ করিতে প্রয়াস পাইতেন, তাঁহাদিগকে উদ্দেশ করিয়াই তিনি বলিয়াছিলেন, "যারা মিশর দেশের পুরাতত্ত্ব-আলোচনায় ব্যস্ত থাকে, তাদের যেমন ঐ দেশের প্রতি একটা স্বার্থজড়িত অনুরাগ থাকে, তেমনি এঁদের ভারতের প্রতি অনুরাগও সম্পূর্ণ স্বার্থজড়িত। এঁদের পড়া বইগুলিতে, চর্চ্চায় এবং কল্পনারাজ্যে যে ভারতের চিত্র এঁদের মনোমধ্যে রয়েছে, সেই অতীত যুগের ভারতকেই এঁরা আবার দেখবার জন্য লালায়িত হন।" তিনি নিজে দেখিতে চাহিতেন যে, সেই প্রাচীন ভারতের বলবীর্য্য এই নূতন যুগে নূতন ভাবে প্রযুক্ত হউক, এবং কল্পনাতীতরূপে প্রকাশপ্রাপ্ত হউক। তিনি একটী 'ক্রিয়াশীল ধর্ম্ম' (dynamic religion) দেখিতে চাহিতেন। কেন লোকে ধর্ম্মের শুধু নীচ, অধোগতিসূচক এবং উন্নতির পরিপন্থী অংশগুলিকেই বাছিয়া লইয়া তাহাদিগকে 'প্রাচীনপন্থী' (orthodox)

আখ্যায় অভিহিত করিবে? উক্ত শব্দ এত মহান্, এত বলবীর্য্যশালী, এবং এত প্রাণশক্তিপূর্ণ যে, উহাকে ঐরূপ কোন ভাবে প্রয়োগ করা চলে না। যে পরিবারে সকল পুরুষই পাণ্ডব বীরদিগের তুল্য, এবং সকল স্ত্রীই সীতার ন্যায় মহীয়সী, বা সাবিত্রীর ন্যায় নির্ভীকা, শুধু সেই পরিবার সম্বন্ধেই ঐ শব্দের যথার্থ প্রয়োগ হইতে পারে। সকল বিশেষ সমস্যা হইতেই তিনি দূরে থাকিতেন, উহা রক্ষণশীলতা, বা সংস্কার—যাহাই হউক। তাহার কারণ ইহা নহে যে, তিনি কোন এক দলের প্রতি অন্য দল অপেক্ষা অধিক সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন; উহার প্রকৃত কারণ এই—তিনি দেখিতেন যে, উভয় দলের পক্ষেই প্রকৃত প্রয়োজন আদর্শটীকে ঠিক ঠিক ধরিতে পারা, এবং উহাকে ভারতের অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করাইয়া দেওয়া। নারীগণের এবং নিম্নশ্রেণীস্থ লোকদিগের উভয়ের জন্যই তিনি বলিতেন যে, তাহাদের প্রতি আমাদের কর্ত্তব্য সমাজের বর্ত্তমান ব্যবস্থাগুলিকে পরিবর্ত্তন করা নহে, কিন্তু যাহাতে তাহারা নিজেদের সমস্যা নিজেরাই সমাধান করিয়া লইতে পারে, শিক্ষাবিস্তার দ্বারা তাহারই ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া।

যাহা জগতে অলৌকিক রহস্য নামে পরিচিত, সেই জিনিসটীকে ভারতের সহিত অভিন্ন জ্ঞান করাকে তিনি এরূপ উৎকট ভীতির চক্ষে দেখিতেন যে, ঐ ভয় তাঁহার এই অজ্ঞানের প্রতি বিদ্বেষ অপেক্ষা বড় কম ছিল না। শিক্ষিত লোকদিগের এবিষয়ে যেরূপ স্বাভাবিক ঔৎসুক্য ও কৌতূহল থাকে, তাহা তাঁহারও ছিল, এবং জলের উপর দিয়া হাঁটিয়া যাওয়া, আগুনে হাত দেওয়া প্রভৃতির কথা শুনিলে উহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য তিনি অসুবিধা স্বীকার করিতেও

সর্ব্বদাই প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু বিশেষ করিয়া অনুসন্ধান করিলে এই সকল ব্যাপার যে শেষে প্রায়ই অত্যন্ত অবিশ্বাস্য শোনা-কথায় গিয়া দাঁড়ায়, তাহা সকলেই জ্ঞাত আছেন। যাহাই হউক না কেন, তাঁহার নিকট এইসকল ঘটনা শুধু ইহাই সূচিত করিত যে, আমাদের ঘটনাসকলের বর্ত্তমান শ্রেণীবিভাগ অসম্পূর্ণ, এবং উহাকে সংশোধন করিয়া, যাহা সচরাচর চক্ষে পড়ে না অথচ যাহা সম্ভবপর, এমন কতকগুলি ব্যাপারকেও উহার অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইতে হইবে। উহারা আমাদিগকে এই সরল উপদেশটুকুই দেয়। তাঁহার নিকট উহারা কোনক্রমেই অলৌকিক বলিয়া বিবেচিত হইত না। কোন ভিক্ষু ঐরূপ অতিপ্রাকৃত কার্য্য করায় ভগবান বুদ্ধ তাঁহার সন্ন্যাসের পরিচ্ছদ কাড়িয়া লইয়াছিলেন—এই গল্পটী স্বামিজীর যত মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছিল, বুদ্ধ-জীবনের অপর অতি অল্প ঘটনাই সেরূপ হইয়াছিল। আর খৃষ্টান বাইবেলে যে মহাপুরুষের লীলাসমূহ বর্ণিত হইয়াছে, তৎ-সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছিলেন যে, যদি তিনি কতকগুলি অদ্ভুত কর্ম্ম করিয়া লোকের বিশ্বাস উৎপাদন করিবার চেষ্টা না করিতেন, তাহা হইলে তিনি (স্বামিজী) তাঁহাকে আরও সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ চরিত্র বলিয়া জ্ঞান করিতেন। এই বিষয়ে আমাকে পরে স্বামী সদানন্দ যাহা দেখাইয়া দিয়াছেন, তাহাই বোধ হয় সত্য—অর্থাৎ, পূর্ব্ব ও পশ্চিম এসিয়ার মধ্যে মনোবৃত্তির পার্থক্যের ন্যায় একটা ধাতুগত পার্থক্যও আছে। পশ্চিম এসিয়া চিরকাল শক্তি বা সিদ্ধাই-এর কিছু কিছু নিদর্শন দেখিতে চায়, কিন্তু পূর্ব্ব এসিয়া উহাকে বরাবর ঘৃণা করে। স্বামী সদানন্দের মতে, এই বিষয়ে মোঙ্গলীয় ও সেমিটিকদিগের ধারণা বিপরীত, আর আর্য্যেরা এই দুইয়ের মধ্যবর্ত্তী থাকিয়া, উহা উচিত

কি অনুচিত, ইহাই বিচার করিয়া থাকেন। সে যাহাই হউক, আমাদের অনেকেই স্বীকার করিবেন যে, তথাকথিত অলৌকিক ব্যাপারে আজকালকার লোকের যেরূপ আগ্রহ পড়িয়াছে, তাহাতেই অনেকটা এই অনিষ্টকর ধারণা জন্মাইয়া দিয়াছে যে, প্রাচ্য মানব যেন এক দুর্ব্বোধ্য প্রকৃতির জীব, সাধারণ মানবের ইচ্ছা-অনিচ্ছার সহিত যেন তাহার কোনও সম্পর্ক নাই, এবং তাহাদের শরীরে অমানুষিক শক্তির গুপ্ত ভাণ্ডারসকল সঞ্চিত আছে। এইসকল কথা স্বামিজীর নিকট ঘৃণার বস্তু ছিল। তিনি চাহিতেন যে, সকলে বুঝুক—ভারতবর্ষে মানুষের বাস; ভারতবাসীদের চরিত্র খুব বিশেষত্ব-পূর্ণ বটে, এবং অন্য সকলের অপেক্ষা তাহাদের শিক্ষাদীক্ষা অধিক, কিন্তু সকল মানুষের ন্যায় তাহারাও সর্ব্বাংশে মানুষ, এবং মানব সাধারণের সকল কর্ত্তব্য, দাবীদাওয়া ও সুখদুঃখ তাহাদেরও আছে।

প্রাচীন কালে ভারতীয় ঋষিগণ ভারতবাসীদিগের নিকট যে ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, উদারহৃদয় স্বামিজী পাশ্চাত্যবাসীদিগের নিকটও সেই ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। মানবের মধ্যে ব্রহ্মভাব অন্তর্নিহিত রহিয়াছে, এবং যে-কোন আকারের নিষ্ঠাসহকৃত সেবাদ্বারা উহার বিকাশ করা যায়—ইহাই উক্ত ধর্ম্মের সার কথা। বাহ্য জগতের যে জীবন, যাহাতে লোকে ইন্দ্রিয়জ অনুভূতিগুলিকেই সার জ্ঞান করিয়া তাহাতেই চিত্ত নিবিষ্ট করিয়া থাকে—উহা স্বামিজীর মতে মোহজনিত কল্পনা বা স্বপ্নমাত্র; উহাতে উচ্চ বা মহান্ কিছুই নাই। প্রাচ্য মানবের যেমন, তেমনি পাশ্চাত্ত্য মানবেরও আত্মার আকাঙ্ক্ষা—এই স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া এক গভীরতর এবং অধিকতর শক্তিশালী বাস্তব সত্তায় জাগরিত হওয়া। সকল মানবের ভিতরেই যে সেই এক বিপুল শক্তি

প্রচ্ছন্নভাবে রহিয়াছে, তাঁহার এই বিশ্বাস তিনি ক্রমাগত নূতন নূতন ভাবে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিতেন। তিনি একবার বলিয়াছিলেন, "সত্য বটে, আমার নিজের জীবন এক মহাপুরুষের অপূর্ব্ব ভাবরাশির অনুপ্রেরণায় চলছে, কিন্তু তাতে কি? ঈশ্বরীয় ভাবসকল শুধু এক ব্যক্তির মধ্য দিয়েই জগতে প্রচারিত হয় নি!"

তিনি আবার বলিয়াছিলেন, "সত্য বটে, আমি বিশ্বাস করি যে, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস আপ্ত পুরুষ ছিলেন। কিন্তু আমিও একজন আপ্ত এবং তুমিও আপ্ত। তোমার শিষ্যরাও ঐরকম হবে, তারপর তাদের শিষ্যগণও—এভাবে অনন্তকাল ধরে চলতে থাকবে!"

প্রাচীনকালের আচার্য্যদিগের এক নিয়ম ছিল যে, যাহারা পরীক্ষা দ্বারা উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে, শুধু তাহাদিগকেই সত্যের উপদেশ করা হইবে। একবার এক ব্যক্তি স্বামিজীকে ঐ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করায় তিনি থাকিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিলেন, "দেখছ না যে, রহস্যব্যাখ্যার নাম দিয়ে সত্যকে জনকতক লোকের মধ্যে আটকে রাখবার যুগ চলে গেছে? ভালর জন্যই হোক, আর মন্দর জন্যই হোক, সে দিন জন্মের মত কালগর্ভে বিলীন হয়েছে। ভবিষ্যতে সত্যের দ্বার সমস্ত জগতের কাছে উদ্ঘাটিত থাকবে!"

সমগ্র ভারতবর্ষকে ইউরোপীয়দিগের দ্বারা প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মভাব ও সম্প্রদায়সমূহে প্লাবিত করিবার যে পুনঃ পুনঃ চেষ্টা হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে স্বামিজী অপূর্ব্ব কৌতুকসহকারে বলিতেন যে, সে সমুদয় এক জাতির কল্যাণকল্পে অপর এক জাতিকে উচ্ছেদ করিবার এক সুদীর্ঘ চেষ্টারই চরম ফলমাত্র। কিন্তু ধর্ম্মের ব্যাপারে ঐরূপ ইউ-রোপীয় নেতৃত্বের সফলতায় তিনি কদাপি বিশ্বাস করিতেন না।

সর্ব্বশেষে, খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীতে অশোক তাঁহার দেশবিদেশে প্রেরিত ধর্ম্মপ্রচারকগণকে যে মহান্ ভার অর্পণ করিয়াছিলেন, তাহার ন্যায় ভারতেতিহাসের অপর কোন ঘটনাই স্বামিজী বারংবার উল্লেখ করিতেন না। যাঁহারা দেশদেশান্তরে বুদ্ধোক্ত ধর্ম্ম বহন করিয়া লইয়া যাইবেন, তাঁহাদিগকে সেই প্রতাপান্বিত সম্রাট বলিয়াছিলেন, "মনে রাখবেন যে, সকল স্থানেই আপনারা ধর্ম্ম ও সদাচারের কিছু-না-কিছু বীজ দেখতে পাবেন। দেখবেন যেন আপনারা সেগুলি পোষণ করেন, এবং কখনও নষ্ট না করেন!" এইরূপে অশোক কল্পনা করিয়াছিলেন যে, সমগ্র জগৎ একদিন ভাবরাশির দ্বারা এক সূত্রে গ্রথিত হইবে, এবং ঐসকল ভাব সর্ব্বদাই চরম সত্যলাভ ও আদর্শ-আচরণের ইচ্ছা দ্বারা পরিচালিত ও অনুপ্রাণিত হইবে। কিন্তু অশোকের ঐ স্বপ্ন সফল হইবার পক্ষে প্রাচীনকালের অসংখ্যজাতি-অধ্যুষিত, অর্দ্ধজানিত দেশসমূহে গমনাগমনের, এবং দ্রব্যসম্ভার লইয়া যাইবার উপযোগী পথের, অভাব অন্তরায়স্বরূপ হইয়াছিল। সুতরাং তাঁহার সঙ্কল্পিত জগৎ-একীকরণের পূর্ব্বানুষ্ঠেয় কার্য্যগুলি সম্পন্ন করিতেই স্বভাবতঃ এত অধিক সময়ের প্রয়োজন ছিল যে, যে বিশ্বাস ও শক্তিতরঙ্গ প্রথমে উক্ত প্রচারকার্য্যের সূত্রপাত করিয়াছিল, তাহা হয়ত ইত্যবসরে লোপ পাইয়া যাইবে। সম্ভবতঃ এইসকল বিষয় আলোচনা করিয়াই স্বামিজী একদিন, আমরা কাঠগুদামের কিঞ্চিৎ উপরিভাগে অবস্থিত গিরিবর্ত্মটীতে প্রবেশ করিলে, দীর্ঘকাল গভীর চিন্তার পর সহসা আমাদের দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিলেন, "বৌদ্ধদের যে কল্পনা ছিল, শুধু আধুনিক জগৎই তার জন্য উপযুক্ত হয়েছে। আমাদের আগে কেউই তাকে কাজে লাগাইবার সুযোগ পায় নি!"

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

স্বামিজী বুদ্ধকে কি চক্ষে দেখিতেন

বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনা দ্বারা মানবমনে যে বিবিধ অনুরাগ উৎপন্ন হয়, স্বামিজীর জীবনে বুদ্ধের প্রতি ভক্তিই তাহাদের সর্ব্বপ্রধান। সম্ভবতঃ ভারতের এই মহাপুরুষের জীবনের ঐতিহাসিক সত্যতা হেতুই তিনি উহাতে এত আনন্দ অনুভব করিতেন। তিনি বলিতেন, "ধর্ম্মাচার্য্যগণের মধ্যে কেবল বুদ্ধ ও মহম্মদ সম্বন্ধেই আমরা প্রকৃত বৃত্তান্ত জানি, কারণ সৌভাগ্যক্রমে তাঁদের শত্রু-মিত্র দুই-ই ছিল।" তাঁহার নায়কের চরিত্রে যে পূর্ণ জ্ঞান-বিচারের পরিচয় পাওয়া যায়, তিনি বার বার তাহারই বর্ণনা করিতেন। তাঁহার নিকট বুদ্ধ শুধু আর্য্যগণের মধ্যেই শ্রেষ্ঠ নহেন, কিন্তু পৃথিবীতে যত লোক জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তন্মধ্যে একমাত্র তিনিই সম্পূর্ণ স্থির-মস্তিষ্ক ছিলেন। তিনি কেমন পূজা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন! কিন্তু কেহ কেহ যে বাস্তবিকই তাঁহাকে পূজা করিয়াছিল, সে বিষয়ে স্বামিজী কোন উচ্চবাচ্য করেন নাই। তিনি বলিয়াছিলেন, "বুদ্ধ ব্যক্তি-বিশেষের নাম নয়, ওটী একটী উচ্চ অবস্থা। এস, সকলে সেটী লাভ কর। এই নাও তার চাবি!"

সাধারণ লোকেরা আজগুবী ব্যাপার দেখিবার জন্য যে ঔৎসুক্য প্রকাশ করে, বুদ্ধ উহাতে এত বীতস্পৃহ ছিলেন যে, তিনি একটী

যুবককে জনতার সমক্ষে একটা খোঁটার উপর হইতে বাক্যমাত্র দ্বারা একটী মণিখচিত বাটী নামাইয়া আনার জন্য নির্ম্মমভাবে সঙ্ঘ হইতে বাহির করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে, ধর্ম্মের সহিত বুজরুকীর কোন সম্পর্ক নাই।

এই আনন্দময় পুরুষের কি অসাধারণ স্বাধীনতা ও দীন ভাব ছিল! তিনি বারনারী অম্বপালীর নিমন্ত্রণে যোগদান করিয়াছিলেন। তিনি এক অন্ত্যজের গৃহে ভিক্ষাগ্রহণ করিয়াছিলেন—উহাতে তাঁহার মৃত্যু হইবে, তাহা জানিয়াও ঐরূপ করিয়াছিলেন। তিনি ইচ্ছা করিয়াছিলেন যে, হীনপদস্থ লোকদিগের সহিত মেলামেশার ব্যাপারই তাঁহার জীবনের শেষ কার্য্য হউক। তৎপরে তিনি আবার, যাহার গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাকে মহাপরিনির্ব্বাণের সহায়তা করার জন্য সৌজন্যপূর্ণ বচনে ধন্যবাদ দিয়া পাঠান। কি প্রশান্ত! কি পুরুষের ন্যায় আচরণশীল! সত্যসত্যই তিনি অশেষগুণাকর পুরুষর্ষভ ছিলেন।

আবার, যেমন তাঁহাতে বিচারশক্তির পরাকাষ্ঠা ছিল, তেমনি তিনি অদ্ভুত দয়ারও আধার ছিলেন। রাজগৃহে ছাগগুলিকে বাঁচাইবার জন্য তিনি নিজের জীবন দিতেই প্রস্তুত হইয়াছিলেন। একবার এক ব্যাঘ্রীর ক্ষুধাপরিতৃপ্তির জন্য নিজ শরীরই দান করিয়াছিলেন। পাঁচশত বার পরার্থে জীবনবিসর্জ্জনের ফলে অল্পে অল্পে সেই পবিত্র দয়ারাশির উদ্ভব হইয়াছিল, যাহাতে তাঁহাকে বুদ্ধত্বপদবীতে আরোহণ করাইয়াছিল।

জনৈক যুবক, যাহাকে সে কখনও দেখে নাই এবং যাহার নাম পর্য্যন্ত শুনে নাই, এরূপ এক নায়িকার প্রতি গদগদকণ্ঠে নিজ প্রেম

ব্যক্ত করিতেছে—ভগবান্ বুদ্ধ এই গল্পটী বলিয়া তৎপরে তাহার ঐ কষ্টকর অবস্থাকে মানবের ঈশ্বরসম্বন্ধীয় নানা উক্তির সহিত তুলনা করেন। এই ঘটনাটী হইতে, এত যুগের ব্যবধানেও, আমরা তাঁহার রসজ্ঞানের কথঞ্চিৎ আভাস প্রাপ্ত হই। একমাত্র তিনিই ধর্ম্মকে সম্পূর্ণরূপে স্বর্গ-নরকাদি কল্পনা হইতে পৃথক করিতে পারিয়াছিলেন। অথচ উহাতে তাঁহার শক্তি এবং মানবহৃদয়ের উপর অধিকারের কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই। তাঁহার অদ্ভুত চরিত্র এবং সমসাময়িক লোকদিগের উপর উহার প্রভাবই ঐ সফলতার কারণ।

একদিন সন্ধ্যাকালে স্বামিজী আমাদিগের কয়েকজনের জন্য বুদ্ধের জীবনের ঘটনাবলী তাঁহার সহধর্ম্মিণী যশোধরার নিকট যেরূপ প্রতিভাত হইয়াছিল, তাহার একটী কাল্পনিক চিত্রের বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইলেন। ইতিহাসের শুষ্ক কঙ্কালকে আমি আর কখনও অমন জীবন্ত, চাক্ষুষ ঘটনার ন্যায় বর্ণিত হইতে শুনি নাই। নিজে হিন্দু সন্ন্যাসী হইলেও স্বামী বিবেকানন্দের নিকট ইহা খুব স্বাভাবিকই বোধ হইয়াছিল যে, বুদ্ধের ন্যায় দৃঢ়চেতা ব্যক্তির "বিবাহ সম্বন্ধে ইউরোপীয়দিগের মত ধারণা" থাকিবে, এবং তিনি নির্ব্বন্ধসহকারে নিজেই নিজের পাত্রী নির্ব্বাচন করিয়া লইবেন। সপ্তাহব্যাপী উৎসব ও বাগ্‌দানের প্রত্যেক খুঁটিনাটি ব্যাপারটী স্বামিজী সাদরে বর্ণনা করিলেন। তৎপরে তিনি বিবাহের দীর্ঘকাল পরে উভয়ের দাম্পত্যজীবনের এবং সেই বিখ্যাত বিদায়রজনীর বর্ণনা করিলেন। দেবতাগণ গাহিলেন, "জাগো, হে প্রবুদ্ধ! উঠ এবং জগৎকে সাহায্য কর!" অমনি রাজপুত্রের মনের মধ্যে সংগ্রাম চলিতে লাগিল, তিনি বার বার নিদ্রিত পত্নীর শয্যাপার্শ্বে প্রত্যাগত হইলেন।

"কোন্ সমস্যায় তাঁর মন আন্দোলিত হচ্ছিল? তিনি যে তাঁর পত্নীকেই জগতের কল্যাণের জন্য বলি দিতে উদ্যত হয়েছেন! —ওরই জন্য মনের মধ্যে সংগ্রাম! তিনি নিজের জন্য মোটেই ভাবছিলেন না।"

তারপর তাঁহার জয়লাভ এবং তাহারই অনিবার্য্য ফলস্বরূপ বিদায়গ্রহণ এবং অতি সন্তর্পণে রাজপুত্রীর চরণচুম্বন—এত সন্তর্পণে যে, তিনি তাহাতে জাগরিতা হইলেন না—এসকল বর্ণিত হইল। স্বামিজী বলিলেন, "তোমরা কি কখনও বীরগণের হৃদয়ের বিষয় চিন্তা কর নি? উহা মহৎ, অতি মহৎ। সে মহত্ত্বের তুলনা নেই—তবু তা আবার ননীর মত কোমল!"

দীর্ঘ সাত বৎসর পরে রাজপুত্র—এখন তিনি বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন—কপিলাবস্তুতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তাঁহার গমন-দিবসাবধি যশোধরা তাঁহার স্ত্রীসুলভ উপায়ে স্বামীর ধর্ম্মজীবনের অনুবর্ত্তন করিয়া তথায়ই বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার পরিধানে কাষায় বসন, ভোজন শুধু ফলমূল এবং শয়ন অনাবৃত স্থানে ধরাশয্যায়। বুদ্ধ প্রবেশ করিলে যশোধরা প্রকৃত সহধর্ম্মিণীর ন্যায় তাঁহার বস্ত্রপ্রান্ত স্পর্শ করিলেন। তখন ভগবানও তাঁহাকে ও তাঁহার পুত্রকে সত্য উপদেশ করিতে লাগিলেন।

উপদেশান্তে তিনি উদ্যানে চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময়ে যশোধরা চমকিত হইয়া পুত্রের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "শীগ্‌গির তোমার বাবার কাছে গিয়ে তোমার পিতৃধন চেয়ে নাও! দেরী করো না!"

তারপর শিশু যখন প্রশ্ন করিল, "মা, এঁদের মধ্যে কে আমার

বাবা?" তখন তিনি গর্ব্বভরে "রাজপথ দিয়ে যিনি সিংহের মত যাচ্ছেন, উনিই তোমার বাবা!"—এতদ্ব্যতীত আর কিছুই উত্তর দিলেন না।

শাক্যবংশের ভাবী উত্তরাধিকারী কুমার তখন পিতার নিকট যাইয়া বলিল, "বাবা, আমাকে আমার পিতৃধন দিন।"

তিনবার সে এইরূপ যাচ্ঞা করিলে বুদ্ধ আনন্দের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "দাও ওকে!" তখন একব্যক্তি বালকের উপর গৈরিক বস্ত্র ফেলিয়া দিল।

তারপর সেই প্রধান শিষ্য যশোধরাকে দেখিয়া এবং তিনিও স্বামীর নিকটে থাকিবার জন্য উৎসুক হইয়াছেন বুঝিতে পারিয়া ভগবানকে বলিলেন, "ভগবন্, স্ত্রীগণও এই সঙ্ঘে প্রবেশ করতে পারে কি? এঁকেও কি আমরা গৈরিক বস্ত্র দেব?"

বুদ্ধ উত্তর করিলেন, "জ্ঞানে কি কখনও লিঙ্গভেদ থাকতে পারে? আমি কি কখনও বলেছি যে স্ত্রীগণের এই সঙ্ঘে প্রবেশাধিকার নেই? কিন্তু আনন্দ, এ তোমারই উপযুক্ত প্রশ্ন হয়েছে!"

এইরূপে যশোধরাও শিষ্যত্বে পরিগৃহীত হইলেন। তারপর সেই সাত বৎসরের রুদ্ধ প্রেম ও করুণা সমস্ত জাতকগল্পাকারে প্রবাহিত হইল! কারণ ঐগুলি সমস্ত যশোধরারই জন্য কথিত! পাঁচশত বার উভয়ের প্রত্যেকেই অহংভাবনা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। এখন তাঁহারা উভয়ে একত্র চরম পূর্ণত্ব লাভ করিবেন।

"এইরকমই হয়েছিল, এতে কিছুমাত্র সন্দেহ করো না! যশোধরা এবং সীতার পক্ষে একশ' বছর তাঁদের প্রেম-পরীক্ষার যথেষ্ট সময় নয়।"

একটু চুপ করিয়া আধ্যাত্মিকার পরিসমাপ্তিকালে স্বামিজী আপনমনে বলিতে লাগিলেন, "না, না, এস, আমরা সকলেই স্বীকার করি যে, এখনও আমাদের কামক্রোধাদি রয়েছে! এস, আমরা প্রত্যেকেই বলি, 'আমি আদর্শ অবস্থায় পৌঁছাই নি!' কেউ যেন কখনও অন্য দ্বিতীয় ব্যক্তিকে ভগবান বুদ্ধের সঙ্গে তুলনা করবার সাহস না করে!"

আমাদের আচার্য্যদেব যৌবনের প্রারম্ভে যখন দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করিতেন, সেই সময়ে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি জগতের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিল। এই সময়ে ইংরেজরাজের আদেশে বুদ্ধগয়ার বৃহৎ মন্দিরের পুনরুদ্ধারকার্য্য সাধিত হইতেছিল * এবং বাঙ্গালী পণ্ডিতপ্রবর ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র এই কার্য্যে যোগদান করায় সমগ্র ভারতবর্ষের লোক ঐ বিষয়ে বিলক্ষণ মাতিয়া উঠেন। আবার ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে সার এড্‌উইন আর্নল্ডের 'লাইট অব এশিয়া' নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ায় ইংরেজীভাষী দেশ-সমূহের সামান্য লেখাপড়া জানা সাধারণ লোকদিগের কল্পনাও বিশেষভাবে উদ্দীপিত হইয়া উঠে। উক্ত পুস্তক অনেকস্থলে অশ্বঘোষের 'বুদ্ধচরিতের' প্রায় অবিকল অনুবাদ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। কিন্তু স্বামিজী কখনও অপরের মুখে শুনিয়া তৃপ্ত হইতেন না, এবং এই বিষয়েও তিনি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন নাই; অবশেষে তিনি ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার গুরুভ্রাতৃগণের সহিত একত্র শুধু

* উক্ত বৃহৎ মন্দিরের চতুর্দ্দিকে খননকার্য্য ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মদেশীয় সরকার কর্ত্তৃক প্রথম আরব্ধ হয়। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ সরকার উহার ভার লন, এবং ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে উহা শেষ হয়।

'ললিতবিস্তর' নহে, বৌদ্ধধর্ম্মের মহাযান শাখার বিখ্যাত গ্রন্থ মূল 'প্রজ্ঞাপারমিতা'* সংগ্রহ করিয়া অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।† তাঁহাদের সংস্কৃতে ব্যুৎপত্তিই তাঁহাদিগকে পালিভাষা বুঝিতে সহায়তা করিল, কারণ পালি সংস্কৃত হইতেই উদ্ভূত। ডাক্তার রাজেন্দ্র-লাল মিত্রের রচনাবলী এবং 'লাইট অব এশিয়া' পাঠ স্বামিজীর জীবনের ক্ষণস্থায়ী ঘটনামাত্র হয় নাই। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রধান শিষ্যের সদা অবহিত মনে তাঁহার শিষ্যত্বকালে এইরূপে যে বীজ উপ্ত হইল, তাহা তাঁহার সন্ন্যাসব্রতগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই পুষ্পভারে সুশোভিত হইয়া উঠিল। কারণ, ঐ সময়ে তাঁহার প্রথম কার্য্যই এই হইল যে, তিনি অবিলম্বে বুদ্ধগয়ায় গমন করিলেন এবং সেই মহাবৃক্ষের তলে বসিয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "এ কি সম্ভব যে তিনি যে বায়ুতে শ্বাস প্রশ্বাস নিয়েছিলেন, আমিও সেই বায়ুতেই শ্বাসপ্রশ্বাস নিচ্ছি? —তিনি যে মাটীর ওপর বিচরণ করেছিলেন, আমিও তারই ওপর বিচরণ কচ্ছি?"

তাঁহার জীবনের শেষভাগে—উনচত্বারিংশত্তম জন্মদিবসের প্রাতঃ-কালে স্বামিজী আর একবার ঐরূপে বুদ্ধগয়ায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। ৺কাশী দর্শন করিয়া এই যাত্রার শেষ হয়। ইহাই তাঁহার জীবনের শেষ ভ্রমণ। যে সময়ে স্বামিজী কয়েক বৎসর ধরিয়া ভারত পরিভ্রমণ করিতেছিলেন, তাহারই কোন সময়ে তিনি বুদ্ধের

* যাহা বুদ্ধিবৃত্তির অগম্য অতীন্দ্রিয় রাজ্যে লইয়া যায়।

† এই দুইখানি পুস্তক তখন ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের দক্ষ সম্পাদকতায় এশিয়াটিক সোসাইটী হইতে প্রকাশিত হইতেছিল। সাধারণ পাঠকের সুবিধার জন্য গ্রন্থের মূল পালির পরিবর্ত্তে সংস্কৃত অক্ষরে ছিল।

ভস্মাবশেষ অস্থিসমূহ—সম্ভবতঃ যে স্থানে উহারা প্রথম আবিষ্কৃত হইয়াছিল সেই স্থানেই—স্পর্শ করিতে পাইয়াছিলেন। তখন যে তিনি প্রবল ভক্তি ও নিঃসংশয়তার ভাবে এককালে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন, ইহা পরে বহুবার ঐ প্রসঙ্গের উত্থাপনমাত্র তাঁহাতে উক্ত ভাবের কিছু কিছু প্রকাশ দেখিয়া আমরা একরূপ নিশ্চয় করিয়া লইতে পারি। কোন রমণী অবতারগণকে ঈশ্বর-জ্ঞানে পূজা করা সম্বন্ধে তাঁহাকে প্রশ্ন কবিলে তিনি যে উত্তর দিয়াছিলেন, তাহা খুবই স্বাভাবিক; তিনি বলিয়াছিলেন, "বলতে কি, যদি আমি ন্যাজারেথনিবাসী ঈশার সময়ে যুডিয়ায় বাস করতুম, তাহলে আমি চোখের জলে নয়, হৃদয়ের শোণিতে তাঁর পাদুটী ধুয়ে দিতুম!"

তিনি কোন্ ধর্ম্মাবলম্বী ঠিক না জানিয়া একজন ভ্রমবশতঃ তাঁহাকে বৌদ্ধ বলায় তিনি বলিয়াছিলেন, "বৌদ্ধ! আমি বুদ্ধের দাসগণ, তাঁদের দাসগণ, তাঁদের দাস!" তাঁহার বুদ্ধের প্রতি ভক্তি এরূপ প্রগাঢ় ছিল যে, তাঁহার নিকট তন্মতে বিশ্বাসী হওয়াও যেন এক অতি উচ্চপদ—যেন তিনি উহারও উপযুক্ত নহেন।

বুদ্ধের অস্তিত্বের ঐতিহাসিক সত্যতাই শুধু তাঁহাকে মন্ত্রমুগ্ধ করে নাই। ঠিক ঐরূপ প্রধান আর একটী কারণ এই যে, তাঁহার গুরুদেবের জীবন—যাহা তিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন, তাহার সহিত সার্দ্ধদ্বিসহস্র বর্ষ পূর্ব্বের এই সর্ব্বজনস্বীকৃত ইতিহাসের বহুশঃ ঐক্য পরিলক্ষিত হয়। ভগবান বুদ্ধের জীবনে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসকে দেখিতে পাইয়াছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে তিনি ভগবান বুদ্ধকে দেখিতে পাইয়াছিলেন।

একদিন বুদ্ধের দেহত্যাগের দৃশ্যবর্ণনকালে চকিতের ন্যায় তাঁহার মনের এইরূপ ভাব প্রকাশ পাইল। তিনি বলিতে লাগিলেন —এক বৃক্ষতলে তাঁহার জন্য কম্বল বিছান হইয়াছিল, এবং সেই আনন্দময় পুরুষ "সিংহের ন্যায় দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন করিয়া" মৃত্যু প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। এমন সময় সহসা একব্যক্তি উপদেশ-গ্রহণের নিমিত্ত তাঁহার নিকট দৌড়িয়া আসিল। শিষ্যগণ লোকটীর ঐরূপ সময়ে প্রবেশ করা উচিত নহে জ্ঞান করিয়া, এবং তাঁহাদের প্রভুর মৃত্যুশয্যার নিকট কোনক্রমে গোলমাল হইতে দিবেন না সঙ্কল্প করিয়া, তাহাকে তাড়াইয়া দিতে যাইতে-ছিলেন, কিন্তু ভগবান তাহাদের কথোপকথন দূর হইতে শুনিতে পাইয়া বলিলেন, "না, না! ফিরিয়ে দিও না! তথাগত সদাই প্রস্তুত আছেন!" তখনই তিনি কনুইয়ের উপরে ভর দিয়া একটু উঠিয়া তাহাকে উপদেশ করিলেন। ঐরূপ চারিবার ঘটিল; তখন বুদ্ধ ভাবিলেন, 'এখন আমি নিশ্চিন্তমনে মরতে পারি।' —তাহার পূর্ব্বে নহে। স্বামিজী বলিতে লাগিলেন, "কিন্তু তিনি প্রথমে আনন্দকে কাঁদার জন্য তিরস্কার করলেন। বললেন, বুদ্ধ কোন ব্যক্তিবিশেষের নাম নয়, ওটী একটী উচ্চ অবস্থার নাম, এবং তাঁদের মধ্যে যে-কেউ সেটী লাভ করতে পারেন। আর শেষ নিঃশ্বাসের সঙ্গে তিনি কারও পূজা করতে তাঁদের নিষেধ করলেন।"

অমরকাহিনী ক্রমে সমাপ্ত হইল। কিন্তু যখন স্বামিজী বর্ণনা করিতে করিতে "কনুয়ের উপর ভর দিয়া একটু উঠিয়া তাহাকে উপদেশ করিলেন," এই স্থলটীতে আসিয়া একটু থামিলেন, এবং

আনুষঙ্গিক-রূপে বলিলেন, "দেখ, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের জীবনে আমি ওটা স্বচক্ষে দেখেছি!" তখন শ্রোতৃবর্গের মধ্যে একজনের নিকট এই অংশটী সর্ব্বাপেক্ষা বহ্বর্থ বলিয়া মনে হইয়াছিল। অমনি আমার মনের মধ্যে সেই ব্যক্তির কথা উদিত হইল, সেই আচার্য্য-শ্রেষ্ঠের নিকট শিক্ষালাভ যাঁহার ভাগ্যে ছিল। তিনি একশত মাইল দূর হইতে আসিতেছিলেন, এবং যখন তিনি কাশীপুরে আসিয়া পৌঁছিলেন, তখন ঠাকুরের অন্তিমকাল উপস্থিত।* এ ক্ষেত্রেও শিষ্যগণ তাঁহাকে প্রবেশ করিতে দিতেন না, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ আপনা হইতেই বলিলেন যে, আগন্তুককে আসিতে দেওয়া হউক, তিনি উহাকে উপদেশ দিবেন।

বৌদ্ধমতবাদের ঐতিহাসিক ও দার্শনিক অর্থবত্তা সম্বন্ধে স্বামিজী সর্ব্বদাই গভীরভাবে মনে মনে আলোচনা করিতেন। মধ্যে মধ্যে হঠাৎ তৎসম্বন্ধে প্রসঙ্গ উত্থাপন করায়, তিনি যে ঐ বিষয়ে সর্ব্বদা চিন্তা করিতেন তাহা বুঝা যাইত। একদিন তিনি বুদ্ধের উপদেশ-সমূহ † হইতে উদ্ধৃত করিয়া বলিলেন, "রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান—এগুলিই পঞ্চস্কন্ধ বা পঞ্চতত্ত্ব। এগুলি ক্রমাগত পরিবর্ত্তিত ও একে অন্যের সঙ্গে মিলিত হচ্ছে। এরই নাম মায়া। কোন একটী বিশেষ তরঙ্গসম্বন্ধে কিছুই বলা যায় না, কারণ, সেটা এখন আর নাই। সেটা ছিল মাত্র, এখন গত হয়েছে। হে মানব, জেনো যে, তুমি সাগরস্বরূপ!" তৎপরে আরও বলিলেন, "মহর্ষি

* শ্রীরামকৃষ্ণ ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ১৬ই আগষ্ট শ্রীযুত কৃষ্ণগোপাল ঘোষের কাশীপুরস্থ উদ্যান-বাটীতে মহাসমাধি লাভ করেন।

† বিনয় পিটক, প্রথম ভাগ, দ্রষ্টব্য।

কপিলও এই দর্শনই প্রচার করেছিলেন ; কিন্তু তাঁর মহানুভব শিষ্যের (বুদ্ধের) অদ্ভুত হৃদয় তাকে সজীব করে তুলেছিল।"

তারপর সেই পুরুষশ্রেষ্ঠের কথাগুলি অন্তরের ভিতর ধ্বনিত হওয়ায় তিনি মুহূর্ত্তের জন্য নীরব রহিলেন। তৎপরে তাঁহার মানব-আত্মার প্রতি অমর আদেশবাক্যের আবৃত্তি করিতে লাগিলেন, "কোনও নির্দ্দিষ্ট পথের দিকে লক্ষ্য না রেখে ক্রমাগত এগিয়ে যাও! কোন কিছু থেকে ভয় না পেয়ে, কিছুই গ্রাহ্য না করে, তুমি গণ্ডারের মত একাকী বিচরণ কর!

"সিংহ যেমন কোন শব্দে ভীত হয় না, বায়ু যেমন জালবদ্ধ হয় না, পদ্মপত্র যেমন জললিপ্ত হয় না, তুমিও তেমনি একাকী, গণ্ডারের মত বিচরণ কর!"

একদিন স্বামিজী বৌদ্ধদিগের প্রথম সভা এবং তাহার সভাপতি নির্ব্বাচন লইয়া বিবাদের বর্ণনা করিতে করিতে বলিলেন, "তাঁদের কি রকম তেজ ছিল, তোমরা কি তা কল্পনায়ও আনতে পার? একজন বললেন, 'আনন্দই সভাপতি হবে, কারণ, সেই তাঁকে সবচেয়ে ভালবাসত।' কিন্তু আর একজন এগিয়ে এসে বললেন, 'তা হবে না। কারণ, আনন্দ তাঁর মৃত্যুশয্যায় ক্রন্দন করার অপরাধে অপরাধী।' অমনি তাঁকে বাদ দিয়ে অন্য ব্যক্তিকে নির্ব্বাচন করা হল।"

তিনি বলিতে লাগিলেন, "কিন্তু বুদ্ধ এই মারাত্মক ভুল করেছিলেন যে, তিনি ভাবতেন, সমগ্র জগৎকে উপনিষদের উচ্চ আদর্শে উন্নীত করা যেতে পারে। ফলে স্বার্থপরতা এসে সমস্ত নষ্ট করল। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর চেয়ে বিজ্ঞ ছিলেন, কারণ, তিনি

দেশ-কাল-পাত্র বুঝে কাজ করেছিলেন। কিন্তু বুদ্ধ আপোষের ঘোর বিরোধী ছিলেন। আপোষ করার জন্য অবতারপুরুষও যে বিনাশপ্রাপ্ত হয়েছেন, লোকে বুঝতে না পেরে যে তাঁকে যন্ত্রণা দিয়ে মেরে ফেলেছে—এরকম জগতের ইতিহাসে ইতিপূর্ব্বে ঘটেছে। কিন্তু বুদ্ধ যদি এক মুহূর্ত্তের জন্য আপোষ করতেন, তা হলে তাঁর জীবদ্দশাতেই তিনি সমগ্র এশিয়ায় ঈশ্বরের মত পূজিত হতে পারতেন। তিনি কি উত্তর দিয়েছিলেন জান? তিনি শুধু বলেছেন, 'বুদ্ধত্ব একটা উচ্চ অবস্থা মাত্র, কোন ব্যক্তিবিশেষের নাম নয়!' বাস্তবিক তিনিই জগতে একমাত্র লোক, যাঁর মাথা সম্পূর্ণ ঠিক ছিল—সারা জগতের মধ্যে তিনিই একমাত্র স্থিরপ্রজ্ঞ ব্যক্তি।"

খৃষ্টান আমরা কষ্টকে পূজা করিতে ভালবাসি। স্বামিজী আমাদের ঐরূপ ভাবকে ঘৃণা করিতেন। ইহা ভারতবাসিগণের সম্যক চিন্তাশক্তিরই পরিচয়। পাশ্চাত্ত্যে অনেকে তাঁহাকে বলিয়াছিল যে, বুদ্ধ যদি ক্রুশে বিদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার মহত্ত্ব লোকের আরও অধিক হৃদয়গ্রাহী হইত! ইহাকে তিনি 'রোমক নিষ্ঠুরতা' বলিয়া তীব্রভাবে নিন্দা করিতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করেন নাই। তিনি বলিতে লাগিলেন, "সবচেয়ে নীচ এবং পাশব প্রকৃতির লোকেরাই একটা কিছু অসাধারণ রকমের ব্যাপারের পক্ষপাতী। সেজন্যই জগৎ চিরকাল epic বা মহাকাব্য ভালবাসবে। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় যে, ভারত 'হেঁটমুণ্ডে গভীর, অতলস্পর্শ গহ্বরে নিক্ষেপ করলেন' (Hurled headlong down the steep abyss)—এরকম রচনার স্রষ্টা মিল্‌টনের মত কবি প্রসব করেন নি। ঐ কাব্যের সবটার বদলে ব্রাউনিং-এর দুই ছত্র কবিতা

পাওয়া গেলেও লাভ !" তাঁহার মতে খৃষ্টের জীবনবৃত্তান্তের এই কাব্যোচিত ওজোগুণই রোমকদিগের হৃদয় স্পর্শ করিয়াছিল। খৃষ্টধর্ম্ম যে রোমীয় জগতের সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল, তাহা ঐ ক্রুশে বিদ্ধ হওয়ার ঘটনা হইতেই। তিনি আবার বলিলেন, "এ কথা অস্বীকার করবার যো নেই যে, পাশ্চাত্ত্যবাসী তোমরা মস্ত মস্ত কাজ দেখতে চাও! জীবনের প্রত্যেক সাধারণ ক্ষুদ্র ঘটনাটীর কবিত্ব তোমরা এখনও বুঝতে পার না। অল্পবয়স্ক মাতার মৃতপুত্র কোলে নিয়ে বুদ্ধের কাছে আসা—এর সৌন্দর্য্যের চেয়ে আর কি কোন সৌন্দর্য্য বেশী হতে পারে? অথবা, ছাগদের জীবনরক্ষার গল্পটী? তোমরা জান যে, মহাভিনিষ্ক্রমণ ব্যাপারটী ভারতে নূতন জিনিস ছিল না। গৌতম এক সামান্য রাজার পুত্র ছিলেন। তাঁর পূর্ব্বে অনেকবার লোকে ঐরকম ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করে চলে গেছে। কিন্তু নির্ব্বাণের পর, আহা! দেখ কি কবিত্ব!

"রাত্রিকাল, অনবরত বৃষ্টি পড়ছে। তিনি এক গোপের কুটীরে এসে ছাঁচের নীচে দেওয়ালের গা ঘেঁষে দাঁড়ালেন। ছাঁচ থেকে বৃষ্টির জল ঝরছে। মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে এবং বায়ুও আবও প্রবল হচ্ছে।

"ভেতরে গোপ জানালা দিয়ে চকিতের মত একখানি মুখ দেখতে পেল এবং মনে মনে বলল, 'বা, বা! গেরুয়াধারী! থাক ওখানে, তোমার পক্ষে এই যথেষ্ট!' তারপর সে গান ধরল, 'আমার গরুবাছুর ঘরে উঠেছে, আগুনও খুব জ্বলছে, আমার স্ত্রী নিরাপদ, ছেলেমেয়েরাও সুখে নিদ্রা যাচ্ছে! সুতরাং মেঘসকল, আজ রাত্রে তোমরা স্বচ্ছন্দে বর্ষণ করতে পার!'

"বুদ্ধ বার থেকে উত্তর দিচ্ছেন, 'আমার মন সংযত, ইন্দ্রিয়সকল প্রত্যাহৃত; আমার হৃদয় দৃঢ়। সুতরাং মেঘসকল, আজ রাত্রে তোমরা স্বচ্ছন্দে বর্ষণ করতে পার!'

"গোপ আবার গাইল, 'ক্ষেতে ফসল কাটা হয়ে গেছে, ঘাসগুলিও খামারে ভাল করে রাখা আছে; নদীতে যথেষ্ট জল রয়েছে এবং রাস্তাগুলিও বেশ শক্ত। সুতরাং মেঘসকল, আজ রাত্রে তোমরা স্বচ্ছন্দে বর্ষণ করতে পার!'

"এভাবে খানিকক্ষণ চলতে লাগল, শেষে গোপ বিস্মিত ও অনুতপ্ত হয়ে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করল। *

"অথবা ক্ষৌরকার উপালির † গল্পটীর চেয়ে আর কিছু বেশী সুন্দর আছে কি?—

'ভগবান আমার বাটীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। আমি ক্ষৌরকার, আমারও বাটীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন! আমি দৌড়ালাম, কিন্তু তিনি নিজেই ফিরলেন এবং আমার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন।

'আমি ক্ষৌরকার, আমারও জন্য অপেক্ষা করলেন!

'আমি বললাম—প্রভু, তোমার সঙ্গে কথা কইতে পারি কি?

'তিনি বললেন, হাঁ।

---

* স্বামিজী এখানে সুত্তনিপাতান্তর্গত ধনিয়া সুত্তের Rhys Davids-কৃত পদ্যানুবাদের ভাবার্থটী স্মৃতি হইতে আবৃত্তি করিতেছিলেন। Rhys Davids-এর আমেরিকার বক্তৃতাগুলি দ্রষ্টব্য।

† এই 'উপালি পৃচ্ছা' নামক গল্পটী প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থে যে আকারে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা অধুনা লুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু ঐরূপ একটী রচনা যে ছিল, তাহা 'বিনয় পিটক' প্রভৃতি অন্যান্য বৌদ্ধগ্রন্থে উহার উল্লেখ হইতে জ্ঞাত হওয়া যায়।

'আমি ক্ষৌরকার, আমাকেও 'হাঁ' বললেন !

'আমি বললাম—নির্ব্বাণ আমার মত লোকদের জন্য কি?

'তিনি বললেন, হাঁ।

'আমি ক্ষৌরকার, আমার জন্যও !

'আমি বললাম, আমি তোমার পিছু পিছু যেতে পারি কি ?

'তিনি বললেন, নিশ্চয়ই !

'আমি ক্ষৌরকার, আমাকেও !

'আমি বললাম, প্রভু, আমি তোমার নিকট থাকতে পারি কি ?

'তিনি বললেন, পার।

'আমি দরিদ্র ক্ষৌরকার, আমাকেও !' "

একদিন স্বামিজী বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাস সংক্ষেপে এইভাবে বলিতেছেন যে, উহার তিনটী যুগ আছে—পাঁচশত বৎসর বুদ্ধোক্ত বিধিসমূহের যুগ, পাঁচশত বৎসর প্রতিমাপূজার যুগ এবং পাঁচশত বৎসর তন্ত্রের যুগ। বলিতে বলিতে তিনি সহসা সে প্রসঙ্গ ছাড়িয়া বলিতে লাগিলেন, "কখনও মনে করো না যে, ভারতে কোনকালে বৌদ্ধধর্ম্ম নামে একটি পৃথক ধর্ম্ম ছিল, আর তার নিজস্ব মন্দির ও পুরোহিতাদি বর্ত্তমান ছিল ! মোটেই নয়। বৌদ্ধ-ধর্ম্ম চিরকাল হিন্দুধর্ম্মেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। কেবল এক সময়ে বুদ্ধের প্রভাব অত্যন্ত প্রবল হয়ে উঠেছিল এবং তারই ফলে সমগ্র জাতিটী সন্ন্যাসের পথ অবলম্বন করেছিল।" আমার মনে হয়, পণ্ডিতগণের নিকট স্বামিজীর উক্ত ঐ মতের সত্যতা আরও প্রতিপন্ন হইতে এখনও বহু সময় ও অধ্যয়ন আবশ্যক হইবে। এই মতানুসারে, বৌদ্ধধর্ম্ম যেসকল দেশ প্রচারকপ্রেরণ দ্বারা

জয় করিয়াছিল, কেবল সেই দেশগুলিতেই সম্পূর্ণ নিজস্ব মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করিয়াছিল। কাশ্মীর এইসকল দেশের অন্যতম। স্বামিজী এই সম্বন্ধে এই মনোহর ইতিহাসটুকু বর্ণনা করিলেন—ঐ দেশে ভারতীয় মহাপুরুষগণ ধর্ম্মের অঙ্গস্বরূপে পরিগৃহীত হইলেন। ফলে স্থানীয় নাগগণ (অর্থাৎ লোকে পুণ্যতোয়া কুণ্ডগুলির অভ্যন্তরে যেসকল অদ্ভুত ক্ষমতাশালী সর্পের অস্তিত্ব কল্পনা করিত) তাহাদের দেবত্ব-পদবী হইতে বিচ্যুত হইল। আশ্চর্য্যের বিষয়, উহাদের বিতাড়নের সঙ্গে সঙ্গে, লোকে পুরাতন সংস্কারগুলিকে ত্যাগ করিয়া, অথচ নূতনগুলিকে ঠিক ঠিকভাবে আয়ত্ত করিতে না পারিয়া, এক মহাসঙ্কটে পড়িল, এবং ভীত হইয়া তাড়াতাড়ি পুরাতন কুসংস্কার ও নূতন সত্য—এই দুইয়ের মাঝামাঝি একটা আপোষ করিয়া লইল। তাহারই ফলে নাগগণ নূতন ধর্ম্মের ঋষি বা গৌণ দেবতারূপে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইল। মানুষ যে এইরূপ করিয়াই থাকে, তাহার দৃষ্টান্ত অন্যত্র বিরল নহে।

বৌদ্ধধর্ম্ম ও তাহার প্রসূতি হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে একটী প্রধান পার্থক্য এই যে, হিন্দুরা একই আত্মার পুনঃ পুনঃ জন্মান্তরপরিগ্রহ দ্বারা কর্ম্মসঞ্চয়ে বিশ্বাস করেন, কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্ম শিক্ষা দেয় যে, এই আপাতপ্রতীয়মান একত্ব মায়ামাত্র এবং ক্ষণিক। বৌদ্ধেরা বলেন যে, আমরা এ জীবনে যে কর্ম্ম সঞ্চিত রাখিয়া যাই, তাহা অপর এক আত্মা প্রাপ্ত হয় এবং আমাদের ঐ অভিজ্ঞতা লইয়া নূতন কর্ম্মবীজবপনে অগ্রসর হয়। এই প্রতিদ্বন্দ্বী মতদ্বয়ের মধ্যে কোন্‌টীতে কতটা সত্য নিহিত আছে, তৎসম্বন্ধে স্বামিজী অনেক সময় বসিয়া বসিয়া চিন্তা করিতেন। তাঁহার মত, যাহাদের নিকট

মহান্ অতীন্দ্রিয় অনুভূতির দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়াছে তাঁহারা, আর যাঁহারা কেবল উহার ছায়াংশে বাস করিয়াছেন, কতক পরিমাণে তাঁহারাও, দেখেন যে আত্মার শরীরে অবস্থিতি একটা চিরযন্ত্রণাদায়ী বন্ধন। পিঞ্জরাবদ্ধ আত্মা শরীররূপ কারাগারের শলাকাসমূহে বিদ্রোহীর ন্যায় ক্রমাগত পক্ষদ্বারা আঘাত করিতে থাকে; উহা শরীরের বহির্দ্দেশে এবং পারে সেই শুদ্ধ, চৈতন্যময়, ভাবঘন, সদানন্দ, পরম জ্যোতির্ম্ময় ধাম দেখিতে পায়; উহাই তাহার আদর্শ এবং গন্তব্য স্থল। এইসকল ব্যক্তির নিকট শরীর, পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ রাখিবার সহায় হওয়া দূরে থাকুক, বরং একটা আবরণ বা প্রাচীরস্বরূপ। সুখ দুঃখ সেই আদি জ্যোতিই—শুধু উহা ব্যষ্টিচৈতন্য-রূপ পরকলার মধ্য দিয়া আসিতেছে। লোকের একমাত্র কামনা হওয়া উচিত—উহাদের উভয়ের অতীত হইয়া সেই শুদ্ধ, অখণ্ড জ্যোতিস্বরূপকে প্রত্যক্ষ করা।

আচার্য্যদেব প্রচলিত ধারণাসমূহ সহিতে না পারিয়া যেসকল মত প্রকাশ করিতেন, তাহাতে মাঝে মাঝে এইরূপ ভাবপরম্পরাই লক্ষিত হইত। যেমন, একদিন তিনি হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, "কি আশ্চর্য্য! এক জন্ম শরীর ধারণ করাই যেন লক্ষ লক্ষ বৎসর কারাবাস বলে মনে হয়, লোকে আবার পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের স্মৃতি জাগিয়ে তুলতে চায়! এক এক দিনের ভাবনা-দুশ্চিন্তাই সেদিনের পক্ষে যথেষ্ট, আর অন্যদিনের ভাবনায় কাজ নেই!" তথাপি একই দীর্ঘ, শৃঙ্খলিত অভিজ্ঞতাপরম্পরায় বিভিন্ন ব্যক্তিগণের মধ্যে কাহার সহিত কাহার কতটা সম্বন্ধ—এই প্রশ্নটী তাঁহার সকল সময়েই চিত্তাকর্ষক হইত। পুনর্জ্জন্মবাদকে তিনি কখনও অবিসংবাদী সত্য বলিয়া জ্ঞান

করিতেন না। তাঁহার নিজের কাছে উহা একটী বিজ্ঞানসম্মত অনুমানমাত্র, তবে উহাতে মনের খুব সন্দেহভঞ্জন হয়। আমাদের পাশ্চাত্ত্য দেশে ইন্দ্রিয়জ অনুভূতি হইতেই সকল জ্ঞানের উৎপত্তি—শিক্ষাসম্বন্ধে এই যে এক মত আছে, তাহার প্রতিকূলে স্বামিজী সর্ব্বদাই জন্মান্তরবাদের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতেন এবং নিজ পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য দেখাইয়া দিতেন যে, পাশ্চাত্ত্য-কথিত এই জ্ঞানোন্মেষ প্রায়ই নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তির সুদূর অতীত জীবনে ঘটে বলিয়া আর উহাকে লক্ষ্য করিতে পারা যায় না।

তথাপি উভয় পক্ষের সব বক্তব্য শেষ হইলেও, বৌদ্ধধর্ম্ম অবশেষে দার্শনিক হিসাবে যথার্থ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে কিনা, এ প্রশ্ন বিচারাধীনই রহিয়া যায়। একই আত্মা পুনঃ পুনঃ জন্ম পরিগ্রহ করিতেছে, অথচ উহা সেই একই রহিয়া যাইতেছে—এই সম্বন্ধে আমাদের যাহাকিছু ধারণা সমস্তই ভ্রান্তিমূলক নহে কি? এবং পরিশেষে উহা 'একই সৎ, বহু অসৎ'—এই চরম অনুভূতির নিকট পরাভূত হয় না কি? একদিন তিনি দীর্ঘকাল একাকী চিন্তা করিয়া পরিশেষে বলিয়া উঠিয়াছিলেন, "নিশ্চয়ই বৌদ্ধধর্ম্ম ঠিক বলছে! পুনর্জ্জন্ম মরীচিকামাত্র! কিন্তু এই অনুভূতি কেবল অদ্বৈতমার্গেই লাভ হতে পারে!"

এইরূপে বৌদ্ধধর্ম্মের অপূর্ণতাটুকু দূর করিবার জন্য অদ্বৈতবাদের সাহায্য গ্রহণ করিয়া স্বামিজী যেন বুদ্ধ ও শঙ্করাচার্য্যের মধ্যে দ্বন্দ্ব বাধাইয়া কৌতুক দেখিতে ভালবাসিতেন। হয়ত, ইহাতে ইতিহাসের দুইটী বিভিন্ন যুগের সম্মিলন সাধিত হয় বলিয়া তিনি উহাতে এত প্রীতি অনুভব করিতেন; কারণ উক্ত মতদ্বয়ের মধ্যে একটী অপরটীর

সাহায্য ব্যতীত অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়—ইহাই ইতিপূর্ব্বে প্রতিপন্ন হইল। মনুষ্যত্বের চরম বিকাশের সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিতে তিনি সর্ব্বদাই "বুদ্ধের হৃদয় এবং শঙ্করাচার্য্যের মনীষা"—এই কথা কয়টীর প্রয়োগ করিতেন। বৌদ্ধ কর্ম্মবাদের বিরুদ্ধে জনৈক পাশ্চাত্ত্য রমণীর যুক্তিসমূহ তিনি ঐভাবেই শ্রবণ করিয়াছিলেন। উক্ত মত গ্রহণ করিলে যে সঙ্গে সঙ্গে একটা অসাধারণ সামাজিক দায়িত্ববোধ * আসিয়া থাকে, সে কথা এই রমণী ধরিতে পারেন নাই। তিনি বলিলেন, "যেখানে আমার সৎকর্ম্মের ফল আমি ভোগ করতে পাব না, অন্যে করবে, সেখানে কেন আমি মোটেই সেরকম কর্ম্ম করতে যাব, তার কারণ খুঁজে পাই না!"

স্বামিজী নিজে এভাবে চিন্তা করিতে একান্ত অশক্ত হইলেও উক্ত মন্তব্য তাঁহার খুব মনে লাগিল; এবং তিনি দুই-এক দিন পরে সমীপস্থ এক ব্যক্তিকে বলিলেন, "সে দিন যে কথাটী উঠেছিল, সেটী বড় চমৎকার কথা—অর্থাৎ পরের উপকার করবার কোনই কারণ থাকে না, যদি যাদের উদ্দেশে উহা করা হয়, তারা না হয়ে অপরে তার ফল ভোগ করে!"

যাঁহাকে স্বামিজী কথাগুলি বলিলেন, তিনি অশিষ্টের মত উত্তর দিলেন, "কিন্তু তা নিয়ে ত তর্ক হয় নি! কথাটী এই ছিল যে, আমি ছাড়া অপর কেহ আমার কর্ম্মের ফলভোগ করবে!"

* যদি আমরা ভাবি যে, আমাদের দুষ্কৃতিসমূহের ফলভোগ আমরা না করিয়া অপরে করিবে, তাহা হইলে আমাদের সৎকর্ম্ম করিবার প্রবৃত্তিটী আরও দৃঢ়ীভূত হয়। অপরের সম্পত্তি বা সন্তানসন্ততিরক্ষার জন্য আমরা যে অধিক দায়িত্ববোধ করিয়া থাকি, তাহাও এই জাতীয়।

স্বামিজী ধীরভাবে উত্তর দিলেন, "আমি তা জানি, কিন্তু আমাদের পরিচিতা রমণী যদি ঐভাবে কথাটী উঠাতেন, তবে তাঁর মতটী আরও যুক্তিযুক্ত হ'ত। ধর, তিনি ঐভাবেই প্রশ্নটি করেছেন—অর্থাৎ আমরা কারও উদ্দেশে সেবা করে বঞ্চিতই হয়ে থাকি, কারণ ঐ সেবা তাদের কাছে পৌছায় না। দেখছ না, ওর একটী মাত্র উত্তর আছে, তা অদ্বৈতবাদ! কারণ আমরা সকলেই এক!"

তিনি কি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, মধ্যযুগের ও বর্ত্তমান কালের হিন্দুমনের মধ্যে এইটীই প্রভেদ যে, ভারতের আধুনিক ধারণায় বৌদ্ধধর্ম্ম ও বুদ্ধের জন্য স্থান থাকিবেই? তিনি কি ভাবিয়াছিলেন যে, যে রামায়ণ ও মহাভারত গুপ্তরাজগণের সময় হইতে ভারতীয় শিক্ষার উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়া আসিয়াছে, তাহার সহিত অতঃপর সাধারণ লোকে অশোকের ও তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের ইতিহাসও জুড়িয়া দিবে? এশিয়ার পক্ষে এরূপ একটী সমন্বয়ের অর্থ কতদূর ব্যাপক, উহাতে হিন্দুধর্ম্মের মধ্য হইতে কি নব জীবন বৌদ্ধ দেশসমূহে সঞ্চারিত হইবে, আবার জননীস্বরূপ হিন্দুধর্ম্ম আপনাকে চিনিতে পারিয়া কন্যাস্থানীয় বৌদ্ধজাতিসমূহকে জ্ঞানামৃতদানে তৃপ্ত করিলে স্বয়ং ভারতও কত বলবীর্য্য লাভ করিবেন—এসকল কথা তিনি ভাবিয়াছিলেন কি? ভাবিয়া থাকুন আর নাই থাকুন, আমাদের ভুলিলে চলিবে না যে, এই দুইটী ধর্ম্মের দৃঢ় সম্মিলনভূমি তিনি হিন্দুধর্ম্মের ভিতরেই দেখিতে পাইয়াছিলেন। তিনি দেখিয়াছিলেন যে, জননীই (হিন্দুধর্ম্ম) সর্ব্বমত-সমঞ্জসা; কন্যা (বৌদ্ধধর্ম্ম) নহেন। তিনি মহীয়সী ও প্রেমময়ী জননী, তাই তিনি চিরকালের জন্য তাঁহার

অবতারগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বাপেক্ষা বীরহৃদয়, মহামহিম বুদ্ধাবতারকে ক্রোড়ে স্থান দিয়াছেন। তিনি তৎপ্রবর্ত্তিত সম্প্রদায়-সমূহকে স্থান দান করিয়াছেন, তাঁহার শিক্ষা বুঝিতে পারেন ও উহাকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন, তাঁহার আশ্রিত ভক্তগণকে মাতার ন্যায় স্নেহ করেন, এবং তিনি যেসকল নবজাত সন্তান তাঁহার পাদমূলে আনিয়া দিয়াছেন, তাহাদিগের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ ও তাহাদিগকে সাদর সম্ভাষণ করেন। কিন্তু হিন্দুধর্ম্ম কখনও বলিবেন না যে, বুদ্ধ সত্যকে যে আকারে প্রচার করিয়াছেন, তাহার বাহিরে আর সত্য নাই; কখনও বলিবেন না যে, শুধু সন্ন্যাসীর নিয়মের মধ্য দিয়াই মুক্তিলাভ হয়; অথবা চরম পূর্ণতালাভের মাত্র একটী পথ আছে। বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে স্বামিজীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উক্তি সম্ভবতঃ এইটী :

"বৌদ্ধধর্ম্ম ও হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে প্রধান পার্থক্য এই যে, বৌদ্ধধর্ম্ম বলেন, 'যা কিছু দেখছ সমস্তই মায়া বলে জেনো!' আর হিন্দুধর্ম্ম বলেন, 'জেনো যে মায়ার অন্তরালে সেই সত্যবস্তু রয়েছেন।' কি করে এই অনুভূতি লাভ করতে হবে, সে সম্বন্ধে হিন্দুধর্ম্ম কোন ধরাবাঁধা নিয়ম করে দেন নি। বৌদ্ধধর্ম্মের আদেশ শুধু সন্ন্যাসের দ্বারাই পালন করা চলে; হিন্দুধর্ম্মের আদেশ জীবনের সকল অবস্থায় পালন করা যায়। হিন্দুধর্ম্ম বলেন যে, সকল মতই সেই অদ্বিতীয় সত্যে পৌঁছবার এক একটী পথ। হিন্দুধর্ম্মের অতি উচ্চ ও শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যা এক ব্যাধের (ধর্ম্মব্যাধ) মুখ দিয়ে বের হয়েছে—ব্যাধ এক পতিব্রতা রমণীর নির্দ্দেশে এক সন্ন্যাসীর নিকট ঐ ধর্ম্মের উপদেশ করেছিলেন (ব্যাধগীতা)। এভাবে বৌদ্ধধর্ম্ম এক সন্ন্যাসি-

সঙ্ঘের ধর্ম্ম হয়ে দাঁড়াল, কিন্তু হিন্দুধর্ম্ম সন্ন্যাসাশ্রমের যথেষ্ট প্রশংসা করলেও, চিরকাল নিষ্ঠার সহিত প্রতিদিনের কর্ত্তব্যপালনকেই—তা যার যেরকম হোক না কেন—ঈশ্বরলাভের পথ বলে নির্দ্দেশ দিয়ে আসছে।"

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

ঐতিহাসিক খৃষ্টধর্ম্ম সম্বন্ধে স্বামিজী

আমাদের জীবনের কোন কোন সুগভীর বিশ্বাসের মূলে এমন কতকগুলি ব্যাপার থাকে, যাহারা স্বভাবতঃই আমাদিগকে ব্যতীত অপর কাহাকেও প্রভাবিত করিতে পারে না। যেমন, ব্যক্তিবিশেষ সম্বন্ধে বা কাহারও কোন উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমরা তৎক্ষণাৎ যে ধারণা করিয়া লই, তাহা সেইরূপ জীবন্তভাবে অপরকে বুঝান যায় না; তথাপি উহা আমাদের মনে একেবারে বদ্ধমূল হইয়া যায়। উহা সত্যও হইতে পারে, মিথ্যাও হইতে পারে, অর্থাৎ উহা হয়ত এমন এক সূক্ষ্ম দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত, যাহা অতি অল্প লোকেরই পক্ষে সম্ভবপর, অথবা উহা ভাবপ্রসূত মাথার খেয়ালমাত্র হইতে পারে। যাহাই হউক না কেন, যাঁহার মনে একবার ঐরূপ প্রবল অনুভূতির ছাপ পড়িয়া গিয়াছে, তাঁহার পরজীবনের চিন্তাসমূহ অনেকটা উহার দ্বারা অনুরঞ্জিত হইবেই; আর অপরে, সৌভাগ্যক্রমে যদি উহা বাহ্য ঘটনার সহিত মিলিয়া যায়, তাহা হইলে উহাকে জ্ঞান বলিয়া বিবেচনা করিবে, আর দুরদৃষ্টবশতঃ যদি মিল না হয় তবে উহাকে খেয়াল বলিয়া গণ্য করিবে। সেইরূপ, যদি তর্কের খাতিরে আমরা পুনর্জ্জন্মবাদকে সত্য বলিয়া মানিয়া লই, তাহা হইলে সঙ্গে সঙ্গে আমরা ইহাও বুঝিতে পারি যে, কতকগুলি লোক আপনাদের

অন্তরস্থ সুপ্ত স্মৃতিভাণ্ডারে মধ্যে মধ্যে প্রবেশসুখলাভ করিতে পারেন, তাহা অপরের পক্ষে দুঃসাধ্য। যদি তাহাই হয় তাহা হইলে ইহাও সম্ভবপর যে, ঐরূপ গতিবিধির ফলে তাঁহারা অনেক বিষয়ে মূল্যবান তথ্যের আভাস পাইতে পারেন, যদিও শুদ্ধ কল্পনা ও ইহার মধ্যে কতটুকু পার্থক্য, তাহা কেবল যিনি ঐরূপে অন্তররাজ্যে প্রবেশ করিয়াছেন, তিনিই বুঝিতে পারিবেন।

আমার গুরুদেবের চিন্তা ও মনের উপর যে তিনটী অদ্ভুত আন্তর্জ্জগতিক অনুভূতি স্পষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহাদিগকে উত্তমরূপে বুঝিতে হইলে কতকটা ঐভাবে চিন্তা করা প্রয়োজন। ইহাদের মধ্যে প্রধান, সম্ভবতঃ—তাঁহার ধ্যানযোগে সিন্ধুনদতীরে এক বৃদ্ধকে বৈদিক ঋঙ্মন্ত্র আবৃত্তি করিতে দেখা। উহা হইতেই তিনি তাঁহার সংস্কৃত আবৃত্তির অদ্ভুত রীতি শিক্ষা করিয়াছিলেন; উহা সাধারণ বেদোচ্চারণপ্রণালী অপেক্ষা অনেকাংশে গ্রিগরি-প্রবর্ত্তিত সাদাসিধা সুরের * সদৃশ। তিনি সর্ব্বদা বিশ্বাস করিতেন যে, এই উপায়ে তিনি আর্য্য পূর্ব্বপুরুষগণের সঙ্গীতের সুরটী পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শঙ্করাচার্য্যের কবিতাবলীতে তিনি এমন কিছু দেখিতে পাইয়াছিলেন, যাহার সহিত এই আবৃত্তিকরণপ্রণালীর আশ্চর্য্যজনক সাদৃশ্য আছে। এই ঘটনাটীর প্রসঙ্গেই তিনি এই মত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, আচার্য্য শঙ্করও তাঁহারই ন্যায়

---

* খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে পোপ প্রথম গ্রিগরি রোম্যান-ক্যাথলিক উপাসনার অঙ্গস্বরূপ উক্ত সুরের প্রবর্ত্তনা করেন। উহা সাদাসিধা অথচ গম্ভীর, এবং উহাতে বেশী আরোহ-অবরোহ নাই।

কোন প্রকারের দর্শন হইতে বেদোচ্চারণরীতির ইঙ্গিত পাইয়া থাকিবেন।*

ঐরূপ আর একটী অনুভূতি তাঁহার বাল্যকালে উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি তখন দক্ষিণেশ্বরে পরমহংসদেবের নিকট গমনাগমন করিতেছেন। একদিন তিনি বাটীতে নিজ ক্ষুদ্র পাঠাগারে বসিয়া ধ্যান করিতেছেন, এমন সময়ে সহসা তাঁহার সম্মুখে এক দীর্ঘাকৃতি, আয়তবপুঃ পুরুষ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার বদনে এমন একটী স্থির, গম্ভীর শান্তি বিরাজ করিতেছিল যে, তরুণবয়স্ক স্বামিজী তাঁহার দিকে চাহিয়া বোধ করিলেন যেন তিনি অনন্তকাল ধরিয়া দুঃখ ও সুখ উভয়ই বিস্মৃত হইয়াছেন। সাধক আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া আগত পুরুষপ্রবরের চরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলেন, তৎপরে ভক্তি ও বিস্ময়ে আত্মহারা হইয়া তাঁহার প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। সহসা তাঁহার বোধ হইল, যেন সম্মুখস্থ মূর্ত্তি কিছু বলিবেন। কিন্তু উহাতে বালকের মনে কেমন একটা ভয়ের সঞ্চার হইল, এবং তিনি কি বলেন শুনিবার জন্য অপেক্ষা না করিয়া, আস্তে আস্তে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন এবং ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন। এই দর্শন সম্বন্ধেই স্বামিজী পরে বলিয়াছিলেন যে, বাল্যকালে তাঁহার কক্ষে ভগবান বুদ্ধ প্রবেশ করিয়াছিলেন।

---

* স্বামী সারদানন্দ বলেন, স্বামিজীর ঐ দর্শন শ্রীরামকৃষ্ণের অদর্শনের প্রায় দুই বৎসর পরে, সম্ভবতঃ ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে ঘটিয়াছিল। যে মন্ত্রটী তিনি শুনিয়াছিলেন, তাহা গায়ত্রী দেবীর আবাহন :

আয়াহি বরদে দেবি ত্র্যক্ষরে ব্রহ্মবাদিনি।
গায়ত্রিচ্ছন্দসাং মাতঃ ব্রহ্মযোনি নমোঽস্তু তে॥

"আর আমি তাঁর চরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করেছিলাম, কারণ আমি জানতুম, স্বয়ং ভগবানই এসেছেন।" বুদ্ধের প্রতি স্বামিজীর যে জীবন্ত, জ্বলন্ত ভাব ছিল—তাঁহার অসাধারণ স্থির বুদ্ধি সম্বন্ধে বিশ্বাস এবং তাঁহার অসীম ত্যাগ ও দয়া সম্বন্ধে দৃঢ় ধারণা, এ সকলের কতটা তাঁহার বাল্যের সেই সাক্ষাৎ দর্শনমুহূর্ত্ত হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল, তাহা কে বলিতে পারে ?

তাঁহার অন্তরঙ্গগণের যতদূর জানা আছে, তাঁহার এই বিশিষ্ট দর্শনগুলির তৃতীয় এবং শেষ দর্শন তাঁহার স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন-কালে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে সংঘটিত হইয়াছিল। বুঝা যায় যে, ইউরোপের ক্যাথলিক দেশসমূহে ভ্রমণকালে তিনি, পূর্ব্ববর্ত্তী অপর সকলের ন্যায়, হিন্দুধর্ম্মের সহিত খৃষ্টধর্ম্মের সহস্র নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপারে সৌসাদৃশ্য দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলেন। খৃষ্টানদের Blessed Sacrament (ঈশ্বরোদ্দেশে রুটী ও মদ্য-নিবেদন) তাঁহার নিকট হিন্দুদিগের ভোগনিবেদনেরই রূপান্তর বলিয়া বোধ হইত। যাজকদিগের Tonsure বা মস্তকের কিয়দংশ মুণ্ডন, ভারতীয় সন্ন্যাসিগণের মস্তকমুণ্ডনের কথা তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিত। আর যখন তিনি একখানি চিত্রে দেখিলেন যে, জাস্টিনিয়ান * দুইজন মুণ্ডিতমস্তক সাধুর নিকট হইতে মুসাপ্রচারিত ধর্ম্মবিধি গ্রহণ করিতেছেন, তখন তাঁহার মনে হইল, তিনি যাজকদিগের মস্তকের কিয়দংশ মুণ্ডনপ্রথার উৎপত্তি কোথা হইতে,

* ফ্লেবিয়াস্ এনিসিয়াস্ জাস্টিনিয়ানাস্ (৪৮২—৫৬৫) রোম সাম্রাজ্যের অধিপতি ছিলেন। তিনি তৎকালপ্রচলিত নীতিসমূহ 'Corpus Juris Civilis' নামে সংহত করেন এবং এই জন্যই জগতে চিরস্মরণীয় হইয়া আছেন।

তাহা আবিষ্কার করিয়াছেন। তাঁহার নিশ্চয়ই মনে ছিল যে, বৌদ্ধধর্ম্মের পূর্ব্বেও ভারতে সন্ন্যাসী সন্ন্যাসিনী ছিল, এবং ইউরোপ Thebaid * নামক গ্রন্থ হইতে তাহার সন্ন্যাসিসম্প্রদায়ের ভাব গ্রহণ করিয়াছে; হিন্দু ক্রিয়াকাণ্ডেও ধূপদীপদান ও গীতবাদ্যের ব্যবস্থা আছে। ক্যাথলিকদিগকে মধ্যে মধ্যে অঙ্গে অঙ্গুলি দ্বারা ক্রুশের চিহ্ন অঙ্কিত করিতে দেখিয়া, তাঁহার হিন্দুদিগের পূজাদিতে ন্যাসের কথা মনে পড়িয়াছিল। তারপর যখন তিনি এক গীর্জ্জায় প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, উহাতে অল্প কয়েকখানি মাত্র চেয়ার রহিয়াছে, এবং ঘেরা, নির্দ্দিষ্ট আসন (Pews) মোটেই নাই—তখন তিনি এই বিষয়ের চরম নিদর্শন পাইলেন। এতদিন পরে তিনি যেন ঠিক নিজেদের দেশেই রহিয়াছেন, বোধ করিলেন। এখন হইতে আর তিনি খৃষ্টধর্ম্মকে বিদেশী জিনিস বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারিতেন না।

আমি স্বামিজীর যে স্বপ্নবৃত্তান্তটী বলিতে যাইতেছি, আর কতকগুলি চিন্তা হয়ত তাঁহাকে অজ্ঞাতসারে উহার জন্য উন্মুখ করিয়া দিয়াছিল। উহাদিগের মূল এই: আমেরিকায় তাঁহার এক ইহুদী শিষ্য ছিলেন। তিনি স্বামিজীকে নিষ্ঠাবান ইহুদী-সমাজের সহিত পরিচিত করিয়া দিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে অল্পবিস্তর মনোযোগ সহকারে ইহুদীদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ তালমুদ (Talmud) পাঠ করিতে প্রবৃত্ত করিয়াছিলেন। এইরূপে স্বামিজী, যে পারিপার্শ্বিক

* ষ্ট্যাসিউস্-প্রণীত থীব্‌সের ইতিবৃত্তমূলক ল্যাটিন কাব্য—খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে রচিত। থীব্‌স প্রাচীন গ্রীসের এক অংশের সমৃদ্ধ রাজধানী ছিল। সিংহাসনার্থী ভ্রাতৃদ্বয়ের পরস্পর যুদ্ধই উহার আখ্যানবস্তু।

চিন্তারাশির মধ্য হইতে সেণ্ট পল উদ্ভূত হইয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে সাধারণ লোকদের অপেক্ষা পরিষ্কার ধারণা করিতে পারিয়াছিলেন।

তাঁহার খৃষ্টধর্ম্মালোচনা সম্বন্ধে আরও একটী বিষয় মনে রাখিতে হইবে যে, তিনি আমেরিকায় 'ক্রিশ্চান সায়েন্স' নামক আন্দোলনটীর সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইয়াছিলেন। পরে তিনি একবার বলিয়াছিলেন যে, সকল ধর্ম্মেরই উৎপত্তি আলোচনা করিতে গেলে আমাদিগকে সর্ব্বদা তিনটী জিনিসের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে—মতবাদ, কর্ম্মকাণ্ড এবং ইন্দ্রজাল অথবা অলৌকিক ব্যাপারজাতীয় আর একটী জিনিস, যাহা সচরাচর রোগ ভাল করা রূপেই প্রকাশ পাইয়া থাকে। আমার মনে হয়, তাঁহার উক্ত লক্ষণত্রয়ের শেষটীকে গণনা করার কারণ কতকটা তাঁহার ক্রিশ্চান সায়েন্স ও ঐ শ্রেণীর অপরাপর আন্দোলনের ক্রিয়াকলাপ লক্ষ্য করা (তৎসঙ্গে তাঁহার নিজ বিশ্বাসের কথাও মনে রাখিতে হইবে যে, আমরা এক্ষণে ধর্ম্মের এক নূতন মহাসমন্বয়ের দ্বারদেশে উপনীত হইয়াছি), এবং কতকটা তাঁহার বক্ষ্যমাণ অনুভূতিটী—কারণ, উহা তাঁহার মস্তিষ্কে এত জলন্তভাবে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল যে, উহাকে তিনি জীবন্ত, বাস্তব প্রত্যক্ষ সকলেরই অন্যতম বলিয়া চিরকাল মনে রাখিয়াছিলেন।

রাত্রিকাল; তিনি নেপ্‌লসে যে জাহাজে উঠিয়াছিলেন, তাহা তখনও পোর্ট সৈয়দ অভিমুখে চলিতেছে, এমন সময়ে তিনি এই স্বপ্নটী দেখেন—জনৈক বৃদ্ধ শ্মশ্রুধারী লোক তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিল, "যে স্থানটী তোমাকে দেখাচ্ছি, ভাল করে লক্ষ্য করো। তুমি এখন ক্রীট দ্বীপে। এখানেই খৃষ্টধর্ম্মের আরম্ভ।"

খৃষ্টধর্ম্মের এই উৎপত্তির সমর্থন জন্য বৃদ্ধ দুইটী শব্দের উল্লেখ করিল—তন্মধ্যে একটী শব্দ 'থেরাপিউটী'—এবং উভয়েই যে প্রত্যক্ষভাবে সংস্কৃত ধাতু হইতে উৎপন্ন তাহাও বলিল। উত্তরকালে স্বামিজী পুনঃ পুনঃ এই স্বপ্নটীর কথা বলিতেন এবং সর্ব্বদাই শব্দদ্বয়ের ধাতু-প্রত্যয় নির্দ্দেশ করিতেন। কিন্তু তথাপি অপর শব্দটী* আর এখন পাওয়া যাইতেছে না, বোধ হয় কখনও যাইবে না। বৃদ্ধ 'থেরাপিউটী' (থেরপুত্র) শব্দের অর্থ বলিয়াছিল—থের অর্থাৎ উচ্চপদস্থ বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের পুত্রেরা। ভূমির দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বৃদ্ধ আরও বলিল, "প্রমাণ সব এখানে আছে, খুঁড়লেই দেখতে পাবে।"

স্বামিজী জাগিয়া উঠিলেন; বুঝিলেন যে, তিনি সাধারণ স্বপ্ন দেখেন নাই। তিনি বায়ুসেবনের জন্য কোন প্রকারে ডেকের উপরে বাহির হইয়া পড়িলেন। বাহিরে আসিয়াই জাহাজের একজন কর্মচারীকে দেখিতে পাইলেন—তিনি তাঁহার নির্দ্দিষ্টকালব্যাপী কর্ত্তব্য সমাপন করিয়া নিজ কামরায় ফিরিতেছেন। স্বামিজী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কটা বেজেছে?"

উত্তর হইল, "মধ্যরাত্রি।"

"আমরা এখন কোথায়?"

"ক্রীটের ঠিক পঞ্চাশ মাইল দূরে।"

এই অপ্রত্যাশিত ঐক্য দর্শনে স্বামিজী বিস্মিত হইলেন; উহাতে তাঁহার স্বপ্নটীকেও অনেকটা সত্য বলিয়া বোধ হইল। এক্ষণে তাঁহার বোধ হইল, যেন উক্ত অনুভূতি হইতে এমন

---

* আমার নিজের বিশ্বাস যে, দ্বিতীয় শব্দটী 'Essene', কিন্তু দুঃখের বিষয় উহার সংস্কৃত ধাতুপ্রত্যয় আমার মনে নাই।

কতকগুলি বিষয়ের ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে, যাহা উহার সাহায্য ব্যতীত তাঁহার নিকট চিরকাল অর্থহীন ও অসম্বদ্ধই রহিয়া যাইত। পরে তিনি স্বীকার করিয়াছিলেন যে, ইতিপূর্ব্বে খৃষ্টের ঐতিহাসিক অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কথা তাঁহার মনেই হয় নাই, কিন্তু ইহার পরে তিনি আর উহাতে পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারিতেন না। তিনি সহসা বুঝিতে পারিলেন যে, কেবল সেণ্ট পল সম্বন্ধেই আমরা নিশ্চিত হইতে পারি। Acts of the Apostles (খৃষ্টের দ্বাদশ শিষ্যের কার্য্যাবলি) নামক গ্রন্থ Gospel (খৃষ্টের জীবনী) চতুষ্টয় অপেক্ষা কেন প্রাচীনতর, তিনি তাহার অর্থ বুঝিতে পারিলেন। তিনি আরও অনুমান করিলেন যে, হয়ত খৃষ্টের উপদেশাবলী র‍্যাবাই হিলেল (Rabbi Hillel)* হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, এবং ন্যাজারীন নামক প্রাচীন সম্প্রদায় ও তাহার সুদূর অতীতের গর্ভ হইতে প্রতিধ্বনিত সুন্দর সুন্দর উক্তিসমূহ—হয়ত ইহারাই খৃষ্টের নাম ও জীবন, এই দুইটীকে জোগাইয়া দিয়াছে।

কিন্তু যদিও তাঁহার দর্শনটী এইরূপে তাঁহার নিজ মনের উপর স্পষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তথাপি তিনি উহাকে প্রমাণস্বরূপ অপরের নিকট উপস্থিত করিতে যাওয়াকে বাতুলতা জ্ঞান করিতেন। তিনি মনে করিতেন যে, এইরূপ অনুভূতির কোন ফলাফল আছে বলিয়া স্বীকার করিলে, উহা শুধু যিনি ঐরূপ অনুভব করিয়াছেন, তাঁহারই কাজে আসিতে পারে। ইহার প্রভাবে স্বামিজী ন্যাজারেথ-সম্ভূত ঈশার ঐতিহাসিক চরিত্রকে অবিশ্বাস করিতে পারিতেন,

* ইহুদী ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রধান পণ্ডিতবর্গের অন্যতম। ইনি খৃষ্টপূর্ব্ব ৬০ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন।

কিন্তু তিনি ক্রীট দ্বীপই যে সম্ভবতঃ খৃষ্টধর্ম্মের জন্মভূমি, একথা কখনও বলেন নাই। উহা একটী অনুমান মাত্র, যাহার সত্যাসত্যতা-নির্দ্ধারণ কেবল লৌকিক পণ্ডিতেরাই করিতে পারিবেন। এতৎসংক্রান্ত ভৌগোলিক ব্যাপারসমূহের মধ্যে আলেকজান্দ্রিয়ায় ভারতীয় ও মিশরীয় উপকরণসমূহের সম্মিলনের সর্ব্বজনস্বীকৃত ঐতিহাসিক ঘটনার কথাই শুধু তিনি উল্লেখ করিতেন। আর বিচারবুদ্ধির চক্ষে এই সন্দেহটুকু থাকিলেও, উহাতে তাঁহার মেরীতনয়ের প্রতি জ্বলন্ত প্রেমের কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই। হিন্দুদিগের মতে, কোন আদর্শের আদর্শহিসাবে সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণতাই আসল জিনিস, উহার দেশকালের সহিত সম্বন্ধ কতদূর সত্য, তাহা দেখিবার প্রয়োজন নাই। সুতরাং স্বামিজীর পক্ষে ভক্তির ভাব হইতে Sistine Madonna বা পুত্র-ক্রোড়ে খৃষ্টমাতার একখানি ছবিকে আশীর্ব্বাদ করিতে অস্বীকার, এবং তৎপরিবর্ত্তে শ্রীভগবানের বালগোপালমূর্ত্তির পাদপদ্ম স্পর্শ করা খুব স্বাভাবিকই হইয়াছিল। সেইরূপ জনৈক মহিলার প্রশ্নের তিনি যে উত্তর দিয়াছিলেন, তাহাও খুবই স্বাভাবিক হইয়াছিল—"যদি আমি ন্যাজারেথবাসী ঈশার সময়ে প্যালেস্টাইনে বাস করতুম, তাহলে আমি চোখের জলের বদলে হৃদয়ের রক্তে তাঁর পা দুখানি ধুয়ে দিতুম।" এতদ্ভিন্ন, এবিষয়ে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের স্পষ্ট সম্মতিও পাইয়াছিলেন। বাল্যকালে তিনি ঐরূপ একটী প্রশ্ন সম্বন্ধে ব্যগ্রভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের মতামত জানিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি উত্তর দিয়াছিলেন, "একথা কি তোমার মনে হয় না যে, যাঁরা এরকম সব জিনিস সৃষ্টি করতে পেরেছেন, তাঁরা অপরের উপাসনার জন্য যেসকল আদর্শ প্রচার করতেন, নিজেরাই সেগুলির জীবন্ত মূর্ত্তি ছিলেন?"

বিংশ পরিচ্ছেদ

নারীজাতি ও নিম্নশ্রেণীসমূহ

দক্ষিণেশ্বরের মন্দির কৈবর্ত্ত (মাহিষ্য)-কুলোদ্ভবা ধনাঢ্যা রাণী রাসমণি কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল, এবং ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণ পূজাদি কর্ম্মে নিয়ত ব্রাহ্মণগণের অন্যতমরূপে তথায় বাস করিতে আরম্ভ করেন।

এই ঘটনাদ্বয় স্বামী বিবেকানন্দের মনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল—সে প্রভাবের সম্যক্ পরিচয় সম্ভবতঃ তিনি নিজেই পান নাই। তাঁহার গুরুদেবের সকল শিষ্য যে ধর্ম্মান্দোলনের অঙ্গীভূত ছিলেন, নিম্নশ্রেণীর লোকদের মধ্য হইতে উদ্ভূতা জনৈক রমণীই এক হিসাবে সেই সমস্ত ব্যাপারটীর মূলকারণস্বরূপ ছিলেন। মানবীয় দৃষ্টিতে দেখিলে, দক্ষিণেশ্বর মন্দির না থাকিলে আমরা শ্রীরামকৃষ্ণকে পাইতাম না, শ্রীরামকৃষ্ণ না থাকিলে স্বামী বিবেকানন্দও থাকিতেন না, এবং স্বামী বিবেকানন্দ না থাকিলে পাশ্চাত্ত্য দেশে কোন প্রচার-কার্য্যও হইত না। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের অব্যবহিত পূর্ব্বে কলিকাতার কয়েক মাইল উত্তরে গঙ্গাতীরে এক কালীবাটী-নির্ম্মাণের উপরই এই সমগ্র ব্যাপারটী নির্ভর করিয়াছে। উহাও আবার নিম্নকুলোদ্ভবা জনৈক ধনাঢ্যা রমণীর ভক্তির ফলস্বরূপ ছিল। স্বামিজী স্বয়ংই আমাদিগের মনে পড়াইয়া দিয়াছিলেন যে, এদেশ

ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য-সংরক্ষণে বদ্ধপরিকর হিন্দু রাজগণের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে শাসিত হইলে এই জিনিসটী কদাপি ঘটিতে পারিত না। ইহা হইতেই তিনি ভারতে একচ্ছত্রী রাজগণের জাতিভেদের প্রতি বিশেষ মনোযোগ না দেওয়ার গুরুত্ব অনুমান করিতে পারিয়াছিলেন।

রাণী রাসমণি তাঁহার সময়ে একজন বীরহৃদয়া রমণী ছিলেন। কিরূপে তিনি কলিকাতার ধীবরদিগকে অন্যায্য করভার হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, সে কথা এখনও লোকমুখে শুনিতে পাওয়া যায়। তিনি তাঁহার স্বামীকে সরকার যে বিপুল অর্থ দাবী করিয়াছিলেন, তাহা দিতে সম্মত করাইয়া তৎপরে নদীতে যাহাতে বিদেশীয়দিগের জাহাজ চলাচল একেবারে বন্ধ হয়, তজ্জন্য জেদ করিয়া বসিলেন। সুসমৃদ্ধ গড়ের মাঠে তাঁহার যেসকল রাস্তা ছিল, সেইসকল রাস্তা দিয়া তাঁহার পরিবারস্থ লোকেরা কেন দেব-প্রতিমাদি লইয়া যাইতে পারিবেন না, ইহা লইয়া তিনি ঐরূপ আর এক তুমুল যুদ্ধ বাধাইয়া দেন। তিনি এক প্রকার বলিয়াই ছিলেন যে, যদি ইংরেজরা ভারতবাসিগণের ধর্ম্ম পছন্দ না করেন, তাহা হইলে যে রাস্তা দিয়া মিছিল বাহির হয় তাহার আপত্তিজনক অংশগুলিতে দক্ষিণে ও বামে প্রাচীর তুলিয়া দিলেই হইল—উহাতে আর বেশী হাঙ্গামা কি আছে? আর সেইরূপ করাও হইল—উহার ফল হইল এই যে, কলিকাতায় 'রতন রো' নামক চমৎকার রাজপথটী মাঝখানে বন্ধ হইয়া গেল। পতি-বিয়োগের কিছুদিন পরেই তাঁহাকে তাঁহার ব্যাঙ্কারদিগের নিকট যে বিপুল অর্থ জমিয়াছিল তাহা নিজ হস্তে উঠাইয়া লইবার জন্য বিধিমতে চেষ্টা করিতে হইয়াছিল। তিনি উহা নিজে খাটাইবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। কার্য্যটী কঠিন হইলেও তিনি উহা অসীম বুদ্ধি

ও দক্ষতাসহকারে সম্পাদন করিয়াছিলেন, এবং তদবধি নিজের সমস্ত কার্য্য নিজেই পরিচালনা করিতেন। অনেকদিন পরে তাঁহার একটী বড় মকদ্দমায় তিনি কৌঁসুলীর দ্বারা যেসকল প্রত্যুৎপন্নমতিত্বপূর্ণ উত্তর প্রদান করিয়া প্রতিপক্ষকে নিরস্ত করিয়াছিলেন, তাহা কলিকাতার প্রত্যেক হিন্দুপরিবারে চলিত কথার ন্যায় হইয়া গিয়াছে।

রাণী রাসমণির জামাতা মথুরবাবুর নাম শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম জীবনের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। যখন আশপাশের সকল লোক এই মহাসাধককে ধর্ম্মোন্মাদ বলিয়া স্থির করিয়াছে, তখন তিনিই ইঁহাকে রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। তিনিই তাঁহাকে কোনরূপ কাজ-কর্ম্ম না করিয়াও বরাবর বৃত্তি ও বাসস্থান ভোগ করিতে দিয়াছিলেন। এইসকল বিষয়ে মথুরবাবু তাঁহার শ্বশ্রূঠাকুরাণীর প্রতিনিধিরূপে কার্য্য করিতেন। রাণী রাসমণি প্রথম হইতেই শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্ম্মবিষয়িণী প্রতিভা বুঝিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, এবং আজীবন নিষ্ঠার সহিত সেই প্রথম ধারণাই বলবতী রাখিতে পারিয়াছিলেন।

তথাপি যখন শ্রীরামকৃষ্ণ কামারপুকুরের ব্রাহ্মণকুমাররূপে দক্ষিণেশ্বরে প্রথম আগমন করেন, তখন তিনি এত আচারনিষ্ঠ ছিলেন যে, জনৈক নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোক উক্ত মন্দির নির্ম্মাণ এবং তদুদ্দেশ্যে সম্পত্তি দান করিয়াছে—একথা তাঁহার অত্যন্ত বিসদৃশ বোধ হইয়াছিল। প্রধান পুরোহিতের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়া তাঁহাকে প্রতিষ্ঠা-দিবসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পূজাদি কার্য্যে সাহায্য করিতে হইয়াছে। কিন্তু তিনি তথায় প্রসাদ গ্রহণ করিতে আদৌ সম্মত হইলেন না। শুনা যায়, সকল কার্য্য চুকিয়া যাইলে এবং সমাগত লোকজন

চলিয়া গেলে তিনি সেই রাত্রে বাজার হইতে একমুঠা ছোলাভাজা কিনিয়া সমস্ত দিন উপবাসের পর তদ্দ্বারা ক্ষুন্নিবৃত্তি করিলেন।

পরে তিনি কালীবাটীতে যে পদ অধিকার করিয়াছিলেন, এই ঘটনাটী নিশ্চয়ই তাহার অর্থকে গভীরতর করিয়া দিতেছে। তিনি কদাচ ভ্রমবশতঃ কৈবর্ত্তবংশীয়া রাণীর সম্মানিত অতিথি ও প্রতিপাল্য হয়েন নাই। আমাদের বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ আছে যে, যখন তিনি জগতে তাঁহার কার্য্য কি তাহা জানিতে পারেন, তখন তিনি দেখিলেন যে, বাল্যে পল্লীগ্রামে তিনি যে কঠোর আচার-নিষ্ঠতায় অভ্যস্ত হইয়াছিলেন, তাহা ঐ কার্য্যের পোষক না হইয়া বরং প্রতিকূল ছিল। আমরা ইহাও বলিতে পারি যে, তাঁহার সমগ্র জীবন, তিনি যে সকল মানবের ধর্ম্মরাজ্যে সামাজিকপদ-নির্ব্বিশেষে সমান প্রাধান্যে বিশ্বাসী ছিলেন, এই কথাই ঘোষণা করিতেছে।

আমাদের আচার্য্যদেব অন্ততঃ, তিনি যে সঙ্ঘভুক্ত ছিলেন তৎসম্বন্ধে মনে করিতেন যে, স্ত্রীজাতি ও নিম্নশ্রেণীর লোকদিগের উন্নতিসাধনই উহার জীবনের ব্রত। খেতড়ীর রাজাকে পাঠাইবার জন্য যখন তিনি আমেরিকায় ফনোগ্রাফসম্মুখে কয়েকটী কথা কহেন, তখন আপনা হইতে এই বিষয়টীই তাঁহার মনে আসিয়াছিল। বিদেশে যখনই তিনি আপনাকে অন্য সময় অপেক্ষা মৃত্যুর অধিকতর নিকটবর্ত্তী জ্ঞান করিতেন এবং নিকটে কোন গুরুভ্রাতা না থাকিতেন, তখনই ঐ চিন্তা তাঁহার মনকে অধিকার করিত, এবং তিনি সমীপস্থ শিষ্যকে বলিতেন, "কখনও ভুলো না, 'স্ত্রীজাতি ও নিম্নশ্রেণীর লোকদের উন্নতিসাধনই' আমাদের মূলমন্ত্র।"

একথা সত্য যে, সমাজে যখন নানা দলের সৃষ্টি হইতে থাকে, সেই সময়েই তাহার শক্তির সমধিক বিকাশ লক্ষিত হয়, এবং স্বামিজী এই কথাটী খুব চিন্তা করিতেন যে, যাহা একবার কোন নির্দ্দিষ্ট গঠন প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা আর জীবনসঞ্চার করিতে বা অনুপ্রাণিত করিতে পারে না। তাঁহার মতে 'নির্দ্দিষ্ট আকারপ্রাপ্ত' ও 'মৃত'—ইহারা একার্থক শব্দ; যে সমাজ চিরকালের জন্য একটা নির্দ্দিষ্ট আকার প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা যেন যাহার বৃদ্ধিকাল অতীত হইয়াছে, এমন একটী বৃক্ষের ন্যায়। উহা হইতে যদি আমরা কিছু প্রত্যাশা করি, সে কেবল মিথ্যা ভাবুকতামাত্র হইবে, আর স্বামিজী ভাবুকতাকে স্বার্থপরতা বলিয়া জ্ঞান করিতেন, কারণ উহা 'ইন্দ্রিয়ের অসংযমজনিত উচ্ছ্বাসমাত্র।'

স্বামিজী জাতিভেদ-ব্যবস্থাটীর সর্ব্বদা আলোচনা করিতেন। তিনি কদাচিৎ উহার বিরুদ্ধ সমালোচনা করিতেন, বরং সর্ব্বদা তদ্বিষয়ে অনুসন্ধান করিতেন। উহাকে মানবজীবনেরই একটী অনিবার্য্য ব্যাপার বলিয়া দেখিতে পাওয়ায়, তিনি উহাকে শুধু হিন্দুধর্ম্মেরই একটী বিশেষ ব্যাপার বলিয়া মনে করিতে পারিতেন না। জনৈক ইংরেজকে ভদ্রলোকদের সম্মুখে, তিনি যে এক সময়ে মহীশূরে গোবধ করিতেন, একথা স্বীকার করিতে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়াই স্বামিজী বলিয়া উঠিয়াছিলেন, "লোকের স্বজাতির মতামতই তাকে ধর্ম্মপথে রাখবার শেষ এবং শ্রেষ্ঠ উপায়।" তারপর তিনি দুই-চারি কথায় এই দুই প্রকার আদর্শের পার্থক্যের বর্ণনা করিলেন—এক প্রকার আদর্শ শিষ্ট ও দুষ্টের মধ্যে, অথবা ধার্ম্মিক ও নাস্তিকের মধ্যে, কি প্রভেদ তাহাই নির্দ্দেশ করে, আবার অপর এক প্রকার সূক্ষ্মতর

নৈতিক আদর্শ আছে, যাহা ভাঙ্গা অপেক্ষা গড়ার দিকে অধিক মন দেয়—যাহা আমাদিগের মধ্যে আমাদের সমানপদস্থ অল্পসংখ্যক মানবের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিবার চেষ্টা জাগাইয়া দেয়।

কিন্তু এই প্রকারের মন্তব্যগুলি পক্ষপাতিত্বের পরিচায়ক নহে। সন্ন্যাসী জীবনকে শুধু সাক্ষিস্বরূপে দেখিয়া যাইবেন, উহাতে কোন পক্ষ অবলম্বন করিবেন না। অনেক সম্প্রদায় হইতে তাঁহার নিকট এমন সব প্রস্তাব আসিয়াছিল, যাহা গ্রহণ করিলে তিনি উহাদের অন্যতমের নেতা বলিয়া পরিগণিত হইতেন। সে-সকলকে তিনি অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন। স্ত্রীজাতি ও নিম্নশ্রেণীর লোকেরা শুধু শিক্ষালাভ করুক—তাহাদের ভবিষ্যৎসংক্রান্ত অন্য সকল প্রশ্নের মীমাংসা তাহারা নিজেরাই করিতে সক্ষম হইবে। তিনি স্বাধীনতা বলিতে ইহাই বুঝিতেন, এবং আজীবন এই কথাই সকলকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। ঐ শিক্ষা কিরূপ আকারের হওয়া চাই, তৎসম্বন্ধে তিনি নিজ অভিজ্ঞতা হইতেই বুঝিয়াছিলেন যে, এপর্যন্ত উহার অতি সামান্য অংশই স্থিরীকৃত হইয়াছে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রতি তাঁহার যথেষ্ট শ্রদ্ধা থাকিলেও, যাহাকে তিনি অসতী বিধবার পাপাচরণ বলিয়া অভিহিত করিতেন, তৎপ্রতি তাঁহার দারুণ ঘৃণা ছিল। তিনি প্রাণের ভিতর অনুভব করিতেন এবং বলিতেন, "আর যা হয় হোক, ওটী যেন কখনও না হয়!" বৈধব্যের শ্বেতবাস, তাঁহার নিকট, যাহা কিছু পবিত্র ও সত্য, তাহারই চিহ্নস্বরূপ ছিল। সুতরাং যে-কোন শিক্ষাপ্রণালী এইসকল বস্তুর প্রতি লক্ষ্য রাখে না, তাহাকে তিনি স্বভাবতঃ শিক্ষা বলিয়াই গণ্য করিতেন না। যাহারা চঞ্চল, বিলাসী এবং জাতীয়তাভ্রষ্ট, শত বাহ্য পারিপাট্য সত্ত্বেও তাহারা

তাঁহার মতে শিক্ষিত নহে, বরং অধঃপতিত। পক্ষান্তরে, যদি তিনি দেখিতেন যে, কোন আধুনিকভাবাপন্ন স্ত্রীলোক সেই প্রাচীন কালের ন্যায় একান্ত নির্ভর ও পরম ভক্তির সহিত স্বামীর জীবনসঙ্গিনী হইয়াছেন এবং শ্বশুরগৃহের পরিজনদিগের প্রতি প্রাচীনকালসুলভ নিষ্ঠা বজায় রাখিয়াছেন, তাহা হইলেই তিনি, তাঁহার নিকট, 'আদর্শ হিন্দু পত্নী" বলিয়া বিবেচিত হইতেন। প্রকৃত সন্ন্যাসের ন্যায় যথার্থ নারীজীবনও কেবল লোক-দেখান ব্যাপার নহে। আর যে স্ত্রীশিক্ষা প্রকৃত নারীজনোচিত গুণসমূহকে প্রচার ও তাহাদের বিকাশে সহায়তা না করে, তাহা স্ত্রীশিক্ষাপদবাচ্যই নহে।

ভাবী আদর্শ রমণীর গুণাবলীর সূচনা যদি দৈবাৎ কোথাও মিলিয়া যায়, তিনি সর্ব্বদাই তাহার সন্ধানে থাকিতেন। তিনি ভাবিতেন, কতকটা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বিকাশ হইবেই, এবং তৎসঙ্গে অধিক বয়সে বিবাহ ও হয়ত কতকটা নিজের পছন্দমত পতিনির্ব্বাচন, এ দুইটীও আসিবেই। সম্ভবতঃ ইহাই অন্য সকল উপায় অপেক্ষা বাল্যবৈধব্য-জনিত সমস্যাসমূহের প্রকৃষ্টতর সমাধান করিবে। কিন্তু ঐ সঙ্গে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যখন বাল্যবিবাহপ্রথার সূত্রপাত হয়, তখন সমাজ উহা ইচ্ছাপূর্ব্বকই করিয়াছিলেন। বিবাহ বিলম্বে হইলে অপর যেসকল দোষের প্রাদুর্ভাব হয় বলিয়া তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন, ঐ উপায়ে তাঁহারা সেইগুলিকে পরিহার করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন।

ভবিষ্যতের হিন্দু রমণীকে তিনি একেবারে প্রাচীনকালের ধ্যান-শক্তিবর্জ্জিত বলিয়া চিন্তা করিতে পারিতেন না। নারীগণকে আধুনিক বিজ্ঞান শিখিতেই হইবে, কিন্তু প্রাচীন ধর্ম্মভাব খোয়াইয়া

নহে। তিনি বেশ স্পষ্ট বুঝিয়াছিলেন যে, তাহাই আদর্শ শিক্ষা হইবে, যাহাতে সমগ্র সমাজ-শরীরে প্রত্যক্ষভাবে সর্ব্বাপেক্ষা অল্প পরিবর্ত্তন আনয়ন করিবে। আদর্শ শিক্ষা এরূপ হইবে যে, কালে উহা প্রত্যেক নারীকে একাধারে ভারতের অতীতকালের সমুদয় নারীর শ্রেষ্ঠত্ব বিকাশ করিতে সহায়তা করিবে।

অতীত কালের প্রত্যেক জ্বলন্ত উদাহরণটী পৃথকভাবে নিজ নিজ কার্য্য করিয়াছে। রাজপুত-ইতিহাস জাতীয় আদর্শ নারী-জীবনের তেজ ও সাহসে ভরপুর রহিয়াছে। কিন্তু ঐ অত্যুষ্ণ দ্রব ধাতুকে নূতন ছাঁচে ঢালিতে হইবে। ভারতে যত নারী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, রাণী অহল্যা বাঈ তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা গরীয়সী। একজন ভারতীয় সাধুর পক্ষে দেশের সর্ব্বত্র তাঁহার লোকহিতকর কীর্ত্তিগুলি দেখিয়া ঐরূপ ভাবাই স্বাভাবিক। তথাপি ভাবী নারীগণের মহত্ত্ব তাঁহার মহত্ত্বের ঠিক প্রতিরূপমাত্র হইবে না ; ইহা তাহাকেও ছাড়াইয়া যাইবে। আগামী যুগের স্ত্রীগণের মধ্যে বীরোচিত দৃঢ়সঙ্কল্পের সহিত জননীসুলভ হৃদয়ের সমাবেশ থাকিবে। পবিত্র শান্তি ও স্বাধীনতার আধারভূতা সাবিত্রী যে বৈদিক অগ্নিহোত্রাদি পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্য হইতে উদ্ভূত হইয়াছিলেন, তাহাই আদর্শ অবস্থা। কিন্তু ভবিষ্যতে নারীগণকে ইহার সহিত মলয়মারুতের ন্যায় কোমলতা ও মাধুর্য্যেরও বিকাশ দেখাতেই হইবে।

নারীগণকে অধিকতর যোগ্যতা দেখাইতে হইবে, উহার হ্রাস হইলে চলিবে না। বিধবাশ্রম, বা বালিকাবিদ্যালয় ও কলেজের তিনি যেকোন প্ল্যান বা কল্পনা করিতেন, তাহাতে বড় বড় হরিদ্বর্ণ শষ্পাচ্ছাদিত স্থানের ব্যবস্থা থাকিত। তিনি বলিতেন,

যাঁহারা তথায় বাস করিবেন, তাঁহাদের শারীরিক ব্যায়াম, উদ্যান-সংরক্ষণ এবং পশুচর্য্যা, এগুলি নিত্য কর্ত্তব্যের মধ্যে হওয়া চাই। ধর্ম্ম, এবং সংসার অপেক্ষা সন্ন্যাসাশ্রমমধ্যেই যাহার সমধিক বিকাশ দেখা যায়, সেই উচ্চ লক্ষ্যের প্রতি প্রবল অনুরাগ এই নূতন ধরনের ব্যাপারগুলির অস্থিমজ্জাস্বরূপ হইবে; ইহাদিগেরই আশ্রয়ে ঐগুলি পুষ্ট হইয়া উঠিবে। আর এবংবিধ বিদ্যালয়সকল শীতঋতুর অবসানে তীর্থযাত্রায় বাহির হইবে এবং ছয় মাস কাল হিমালয়ে থাকিয়া পাঠাদি অভ্যাস করিবে। এইরূপে এমন এক শ্রেণীর নারী সৃষ্টি হইবে, যাহারা ধর্ম্মরাজ্যে 'বাশি-বাজুকদিগেরই'* সদৃশ হইয়া দাঁড়াইবে, এবং তাহারাই নারীগণের সমস্যার সমাধান করিবে। তাহাদের অন্য কোন গৃহ থাকিবে না; যেখানে তাহারা কাজ করিবে, তাহাই তাহাদের গৃহ হইবে; ধর্ম্মের বন্ধন ব্যতীত তাহাদের অপর কোন বন্ধন থাকিবে না; এবং গুরু, স্বদেশ ও দেশের আপামর জনসাধারণ, এই তিনের প্রতি ব্যতীত অপর কাহারও প্রতি কোন প্রীতি থাকিবে না। তাঁহার কল্পনা কতকটা এইরূপই ছিল। তিনি বেশ বুঝিয়াছিলেন যে, একদল শিক্ষয়িত্রীর বিশেষ প্রয়োজন,

---

* Bashi-Bazouks—ইহারা খালিফদিগের শরীর-রক্ষক ছিল। বহুকাল যাবৎ এইরূপ প্রথা ছিল যে, যেসকল সৈনিককে তুর্কী রক্ষিদলে ভর্ত্তি করা হইত, তাহাদিগকে শৈশবে সকল দেশ ও জাতির মধ্য হইতে চুরি করিয়া আনিয়া মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া লালনপালন করা হইত। এইরূপে তাহাদের ধর্ম্মে যার-পর-নাই অনুরাগ ছিল, এবং দেশের ও রাজার সেবাই পরস্পরের মধ্যে একমাত্র বন্ধনস্বরূপ ছিল। সমগ্র ইউরোপে তাহারা হিংস্রপ্রকৃতি ও সাহসী বলিয়া বিখ্যাত ছিল। মিশরে নেপোলিয়ন তাহাদের ক্ষমতা চূর্ণ করেন।

এবং তিনি এইরূপেই উঁহাদিগকে সংগ্রহ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। কি পুরুষে, কি স্ত্রীতে, তিনি এই একমাত্র গুণের বিকাশ দেখিতে চাহিতেন—উহা বল (strength)। কিন্তু বল কাহাকে বলে, তৎসম্বন্ধে তিনি কি কঠোরভাবে বিচার করিতেন! নিজেকে জাহির করা, অথবা অতিরিক্ত ভাবোচ্ছ্বাস—এ-দুইয়ের কোনটীর তিনি প্রশংসা করিতেন না। সেই প্রাচীনকালের মৌন, মাধুর্য্য ও নিষ্ঠার আদর্শভূত চরিত্রসমূহে তাঁহার মন এতদূর মুগ্ধ হইয়াছিল যে, কেবল বাহ্য আড়ম্বর দ্বারা উহা আর আকৃষ্ট হইত না। সেই সঙ্গে আবার বর্ত্তমান যুগে ভারতে চিন্তা ও জ্ঞানের যাহা কিছু উন্নতি সাধিত হইয়াছে, তাহাতে পুরুষদিগের ন্যায় স্ত্রীলোকদিগেরও সমান অধিকার আছে। সত্যে লিঙ্গবিচার চলে না। যাহাতে আত্মা ও মনের উপর শরীরের বন্ধনকে আরও দৃঢ় করিয়া তুলিতে চাহে, এরূপ কোন সমাজ বা রাষ্ট্রনীতিকে তিনি আদৌ সহিতে পারিতেন না। যে রমণী যত বড় হইবেন, তিনি ততই চরিত্র-মনের রমণী-সুলভ দুর্ব্বলতাগুলিকে অতিক্রম করিবেন; এবং আশা করা যায় যে, ভবিষ্যতে ক্রমশঃ অধিক-সংখ্যক স্ত্রীলোক এইরূপ উন্নতিলাভ করিয়া প্রশংসার্হ হইবেন।

তিনি স্বভাবতঃই বিধবাগণের মধ্য হইতে প্রথম শিক্ষয়িত্রী-দল সংগৃহীত হইবে, এইরূপ আশা করিয়াছিলেন। ইঁহারা পাশ্চাত্ত্য দেশের মঠাধিকারিণীদিগের অনুরূপ হইবেন। কিন্তু অন্য সকল বিষয়ের ন্যায় এ বিষয়েও তিনি কোনরূপ নির্দ্দিষ্ট সঙ্কল্প করেন নাই। তিনি শুধু বলিতেন, "জাগো! জাগো! সঙ্কল্পগুলি কালে আপনা থেকেই পরিপুষ্ট এবং কাজে পরিণত হয়।"—এগুলি তাঁহারই

কথা। তথাপি উপকরণ উপস্থিত হইলে—উহা যেখান হইতেই আসুক না কেন—তিনি উহাকে সাদরে গ্রহণ করিতেন। কেন প্রত্যেক স্ত্রীলোক দৃঢ় ও সরল চরিত্র এবং বুদ্ধিসহায়ে সত্যপথে থাকিয়া আপনাকে উচ্চতম আদর্শের যন্ত্রস্বরূপে পরিণত করিতে পারিবেন না, এ বিষয়ে তিনি কোনই কারণ খুঁজিয়া পাইতেন না। অসৎকর্ম্মহেতু মনের উপর বোঝা থাকিলেও তাহা অকপটতা দ্বারা দূর করা চলিবে। নারীগণের উন্নতিবিধায়ক আন্দোলন সম্বন্ধে যিনি গ্রন্থাদি লিখিয়াছেন, এরূপ এক আধুনিক লেখক বলিয়াছেন, "সকল উচ্চ উদ্দেশ্যের স্বাধীনভাবে অনুসরণ করা চাই।" স্বামিজীও স্বাধীনতাকে ভয় পাইতেন না, এবং ভারতীয় স্ত্রীজাতিকে সন্দেহ করিতেন না। কিন্তু তিনি যে স্বাধীনতা-বিকাশের কল্পনা করিতেন, তাহা আন্দোলন, হৈ চৈ বা সকল প্রাচীন অনুষ্ঠানকে যথেচ্ছভাবে ভাঙ্গিয়া ফেলা, এসকলের দ্বারা সাধিত হইবার নহে। উহা পরোক্ষভাবে, নীরবে এবং ভিতর হইতে আপনা আপনি সাধিত হওয়া চাই। প্রথমে নারীগণকে সমাজের আদর্শগুলি ঘাড় পাতিয়া গ্রহণ করিতে হইবে; তারপর যতই তাঁহারা অধিকতর গুণশালিনী হইতে থাকিবেন, ততই তাঁহাবা জাতীয় জীবনের বৈশিষ্ট্য-পূর্ণ আদেশ ও সুযোগগুলি অধিক পরিমাণে বুঝিতে থাকিবেন। ঐসকল নির্দ্দেশ পালন করিয়া এবং ঐ সকল সুযোগ পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করিয়া তাঁহারা ক্রমশঃ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ভারতীয়ভাবাপন্ন হইবেন, এবং উন্নতির এরূপ উচ্চশিখরে আরোহণ করিবেন, যাহা প্রাচীন ভারত কখনও স্বপ্নেও ভাবে নাই।

আমাদের জাতীয় জীবনধারা যে অবিচ্ছিন্ন রহিয়াছে, এই বিষয়টী

হৃদয়ঙ্গম করায় স্বামিজীর স্বাধীন চিন্তার যেমন স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়, তেমন আর কোন বিষয়ে পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। তাঁহার নিকট কোন প্রথার নূতন আকারটী সর্ব্বদাই পুরাতন পবিত্র সংস্কারসমূহের দ্বারা পবিত্রীকৃত বলিয়া বোধ হইত। তাঁহার মতে দেবী সরস্বতীর চিত্র অঙ্কিত করাই "তাঁহাকে পূজা করা"; ভৈষজ্য-বিজ্ঞান অধ্যয়ন করাই "রোগ ও ময়লারূপ দানবদ্বয়ের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য নতজানু হইয়া ভগবানের নিকট প্রার্থনা করা।" প্রাচীনকালের ভক্তিপূর্ব্বক গোসেবা হইতে ইহাই পরিচয় পাওয়া যায় যে, হিন্দুসমাজের মধ্যে নূতন ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে দুগ্ধ, মাখন প্রভৃতি সরবরাহ করা, পশুগণের জন্য চারণ-ভূমির ব্যবস্থা করা ও সকল প্রকারে তাহাদিগের পরিচর্য্যা করা ইত্যাদি ভাব পূর্ব্ব হইতেই যথেষ্ট পরিমাণে বর্ত্তমান ছিল। বুদ্ধি-বৃত্তির যতদূর সম্ভব অনুশীলন করাকে তিনি ধ্যান-ধারণাদির শক্তিলাভের পক্ষে অত্যাবশ্যক জ্ঞান করিতেন। তাঁহার মতে অধ্যয়নই তপস্যা, এবং হিন্দুদিগের ধ্যানপরায়ণতা বৈজ্ঞানিক সূক্ষ্ম-দৃষ্টিলাভের একটী উপায়। সকল কার্য্যই এক প্রকারের ত্যাগ। গৃহ ও পরিবারবর্গের প্রতিও যে ভালবাসা, তাহাকেও সর্ব্বদা মহত্তর ও বিশ্বজনীন প্রীতিতে পরিণত করা যাইতে পারে।

তিনি সানন্দে দেখাইয়া দিতেন যে, হিন্দুগণের নিকট সকল লিখিত শব্দই সমান পবিত্র; সংস্কৃতও যেমন, ইংরেজী ও পারসিক শব্দও ঠিক তেমনি। কিন্তু তিনি বিদেশী আদবকায়দা ও বিদেশী শিক্ষাদীক্ষার বাহ্য চাকচিক্যকে ঘৃণা করিতেন। যে সমালোচনা শুধু বাহিরের ব্যাপারগুলিকেই নূতন করিয়া সাজাইতে চায়, তাহাতে

তিনি কর্ণপাত করিতেই পারিতেন না। যখন তিনি দুইটী সমাজের মধ্যে তুলনা করিতেন, তখন তিনি সর্ব্বদা দেখাইয়া দিতেন যে, বিভিন্ন সমাজ বিভিন্ন আদর্শকে বিকাশ করিবার চেষ্টা করিতেছে, এবং কি আধুনিক, কি মধ্য যুগে, এই লক্ষ্যসাধনে কে কতটা পরিমাণে সফলকাম হইয়াছে, তাহা দেখিয়াই তিনি তাহাদের সাফল্য ও অকৃতকার্য্যতার বিচার করিতেন।

সর্ব্বোপরি তাঁহার ভালবাসা সম্বন্ধে ধারণা এরূপ ছিল যে, তিনি বক্তা ও যাঁহার সম্বন্ধে বলা হইতেছে, এই দুইজনের মধ্যে এতটুকু ভেদ রাখিতে দিতেন না। কাহারও সম্বন্ধে 'তাহারা' বলিয়া উল্লেখ করাই তাঁহার নিকট ঘৃণার কাছাকাছি বলিয়া বোধ হইত। তিনি যাহাদিগের ত্রুটি বা দোষ দেখান হইতেছে, সর্ব্বদা তাহাদিগেরই পক্ষ অবলম্বন করিতেন। যাঁহারা তাঁহার সঙ্গ করিতেন, তাঁহারা বেশ বুঝিয়াছিলেন যে, যদি জগৎকে সত্যসত্যই ঈশ্বর ও শয়তান নামক দুই পৃথক ব্যক্তির সৃষ্টি বলিয়া কল্পনা করা চলিত, তাহা হইলে তিনি নিজে ঈশ্বরের সেনাপতি আর্কেঞ্জেল মাইকেলের পক্ষ অবলম্বন না করিয়া, যাঁহার উপর তিনি বিজয়লাভ করিয়াছিলেন, সেই সদাপরাজিত শয়তানেরই পক্ষ গ্রহণ করিতেন। তাঁহার এই ভাবটী, তিনি শিক্ষা দিতে বা সাহায্য করিতে সমর্থ, এই আন্তরিক দৃঢ় বিশ্বাসের ফলস্বরূপ ছিল না—পরন্তু উহা শুধু কেহ চিরদিনের মত যে দুঃসহ ক্লেশ সহ্য করিতে বাধ্য হইতেছে, তাহারই অংশ গ্রহণ করিবার আন্তরিক দৃঢ় সঙ্কল্প-প্রসূত। কেহ কোথাও জন্মের মত যে দারুণ কষ্টে পতিত হইয়াছে, তাহারই সবটুকু নিজে গ্রহণ করিয়া, তিনি বিশ্বের সমগ্র শক্তিকে অগ্রাহ্য করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতেন।

তাঁহার প্রকাশিত পত্রগুলির মধ্যে কোন কোন খানিতে তিনি দেখাইয়া দিয়াছেন যে, দয়ারূপ ভিত্তির উপরেও নরসেবাব্রতকে ঠিক ঠিক দাঁড় করান যায় না। তাঁহার পক্ষে ঐরূপ বলা খুবই স্বাভাবিক হইয়াছে। তিনি ওরূপ পৃষ্ঠপোষকতার আদৌ পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি বলিতেন যে, দয়া তাহাকেই বলে, যাহা অপরকে জীবজ্ঞানে সাহায্য করে; কিন্তু প্রেম সকলকে আত্মা জ্ঞান করিয়া সেবা করিয়া থাকে। অতএব প্রেমই পূজাস্বরূপ এবং এই পূজাই ঈশ্বরদর্শনে পরিণত হয়। "সুতরাং অদ্বৈতীর পক্ষে প্রেমই একমাত্র কার্য্যপ্রবৃত্তির হেতু।" কোন উচ্চ সেবার ভারপ্রাপ্তির সহিত আর কোন উচ্চাধিকারই তুলিত হইতে পারে না। একখানি পত্রে তিনি বলিতেছেন, "যিনি কাহাকেও রক্ষা করিয়াছেন, তিনিই সন্তুষ্টচিত্তে যাইবেন; যাঁহাকে রক্ষা করা হইয়াছে, তিনি নহেন।" পুরোহিতগণকে যেমন বাহ্যান্তরশুদ্ধি করিয়া উৎসুকভাবে অথচ সসম্ভ্রমে এবং সমস্ত বাধাবিপত্তির মধ্যেও অবিচলিত থাকিবার দৃঢ় সঙ্কল্প হৃদয়ে পোষণ করিয়া পূজাকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হয়, তেমনি যাঁহারা স্ত্রীশিক্ষারূপ পবিত্র কার্য্যের জন্য মনোনীত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকেও কার্য্যে অবতীর্ণ হইতে হইবে। কলিকাতা মহাকালী পাঠশালার স্থাপয়িত্রী, মহারাষ্ট্র মহিলা মাতাজী মহারাণীর কথাগুলি স্বামিজী মনে রাখিয়াছিলেন এবং প্রায়ই উহাদের উল্লেখ করিতেন। যে ছোট ছোট মেয়েগুলিকে তিনি পড়াইতেন, তাহাদের দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, "স্বামিজী, আমার কোন সহায় নেই। কিন্তু আমি এই নিষ্পাপা কুমারীগুলিকে পূজো করি; তারাই আমাকে মুক্তির পথে নিয়ে যাবে।"

নিম্নশ্রেণীর লোকদের শিক্ষার প্রতি স্বামিজী যে ভাব পোষণ করিতেন, তাহাতে ঐরূপ এক প্রগাঢ় সহানুভূতি ও সেবার ভাবই প্রকাশ পাইত। তাঁহার মতে, সমাজের উচ্চ শ্রেণীসমূহের যেমন বিদ্যাশিক্ষা ও জ্ঞানলাভের অধিকার আছে, তাঁহাদের এই নিম্নশ্রেণীর ভ্রাতৃগণেরও ঐ বিষয়ে ঠিক তেমনি অধিকার আছে। এইটী পাইলেই তাহারা স্বাধীনভাবে ভিতর হইতে নিজেদের ভাগ্য নিজেরাই নির্ণীত করিয়া লইবে। তাঁহার পুরোবর্ত্তী এই কার্য্যটী সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্তভাবে চিন্তা করিয়া তিনি শুধু, বুদ্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া এ পর্য্যন্ত ভারতে যত মহাপুরুষ প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন, তাঁহাদিগেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করিতেছিলেন। যে যুগে ঔপনিষদিক জ্ঞান শুধু আর্য্যদিগেরই বিশেষ অধিকার বলিয়া গণ্য হইত, ভগবান তথাগত সেই যুগে প্রাদুর্ভূত হইয়া জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সকলকে ত্যাগ দ্বারা নির্ব্বাণ লাভরূপ শ্রেষ্ঠ মার্গের উপদেশ করিলেন। যে দেশে এবং যে কালে সিদ্ধ আচার্য্যগণের প্রদত্ত মন্ত্র কেবল অত্যল্প-সংখ্যক সুশিক্ষিত ব্যক্তির মধ্যেই সযত্নে রক্ষিত হইত, আচার্য্য রামানুজ সেই দেশে এবং সেই সময়ে কাঞ্চীনগরীর গোপুরে আরোহণ করিয়া সেই মহামন্ত্র সকল প্যারিয়া বা চণ্ডালের সমক্ষে ঘোষণা করিলেন। এখন ভারতে আধুনিক যুগের অভ্যুদয়কাল; এখন ভারতবাসিগণ ঐহিক জ্ঞান (secular knowledge) দ্বারা মানুষ হইতে শিখিবে। সুতরাং কিরূপে ইতর লোকদিগের মধ্যে ঐহিক জ্ঞানের বিস্তার করা যাইতে পারে, তাহাই স্বভাবতঃ স্বামী বিবেকানন্দের নিকট সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর প্রশ্ন হইয়াছিল।

অবশ্য তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, ভারতে পুনরায় ঐহিক সম্পদের

অভ্যুদয় করিতে হইলে সমগ্র জাতিটীর শক্তি ও সমবেত চেষ্টার প্রয়োজন। আর তিনি বেশ জানিতেন যে, ঐহিক সম্পদের পুনঃ প্রতিষ্ঠাই সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক। তিনি তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ওজস্বিতার সহিত বলিয়াছিলেন, "যে ঈশ্বর আমাকে ইহজীবনে এক টুকরা রুটী দিতে পারেন না, তিনি যে পরজীবনে আমাকে স্বর্গরাজ্য দেবেন, একথা আমি বিশ্বাস করতে পারি না!" সম্ভবতঃ তিনি আরও বুঝিয়াছিলেন যে, একমাত্র জ্ঞানবিস্তার দ্বারাই সমগ্র দেশটী সে যে মহান্ চিন্তা ও ধর্ম্মোৎকর্ষের উত্তরাধিকারী হইয়াছে, তৎপ্রতি শ্রদ্ধা অক্ষুন্ন রাখিতে পারিবে। যাহাই হউক না কেন, কেবল ইতর সাধারণের সহিত আদানপ্রদানসম্বন্ধ-স্থাপনের এক বিরাট আন্দোলন উত্থাপিত করিলেই উচ্চশ্রেণীসমূহের ধমনীতে নবজীবন সঞ্চারিত হইতে পারিবে। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, উচ্চকুলে জন্মগ্রহণ করিলেই যে লোকে নেতৃত্বের সনদ প্রাপ্ত হয়, এই ধারণাটীকে সর্ব্বতোভাবে পরিহার করিতে হইবে। সম্যক্ অনুশীলন দ্বারা সুমার্জিত যে কাণ্ডজ্ঞানকে লোকে প্রতিভা আখ্যা প্রদান করিয়া থাকে, তাহার উদ্ভব ব্রাহ্মণ বা কায়স্থের মধ্যে যেমন সম্ভবপর, সামান্য দোকানদার বা হলচালনাকারী কৃষকের মধ্যেও ঠিক তেমনি সম্ভবপর। যদি সাহস ক্ষত্রিয়েরই একচেটিয়া সম্পত্তি হইত, তাহা হইলে তাতিয়া ভীল কোথায় থাকিত? তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, বিধাতা সমগ্র ভারতবর্ষকেই গলাইবার পাত্রে প্রক্ষেপ করিতে উদ্যত হইয়াছেন; তাহার ফলে কোন্ নব নব আকারের শক্তি ও সমৃদ্ধির সৃষ্টি হইবে, তাহা পূর্ব্ব হইতে বলা মানবের ক্ষমতাতীত।

তিনি পরিষ্কাররূপে বুঝিয়াছিলেন যে, ভারতের শ্রমজীবিকুলকে শিক্ষা দেওয়া প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়েরই কার্য্য, অপর কাহারও নহে। বিদেশী লোকের দ্বারা বিদেশজাত জ্ঞানের প্রচলন হইলে তাহাতে যে কি অশেষ বিপদের সম্ভাবনা, তাহা কখনও এক মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার নিকট লুক্কায়িত ছিল না। তাঁহার প্রকাশিত পত্রাবলীতে তিনি যে ক্রমাগত ছাত্রগণকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ম্যাজিক লণ্ঠন, ফটোগ্রাফের ক্যামেরা এবং রাসায়নিক পরীক্ষার উপযোগী কিছু কিছু উপকরণ, এই সকলের সাহায্যে গ্রামবাসিগণকে শিক্ষা দিতে বলিতেছেন, তাহার অর্থই এই। আবার, সাধুরা যখন ভিক্ষা উপলক্ষ্যে নিম্নশ্রেণীর লোকদের সহিত মিশেন, সেই সময় তাঁহারা যেন কিছু কিছু ঐহিক শিক্ষাও উহাদিগকে প্রদান করেন, একথাও তিনি বিশেষ করিয়া বলিতেছেন। এইগুলি নবশিক্ষার সহায়ক ও প্ররোচনা মাত্র হইবে। সেই আসল শিক্ষার জন্য প্রত্যেককে একাকী বা দলবদ্ধভাবে প্রাণপণ চেষ্টা করিতে হইবে। কিন্তু একথা নিঃসন্দেহ যে, একটী বৃহৎ জাতিকে তাহার বোধসীমার বাহিরে একটী চিন্তা ও জ্ঞানের রাজ্য রহিয়াছে, প্রথমে এই কথাটী হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দেওয়াই নূতন শিক্ষাকে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে প্রচার করিবার প্রথম সোপান। সুতরাং স্বামিজীর এইপ্রকার নানা কল্পনা করা খুবই সঙ্গত হইয়াছিল।

কিন্তু তিনি নিজে যে আচার্য্যোচিত কার্য্যের সূত্রপাত ও মাহাত্ম্য প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তাহা অধিকাংশ স্থলেই ক্ষুধার্ত্ত বা পীড়িতদিগের কোন বিশেষ প্রকারের সেবারূপে প্রকাশ পাইত। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে প্লেগনিবারণকল্পে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবকদল

প্রেরণ করিয়া পল্লীনগরাদির স্বাস্থ্যরক্ষার যে প্রথম বন্দোবস্ত করেন, এবং যাহা অদ্যাবধি তাঁহারা করিয়া আসিতেছেন, তাহা আরম্ভ করিবার উপযোগী অর্থ স্বামিজীই সংগ্রহ করিয়া দেন। তিনি পাশ্চাত্ত্যদেশে যে কয় বৎসর ছিলেন, ভারতের অন্ত্যজদিগের সেবাকার্য্যে যাহারা ব্রতী হইতে সক্ষম, সর্ব্বদা এমন সেবকগণের সন্ধানে থাকিতেন, এবং ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার ব্রাহ্মণ শিষ্যদিগকে নীচজাতীয় কলেরারোগীদিগের সেবা করিতে দেখিয়া তিনি যেরূপ উল্লসিত হইয়াছিলেন, এমন আর কিছুতেই হন নাই। এই বিষয়ের উল্লেখ করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, "পূর্ব্বে বুদ্ধের সময় যা ঘটেছিল, আমরা এখন আবার তা দেখতে পাচ্ছি!" তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তগণ তাঁহার প্রেম ও দয়ার সর্ব্বকনিষ্ঠ-সন্তানপ্রতিম কাশীস্থ ক্ষুদ্র সেবাশ্রমটীর প্রতি এক বিশেষপ্রকার শ্রদ্ধা ও প্রীতি অনুভব করিয়া থাকেন।

কিন্তু তাঁহার হৃদয় অন্যান্য বিষয়েও কম আকৃষ্ট হইত না। এগুলির সহিত তাঁহার তেমন সাক্ষাৎ সম্বন্ধ না থাকিলেও ইহারা আরও অধিক পরিমাণে শিক্ষাসংক্রান্ত ব্যাপারই ছিল। যেসকল মাসিক পত্রের সহিত রামকৃষ্ণসঙ্ঘের অল্পবিস্তর সম্বন্ধ ছিল, তাহাদের হিতাহিত, এবং মুর্শিদাবাদের অনাথাশ্রম হইতে যে শিল্পশিক্ষা প্রদত্ত হইত তাহা—এগুলি তাঁহার চক্ষে বিশেষ গুরুতর ব্যাপার বলিয়া পরিগণিত হইত। ভারতের বর্ত্তমান অবস্থায় মাসিক-পত্রগুলি অনেক সময় একাধারে একপ্রকার জঙ্গম স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় বলিলেই চলে। তাহাদের প্রভাব অদ্ভুত। উহারা একদিকে যেমন ভাব ছড়াইয়া দেয়, অপরদিকে তেমনি লোকের

মনোভাব ব্যক্ত করিবার যন্ত্রস্বরূপ হয়। স্বামিজী উহাদের এই শিক্ষা-সংক্রান্ত উপকারিতা যেন সহজ সংস্কারপ্রভাবে বুঝিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি তাঁহার গুরুভ্রাতা ও শিষ্যগণ কর্তৃক পরিচালিত মাসিকপত্রগুলির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এত আগ্রহান্বিত ছিলেন। কোন সাময়িক পত্রের একই সংখ্যায় হয়ত একপৃষ্ঠায় উচ্চতম অতীন্দ্রিয় তত্ত্বসমূহ আলোচিত হইয়াছে, আবার অপর এক পৃষ্ঠায় অপেক্ষাকৃত কাঁচা হাতের লেখা নানা ঐহিক বিষয়ের কল্পনা-জল্পনা স্থান পাইয়াছে। ইহা হইতে ভারতীয় যুগ-সন্ধিকালের (Transition) সাধারণ লোকের মনের গতি কোন্ দিকে, তাহারও একটী প্রকৃষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়। এই আপাত-বিসংবাদী সত্য ব্যাপারটী সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়া স্বামিজী নিজেই বলিয়াছিলেন, "হিন্দুরা মনে করে যে, ধ্যানের দ্বারাই জ্ঞানলাভ হবে ; এটী তাদের পক্ষে বেশ খাটে—যখন বিষয়টী গণিতশাস্ত্র হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ভূগোলের বেলাও তারা স্বাভাবিক সংস্কারের বশে ঐ উপায় গ্রহণ করতেই প্রবৃত্ত হয় ; ঐ উপায়ে যে ভূগোলের বিশেষ জ্ঞানলাভ হয় না, তা বলাই নিষ্প্রয়োজন।"

কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দের স্বাভাবিক দয়াপ্রবৃত্তি শুধু যে ভারত-বাসিগণের কথাই চিন্তা করিত, তাহা নহে। যে-সকল লোক মনে করে যে, ব্যবসায় যত অধিক মূলধন লইয়া হইবে, ততই তাহা ভাল হইবে, তিনি তাহাদের পক্ষ গ্রহণ না করিয়া বরং যাহাদের অল্প জমির চাষ আছে, অথবা যাহারা অল্প পুঁজিতে কৃষিজাত দ্রব্যের কারবার করে, সর্ব্বদা তাহাদিগকেই সমর্থন করিতেন। উহা তাঁহার প্রাচ্য ভূখণ্ডে জন্মগ্রহণের অনুরূপ কার্য্যই হইয়াছিল। তিনি বলিতেন

যে, এক্ষণে যে দয়া-দাক্ষিণ্যের যুগের অভ্যুদয় হইতেছে, তাহার প্রধান কার্য্যই হইবে—শ্রমজীবী বা 'শূদ্র'দিগের সমস্যার সমাধান করা। যখন তিনি পাশ্চাত্ত্যে প্রথম পদার্পণ করেন, তখন তিনি যে তথাকার আপাতপ্রতীয়মান অধিকার-সাম্য দেখিয়া বিশেষ আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, একথা আমরা তাঁহার পত্রাবলী হইতে বুঝিতে পারি। পরে, ১৯০০ খৃষ্টাব্দে, তিনি উহার পশ্চাতে যে ধনীদিগের স্বার্থপরতা ও বিশেষাধিকারলাভের জন্য প্রাণপণ সঙ্ঘর্ষ রহিয়াছে, তাহা বেশ দেখিতে পাইয়াছিলেন, এবং একজনকে চুপে চুপে বলিয়াওছিলেন যে, এখন পাশ্চাত্ত্য জীবন তাঁহার নিকট 'নরক' বলিয়া বোধ হইতেছে। পরিপক্ক বয়সের বহুদর্শিতার ফলে তিনি যেন কতকটা বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, অন্য যেকোন অপেক্ষাকৃত আধুনিক দেশ অপেক্ষা চীন দেশই মানবীয় নীতিজ্ঞানের আদর্শধারণার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সমীপবর্ত্তী হইয়াছে। তথাপি, সমগ্র জগতের লোকদিগের নিকটই আগামী যুগ যে ইতর সাধারণের বা শূদ্রজাতির কল্যাণের কারণ হইবে, এ বিষয়ে তাঁহার অণুমাত্র সন্দেহ ছিল না। তিনি একদিন বলিয়াছিলেন, "শূদ্রজাতির সমস্যার আমাদের সমাধান করতে হবে, কিন্তু কি ভয়ঙ্কর সংক্ষোভ, কি ভীষণ আলোড়নের মধ্য দিয়ে তা সঙ্ঘটিত হবে!" তিনি যেন ভবিষ্যৎ প্রত্যক্ষ করিতে করিতেই কথা বলিতেছিলেন; তাঁহার কণ্ঠস্বর ভবিষ্যদ্বাণীর ন্যায় আরও লোকের কানে বাজিতেছিল। কিন্তু যদিও শ্রোতা উৎসুকভাবে শুনিবার আশায় অপেক্ষা করিতে লাগিলেন, তথাপি স্বামিজী নির্ব্বাক হইয়াই রহিলেন, এবং আরও গভীর চিন্তায় মগ্ন হইলেন।

আমার বরাবর বিশ্বাস যে, এইরূপ একটা বিপর্য্যয় ও ভয়ের যুগে জনসাধারণকে পরিচালিত করিবার ও প্রকৃতিস্থ রাখিবার জন্যই আমাদের আচার্য্যদেব ও শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে শক্তিপূজার এরূপ এক মহান উদ্বোধন ধ্বনিত হইয়াছে। জগন্মাতাই একাধারে এইসকল বিপরীত ভাবের সমন্বয়-স্থল। তিনি ভালমন্দ উভয়ের মধ্য দিয়াই বিকাশ পাইয়া থাকেন। সকল পথের গন্তব্যস্থান তিনিই। স্বামিজী যখনই মাতৃপ্রণাম-মন্ত্রগুলি সুরসংযোগে আবৃত্তি করিতেন, তখনই আমরা একটীমাত্র কণ্ঠস্বরের পশ্চাতে বহুযন্ত্রোত্থিত মৃদু ধ্বনির ন্যায় ঐতিহাসিক নাটকের এই মহা সমবেতসঙ্গীত শুনিতে পাই। তিনি আবৃত্তি করিতেন—

"যা শ্রীঃ স্বয়ং সুকৃতীনাং ভবনেষ্বলক্ষ্মীঃ।
পাপাত্মনাং কৃতধিয়াং হৃদয়েষু বুদ্ধিঃ।
শ্রদ্ধা সতাং কুলজনপ্রভবস্য লজ্জা।
তাং ত্বাং নতাঃ স্ম পরিপালয় দেবি বিশ্বম্॥" *

তৎপরে যেমন উৎপীড়ক ও উৎপীড়িতগণের এক সাধারণ আশা ও ভয়ে সম্মিলন, সেনাসমূহের সগর্ব্ব পদসঞ্চার, এবং জাতিসমূহের সংক্ষোভ মানসকর্ণে উচ্চতর ও স্পষ্টতরভাবে ধ্বনিত হইতে লাগিল, অমনি সে-সকলকে ছাড়াইয়া এই মহাস্তোত্রের বজ্রনির্ঘোষ শ্রুতিগোচর হইল—

* যিনি সুকৃতিগণের ভবনে স্বয়ং লক্ষ্মী, আবার পাপাত্মাদিগের গৃহে অলক্ষ্মী, যিনি নির্ম্মলবুদ্ধি ব্যক্তিগণের হৃদয়ে বুদ্ধি, যিনি সাধুগণের শ্রদ্ধা ও সৎকুলজাত ব্যক্তিগণের লজ্জাস্বরূপ, সেই তোমাকে আমরা প্রণাম করিতেছি। হে দেবি, বিশ্বকে প্রতিপালন কর।—চণ্ডী ৪।৫

"প্রকৃতিস্ত্বঞ্চ সর্ব্বস্য গুণত্রয়বিভাবিনী।
কালরাত্রির্মহারাত্রির্মোহরাত্রিশ্চ দারুণা॥" *

"সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥" †

* তুমি সকলের গুণত্রয়প্রকাশকারিণী প্রকৃতি, তুমি প্রখর রাত্রি, মরণরূপ রাত্রি এবং দারুণ মোহরাত্রি।—চণ্ডী ১।৭৮-৯

† সকল মঙ্গলের মঙ্গলস্বরূপে, হে শিবে, হে সর্ব্বাভীষ্টসিদ্ধিকারিণি, হে শরণাগত-রক্ষয়িত্রি, হে ত্রিনয়নি, গৌরি, নারায়ণি, তোমাকে নমস্কার।—ঐ ১১।১০

একবিংশ পরিচ্ছেদ

পাশ্চাত্ত্য সেবাব্রতীকে শিক্ষাদানপ্রণালী

স্বামিজী একবার গাজীপুরের পওহারী বাবাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "কাজে সফলতার রহস্য কি?" এবং উত্তর পাইয়াছিলেন, "জৌন সাধন তৌন সিদ্ধি"—যাহা সাধন তাহাই সিদ্ধি, অর্থাৎ সাধন বা উপায়গুলিকে সাধ্য বা উদ্দেশ্যের ন্যায় জ্ঞান করিতে হইবে।

এই উক্তিটীর প্রকৃত অর্থ লোকে কালেভদ্রে ক্ষণেকের জন্য বুঝিতে পারে। কিন্তু যদি ইহার অর্থ এই হয় যে, সাধকের সমস্ত শক্তি উপায়গুলির উপরেই কেন্দ্রীভূত হওয়া চাই—যেন উহারাই উদ্দেশ্য, তদ্ব্যতিরিক্ত অপর কোন উদ্দেশ্যই নাই, সেই সময়ের জন্য তাঁহাকে এইরূপ জ্ঞান করিতে হইবে—তাহা হইলে উহা গীতার সেই মহতী শিক্ষারই প্রকারান্তর মাত্র হইয়া দাঁড়ায়—"কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন"—কর্ম্মেই তোমার অধিকার, ফলে নহে।

আমাদের আচার্য্যদেব তদীয় শিষ্যগণকে এই আদর্শটীর অভ্যাসে অনুপ্রাণিত করিবার রহস্য অদ্ভুত রকমে জানিতেন। তিনি অনুভব করিতেন যে, যদি কোন ইউরোপীয় লোক ভারতের জন্য কার্য্য করেন, তবে তাঁহাকে উহা ভারতীয় প্রণালীতেই করিতে হইবে।

কেন তিনি ঐরূপ ভাবিতেন, তাহার কারণ তিনিই জানিতেন, এবং হয়ত প্রত্যেক ভারতবাসীই তাহা বুঝিতে পারিবেন। এবিষয়ে একদিকে যেমন তিনি কোন্‌গুলি মুখ্য ও কোন্‌গুলি গৌণ অঙ্গ, তাহার ঠিক রাখিতেন, তেমনি অপরদিকে অতি সামান্য খুঁটিনাটি ব্যাপারগুলিকেও বাদ দিতেন না। যেসকল খাদ্য শাস্ত্রসম্মত, শুধু তাহাই আহার করা এবং হাতে করিয়া গ্রাস উঠান, মেজেয় বসা ও ঘুমান, হিন্দু আচারসকল পালন করা, এবং হিন্দুচক্ষে যেসকল আচরণ সু বা কু বলিয়া গণ্য, তাহাদিগকে সেইমত সম্পূর্ণরূপে মানিয়া চলা—এইগুলির প্রত্যেকটী তাঁহার মতে সেই ভারতীয় ভাব আয়ত্ত কবিবার উপায়স্বরূপ, যদ্দ্বারা অতঃপর বিদেশীয়গণ জীবনের বড় বড় সমস্যার ভারতীয় সমাধান আপনা হইতেই ঠিক ঠিক ভাবে ধরিতে ও বুঝিতে অভ্যস্ত হইবেন। অতি তুচ্ছ ব্যাপারও, যেমন সাবানের পরিবর্ত্তে বেসন ও লেবুর রস ব্যবহার করা—এগুলিকেও তিনি প্রণিধানযোগ্য ও করণীয় বলিয়া মনে করিতেন। এমন কি, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের যেসকল চিরপোষিত ধারণা অমার্জ্জিত বলিয়া বোধ হইবে, তাহাদিগকেও বুঝিতে ও আপনার করিয়া লইতে চেষ্টা করিতে হইবে। স্বামিজী ভিতরে ভিতরে জানিতেন যে, হয়ত এমন দিন আসিবে, যখন লোকে তাঁহাবই মত ঐসকল ধারণার পারে যাইবে; কিন্তু কোন একটা অবস্থার মধ্য দিয়া তাহার পারে যাওয়া এবং দৃষ্টিহীনতাপ্রযুক্ত উহাকে উড়াইয়া দেওয়া বা ঘৃণা করা—এ দুয়ের মধ্যে কত প্রভেদ !

কোন একটী প্রথা শিক্ষা দিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার অন্তর্নিহিত আদর্শটীকে দেখাইয়া দিবার স্বামিজীর অসাধারণ ক্ষমতা ছিল।

আজি পর্য্যন্ত আমরা ফুঁ দিয়া আলো নেবানকে মহা অপবিত্র ও অসভ্য-জনোচিত কার্য্য ভাবিয়া শিহরিয়া উঠি ; আবার শাড়ী পরা ও ঘোমটা দেওয়ার অর্থ অভিমান ও হামবড়াইয়ের পরিবর্ত্তে সর্ব্বদা নম্র-মধুর ভাবে সকলকে মানিয়া চলা—এসকল বাহ্য ব্যাপার কত পরিমাণে এক একটী আদর্শের অভিব্যক্তি বলিয়া ভারতের সর্ব্বসাধারণের নিকট পরিচিত, তাহা পাশ্চাত্ত্যবাসী আমরা হয়ত আদৌ ঠিক ঠিক বুঝিতে পারি না। এই ঘোমটা দেওয়া সম্বন্ধে স্বামী সদানন্দ একবার আমাকে বলিয়াছিলেন, "কখনও ওটা টেনে দিতে ভুলো না। মনে রেখো, ঐ সাদা ঘোমটার ভেতরেই আদর্শ পবিত্র জীবনের অর্দ্ধেক রয়েছে!"

এইসকল বিষয়ে স্বামিজী শিষ্যকে, যাহা ইনি পূর্ব্ব হইতেই ঠিক পথ বলিয়া জানিতেন, সেই পথ দিয়া লইয়া যাইতেন। যদি তাঁহাকে ভারতীয় শিক্ষাসংক্রান্ত কোন সমস্যার সমাধান করিতে হয়, তাহা হইলে তাঁহাকে প্রথমে নিম্নস্তরের শিক্ষাদানপ্রণালীর অভিজ্ঞতা লাভ করিতেই হইবে ; এবং এই কার্য্যের জন্য সর্ব্বোচ্চ ও সর্ব্বপ্রধান গুণ হইতেছে জগৎকে ছাত্রের চক্ষে দেখা—তাহা একমুহূর্ত্তের জন্য হয়, সেও স্বীকার। শিক্ষা-বিজ্ঞানের প্রত্যেক নিয়মটী এই কথাই ঘোষণা করিতেছে। যাঁহারা জগৎকে একেবারেই ছাত্রগণের চক্ষে দেখিতে জানেন না, অথবা তাঁহাদিগকে কোন্ অভীপ্সিত উদ্দেশ্য-সাধনে সহায়তা করিতে হইবে তদ্বিষয়ে জ্ঞাত নহেন, তাঁহাদিগের মুখে 'জ্ঞাত হইতে অজ্ঞাত বস্তুতে,' 'সহজ হইতে জটিল ব্যাপারে,' 'স্থূল হইতে সূক্ষ্মে' এই কথাগুলি, এবং 'শিক্ষা' শব্দটী পর্য্যন্ত কেবল কথার কথা মাত্র। ছাত্রের স্বাভাবিক ইচ্ছার প্রতিকূলে

তাহাকে শিক্ষা দিতে গেলে হিতের পরিবর্ত্তে কেবল অহিতই সাধিত হইবে।

স্বামিজীর শিক্ষার মধ্যে তাঁহার এই স্বতঃপ্রবৃত্ত ধারণাই বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করিত যে, ভারতীয় চিন্তা ভারতীয় দৈনন্দিন জীবনের সহস্র খুঁটিনাটি ব্যাপারের উপর প্রতিষ্ঠিত। একটু ভাল করিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, শ্রীরামকৃষ্ণও এই প্রণালী অবলম্বন করিয়াছিলেন। যখনই তিনি কোন নূতন ভাব বুঝিতে ইচ্ছা করিতেন, তখনই উক্ত মতাবলম্বীদিগের আহার, পরিচ্ছদ, ভাষা এবং চালচলন নিজে গ্রহণ করিতেন। তিনি মাত্র কয়েকটী ধর্ম্মমত সম্বন্ধেই তাহাদিগের সদৃশ হইবার চেষ্টা করিয়া ক্ষান্ত থাকিতেন না।

কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দের ন্যায় একজন মহান আচার্য্য এইরূপ ব্যাপারসকলেও শিষ্যগণের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ না রাখিয়া থাকিতে পারেন না। তিনি একটু একটু করিয়া উদ্দেশ্যটী উদ্‌ঘাটন করিতেন এবং সর্ব্বদাই শিষ্য যাহা আয়ত্ত করিয়াছে, তাহারই সহায়ে তাহাকে অগ্রসর করিয়া দিতেন। একথা সত্য যে, তিনি সর্ব্বদাই আপনার ও অপর সকলের কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবার উদ্দেশ্যটী বিশুদ্ধ কিনা, তদ্বিষয়ে পরীক্ষা করিতেন, এবং যাহাতে উহাতে অণুমাত্র স্বার্থ প্রবেশ করিতে না পায়, তজ্জন্য সর্ব্বদাই সতর্ক থাকিতেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি কাউকে বিশ্বাস করি না, কারণ আমি নিজেকেই বিশ্বাস করি না। কে জানে কাল আমি কি হব?" কিন্তু, যেমন তিনি একবার বলিয়াছিলেন, ইহাও সত্য যে, কাহারও স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা তাঁহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল—এমন কি, ভুলের সম্ভাবনা দূর করিবার জন্যও তিনি ঐরূপ করিতে পারিতেন না। যখন

ভুল হইয়া গিয়াছে, তখনই তিনি উহার কারণ প্রদর্শন করিতেন, তৎপূর্ব্বে নহে।

১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের প্রথম ছয় মাস আমি মধ্যে মধ্যে কলিকাতাস্থ নানাশ্রেণীর দেশীয় ও ইউরোপীয় লোকদিগের বাটীতে ভোজন করিতাম। ইহাতে স্বামিজী অশান্তি বোধ করিতেন। সম্ভবতঃ তিনি আশঙ্কা করিয়াছিলেন যে, ইহাতে আমার মন নিষ্ঠাবান হিন্দুজীবনের অত্যধিক সরলতা দেখিয়া বাঁকিয়া বসিতে পারে। একথাও তিনি নিঃসন্দেহ ভাবিয়াছিলেন যে, লোকের মন স্বভাবতঃই আজন্ম-সঞ্চিত সংস্কারসমূহের দ্বারা পুনরায় বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইতে পারে। তিনি পাশ্চাত্ত্যদেশে একটী বিরাট ধর্ম্মান্দোলনকে জনৈক অতিরিক্ত-সুরুচিসম্পন্না স্ত্রীলোকের তুচ্ছ সামাজিক প্রতিপত্তি-লালসাহেতু ধূলিসাৎ হইতে দেখিয়াছিলেন। তথাপি তিনি এ বিষয়ে আমাকে কিছুমাত্র বাধা দেন নাই, যদিও তাঁহার মুখের একটী আদেশবাক্যই যে-কোন সময়ে উহা বন্ধ করিয়া দিতে পারিত। ইহা যে তাঁহার মনঃপূত হইতেছে না, তাহাও তিনি কখনও প্রকাশ করেন নাই। বরং কেহ নিজের কোন অভিজ্ঞতা তাঁহার কর্ণগোচর করিলে তিনি তাহা আদ্যোপান্ত আগ্রহসহকারে শ্রবণ করিতেন। তিনি সাধারণভাবে রাজসিক আহার-বিহার সম্বন্ধে তাঁহার আশঙ্কা প্রকাশ করিতেন, কখনও বা উহাতে গুরুতর অনিষ্ট হইবে, এরূপও বলিয়া দিতেন—যে-সকল কথা আমরা তখন বুঝিতেই পারিতাম না। কিন্তু বর্ত্তমান ভারতে পৃথক পৃথক স্বার্থবিশিষ্ট যেসকল বিভিন্ন জাতি রহিয়াছে, তাহাদিগকে সমন্বয়দৃষ্টিতে ধারণা করা যে আমার পক্ষে বাস্তবিকই অতি প্রয়োজনীয়, সম্ভবতঃ ইহা দেখিয়াই তিনি সম্পূর্ণরূপে

শিষ্যের ইচ্ছাই বলবতী রাখিলেন এবং আমাকে স্বাধীনভাবে এই বিষয়ে তত্ত্ব অন্বেষণ করিতে দিলেন।

যখন আমরা ইংলণ্ড যাত্রা করিয়াছি, সেই সময়ে জাহাজে তিনি নিজ সঙ্কল্পিত আদর্শের কথা সমস্ত খুলিয়া বলিলেন। স্ত্রীশিক্ষা-কার্য্যের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আলোচনাপ্রসঙ্গে তিনি একদিন বলিলেন, "তোমাকে লোকজনের সঙ্গে দেখা করা একেবারে ছেড়ে দিতে হবে এবং রীতিমত নির্জ্জন-বাস করতে হবে। তোমার চিন্তা, তোমার অভাব, তোমার ধারণা, তোমার অভ্যাস—এগুলোকে হিন্দু-ভাবাপন্ন করে তুলতে হবে। তোমার জীবন ভেতরে বাইরে ঠিক ঠিক নিষ্ঠাবতী হিন্দু ব্রাহ্মণ-ব্রহ্মচারিণীর মত হওয়া চাই। এর সাধনোপায় তুমি আপনা হতেই জানতে পারবে, শুধু যদি তুমি এটা মনে প্রাণে ইচ্ছা কর। কিন্তু তোমাকে তোমার অতীতের কথা একেবারে ভুলতে হবে এবং অপরেও যাতে ভুলে যায়, তা করতে হবে। তোমাকে তার স্মৃতি পর্য্যন্ত ছাড়তে হবে।

স্বামী বিবেকানন্দের আপাত-প্রতীয়মান শত আরামপ্রিয়তা ও নিরঙ্কুশতা সত্ত্বেও কোন সন্ন্যাসীই তাঁহার ন্যায় মনে প্রাণে সন্ন্যাস-জীবনের পক্ষপাতী ছিলেন না। তথাপি এই সেবাব্রতীর বেলায় তিনি তাহাকে এক মঠের চতুঃসীমার ভিতরে আবদ্ধ না করিয়া তৎপরিবর্ত্তে ভারতবাসিগণের মধ্যে থাকিয়া তাহাদের জীবনযাত্রা-প্রণালী লক্ষ্য করিতে দিয়াছিলেন। আমার নিকট সময়ে সময়ে ইহাই তাঁহার জীবনে প্রতিভার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ বলিয়া মনে হইয়াছে। তিনি একবার বলিয়াছিলেন, "আমাদের সকল লোকের সঙ্গে তাদের নিজ নিজ ভাবটী বজায় রেখে কথা কইতে হবে।" ইহা

বলিয়া তিনি কল্পনা সহায়ে বর্ণনা করিতে লাগিলেন, হয়ত ভবিষ্যতে ইংলণ্ডীয় ধর্ম্মসম্প্রদায়সমূহের মধ্যে ভারতীয় সম্প্রদায়সকলের একটী শাখা গৈরিকপরিধায়ী, নগ্নপদ এবং অতি কঠোরব্রতধারী হইয়া, সকল ধর্ম্মই যে পরস্পরের সহিত সম্বদ্ধ, সর্ব্বদা এই চরম সত্যের ঘোষণা করিতে বদ্ধপরিকর থাকিবে।

যাহাই হউক, এই ভারতীয় ভাব আয়ত্ত করার ব্যাপারটীতে তিনি শুধু কায়মনোবাক্যে উহা কামনা করাকেই একমাত্র আদর্শ পন্থা বলিয়া ক্ষান্ত থাকেন নাই। একটীর পর একটী করিয়া তিনি হিন্দু আচারব্যবহারের নানা খুঁটিনাটি সম্বন্ধে, ইউরোপে সচরাচর প্রথম কর্ম্মশিক্ষার্থীদিগকে যেসকল উপদেশ দেওয়া হইয়া থাকে, তাহাই দিতে থাকিলেন। এইরূপেই তিনি পাশ্চাত্ত্য আদবকায়দার সদা অস্থির ভাব ও সকল বিষয় জোর দিয়া বলা—যাহা প্রাচ্যবাসীর নিকট এত অমার্জ্জিত বলিয়া বোধ হয়—এই দুইটী অভ্যাসকে দূর করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। কষ্ট বা প্রশংসা বা বিস্ময়—মনে কোনরূপ ভাব উদিত হইবামাত্র তাহাকে প্রকাশ করিয়া ফেলা তাঁহার অত্যন্ত বিসদৃশ বোধ হইত। ইহাকে অধর্ম্ম বলা বাহুল্যমাত্র, কারণ ইহা কুশিক্ষার ফল। প্রাচ্য মানব সকলের নিকট আশা করেন যে, তাঁহারা ভিতরে ভিতরে অনুভব করুন, কিন্তু ভাব চাপিয়া রাখুন। দিবারাত্র কোন কৌতূহলোদ্দীপক বা সুন্দর বস্তু চক্ষে পড়িলেই তাহাকে দেখাইয়া দেওয়াকে তিনি চিন্তার নিভৃত ভাব এবং স্বচ্ছন্দ গতিকে অন্যায় বাধা দেওয়া বলিয়া মনে করেন। তথাপি প্রাচ্যবাসী আদবকায়দার যে শান্তশিষ্ট ভাবটী পছন্দ করেন, তাহা যে শুধু একটা নিষ্ক্রিয় জড় অবস্থা নহে, তাহার নিদর্শন জনৈক সাধুর প্রত্যুত্তর

হইতে পাওয়া যায়। এক রাজা তাঁহাকে "ঈশ্বরের স্বরূপ কি?" "ঈশ্বরের স্বরূপ কি?" বারংবার এই প্রশ্ন করিতেছিলেন। তদুত্তরে সাধু বলিলেন, "রাজা, এতক্ষণ যে তাই আমি তোমাকে বলছিলাম। কারণ মৌনই তাঁর স্বরূপ!"

এ বিষয়টীতে স্বামিজী নাছোড়বান্দা ছিলেন। তিনি ইউরোপীয় শিষ্যগণের প্রতি মধ্যে মধ্যে দীর্ঘকালব্যাপী কঠোর সংযমের আদেশ দিতেন। একবার তিনি বলিয়াছিলেন, "ভাবোচ্ছ্বাসের নামগন্ধ না রেখে আত্মানুভূতির চেষ্টা কর।"

একবার শরৎকালের এক নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় বৃক্ষ হইতে জীর্ণ পত্রসমূহ পড়িতে দেখিয়া, দৃশ্যটীতে কবিত্ব আছে, তাহা তিনি অস্বীকার করেন নাই, কিন্তু বলিলেন যে, বাহ্য ইন্দ্রিয়জগতের সামান্য একটী ঘটনা হইতে যে মানসিক উত্তেজনার উদ্ভব, তাহা ছেলেমানুষি মাত্র এবং অশোভন। তিনি আরও বলিলেন যে, সকল পাশ্চাত্ত্য মানবকে অনুভূতি ও ভাবোচ্ছ্বাস—এই দুইটী জিনিসকে পৃথক রাখিবার মহাশিক্ষা লাভ করিতে হইবে। "গাছের পাতাগুলোর পতন দেখে যাও, কিন্তু তা দেখে যে ভাব হয়, তা পরে কোন সময়ে নিজের ভেতর থেকে জোগাড় কর।"

ইহা আর কিছুই নহে—ইউরোপে যাহাকে শান্ত-সংযত হওয়া বলে এবং যে মতবাদ তত্রত্য মঠসমূহে প্রচলিত, অবিকল তাহাই। ইহা আমাদের উদ্ভাবনী-শক্তিবিকাশেরও এক সূক্ষ্ম উপায় কিনা কে বলিতে পারে? ইহাতে কি এক প্রকারের কবিত্বের সূচনা করিয়া দিতেছে, যাহা জগৎকে এক বিরাট প্রতীক বলিয়া মনে করে, অথচ বিচারবুদ্ধিকে সযত্নে ইন্দ্রিয়ের রাজ্য হইতে বহু উর্দ্ধে স্থান প্রদান করে?

প্রশ্নটীকে শুধু সৎশিক্ষা ও সংযমাভ্যাসের রাজ্যের বাহিরে লইয়া গিয়া কেবল ধর্ম্মজীবন সম্বন্ধে প্রয়োগ করিয়াও স্বামিজী উহাকে সমভাবে সত্য বলিয়া দেখিতে পাইয়াছিলেন। সেইজন্য তিনি সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক বিচার-প্রসূত সুখলিপ্সাকেও ভয়ঙ্কর বন্ধন বলিয়া জ্ঞান করিতেন এবং তৎসম্বন্ধে ঐভাবে বলিতেন। তিনি বলিতেন যে, যাঁহারা আদর্শের রাজ্যেই মাতিয়া থাকেন, তাঁহাদের সকলেরই পক্ষে এই একটী ভয় আছে যে, তাঁহারা নিজে যতটুকু উপলব্ধি করিয়াছেন, মাত্র তাহাকেই আদর্শজ্ঞান করিতে পারেন। ইহা শবের উপর একরাশ ফুল চাপা দেওয়া ব্যতীত আর কিছুই নহে, এবং কার্য্যে পরিণত করিলে উহার অর্থ দাঁড়ায়—শীঘ্রই হউক বা বিলম্বই হউক, ইতর সাধারণের পক্ষ-পরিত্যাগ এবং তাহাদের উন্নতিকল্পে আরব্ধ কার্য্যের বিনাশ। কেবল তাহারাই নিষ্ঠাবান হইতে পারে, যাহারা প্রলোভনের অতীত এবং সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে শুদ্ধ ভাবটীকেই অনুসরণ করে।

ভবিষ্যৎ কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে আলোচনা করিতে করিতে তিনি বলিলেন, "সাবধান! ভাল খাওয়া, ভাল পরা—এসবে মন দিতে পাবে না। সংসারের বাইরের চাকচিক্যে ভুললে চলবে না। এগুলো একেবারে ছেড়ে দিতে হবে—মূলসমেত উপড়ে ফেলতে হবে। এটা ভাবুকতা মাত্র—ইন্দ্রিয়ের অসংযম থেকে এ উচ্ছ্বাস হয়। এটা নানা রকমের বর্ণ, মনোহর দৃশ্য ও শব্দ এবং অন্যান্য সংস্কার অনুসারে নানা আকারে মানুষের কাছে এসে থাকে। একে দূর করে দাও। একে ঘৃণা করতে শেখ। এটা একেবারে বিষ।"

এইরূপে হিন্দুগৃহস্থালীর সাধারণ দৈনন্দিন কর্ত্তব্যগুলি স্বামিজীর

মুখে রাশি রাশি গভীরতর তথ্যের উদ্বোধক হইয়া দাঁড়াইত—সেগুলি কেবল হিন্দুমনেরই সহজবোধ্য। তিনি নিজে আশৈশব সাধুদিগের মঠাদি-পরিচালনা-বিষয়ে জানিতে উৎসুক ছিলেন। এক সময়ে তিনি একখানি ঈশা-অনুসরণ (Imitation of Christ) পুস্তক পাইয়াছিলেন; তাহার মুখবন্ধে উক্ত গ্রন্থের আনুমানিক রচয়িতা জাঁ-দ্য-জের্স (Jean de Gerson) যে মঠভুক্ত ছিলেন তাহার এবং তদনুসৃত নিয়মাবলীর বর্ণনা লিপিবদ্ধ ছিল। এই মুখবন্ধটী স্বামিজীর কল্পনায় পুস্তকখানির রত্নস্বরূপ ছিল। উহা পুনঃ পুনঃ পাঠ করিয়াও তাঁহার তৃপ্তি হইল না; ক্রমে উহা তাঁহার কণ্ঠস্থ হইয়া গেল এবং তাঁহার বাল্যের স্বপ্নের সহিত বিশেষভাবে জড়িত হইয়া গেল। অবশেষে প্রৌঢ়াবস্থায় তিনি দেখিয়া বিস্মিত হইলেন যে, তিনি নিজেই ভাগীরথীতটে অপর এক সন্ন্যাসিসঙ্ঘের স্থাপনা করিতেছেন, এবং বুঝিলেন যে, তাঁহার শৈশবের ঐ বিষয়ে ঐকান্তিক অনুরাগ ভবিষ্যতেরই পূর্ব্ব ছায়াপাত মাত্র।

তথাপি তিনি যে নিয়মানুবর্ত্তিতা কোন পাশ্চাত্ত্য শিষ্যের নিকট আদর্শরূপে উপস্থাপিত করিতেন, তাহা কর্তৃপক্ষের বা বিদ্যালয়ের কঠোর শাসনের আনুগত্য নহে; উহা হিন্দু বিধবাদিগের পরিবারের মধ্যে থাকিয়া স্বাধীনভাবে নিজের নিয়মগুলি পালন করিয়া যাওয়ার ন্যায়। চরিত্রবতী রমণীর আদর্শ বলিতে তিনি 'নিষ্ঠাবতী হিন্দু ব্রাহ্মণ-ব্রহ্মচারিণী' বুঝিতেন। তিনি কি আনন্দের সহিত ঐ কয়েকটী কথা উচ্চারণ করিতেন, তাহা বর্ণনাতীত!

এই বিষয়টীর আলোচনা করিতে করিতে তিনি একদিন বলিলেন, "তোমার ছাত্রীদের জন্য কতকগুলো নিয়ম কর এবং

তোমার মতামতগুলোও স্পষ্টভাবে জানিয়ে দাও। আর যদি সুবিধা হয়, একটু উদার ভাবেরও তাতে স্থান করে নিও। কিন্তু মনে রেখো যে, সারা দুনিয়ায় পাঁচ-ছ জনের বেশী লোক কখনও একসঙ্গে এ ভাবটী নেবার জন্য উপযুক্ত নয়! এতে সম্প্রদায়েরও ব্যবস্থা থাকবে, আবার সম্প্রদায়ের গণ্ডীর বাইরে চলে যাবারও পথ থাকিবে। তোমাকে নিজের সাহায্যকারীদের নিজেই তয়ের করে নিতে হবে। নিয়ম কর, কিন্তু এমনভাবে কর, যাতে যারা ওগুলির সাহায্য ছাড়া কাজ করবার উপযুক্ত হয়েছে, তারা ওগুলিকে সহজে ভাঙতে পারে। আমাদের মৌলিকত্ব হবে এই যে, আমরা পূর্ণ স্বাধীনতা দেব, অথচ শাসনও পুরোপুরি বজায় থাকবে। সন্ন্যাসীর সঙ্ঘেও তা করা যেতে পারে। আমার নিজের কথা বলতে গেলে, আমি সব সময়ই খানিকটা দূর পর্য্যন্ত দেখতে পাই—তাতেই বুঝি ওটা সম্ভবপর।”

এইখানে তিনি সহসা এই বিষয়টী পরিত্যাগ করিয়া প্রসঙ্গান্তরের অবতারণা করিলেন। উহা সকল সময়েই তাঁহার প্রীতিকর ছিল, এবং তিনি উহা সকল সময়েই বাস্তব ঘটনার সহিত মিলে বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। তিনি বলিলেন, “দুটী ভিন্ন জাত একসঙ্গে মিলিত হয়, এবং তাদের মধ্যে থেকে একটা বলবান নতুন জাতের জন্ম হয়ে থাকে। এই নতুন জাতটা নিজেকে অপরের সঙ্গে মিশে যাওয়া থেকে বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা করে, এবং এখানেই জাতিভেদের আরম্ভ। দেখ না, যেমন আপেল। এদের মধ্যে যেগুলি সবচেয়ে ভাল জাত, সেগুলি ভিন্ন ভিন্ন জাতের সংযোগে জন্মেছে, কিন্তু একবার ঐরকম হবার পর

আমরা ঐ বিশেষ জাতটাকে বরাবর পৃথক রাখবার চেষ্টা করে থাকি।"

কয়েকদিন পরে আবার ঐ চিন্তাই স্বামীজীর মনে প্রবল হইয়া উঠিল, এবং তিনি বিশেষ আগ্রহের সহিত বলিলেন, "আমি ভবিষ্যতের যেটুকু দেখতে পাচ্ছি, তার শারীরিক ভিত্তি একটী বলবান ও পৃথক নতুন জাত; —ঐরকম আধার ছাড়া এরূপ চিন্তা স্থান পেতে পারে না। সর্ব্বজনীনতা, উদার ভাব—এগুলি মুখে বলা খুব সহজ, কিন্তু এখনও লক্ষ লক্ষ বছর জগৎ এর জন্য তৈরী হতে পারবে না!"

তিনি আবার বলিলেন, "মনে রেখো, যদি তুমি একখানা জাহাজ দেখতে কিরকম তা জানতে চাও, তবে তা ঠিক যেমনটী, তেমনি ভাবে এর সকল বিষয় বর্ণনা করতে হবে—এর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, আকার, এবং কি কি জিনিসে এটা তৈরী; কোন জাতকে বুঝতে হলেও আমাদের ঠিক সেই রকম করতে হবে। ভারত মূর্ত্তিপূজক দেশ, স্বীকার করি। ও যেমনটী আছে, ঠিক তেমনি ভাবে ওকে সাহায্য করতে হবে—কোন কিছু বাদ দিলে চলবে না। যারা তাকে ত্যাগ করেছে, তারা তার কোন উপকারই করতে পারে না।"

স্বামিজী প্রাণে প্রাণে বুঝিতেন যে, ভারতে স্ত্রীশিক্ষাবিস্তারের যত প্রয়োজন, এমন আর কিছুরই নহে। তাঁহার নিজের জীবনে দুইটী বিশিষ্ট সংকল্প ছিল—একটী হইল রামকৃষ্ণসঙ্ঘের জন্য একটী মঠ নির্ম্মাণ করা, এবং অপরটী স্ত্রীশিক্ষাকল্পে কোন উদ্যমের সূত্রপাত করিয়া যাওয়া। তিনি প্রায়ই বলিতেন, "পাঁচ শ পুরুষের সাহায্যে

ভারতবর্ষকে জয় করতে পঞ্চাশ বছর লাগতে পারে, কিন্তু পাঁচ শ স্ত্রীলোকের দ্বারা মাত্র কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই তা করা যেতে পারে।"

শিক্ষা দিয়া তৈয়ারী করিয়া লইবার উপযোগী বিধবা ও অনাথ সংগ্রহ করা সম্বন্ধে তিনি বলিতেন যে, জন্মগত উচ্চ-নীচ-ভেদকে দৃঢ়তার সহিত উপেক্ষা করিতে হইবে। কিন্তু এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে হইলে এইটী বিশেষ আবশ্যক যে, যাহাদিগকে বাছিয়া লওয়া হইবে, তাহারা যেন অল্পবয়স্ক হয় এবং গঠিতচরিত্র না হয়। তিনি প্রায়ই বলিতেন, "জন্ম কিছুই নয়, পারিপার্শ্বিক অবস্থাই সব।" কিন্তু সর্ব্বোপরি তিনি বুঝিতেন যে, এ বিষয়ে অসহিষ্ণুতা অমার্জ্জনীয়। যদি বার বৎসরে কোন সুফল প্রত্যক্ষ হয়, তাহা হইলেই বিশেষ সফলতা লাভ হইয়াছে বুঝিতে হইবে। এটী এত গুরুতর কার্য্য যে, উহা সম্পাদনে সত্তর বৎসর লাগিলেও তাহা অধিক হইবে না।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া তিনি বসিয়া বসিয়া স্ত্রীশিক্ষাবিষয়ক নানা খুঁটিনাটি সম্বন্ধে কথা কহিতেন, একটী আদর্শ বিদ্যালয়-স্থাপন সম্বন্ধে অনেক আকাশকুসুম রচনা করিতেন, এবং তৎসংক্রান্ত বিশেষ বিশেষ বিষয়ে সাদরে অনেক ক্ষণ ধরিয়া বর্ণনা করিতেন। হয়ত তাহার কোন অংশটাই যথাযথভাবে কার্য্যে পরিণত হইবে না, তথাপি উহার সবটুকুই নিশ্চিত মহামূল্য। কারণ, উহা হইতে দেখা যায়, তিনি কত স্বাধীনতা দিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার দিক হইতে কিরূপ ফলকে তিনি সুফল বলিয়া মনে করিতেন, তাহাও বুঝা যায়।

ইহা খুব স্বাভাবিকই হইয়াছিল যে, এইসকল প্রস্তাবিত কার্য্য-প্রণালী ধর্ম্মভাবে অনুরঞ্জিত হইবে—ইহার অন্য কারণ না থাকিলেও

একটী প্রধান কারণ এই ছিল যে, আমি সেই সময় হিন্দুদিগের ধর্ম্মচিন্তাসমূহের আলোচনায় বিশেষভাবে ব্যাপৃত ছিলাম। এই প্রণালীসকলে পাণ্ডিত্যের দিকে তত লক্ষ্য না রাখিয়া উহাদিগকে সাধুজীবনযাপনের অনুকূল করিবারই বিশেষ চেষ্টা ছিল। কোন্ কোন্ বিদ্যা শিক্ষা দিতে হইবে, তদপেক্ষা শিক্ষার প্রকৃতিটীই তাঁহার সমধিক চিন্তার বিষয় ছিল। "আমাদের বিদ্যালয় থেকে এমন সব মেয়ে শিক্ষিতা হবে, যারা ভারতের সকল মেয়েপুরুষের মধ্যে মনীষায় শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করবে"—একবার মাত্র হঠাৎ এই কথা বলা ছাড়া, আমার মনেই পড়ে না যে, তিনি কখনও স্ত্রীশিক্ষাপ্রস্তাবের ঐহিক দিকটীর সম্বন্ধে প্রত্যক্ষভাবে আর কিছু বলিয়াছিলেন। তিনি ইহা ধরিয়াই লইয়াছিলেন যে, কোন শিক্ষা বাস্তবিক ঐ নামের উপযুক্ত কি না, তাহা উহার গভীরতা ও কঠোরতা দ্বারা নিরূপিত হইবে। তিনি সে মিথ্যা আদর্শকল্পনায় বিশ্বাস করিতেন না, যাহাতে স্ত্রীজাতির পক্ষে অল্পতর জ্ঞান বা নিম্নতর সত্যলাভই যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে।

কিরূপ গৃহোচিত স্বাচ্ছন্দ্যের বিধান করিলে স্ত্রীশিক্ষা-কার্য্যটী খুব উন্নতিশীল অথচ সম্পূর্ণ হিন্দুভাবে পরিচালিত হইতে পারে, এই সমস্যা তাঁহার বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিল। এতদ্ভিন্ন পুরাতন পদ্ধতির নিয়মগুলিকে এমন আকারে প্রকাশ করিতে হইবে, যেন তাহারা বরাবর আধুনিকভাবাপন্ন লোকদিগের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারে।

সামাজিক স্থায়িত্ব ও একতার উপর বিদেশী ভাবসমূহের প্রভাব কিরূপ হইবে, তাহা বিচার না করিয়াই চট্ করিয়া তাহাদিগকে

গ্রহণ করায় যেসকল নৈতিক ও নীতিতত্ত্বসম্বন্ধীয় কুফল প্রত্যক্ষ হয়, তাহা সর্ব্বদাই তাঁহার চক্ষুর সামনে ছিল। তিনি স্বাভাবিক সংস্কারবশে জানিতেন যে, যেসকল বন্ধন দ্বারা প্রাচীন সমাজ একতাবদ্ধ ছিল, সেগুলি আধুনিক শিক্ষার আলোকে নূতন করিয়া প্রমাণিত ও পবিত্রতর বলিয়া পরিগৃহীত হওয়া চাই, নতুবা সে শিক্ষা শুধু ভারতের অধঃপতনেরই সূচনামাত্র হইয়া দাঁড়াইবে। কিন্তু এই পুরাতন ও নূতনের সমন্বয় যে সহজ ব্যাপার, একথা তিনি কদাপি ভ্রমেও চিন্তা করেন নাই। কিরূপে আধুনিক ভাবগুলিকে সমগ্র জাতির মধ্যে ছড়াইয়া দিতে পারা যায় এবং প্রাচীন ভাবগুলিকে আধুনিক যুগোপযোগী করিয়া লওয়া যাইতে পারে, এই কঠিন সমস্যা তাঁহার অধিকাংশ সময় ও চিন্তা অধিকার করিত। তিনি ঠিকই দেখিয়াছিলেন যে, যখন এই দুইটীকে জুড়িয়া এক করা যাইবে, তখনই জাতীয় শিক্ষার সূত্রপাত হইতে পারিবে, তৎপূর্ব্বে নহে।

হিন্দুজীবনের প্রচলিত ঋণগুলিকে নূতন ভাবে ব্যাখ্যা করিয়া কিরূপে আধুনিক যুগের দেশ ও ইতিহাসের প্রতি কর্ত্তব্যবিষয়ক সমগ্র ধারণাটীকেও উহার অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে, তাহা একদিন হঠাৎ তাঁহার মনে উদিত হইল, এবং তিনি বলিয়া উঠিলেন, "ঐ পাঁচটী যজ্ঞের * ব্যাপার নিয়েই কত কি করা যেতে পারে! এগুলিকে কি বড় বড় কাজেই লাগান যেতে পারে!"

*ব্রহ্মযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ ও নৃযজ্ঞ।

"অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ, পিতৃযজ্ঞশ্চ তর্পণম্।
হোমো দৈবো, বলির্ভৌতো, নৃযজ্ঞোঽতিথিপূজনম্।"—মনু, (৩।৭০)

বিষয়টীর এইরূপ নূতন অর্থ হঠাৎ তাঁহার মনে উঠিয়াছিল, কিন্তু উহা মন হইতে চলিয়া যায় নাই। তিনি ভাবটীব সূত্র ধরিয়া ক্রমশঃ খুঁটিনাটি ব্যাপারের অবতারণা করিলেন।

"[পিতৃযজ্ঞ] ঐ প্রাচীনকালের পিতৃ-উপাসনা থেকে তোমরা বীরপূজার সৃষ্টি করতে পার।

"[দেবযজ্ঞ] দেবপূজায় অবশ্য প্রতিমাদির ব্যবহার চাই। কিন্তু তোমরা ওগুলি বদলে নিতে পার। মা-কালীকে সব সময়ই একভাবে দাঁড়ান রাখবার প্রয়োজন নেই। তোমার ছাত্রীদের নূতন নূতন ভাবে মা-কালীকে কল্পনা করবার উৎসাহ দেবে। মা-সরস্বতীকে একশ রকমে ধারণা কর। মেয়েরা নিজের নিজের ভাব অনুযায়ী মূর্ত্তি গড়ুক এবং চিত্র আঁকুক।

"পূজার ঘরে বেদীর সকলের নীচের ধাপে সব সময় একটী জলভরা কলস থাকবে, এবং তামিলদেশের মত বড় বড় ঘিয়ের প্রদীপ সদাই জ্বলতে থাকবে। ঐসঙ্গে যদি দিবারাত্র ভজনপূজাদির ব্যবস্থা করতে পার, তা হলে এর চেয়ে হিন্দুভাবের পোষক আর কি হতে পারে?

"কিন্তু যেসকল পূজাঙ্গের ব্যবস্থা থাকবে, সেগুলি যেন বৈদিক হয়। বৈদিক যুগের মত একটী বেদী থাকবে, তাতে পূজার সময় বৈদিক আগুন জ্বালান হবে। আর ছোট ছোট মেয়েদেরও তাতে যোগ দিয়ে আহুতি দিতে হবে। এই অনুষ্ঠানটী সারা ভারতের শ্রদ্ধা টেনে আনবে।

"[ভূতযজ্ঞ] নানারকম জন্তু রাখবে। গরু থেকে আরম্ভ করলে মন্দ হবে না। কিন্তু অন্যান্য জানোয়ারও—কুকুর, বেরাল,

পাখী প্রভৃতি রাখবে। ছোট ছোট মেয়েদের ওগুলিকে খাওয়াবার ও যত্ন নেবার একটা সময় করে দেবে।

"[ব্রহ্মযজ্ঞ] অর্থাৎ বিদ্যা-যজ্ঞ। এটাই সবচেয়ে সুন্দর। ভারতে প্রত্যেক বই-ই পবিত্র; এ কথা জান কি? শুধু বেদ নয়, ইংরেজী, মুসলমানী সব বই। সব পবিত্র।

"পুরান কলাবিদ্যাগুলি আবার উদ্ধার কর। তোমার মেয়েদের খোয়াক্ষীর দিয়ে নানা রকম ফলের আকার নকল করতে শেখাও। তাদের সুন্দর, পারিপাটি রান্না ও সেলাই শেখাও। তারা ছবি আঁকা, ফটো তোলা, কাগজের নানা রকম নক্সা কাটা এবং সোনারূপোর তার দিয়ে লতাপাতা তৈরী করা ও ছুঁচের কাজ শিখুক। যাতে প্রত্যেকেই এমন কিছু কিছু বিদ্যা শেখে যা দিয়ে দরকার হলে তারা জীবিকা অর্জ্জন করতে পারবে, সে বিষয়ে নজর রেখো।

"[নৃযজ্ঞ] মানুষের সেবার কথা কখনও ভুলো না! সেবার ভাব থেকে মানুষমাত্রকে পূজো করার ভাব ভারতে বীজের আকারে আছে, কিন্তু তাতে কখনও বিশেষ জোর দেওয়া হয় নি। তোমার মেয়েরা ওটাকে ফুটিয়ে তুলুক। ওটাকে কাব্য ও ললিতকলার অঙ্গ করে নিও। হাঁ, প্রত্যহ স্নানের পর এবং খাওয়ার আগে ভিক্ষুকদের পা পূজা করলে একসঙ্গে আশ্চর্য্যরকমে হৃদয় ও হাতের শিক্ষা হবে। কোন কোন দিন এগুলির বদলে ছোট ছোট মেয়েদের—তোমার নিজের ছাত্রীদেরই—পূজো করতে পার। অথবা তুমি অপরের শিশুসন্তানদের চেয়ে এনে তাদের সেবাশুশ্রূষা করতে ও খাওয়াতে-দাওয়াতে পার। মাতাজী মহারাণী আমায়

কি বলেছিলেন জান?—'স্বামিজী! আমার কোন সহায়সম্বল নেই। কিন্তু আমি এই নিষ্পাপা কুমারীদের পূজা করে থাকি; এরাই আমাকে মুক্তির পথে নিয়ে যাবে!' দেখলে, তিনি প্রাণে প্রাণে অনুভব করেন যে, তিনি এসকল কুমারীর ভেতর উমাকেই সেবা করছেন। বিদ্যালয় আরম্ভ করবার পক্ষে এ একটী অতি চমৎকার ভাব।"

কিন্তু স্বামিজী এইরূপে পুরাতন ও নূতনের মধ্যে সংযোগ-স্থাপন-কার্য্যের পুঙ্খানুপুঙ্খ চিত্র-অঙ্কনে প্রবৃত্ত হইলেও, ইহা সকল সময়েই সত্য ছিল যে, তাঁহার উপস্থিতিই আদর্শটীকে ধরিবার প্রধান উপায়স্বরূপ হইত—উহা লোকের আন্তরিক চেষ্টামাত্রকেই ঐ আদর্শের সহিত সাক্ষাৎভাবে সম্বদ্ধ করিয়া দিত। উহাই অতি স্থূলবুদ্ধির নিকটেও প্রাচীন অনুষ্ঠানাদির যথার্থ মর্ম্ম উদ্ঘাটন করিয়া দিত। আধুনিকভাবাপন্ন হিন্দুগণ কর্তৃক ঐসকল অনুষ্ঠান স্বতঃপ্রবৃত্ত-ভাবে পুনরাচরিত হইয়াও উহারই প্রভাবে সহসা সমুজ্জ্বল ও মূল্যবান হইয়া উঠিত। এইরূপে, ইউরোপীয় বিজ্ঞানের উন্নতিকল্পে যেসকল বীরহৃদয় মনীষী জীবন আহুতি দিয়াছেন, তাঁহাদিগের প্রতি জনৈক ভারতীয় মহাবৈজ্ঞানিকের শ্রদ্ধা দেখিয়া মনে হইল, উহা যেন প্রাচীনকালের আচার্য্যকুল-বন্দনারই আধুনিক রূপান্তর মাত্র। যে জাতি ব্রহ্মজ্ঞানকেই জীবনের চরম লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছে, সে জাতির পক্ষে জ্ঞানের বাহ্য প্রয়োগবিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন হইয়া শুধু জ্ঞানের জন্যই জ্ঞানচর্চ্চা একটী অবশ্যম্ভাবী মহত্ত্ব বলিয়াই মনে হইল। নাম, যশ ও ধনের প্রতি মনেপ্রাণে অনাসক্তি হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, কর্ম্মী পৌর ও গার্হস্থ্য জীবন যাপন করিলেও ধর্ম্মের দিক হইতে তিনি সন্ন্যাসীই।

তাঁহার নিজ জীবনের এই যে গুণটীর প্রভাবে আর যাহা কিছু মহৎ ও বীরোচিত, সমস্তই ইতিপূর্বে প্রকাশিত আদর্শ-বিশেষেরই পরিচায়ক বা এক একটী বিশেষ উদাহরণরূপে পরিগণিত হইত, তৎসম্বন্ধে অবশ্য স্বামিজী কিছুই অবগত ছিলেন না। তথাপি মনে হয়, ইহাতেই তাঁহার সকল জিনিসকে ধরিবার বুঝিবার ক্ষমতার শ্রেষ্ঠ বিকাশ। তাঁহার শিক্ষাসংক্রান্ত পুঙ্খানুপুঙ্খ ইঙ্গিতগুলির সম্বন্ধে ইহাই বক্তব্য যে, শিক্ষাব্যাপারে উহাদিগের সত্যতা দেখিয়া আমি সর্ব্বদাই বিস্মিত হইয়া থাকি। উহার কারণ আমি কিছুতেই নির্দ্দেশ করিতে পারি নাই। যদিও তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন যে, এক সময়ে তাঁহাকে দুঃখদারিদ্র্যের সহিত কঠোর সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল, এবং সেই সময়ে তিনি হার্ব্বার্ট স্পেন্সারের Education (শিক্ষা) নামক গ্রন্থ বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিবার ভার লইয়াছিলেন; কিন্তু উক্ত বিষয়ে আরও জানিতে ইচ্ছুক হইয়া তিনি তৎসঙ্গে পেস্টালটসি* (Pestalozzi)-রচিত যতগুলি পুস্তক পাইয়াছিলেন, সেগুলিকেও পড়িয়া ফেলিয়াছিলেন—যদিও উহা লেখাপড়ার ভিতর ছিল না। এই ঘটনাটীও আমার নিকট তাঁহার শিক্ষা বিষয়ে ঐরূপ গভীরজ্ঞানের যথেষ্ট কারণ বলিয়া মনে হয় নাই।

প্রকৃতপক্ষে হিন্দুগণ মনের ক্রিয়াকলাপকে তন্নতন্নভাবে লক্ষ্য

* পেস্টালটসি জীবনের কতক অংশ শিক্ষাসম্বন্ধী সমস্যাসমূহ লইয়া অতিবাহিত করেন, এবং ঐ সম্বন্ধে কয়েকখানি পুস্তকও রচনা করেন। ইনি ১৭৪৬ খৃষ্টাব্দে সুইজারল্যাণ্ডের জুরিক্ (Zurich) সহরে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮২৭ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাস পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন।

করিতে এত নিপুণ, এবং তাঁহাদের ধর্ম্মানুষ্ঠানগুলিতে তাঁহারা সর্ব্বদাই মনোবৃত্তিসমূহের বিকাশের এমন চমৎকার দৃষ্টান্ত দেখিতে পান যে, তাঁহারা শিক্ষাসংক্রান্ত মতামতের আলোচনা-ব্যাপারেও অন্য জাতি অপেক্ষা বিস্তর সুবিধা পাইয়া থাকেন। ইহাও ভাবিবার যথেষ্ট কারণ আছে যে, ঐ বিষয়ে বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে চিন্তা করার রহস্যটীও তাঁহারা কোন না কোন দিন আয়ত্ত করিয়া ফেলিবেন। ইতিমধ্যে ঐরূপ বিশেষস্থানীয় আদর্শ অবস্থাটী লাভ করার প্রথম সোপান—প্রচলিত মতামতগুলি হইতেই কি বিপুল উন্নতি সাধিত হইতে পারে, তাহাই বুঝা। স্বামী বিবেকানন্দের কল্পনার বিস্তার ও পূর্ণতা সম্পাদন করার ভার ভারতীয় শিক্ষাচার্য্যগণের উপর রহিয়াছে। যখন উহা সম্পন্ন হইবে, যখন আমরা তাঁহার অতীতের প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রীতির সহিত তাঁহার ভাবী বংশধরগণের সম্বন্ধে সাহস ও আশা এবং তাঁহার জ্ঞানমাত্রেরই পবিত্রতার নিকট মস্তক নত করা—এইসকলকে একযোগে গ্রহণ করিতে পারিব, তখনই ভারতীয় নারীকুলের জগতের সকল নারীর মধ্যে নিজেদের ন্যায্য স্থান-অধিকারের দিন সমাগতপ্রায় বুঝিতে হইবে।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

সন্ন্যাস ও গার্হস্থ্য

স্বামিজীর চক্ষে তাঁহার সন্ন্যাসের ব্রতগুলি যারপরনাই মূল্যবান ছিল। সকল অকপট সন্ন্যাসীর ন্যায় তাঁহার নিজের পক্ষেও বিবাহ বা তৎসংশ্লিষ্ট যেকোন ব্যাপার মহাপাপ বলিয়া গণ্য হইত। ঐ-বিষয়ক প্রবৃত্তির স্মৃতি পর্য্যন্ত যাহাতে মনে স্থান না পায়, ইহাই তাঁহার আদর্শ ছিল, এবং তিনি কায়মনোবাক্যে আপনাকে এবং নিজ শিষ্যবর্গকে উহার লেশমাত্র আশঙ্কা হইতে দূরে রাখিবার চেষ্টা করিতেন। তাঁহার নিকট অবিবাহিত থাকাটাই একটা আধ্যাত্মিক সম্পদ বলিয়া পরিগণিত হইত। এইসকল বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে ইহাই বুঝা যায় যে, তিনি শুধু সন্ন্যাসের পরাকাষ্ঠালাভের জন্যই সর্ব্বদা উৎসুক থাকিতেন না, কিন্তু তৎসঙ্গে পাছে ব্রত ভঙ্গ হয়, এই ভয়েও সদা আকুল থাকিতেন। এই ভয় তাঁহার নিজের আদর্শ-উপলব্ধির পক্ষে যতই সহায়ক বা আবশ্যক হইয়া থাকুক না কেন, উহা অনেক বৎসর ধরিয়া তাঁহাকে এই অতি প্রয়োজনীয় বিষয়ে একটা চরম সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে দেয় নাই।

কিন্তু ইহা যেন সকলে বুঝেন যে, তিনি স্ত্রীলোক হইতে ভয় পাইতেন না, তিনি ভয় করিতেন প্রলোভনকে। পৃথিবীর সর্ব্বত্র তাঁহাকে স্ত্রীলোকদিগের সহিত যথেষ্ট মিশিতে হইয়াছিল। তাঁহারা

তাঁহার শিষ্য, কার্য্যের সহায়ক, এমন কি, বন্ধু এবং খেলার সাথীও ছিলেন। তাঁহার পরিব্রাজক-জীবনের এইসকল বন্ধুদিগের সহিত ব্যবহারে তিনি প্রায় সকল সময়েই ভারতের পল্লীগ্রামসমূহের প্রথা অবলম্বন করিতেন এবং তাঁহাদিগের সহিত কোন একটা সম্পর্ক পাতাইয়া লইতেন। কোন স্থানের মেয়েরা তাঁহার ভগিনী হইল, কোথাও বা মাতা, কোথাও বা কন্যা; এইরূপ সর্ব্বত্র। ইঁহাদিগের মহত্ত্ব এবং মিথ্যা- বা তুচ্ছভাবরাহিত্য সম্বন্ধে তিনি কখনও কখনও গর্ব্ব করিয়া বলিতেন; কারণ, তাঁহার মধ্যে সেই শ্রেষ্ঠজনোচিত বিশেষত্বটী খুব বেশী পরিমাণে ছিল—তিনি স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে ক্ষুদ্রতা ও দুর্ব্বলতার পরিবর্ত্তে মহত্ত্ব ও চরিত্রবলেরই অন্বেষণ করিতেন। যেমন তিনি আমেরিকায় দেখিয়াছিলেন, মেয়েরা নৌকা চালাইতেছে, সাঁতার দিতেছে এবং নানাপ্রকার খেলা করিতেছে, অথচ "তাদের একবারও মনে পড়ছে না যে তারা বেটাছেলে নয়" (এগুলি তাঁহার নিজমুখের কথা); এসকলে তিনি বিশেষ আনন্দলাভ করিতেন। ঐরূপে তাহারা যে পবিত্রতার আদর্শের মূর্ত্তিমান বিগ্রহ বলিয়া তাঁহার নিকট বোধ হইয়াছিল, তিনি সেই আদর্শটীকে পূজা করিতেন।

সন্ন্যাসীদিগের শিক্ষাসম্বন্ধে তিনি সর্ব্বদা বিশেষ করিয়া বলিতেন যে, সন্ন্যাসী নিজেকে পুরুষ বা স্ত্রী কিছুই ভাবিবেন না, কারণ, তিনি ঐ দুয়ের পারে গিয়াছেন। যাহা কিছু—এমন কি শিষ্টাচারও—লিঙ্গভেদের কথা বিশেষভাবে মনে পড়াইয়া দেয়, তাহাই তাঁহার নিকট অতি ঘৃণার্হ বলিয়া মনে হইত। পাশ্চাত্ত্যে যাহা Chivalry (মেয়েদের প্রতি একটু বেশী সৌজন্য-প্রকাশ) নামে অভিহিত, তাহা

তাঁহার নিকট স্ত্রীলোকদিগকে অপমান করা বলিয়া মনে হইত। কোন কোন লেখক যে বলিয়া থাকেন, মেয়েদের জ্ঞান মোটামুটী রকমের হইলেই হইল, তাহাদিগকে সকল জিনিস ঠিক যেমনটী তেমনি করিয়া জানিতে হইবে না, এবং পুরুষদের জ্ঞানে সহানুভূতির যেন ছড়াছড়ি না থাকে, তাঁহাদের এই মত স্বামিজীর নিকট অতি নীচ এবং উপেক্ষার বস্তু বলিয়া গণ্য হইত। মানবের অন্তরাত্মা চায় স্বাধীনতা ; আমাদের দৈহিক গঠন তাহার উপর যেসকল বন্ধন জোর করিয়া আনিয়া দিয়াছে, কি পুরুষ, কি স্ত্রী, সকলেরই উচিত উহাদিগকে অতিক্রম করিতে চেষ্টা করা।

নির্জ্জনবাস, সংযম এবং গভীর চিত্তৈকাগ্রতা, এইসকলের সমবায়ে গঠিত ছাত্রজীবনের আদর্শই ভারতবর্ষে ব্রহ্মচর্য্য নামে অভিহিত। স্বামিজী বলিয়াছিলেন, "ব্রহ্মচর্য্য শিরায় শিরায় জ্বলন্ত আগুনের মত প্রবাহিত থাকা চাই!" ছাত্রজীবনের আনুষঙ্গিক যে পাঠ্যবিষয়ের উপর মনঃসংযোগ, তাহা তাঁহার চক্ষে সান্তকে অনন্তের মধ্যে মিলাইয়া দিবার অন্যতম পন্থামাত্র ; এই অনন্তের মধ্যে সান্তকে লীন করাকে তিনি সকল মহৎ জীবনের এরূপ অপরিহার্য্য অঙ্গ বলিয়া মনে করিতেন যে, উহার জন্য তিনি রোবস্‌পীয়েরকে পর্য্যন্ত তাঁহার গোঁড়ামি দ্বারা বিভীষিকার রাজত্বের (The Terror) সৃষ্টি করা সত্ত্বেও প্রশংসা করিতে প্রলোভিত হইয়াছিলেন। যেকোন কার্য্যে হৃদয়, মন বা শরীরের উচ্চতম শক্তিবিকাশের প্রয়োজন হয়, তাহার জন্য প্রস্তুত হইতে হইলে সরস্বতীপূজা একান্ত প্রয়োজনীয়, ইহা তিনি সর্ব্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করিতেন ; অবশ্য সরস্বতীপূজা বলিতে তিনি ভাবরাজ্যে ঠিক ঠিক 'আপনাতে

আপনি থাকা' এবং পূর্ণ সংযমকেই লক্ষ্য করিতেন। এরূপ পূজা কুস্তিগীরদিগের উপযুক্ত শিক্ষার অন্যতম অঙ্গ হিসাবে যুগযুগান্তর হইতে ভারতবর্ষে সমাদৃত হইয়া আসিয়াছে, এবং এই ব্যাপারটীর অর্থই এই যে, যদি কেহ মধ্যে মধ্যে সেই সমাধিলভ্য অন্তর্দৃষ্টির শিখরদেশে আরোহণ করিতে চান, যাহাকে অপরে দিব্যজ্ঞান, ঐশী প্রেরণা বা অনন্যসাধারণ দক্ষতা বলিয়া মনে করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাঁহাকে তাঁহার যাবতীয় শক্তি নিয়োজিত করিতে হইবে। ধর্ম্মের ন্যায় সুকুমার শিল্প ও বিজ্ঞানেব শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তির জন্যও ঐরূপ দিব্যজ্ঞানের বিশেষ প্রয়োজন। যে লোক এরূপ না করিয়া স্বার্থপর বা নীচ উপায়ে আপনার শক্তিক্ষয় করিতেছে, সে কখনও রাফেলের ন্যায় অপূর্ব্ব মাতৃমূর্ত্তি অঙ্কিত করিতে বা মাধ্যাকর্ষণের নিয়মাবলী আবিষ্কার করিতে পারে না। ধর্ম্মাদর্শের ন্যায় সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় আদর্শসিদ্ধির জন্যও সন্ন্যাসিসুলভ নিষ্ঠাভক্তির একান্ত প্রয়োজন। কৌমারব্রতগ্রহণের অর্থই দশের হিতের জন্য নিজের হিত বিসর্জ্জন দেওয়া। এইরূপে স্বামিজী দেখিয়াছিলেন যে, প্রকৃত মনুষ্যত্ববিকাশ করিতে হইলে সংযম চাই; দেখিয়াছিলেন যে, যেকোন পথ দিয়াই হউক, প্রকৃত মহত্ত্ব অর্জ্জন করিতে হইলে আত্মাকে দেহের প্রবৃত্তির উপর জয়লাভ করিতেই হইবে; আরও দেখিয়াছিলেন যে, একজন বড় সাধুর ভিতর বড় কর্ম্মী বা রাজ্যের গুণশালী প্রজা হইবারও সামর্থ্য রহিয়াছে। ইহার বিপরীত পক্ষটীর সম্বন্ধে, অর্থাৎ উন্নতচরিত্রা পত্নী বা রাজ্যের গুণান্বিত প্রজা কেবল সেইখানেই জন্মান সম্ভবপর, যেখানে ব্রহ্ম-চারিণী বা সন্ন্যাসিগণ জন্মিতে পারিত, এবিষয়ে তাঁহার ঐরূপ স্পষ্ট

ধারণা ছিল কিনা বলিতে পারি না। আমার মনে হয়, সম্ভবতঃ তিনি নিজে সন্ন্যাসী এবং সন্ন্যাসকামীদিগের গুরু ছিলেন বলিয়া, একটু-আধটু আভাস ছাড়া এই মহাসত্যটীকে ধরিতেই পারেন নাই ; অবশেষে মৃত্যুর প্রাক্কালে তিনি ঐ বিষয়ের চরম সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিয়াছিলেন। তিনি একবার বলিয়াছিলেন, "একথা সত্য যে, এমন সব স্ত্রীলোক আছেন, যাঁদের দেখবামাত্র মানুষ অনুভব করে, কে যেন তাকে ঈশ্বরের দিকে ঠেলে দিচ্ছে ; কিন্তু আবার এমনও স্ত্রীলোক আছে, যারা তাকে নরকের দিকে টেনে নিয়ে যায়।"

তাঁহার নিকটে থাকিলে, যে-ভালবাসা প্রেমাস্পদের দ্বারা কোনও উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে চায়, তাহাকে সর্ব্বতোভাবে আপনার ইচ্ছাধীন রাখিতে চায়, অথবা নিজের সুখ বা কল্যাণের সাধনমাত্র করিয়া ফেলিতে চায়, সে-ভালবাসাকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখা অসম্ভব ছিল। তাহার পরিবর্ত্তে, প্রেমকে প্রেমপদবাচ্য হইতে হইলে চিরন্তন কল্যাণের প্রস্রবণস্বরূপ হইতে হইবে। উহা আপনাকে বিনামূল্যে বিলাইয়া দেয় ; উহা অহেতুক এবং প্রতিদানের আকাঙ্ক্ষারহিত। তিনি যে সর্ব্বদা "অনাসক্তভাবে ভালবাসা"র কথা বলিতেন, তাহার অর্থই এই। একবার কোন স্থানদর্শনান্তে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তিনি আমাদের কয়েক জনকে বলিয়াওছিলেন যে, তিনি এইবার বুঝিতে পারিয়াছেন যে, কোন কিছু হইতে মন উঠাইয়া লইবার শক্তিও যেমন প্রয়োজনীয়, কোন কিছুতে মন লাগাইবার শক্তিও ঠিক তেমনি প্রয়োজনীয়। উভয়ই তৎক্ষণাৎ, পূর্ণমাত্রায় এবং সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্পন্ন হওয়া চাই। আর এতদুভয়ের প্রত্যেকটী অপরটীর পূর্ণতা

সম্পাদন করে। তিনি ইংলণ্ডে বলিয়াছিলেন, "প্রেম সব সময় আনন্দেরই বিকাশমাত্র; যখনই ওর ওপর দুঃখের এতটুকু ছায়া এসে পড়ে, তখনই জানতে হবে, তা দেহসুখ ও স্বার্থপরতা-দুষ্ট হয়েছে।"

যে অল্পপ্রাণ সাহিত্য ও হীনদশাপ্রাপ্ত ললিতকলা মানবকে মুখ্যভাবে শরীর বলিয়া মনে করে—যাহা আমরা দখল করিয়া রাখিতে পারি—এবং মাত্র গৌণভাবে সংযম ও স্বাধীনতার নিত্য লীলাভূমি মন ও আত্মা বলিয়া মনে করে, সে সাহিত্য ও ললিতকলাকে তিনি ভ্রমেও কখনও প্রশংসা করিতেন না। আমাদের পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানবাদের (Idealism) সবটা না হইলেও অনেকটাই তাঁহার নিকট এই ভাব দ্বারা গভীরভাবে কলুষিত বলিয়া বোধ হইত, এবং উহাকে তিনি "মৃতদেহকে ফুল দিয়ে ঢেকে রাখা" বলিতেন।

প্রাচ্যদিগের ন্যায় তিনি মনে করিতেন যে, আদর্শ পত্নী হইতে হইলে একমাত্র স্বামীর প্রতি জ্বলন্ত, হ্রাসবৃদ্ধিহীন নিষ্ঠা থাকা চাই। পাশ্চাত্ত্য প্রথাসকলকে তিনি সম্ভবতঃ বহুপতিক (polyandrous) পর্য্যায়েরই অন্তর্ভুক্ত করিয়া থাকিবেন, কারণ এতদ্ব্যতীত আমি তাঁহার এই উক্তির কোনই হেতু খুঁজিয়া পাই না যে, তিনি বহুপতিক জাতিসমূহের ভিতরও স্বদেশের ন্যায় মহানুভবা এবং পূতচরিত্রা রমণীসকল দেখিয়াছেন। তিনি মালাবারে ভ্রমণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিব্বতে নহে; এবং অনুসন্ধানে জানিতে পারা যায় যে, মালাবারে তথাকথিত বহুপতিক প্রথা প্রকৃতপক্ষে স্ত্রীপ্রাধান্যযুক্ত বিবাহমাত্র। স্বামী পত্নীর পিত্রালয়ে যাইয়াই তাঁহার সহিত দেখাসাক্ষাৎ করেন,

এবং বিবাহও যে ভারতের অন্য সকল স্থানের ন্যায় আজীবন স্থায়ী হইবেই, তাহার কোন মানে নাই; কিন্তু দুইজন পুরুষ একই সময়ে সমপদস্থরূপে পরিগৃহীত হয় না। যাহাই হউক না কেন, তিনি বলিয়াছিলেন যে, তিনি শিক্ষা করিয়াছেন, "দেশাচার কিছুই নহে,"—আচারব্যবহার কোন কালে মানবের বিকাশকে সম্পূর্ণরূপে বাধা দিতে বা সঙ্কুচিত করিতে পারে না। তিনি জানিতেন যে, যে-কোন দেশে, যে-কোন জাতির মধ্যে আদর্শটী বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির মধ্য দিয়া পূর্ণভাবে ফুটিয়া বাহির হইতে পারে।

তিনি কখনও কোন সামাজিক আদর্শকে আক্রমণ করিতেন না। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ড প্রত্যাগমনকালে, তথায় নামিবার দুই-এক দিন পূর্ব্বে তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন যে, পাশ্চাত্ত্য দেশে অবস্থানকালে আমি যেন ইউরোপের সামাজিক আদর্শগুলিকে পুনরায় গ্রহণ করি —যেন আমি উহাদিগকে কখনই পরিত্যাগ করি নাই, এমনিভাবে। ইউরোপ বা আমেরিকায়, বিবাহিতা রমণীগণ তাঁহার নিকট অবিবাহিতা রমণীগণ অপেক্ষা কম সম্মান পাইতেন না। ঐ সমুদ্রযাত্রাকালে জাহাজে কতকগুলি পাদরি কয়েকগাছি রৌপ্য-নির্ম্মিত বিবাহ-বলয় সকলকে দেখাইতেছিল; ঐগুলি দুর্ভিক্ষের দারুণ সঙ্কটকালে তাহারা তামিল রমণীদিগের নিকট হইতে ক্রয় করিয়াছে। কথায় কথায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সকল দেশের স্ত্রীলোকেরাই কুসংস্কারবশতঃ অঙ্গুলি বা মণিবন্ধ হইতে বিবাহ-অঙ্গুরী বা বিবাহবলয় খুলিয়া দিতে আপত্তি করিয়া থাকে, এই কথা উঠিল। শুনিয়াই স্বামিজী সবিস্ময়ে খেদপূর্ণ অনুচ্চ কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "তোমরা

ওটাকে কুসংস্কার বলছ? ওর পেছনে যে উঁচুদরের সতীত্বের আদর্শ রয়েছে, তা তোমরা দেখতে পাচ্ছ না?" *

কিন্তু বিবাহ দ্বারা আমাদের আদর্শ আধ্যাত্মিক স্বাধীনতালাভের কতটা সহায়তা হয়, তাহা দেখিয়াই তিনি উক্ত সংস্কারটীর গুণাগুণ বিচার করিতেন। এখানে 'স্বাধীনতা' শব্দটী প্রাচ্যদেশীয় অর্থে বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ উহাতে কোনকিছু করিবার অধিকার বুঝাইতেছে না, কোনকিছু করিবার ইচ্ছাটাকে দমন করিয়া নিশ্চেষ্ট থাকার অধিকারই বুঝাইতেছে—যে নৈষ্কর্ম্ম্য সকল কর্ম্মের পারের অবস্থা, তাহাই উহার লক্ষ্য। তিনি একদিন তর্কস্থলে স্বীকার করিয়াছিলেন, "বিবাহের পারে যাবার জন্য বিবাহ করা—এর বিরুদ্ধে আমার কিছুই বলবার নেই।" তাঁহার গুরুদেবের, তাঁহার ভ্রাতা স্বামী যোগানন্দের এবং তাঁহার শিষ্য স্বরূপানন্দের যেপ্রকার বিবাহ হইয়াছিল, তাহাই তাঁহার বিবেচনায় আদর্শ বিবাহ। এইরূপ বিবাহ অন্য দেশে হইলে নামমাত্র বিবাহ বলিয়া পরিগণিত হইত। ঐ বিষয়ে আলোচনা করিতে করিতে তিনি একবার বলিয়াছিলেন, "দেখছ, এ বিষয়ে ভারত ও পাশ্চাত্ত্যের মধ্যে ভাবের কি পার্থক্য রয়েছে! পাশ্চাত্ত্যে বিবাহ বলতে আইনের বাঁধনের পরের যা-কিছু শুধু তাই বুঝায়, কিন্তু ভারতে লোকে বিবাহ বলতে এটাই বুঝে থাকে যে, সমাজ দুটী প্রাণীকে অনন্তকালের জন্য একটা বাঁধনে আবদ্ধ করে দিল। ও দুটী

* সতীত্ব বলিতে হিন্দুগণ ইহাই বুঝেন যে, পত্নীর স্বামীতে শুধু নিষ্ঠা থাকিবে তাহাই নহে, সে নিষ্ঠার কখনও এতটুকু ইতরবিশেষ হইবে না। 'এই আদর্শ আমার ভাল লাগিতেছে না' বলিয়া ঐ নিষ্ঠাকে এতটুকু এদিক-ওদিক করিবার জো নাই।

প্রাণীকে, তাদের ইচ্ছা থাকুক বা না থাকুক, জন্মে জন্মে পরস্পরকে বিবাহ করতেই হবে। এদুয়ের প্রত্যেকেই অপরের করা ভালমন্দের অর্দ্ধেকের ভাগী হয়। আর যদি একজন এ জীবনে অত্যন্ত পেছিয়ে পড়ল বলে বোধ করে, তাহলে অপরকে, যতদিন না সে আবার তার নাগাল পায়, ততদিন অপেক্ষা করে থাকতে হবে।"

শুনা যায়, শ্রীরামকৃষ্ণ বিবাহকে মাত্র কয়েক জনের সেবা এবং সন্ন্যাসকে জগতের সেবা বলিয়া সর্ব্বদা নির্দ্দেশ করিতেন। এরূপ স্থলে তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রকারের বিবাহের কথাই বলিতেন বলিয়া বোধ হয়। স্বামিজীর নিজের মনেও যে ইহাই ব্রহ্মচর্য্যের মূল ধারণা ছিল, একথা স্পষ্ট বুঝা যায়। তিনি লোককে এমনভাবে ঐ ব্রত গ্রহণ করিতে আহ্বান করিতেন, যেন তিনি তাহাদিগকে সর্ব্বাপেক্ষা যশস্কর যুদ্ধার্থ আহ্বান করিতেছেন। তিনি সন্ন্যাসিসঙ্ঘকে আচার্য্যের পশ্চাতে যেন 'একদল সৈন্য' বলিয়া জ্ঞান করিতেন, এবং যে আচার্য্যের শিষ্যগণ সকলেই গৃহস্থ ও সংসারী, তাঁহার সৈন্য নাই, এই কথা বলিতেন। যে পক্ষে এই সহায় বর্ত্তমান, আর যাহাদের মধ্যে ইহার অভাব, এই দুয়ের মধ্যে বল সম্বন্ধে তুলনাই হয় না, ইহাই তাঁহার ধারণা ছিল।

তথাপি বিবাহ যে অনেকের পক্ষে একটী পথ, একথা তিনি যে মোটে বুঝিতেন না, তাহা নহে। তিনি এক বৃদ্ধ দম্পতির যে গল্প বলিয়াছিলেন, তাহা আমি কখনও ভুলিতে পারিব না। পঞ্চাশ বৎসর একত্র বাসের পর তাহারা দরিদ্র-নিবাসের (Workhouse) দরজায় পরস্পরের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইল। প্রথম দিনের অবসানে বৃদ্ধ বলিয়া উঠিল, "কি! মেরী ঘুম'বার আগে একবার আমি

তাকে দেখতে ও চুমু খেতে পাব না? আমি যে পঞ্চাশ বছর ধরে রোজ রাতে ঐরকম করে এসেছি।" তাহার ঐ মহৎ কার্য্যের কথা ভাবিয়া স্বামিজী অতি আগ্রহের সহিত বলিলেন, "একবার ভেবে দেখ! একবার ভেবে দেখ! এরকম সংযম ও নিষ্ঠার নামই মুক্তি! ও দুটী প্রাণীর পক্ষে বিবাহই প্রশস্ত পথ হয়েছিল!"

তিনি বরাবর সমান দৃঢ়তার সহিত বলিতেন যে, ইচ্ছা না থাকিলে বিবাহ না করার স্বাধীনতা সকল স্ত্রীলোকের স্বাভাবিক অধিকার বলিয়া গণ্য হওয়া উচিত। একবার একটী বালিকা, যাহার ধর্মজীবনের প্রতি প্রবল অনুরাগ দ্বাদশ বর্ষ বয়সের পূর্ব্বেই বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হইয়াছিল, তাহার বাটীর লোকদিগের বিবাহ-প্রস্তাবসমূহের হস্ত হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করে। তিনিও তাহার পিতাকে এবিষয়ে রাজী করাইয়া এবং ঐরূপ করিলে তিনি কনিষ্ঠ কন্যাদিগের জন্য অধিক যৌতুকের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন, এইরূপ বুঝাইয়া বালিকাকে এ বিষয়ে সাহায্য করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তারপর অনেক বৎসর চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু সে যে-জীবন অবলম্বন করিয়াছিল, তৎপ্রতি তাহার এখনও তেমনি নিষ্ঠা রহিয়াছে—প্রত্যহ দীর্ঘকাল ধরিয়া নির্জ্জনে ধ্যান-চিন্তা ঐ জীবনের অঙ্গস্বরূপ হইয়াছে। তাহার কনিষ্ঠা ভগিনীরাও এক্ষণে সকলে বিবাহিতা। এইরূপ উচ্চভাবসম্পন্ন স্ত্রীলোকের জোর করিয়া বিবাহ দেওয়া তাঁহার চক্ষে মহা গর্হিত আচরণ বলিয়া বোধ হইত। তিনি গর্ব্বসহকারে, হিন্দুসমাজে যে বিভিন্নশ্রেণীর স্ত্রীলোক অবিবাহিত স্ত্রীলোকদিগেরই স্থানীয়, তাঁহাদিগকে এইরূপে গণনা করিতেন—যাঁহারা বালবিধবা, যাঁহারা কুলীন ব্রাহ্মণের স্ত্রী, যাঁহাদের

বিবাহকালে পিতামাতা কোনরূপ যৌতুক দিতে পারেন নাই, এমন দুই-চারি জন, ইত্যাদি।

তিনি বলিতেন যে, বিধবাগণের সতীত্বরূপ স্তম্ভের উপরই সামাজিক অনুষ্ঠানসকল দণ্ডায়মান। কেবল তিনি ইহাই ঘোষণা করিতে চাহিতেন যে, এই বিষয়ে স্ত্রীলোকদিগের ন্যায় পুরুষদিগের জন্যও ঠিক সমান উচ্চাদর্শ থাকা উচিত। প্রাচীন আর্য্যদিগের এইরূপ প্রথা ছিল যে, বিবাহকালে একটী অগ্নি প্রজ্জ্বালিত হইত, প্রত্যহ প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যায় স্বামী ও স্ত্রী উভয়ে একত্র ঐ অগ্নির পূজা করিতেন। এই অনুষ্ঠানটী হইতে ইহাই বুঝা যায় যে, স্বামী স্ত্রী উভয়েরই আদর্শ ও দায়িত্ব সমান। মহর্ষি বাল্মীকির মহাকাব্যে সীতারও যেমন রামের প্রতি অবিচলিত নিষ্ঠা, রামেরও সীতার প্রতি তেমনি নিষ্ঠা বর্ণিত আছে।

পৃথিবীর সর্ব্বত্র যে-সকল বিবাহসংক্রান্ত সামাজিক সমস্যা রহিয়াছে, সে-সকল স্বামিজীর অজ্ঞাত ছিল না। পাশ্চাত্ত্যে একটী বক্তৃতার একস্থলে তিনি সবিস্ময়ে বলিতেছেন, "এসকল দুর্দ্দান্ত স্ত্রীলোক—যাদের মন থেকে 'সহ্য কর, ক্ষমা কর' প্রভৃতি শব্দ চিরদিনের মত চলে গেছে!" তিনি ইহাও স্বীকার করিতে দ্বিধা বোধ করিতেন না যে, যেখানে বিবাহসম্বন্ধ অক্ষুণ্ণ রাখিলে ভবিষ্যৎ মানবজাতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হইবে, সে ক্ষেত্রে স্বামী, স্ত্রী উভয়ের পক্ষেই পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করাই সর্ব্বাপেক্ষা মহত্ত্ব ও সাহসের কার্য্য। তিনি সর্ব্বদাই দেখাইয়া দিতেন যে, ভারতবর্ষে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য আদর্শগুলির মধ্যে পরস্পর আংশিক আদান-প্রদান দ্বারা উভয়কেই একটু ভাঙ্গা করিয়া লওয়া আবশ্যক।

কোন সামাজিক অনুষ্ঠানেই তিনি অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া দোষারোপ করিতেন না, এবং সর্ব্বদা বলিতেন যে, ঐগুলি এমন কোন অনাচার দূর করিবার চেষ্টা হইতেই ক্রমে উদ্ভূত হইয়াছে, যাহা উহাদের সমালোচক মহাশয় খুব সম্ভবতঃ নিজের একগুঁয়েমি বশতঃই বুঝিতে পারিতেছেন না। কিন্তু ঘড়ির দোলনটা (pendulum) কোন এক দিকে বেশী ঝুঁকিয়া পড়িলে তিনি তাহা তৎক্ষণাৎ ধরিতে পারিতেন।

ভারতবর্ষে একদিন তিনি, বিবাহ পাত্রপাত্রীর নিজেদের পছন্দ-মত না হইয়া অভিভাবকগণের ব্যবস্থানুযায়ী হইয়া থাকে, এই কথাপ্রসঙ্গে বলিলেন, "ওঃ! এদেশে কি কষ্ট, কি যন্ত্রণা রয়েছে! তার কতকটা অবশ্য সকল সময়েই ছিল। কিন্তু এখন ইউরোপীয়-দিকে ও তাদের অন্যরকম রীতিনীতিগুলো দেখে সেটা বেড়ে গেছে। সমাজ জানতে পেরেছে যে অন্য একটা রাস্তাও আছে।"

জনৈক ইউরোপবাসীকে তিনি আবার বলিলেন, "আমরা মাতৃ-ভাবকে বাড়িয়ে তুলেছি, তোমরা জায়াভাবকে; এবং আমার মনে হয়, একটু আদান-প্রদান দ্বারা দুপক্ষই লাভবান হতে পারে।"

তারপর তাঁহার সেই স্বপ্নের কথা, যাহা তিনি জাহাজে আমাদিগের নিকট এইরূপে বর্ণনা করিয়াছিলেন—"স্বপ্নে আমি দুজনের গলা শুনতে পেলাম—তারা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য বিবাহের আদর্শগুলির আলোচনা করছে, এবং শেষে এই সিদ্ধান্তে পৌছেছিল যে, দুয়ের মধ্যেই এমন কিছু কিছু অংশ আছে, যা এখনও জগতের পক্ষে হিতকর বলে বর্জ্জন করা উচিত নয়।" এই দৃঢ় বিশ্বাস হেতুই তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সামাজিক আদর্শগুলির মধ্যে কি

পার্থক্য, তাহা বিশেষ করিয়া দেখিতে অত সময় অতিবাহিত করিতেন।

তিনি বলিলেন, "ভারতবর্ষে পত্নী স্বামীকে যত ভালবাসে, পুত্রকে পর্য্যন্ত স্বপ্নেও সেরকম ভালবাসতে পারে না। তাকে সতী হতে হবে। কিন্তু স্বামী মাতাকে যত ভালবাসে, স্ত্রীকে তত ভালবাসতে পারবে না। সুতরাং ভারতে ভালবাসার পরস্পর আদান-প্রদান প্রতিদানশূন্য ভালবাসার মত উঁচু জিনিস বলে গণ্য হয় না। ওটা 'দোকানদারি'। স্বামি-স্ত্রীর সব সময় একত্র থাকার আনন্দ ভারতবর্ষে উচিত বলে গ্রাহ্য হয় না। এটা আমাদের পাশ্চাত্ত্যদের কাছ থেকে নিতে হবে। আমাদের আদর্শকে তোমাদের আদর্শ দ্বারা একটু তাজা করে নিতে হবে। আর তোমাদেরও আমাদের মাতৃভক্তির খানিকটা নেওয়া দরকার।" কিন্তু তাঁহার উপস্থিতি মাত্র লোকের মনে এই ধারণাই অপর সকল চিন্তাকে অভিভূত করিয়া বলবতী হইত যে, যে-জীবনের উদ্দেশ্য কেবল আত্মার মোক্ষ ও জগতের সেবা, সেই সন্ন্যাসজীবন, যাহা স্বচ্ছন্দতা ও গৃহসুখের প্রয়াসী, সেই গার্হস্থ্যজীবন অপেক্ষা অনন্তগুণে শ্রেষ্ঠ। তিনি বিলক্ষণ জানিতেন যে, মহা মহা কর্মিগণ সময়ে সময়ে পোষ্যবর্গের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকিবার প্রয়োজন অনুভব করেন। একবার তিনি সস্নেহে ও অতি সদয়ভাবে জনৈক শিষ্যকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, "যদি এসকল গার্হস্থ্য ও দাম্পত্য জীবনের সাধ কখনও কখনও তোমার মনে ওঠে, তার জন্য চঞ্চল হয়ো না। এগুলি আমারও কখনও কখনও মনে আসে।" আর একবার জনৈক বন্ধুর মুখে তিনি অত্যন্ত একাকী বোধ

করিতেছেন, এইরূপ কথা শুনিয়া তিনি বলিয়া উঠিয়াছিলেন, "প্রত্যেক কর্ম্মী সময়ে সময়ে ঐরকম বোধ করে থাকেন।"

কিন্তু তিনি ভাবিতেন যে, কোন সামাজিক আদর্শকে মিছামিছি বাড়াইয়া তুলিয়া অবশেষে যাহা সমাজের গণ্ডীর পারে অবস্থিত, তাহার চিরন্তন মাহাত্ম্যের লাঘব করায় মহা অনর্থের সম্ভাবনা আছে। তিনি জনৈক শিষ্যকে গুরুগম্ভীর ভাবে এই কথা বিশেষ করিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন, "তুমি যাদের শিক্ষা দেবে, তাদের প্রত্যেককে এ কথা বলতে কখনও ভুলো না—

'মেরুসর্ষপয়োর্যদ্ যৎ সূর্য্যখদ্যোতয়োরিব।
সরিৎসাগরয়োর্যদ্ যৎ তথা ভিক্ষুগৃহস্থয়োঃ॥'

—মেরু ও সর্ষপের মধ্যে যে প্রভেদ, সূর্য্য ও খদ্যোতের মধ্যে যে প্রভেদ, সাগর ও নদীর মধ্যে যে প্রভেদ, সন্ন্যাসী ও গৃহীর মধ্যেও সেই প্রভেদ।"

তিনি জানিতেন যে, ইহাতে ধর্ম্ম-গরিমারূপ বিপদের আশঙ্কা রহিয়াছে। তাঁহার নিজের উহা দমন করিবার উপায় এই ছিল যে, তিনি নিজ গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্য ও ভক্তমাত্রের নিকটই—তিনি গৃহস্থই হউন বা সন্ন্যাসীই হউন—শির নত করিতেন। কিন্তু উক্ত বাক্যের মর্য্যাদা হ্রাস করা, তাঁহার চক্ষে আদর্শটীকেই ছোট করিয়া ফেলা; উহা তিনি কোন মতেই করিতে পারিতেন না। বরং তিনি অনুভব করিতেন যে, এ যুগে সন্ন্যাসি-সঙ্ঘের উপর একটী মহা গুরুতর দায়িত্ব রহিয়াছে—সেটী বিবাহিত জীবনেও সন্ন্যাসাদর্শগুলিকে প্রচার করা; উদ্দেশ্য, যাহাতে কঠিনতর পথটী অপেক্ষাকৃত সহজ পথটীর উপর সর্ব্বদা নিজের সংযমশক্তির প্রয়োগ

করিতে পারে, এবং প্রণয়ের আপাতমধুর মোহজাল—যাহা হৃদয়-মনের একান্ত প্রীতিকর জীবনসঙ্গী বা সঙ্গিনীলাভের দোহাই দিয়া, মানবজীবনের চরম লক্ষ্য যে আত্মার নিজ মহিমায় অদ্বিতীয় ও স্বাধীনভাবে অবস্থিতি, তাহাকে ঢাকিয়া ফেলিতে চায়—সে মোহজাল একেবারে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণের সকল শিষ্যই বিশ্বাস করেন যে, বিবাহের চরম পরিণতি মানবের নিজ স্ত্রীতে মাতৃবুদ্ধি; ইহার অর্থই এই যে, উভয়কেই ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করিতে হয়। সেই মুহূর্ত্ত হইতেই মানবত্ব ঈশ্বরত্বে লীন হয়, এবং তদবধি সমগ্র জীবন আমূল পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। পণ্ডিতেরা বলেন যে, মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া দেখিলে এই আদর্শের যথার্থতা এইরূপে প্রমাণিত হয় যে, ঐ চরম অবস্থায় না পৌঁছান পর্য্যন্ত বিবাহসম্বন্ধের মধ্যে ভালবাসার একবার বৃদ্ধি, একবার হ্রাস, ক্রমাগত এইরূপ প্রবৃত্তির জোয়ার-ভাঁটা হইতে থাকে। কিন্তু যখন বাহ্যসম্বন্ধ-পরিত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে প্রবৃত্তির হাত হইতে উদ্ধার পাওয়া যায়, তখন প্রেমের আর হ্রাসবৃদ্ধি হয় না। এখন হইতে মন প্রেমাস্পদকে সমভাবে পূর্ণ নিষ্ঠার সহিত পূজা করিয়া থাকে।

তথাপি এই বিষয়ে তাঁহার মতামতের আলোচনা করিতে গিয়া আমরা হিন্দুধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্মের মধ্যে পার্থক্য সম্বন্ধে তাঁহার কাশ্মীরে এক দিনের উক্তিটীর কথা মনে না করিয়া থাকিতে পারি না। সেদিন রবিবার, প্রাতঃকাল; উভয় পার্শ্বে সারি সারি পপ্‌লার গাছের মধ্য দিয়া রাস্তা গিয়াছে; তিনি বেড়াইতে বেড়াইতে স্ত্রীজাতি ও জাতিভেদ সম্বন্ধে কথা কহিতেছেন, আমরাও শুনিতেছি।

প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলিলেন, "হিন্দুধর্ম্মের গৌরব এই যে, সে কতকগুলি আদর্শ নির্দ্দেশ করে দিয়েছে, কিন্তু কখনও একথা বলতে সাহস করে নি যে, ওগুলির কোন একটাই একমাত্র সত্য পথ।) বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত ওর প্রভেদ এখানে। বৌদ্ধধর্ম্ম সন্ন্যাসকে অন্য সকল পথের চেয়ে ওপরে স্থান দিয়েছে, এবং বলে যে, ওটাই সকল মুমুক্ষুর একমাত্র অবলম্বনীয় পথ। মহাভারতে এক ছোকরা সাধুর গল্প আছে; তিনি জ্ঞানলাভের জন্য প্রথমে একজন বিবাহিতা নারীর কাছে এবং পরে একজন মাংসবিক্রেতার কাছে যেতে উপদেশ পেয়েছিলেন। এই গল্পটাই আগের কথার সত্যতার যথেষ্ট প্রমাণ। পতিব্রতা এবং ব্যাধ দুজনেই জিজ্ঞাসিত হয়ে উত্তর দিয়েছিলেন, 'বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পালন করেই আমরা এই জ্ঞানলাভ করেছি।' স্বামিজী উপসংহারে বলিলেন, "দেখছ, এমন কোন জীবিকা নেই, যা দিয়ে ভগবানের কাছে যাওয়া না যায়। তাঁকে লাভ করা না করা শেষ পর্য্যন্ত শুধু প্রাণের ব্যাকুলতার ওপর নির্ভর করছে।"

কোন্ জীবনে কতটা পরিমাণে আদর্শ পবিত্রতার প্রকাশ, তাহা দ্বারাই সকল জীবনের মহত্ত্ব নির্দ্ধারণ করিতে হয়, এই ব্যাপারটাকে মতবাদ হিসাবে স্বামিজী সত্য বলিয়াই গ্রহণ করিতেন। তবে কতকগুলি লোক আছে, যাহারা উহার কদর্থ করিয়া এইরূপ মিথ্যা দাবী করিয়া থাকে যে, তাহাদের বিবাহ শুধু ধর্ম্মলাভের উদ্দেশ্যেই অনুষ্ঠিত হইয়াছে। সাধু হিসাবে স্বামিজী এইসকল লোকের উক্তিকে বিষবৎ জ্ঞান করিতেন। তিনি বেশ জানিতেন যে, আমরা আত্মগরিমা বশতঃ সর্ব্বদাই নিজ নিজ কার্য্য ও উদ্দেশ্যগুলিকে

ঐরূপে অজ্ঞাতসারে বাড়াইয়া তুলি। তিনি আমাদিগকে বলিয়াছিলেন যে, পাশ্চাত্ত্যদেশে তাঁহার প্রায়ই এমন সব লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইত, যাহারা বিলাসের মধ্যে অলসভাবে জীবনযাপন করিলেও বুঝাইতে চেষ্টা করিত যে, তাহাদের মধ্যে স্বার্থপরতার নামগন্ধ নাই, বলিত যে শুধু কর্ত্তব্যের খাতিরেই তাহারা সংসারে রহিয়াছে; এবং তাহাদের নানা ভালবাসার মধ্য দিয়া তাহারা বিনা চেষ্টায় আপনা হইতেই ত্যাগ অভ্যাস ও আয়ত্ত করিতে পারিয়াছে। তিনি অত্যন্ত ঘৃণার সহিত এইসকল অলীক কল্পনার প্রতিবাদ করিতেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি শুধু এই উত্তর দিতাম যে, এরকম সব মহাপুরুষ তো ভারতবর্ষে জন্মান না! মহাত্মা জনক রাজাই এরকমের আদর্শ পুরুষ ছিলেন, এবং সারা ইতিহাসে জনক রাজা মাত্র একবারই জন্মেছেন!" এই বিশেষ ভ্রমটীর সম্বন্ধে তিনি দেখাইয়া দিতেন যে, দুই প্রকার আদর্শবাদ (Idealism) আছে; একটী—যথার্থ আদর্শটীকেই পূজা ও উচ্চাসন প্রদান করা; অপরটী—আমরা নিজে যে অবস্থাটা লাভ করিয়াছি, তাহাকেই বাড়াইয়া স্বর্গে তোলা। শেষোক্ত ক্ষেত্রে আদর্শটীকে প্রকৃতপক্ষে আমাদের 'অহং'-জ্ঞানেরই নিম্নে আসন দেওয়া হইল।

কিন্তু তাঁহার এই কঠোর সমালোচনা কোন শুষ্ক দোষদর্শীর (cynic) মত ছিল না। যাঁহারা আমাদের আচার্য্যদেবের 'ভক্তি-যোগ' পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদের এই বিশেষ উক্তিটী মনে পড়িবে, "প্রেমিক প্রেমাস্পদের মধ্যে আদর্শটীকেই দেখে।" আমি তাঁহাকে একটী বালিকাকে বলিতে শুনিয়াছি—বালিকার একজনের প্রতি প্রণয়ের কথা তখন সবে টের পাওয়া গিয়াছে—"যতদিন তোমরা

দুজনে পরস্পরের মধ্যে আদর্শটীকেই দেখতে পাবে, ততদিন তোমাদের পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা ও সুখ না কমে বেড়েই যাবে।”

আমাদের আচার্য্যদেবের বিশেষ পরিচিত ব্যক্তিগণের মধ্যে একজন প্রৌঢ়া মহিলার কিন্তু এই বিশ্বাস ছিল যে, স্বামিজী সন্ন্যাসধর্মের প্রতি প্রগাঢ় নিষ্ঠাবশতঃ বিবাহিত জীবনের পবিত্রতা ও উপকারিতা ঠিক ঠিক বিচার করিতে পারেন নাই। উক্ত মহিলা নিজে দীর্ঘকাল বৈধব্যজীবন যাপন করিতেছিলেন এবং বিবাহিত জীবনে অসাধারণ সুখভোগ করিয়া আসিয়াছিলেন। সুতরাং ইহা খুব স্বাভাবিকই হইয়াছিল যে, স্বামিজী দেহাবসানের কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে এই বিষয়ে যে চূড়ান্ত মীমাংসায় উপনীত হইয়াছিলেন, তাহা ইঁহাকেই জ্ঞাপন করিতে চাহিবেন। আবার যে পত্রবাহক তাঁহার পত্রখানি মহিলার বহুদূরস্থিত গৃহে পৌঁছাইয়া দিল, সেই তাঁহার দেহত্যাগের তারের সংবাদও ঐ সঙ্গে তাঁহার হাতে দিল। কে জানিত পত্রখানি এরূপ দারুণ শোকের সময় যাইয়া উপস্থিত হইবে? পত্রখানিতে স্বামিজী লিখিতেছেন, “আমার মতে কোন জাতিকে অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্যের আদর্শে পৌঁছিবার পূর্ব্বে প্রথমে মাতৃভাবের দিকে বিশেষ শ্রদ্ধা জাগাইয়া তুলিতে হইবে। বিবাহ-বন্ধনকে পবিত্র ও অচ্ছেদ্য জ্ঞান করাই ইহার সোপান। রোমান-ক্যাথলিক ও হিন্দুগণ বিবাহবন্ধনকে পবিত্র ও অচ্ছেদ্য জ্ঞান করিয়া প্রভূত শক্তিশালী, মহাশুদ্ধসত্ত্ব পুরুষ ও নারীগণের সৃষ্টি করিয়াছে। আরবীদিগের নিকট বিবাহ একটা কড়ারে বন্দোবস্ত, বা জোরপূর্ব্বক দখল, যাহা ইচ্ছামাত্র বিচ্ছিন্ন করা যায়। ফলে আমরা দেখি যে, তথায় চিরকুমারী বা ব্রহ্মচারীর আদর্শের বিকাশ নাই।

আধুনিক বৌদ্ধধর্ম, যেসকল জাতি এখনও বিবাহবন্ধনের মাহাত্ম্য বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই, তাহাদের হাতে পড়িয়া সন্ন্যাসকে অতি বিকৃত কদাচারপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। সুতরাং যতদিন জাপানে বিবাহসম্বন্ধে (পরস্পরের মধ্যে আকর্ষণ ও প্রণয় ব্যতীত) একটা মহান্ ও পবিত্র আদর্শ গড়িয়া না উঠিতেছে, তত দিন কিরূপে তথায় উঁচুদরের সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীসকল জন্মিবে, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না। যেমন আপনি ক্রমশঃ বুঝিতে পারিয়াছেন যে, পতিপত্নীর মধ্যে সম্বন্ধটীকে পবিত্র ও অক্ষুণ্ণ রাখাই জীবনের গৌরব, সেইরূপ আমিও ক্রমশঃ এই জ্ঞান লাভ করিয়াছি যে, জগতের অধিকাংশ লোকের পক্ষেই এই মহাপবিত্র বন্ধনের বিশেষ প্রয়োজন; তাহা হইলেই কতিপয় শক্তিশালী, আজীবন ব্রহ্মচর্য্যবান পুরুষ ও নারীর উদ্ভব হইতে পারিবে।"

আমাদের কেহ কেহ বোধ করেন যে, এই পত্রখানিতে স্বামিজী যতটা অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া মনে করিতে পারিতেন, তদপেক্ষাও ব্যাপকতর অর্থ নিহিত আছে। যে মহাদর্শনে বহুত্বের মধ্যে একত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে, ইহাই তাহার শেষ কথা। যদি দাম্পত্য-বন্ধনকে পবিত্র ও অচ্ছেদ্য জ্ঞান করাই সমাজকে নির্জ্জনবাস ও সংযমে গঠিত সন্ন্যাসজীবনের সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করাইবার সোপানস্বরূপ হয়, তাহা হইলে সংসারের কর্ত্তব্যগুলিকে যথোচিত শ্রদ্ধার সহিত সম্পন্ন করাও পূজাপ্রার্থনাদির ন্যায় আত্মসাক্ষাৎকারের অন্যতম পবিত্র উপায়স্বরূপ হইল। সুতরাং এখানে আমরা একটী সাধারণ নিয়মের পরিচয় পাইলাম, যদ্দ্বারা আমরা বুঝিতে পারি, কেন শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবসমাধি প্রভৃতিকে তত প্রশংসা না করিয়া

বরং তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যে চরিত্রদার্ঢ্যের বিকাশেরই সমধিক পক্ষপাতী ছিলেন। আবার, স্বামী বিবেকানন্দ নিজেও যে কেন সর্ব্বদা সকলকে শক্তিমান হইবার জন্য উৎসাহিত করিতেন, তাহার ভিতরকার অর্থও আমরা বুঝিতে পারি। উহার কারণনির্ণয় অতি সহজ। যদি "বহু ও এক, ইহারা একই মনের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অবস্থায় দৃষ্ট একমাত্র সত্তা" হয়, তাহা হইলে এক কথায় বলা যায়, চরিত্রই ধর্ম্ম। জনৈক গম্ভীরচিন্তাশীল ব্যক্তি যেমন বলিয়াছেন, সত্য সত্যই "জগতের সাধারণ জিনিসগুলি গ্রহণ করিয়া ঠিক ঠিকভাবে তাহাদের মধ্যে চলাফেরার নামই মহত্ত্ব; এবং গভীর প্রেম ও প্রভূত সেবার নামই সাধুতা।" কে জানে, হয়ত এই সহজ সত্যগুলিই অবশেষে এ যুগের নবধর্ম্মবাণীর অস্থিমজ্জাস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইবে। ইহা যে সম্ভবপর, তাহার নিদর্শন আমাদের আচার্য্যদেবের নিজ মুখের এই কথাগুলিই, "সর্ব্বোচ্চ সত্য সকল সময়েই অতি সহজ।"

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

তথাকথিত অলৌকিক দর্শনাদির সহিত আচার্য্যদেবের সম্বন্ধ

নিঃসন্দেহ, ভারতবর্ষই মনস্তত্ত্ব-চর্চ্চার প্রকৃষ্ট স্থান। জগতের অন্য যে-কোন জাতি অপেক্ষা হিন্দুদিগের নিকটই মানুষ সমধিক পরিমাণে কতকগুলি মনরূপে প্রতিভাত হয়, একথা বলা চলে। চিত্তৈকাগ্রতা তাহাদের নিকট জীবনের আদর্শ বলিয়া পরিগণিত। ধীশক্তি ও প্রতিভা, সাধারণ সচ্চরিত্রতা ও সর্ব্বোচ্চ সাধুজীবন, নৈতিক দুর্ব্বলতা ও শক্তিমত্তা—এসকলকে তাহারা একাগ্রতার এক-আধটু তারতম্য হইতেই উদ্ভূত বলিয়া মনে করে। ভারতে অতি প্রাচীন কাল হইতেই যে, মনস্তত্ত্ব একটী স্বতন্ত্র বিজ্ঞানের মত যথোচিতভাবে অধীত হইয়া আসিয়াছে, হিন্দুজাতির এই তন্ময়তাই কতকাংশে তাহার কারণ, আবার কতকাংশে তাহার ফলও বটে। জ্ঞানকে লিপিবদ্ধ করিবার পক্ষে লিখন-প্রণালীর উপকারিতা লোকে ঘুণাক্ষরে বুঝিতে পারিবার বহু পূর্ব্বে, হিন্দুসমাজে মানবের সমষ্টিমনের যাবতীয় ব্যাপার পরস্পরের মধ্যে চিন্তা ও অবেক্ষণের ফলসমূহের আদান-প্রদান দ্বারা নিঃশব্দে সংগৃহীত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। বৈজ্ঞানিক গবেষণা-ব্যাপারটীর সহিত যন্ত্রপাতি ও পরীক্ষাগারের আদৌ কোন সম্বন্ধ থাকিতে পারে, এ কথা লোকের

মনে উদিত হইবার যুগযুগান্তর পূর্ব্বে, ভারতবাসীদিগের মধ্যে তাহাদের প্রকৃতির সর্ব্বাপেক্ষা অনুকূল এই বিজ্ঞানটীর সম্বন্ধে পরীক্ষার যুগ পূর্ণভাবে অভ্যুদিত হইয়াছিল।

ভারতবর্ষে এইরূপে যে জ্ঞানরাশি সঞ্চিত হইয়া অদ্ভুত প্রসার লাভ করিয়াছিল, তাহার মধ্যে যে মনোরাজ্যের এমন অনেক ঘটনার যথোচিত সমাবেশ ও শ্রেণীবিন্যাস থাকিবে, যাহা অপেক্ষাকৃত অল্প-অভিজ্ঞ পাশ্চাত্ত্যদিগের নিকট অস্বাভাবিক বা অলৌকিক বলিয়া বোধ হয়, ইহাতে বিচিত্র কিছুই নাই। সুতরাং সম্মোহনী বিদ্যা এবং অজানিত নানা প্রকারের অসাধারণ অনুভব বা শক্তি—রোগ ভাল করা, মনের কথা বলিয়া দেওয়া, দূরদর্শন এবং দূরশ্রবণ, এইগুলিই ইহাদের মধ্যে সাধারণ্যে সর্ব্বাপেক্ষা পরিচিত—এসকল যাঁহারা ভারতের প্রাচীন মনস্তত্ত্ব বা 'রাজযোগের' আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট একটা মস্ত কঠিন ব্যাপার বলিয়া বোধ হয় না।

আমরা সকলেই জানি যে, বিজ্ঞানসম্মত চিন্তার প্রধান উপকারিতা এই যে, উহা আমাদিগকে নানা ঘটনা বুঝিতে ও লিপিবদ্ধ করিতে সহায়তা করে। কোন একটী রোগ বিরল হউক; তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না; যদি সমগ্র চিকিৎসাশাস্ত্রের কোথাও একবার মাত্র উহার উল্লেখ থাকে, তাহা হইলেই যথেষ্ট। তখন হইতে মানবমনে উহার একটী স্থান রহিল। উহা আর অলৌকিক ব্যাপার নহে। তাহার একমাত্র কারণ এই যে, শীঘ্র বা বিলম্বে উহার শ্রেণী-নির্দ্দেশ হইবেই। উহার একটী নাম আছে। উহার নিদান এবং চিকিৎসা এখন শুধু কালসাপেক্ষ।

সচরাচর যাহাকে 'অলৌকিক দর্শনাদি' নামে অভিহিত করা হয়, সেইসকল ঘটনার যে অংশ বিশ্বাস্য, তৎসম্বন্ধে অনেকটা পূর্ব্বোক্তরূপ কথা বলা চলে। সহজেই বুঝা যায় যে, এই পর্য্যায়ভুক্ত ঘটনাবলী সত্য হইলে আর আদৌ অলৌকিক থাকে না—উহা বায়ুকে তরল পদার্থে পরিণত করা, অথবা বায়ু হইতে রেডিয়ম পৃথক করিয়া লওয়ার ন্যায় খুব স্বাভাবিক ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়। বাস্তবিকই, 'অলৌকিক' বা 'অতিপ্রাকৃত' কথাটী আদৌ সঙ্গত কিনা, তদ্বিষয়ে বিশেষ আপত্তি করা যাইতে পারে, কারণ যদি কোন জিনিসের অস্তিত্ব একবার সপ্রমাণ করা যায়, তাহা হইলে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, উহা প্রকৃতির ভিতরেই, এবং উহাকে 'অতিপ্রাকৃত' বলা ঐজন্যই নিতান্ত অযৌক্তিক। আলোচ্য ঘটনাসমূহ ভারতবর্ষে মনোবৃত্তিরই সমধিক বিকাশের ফলমাত্র বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে, এবং উহাদের ব্যাখ্যা ঘটনাগুলির মধ্যে আবিষ্কার করিবার চেষ্টা না করিয়া যে ব্যক্তি ঐসকল উপলব্ধি করিয়াছে, তাহারই মনের অবস্থা-দৃষ্টে অনুসন্ধান করা হইয়া থাকে; কারণ ইহা সহজেই অনুমেয় যে, ঐ মন বিশেষ বিশেষ অবস্থায় অভ্যস্ত অনুভবসকল হইতে স্বতন্ত্র এক একরূপ অনুভূতি লাভ করিতে পারে।

শাস্ত্রে চরম চিত্তৈকাগ্রতার যে-সকল লক্ষণ বর্ণিত আছে, শ্রীরামকৃষ্ণের দক্ষিণেশ্বর বাসকালে বহু বৎসর ধরিয়া তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহার মধ্যে সেই সকল মানসিক বিকাশের অনেকগুলির বিশেষ পরিচয় পাইয়াছিলেন। তিনি বাহ্যজগতের ঘটনাসমূহ এমন জানিতে পারিতেন যে, তাঁহারা দ্বারদেশে উপস্থিত হইবামাত্র তিনি আপনা হইতে তথায় অগ্রসর হইয়া তাঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন,

এবং বালকেরা যেসকল প্রশ্ন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন বলিয়া লিখিয়া পকেটে করিয়া আনিয়াছিলেন, তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বেই তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাদের উত্তর দিতে প্রবৃত্ত হইতেন। তাঁহার অনুভূতিসকল এত সূক্ষ্ম ছিল যে, তিনি স্পর্শমাত্র, কিরূপ চরিত্রের লোক তাঁহার খাদ্যসামগ্রী, কাপড়চোপড়, বা বিছানা ছুঁইয়াছে, তাহা বলিয়া দিতে পারিতেন। একবার এইরূপ স্পর্শ করিতেই তাঁহার অঙ্গ যন্ত্রণায় সঙ্কুচিত হইয়া সরিয়া আসিল। তিনি বলিলেন যে, তিনি দাহযন্ত্রণা অনুভব করিলেন। অন্য এক সময়ে হয়ত বলিলেন, "এই দেখ! এটা আমি খেতে পারি, যে ওসব পাঠিয়েছে সে নিশ্চয়ই ভাল লোক।" আবার তাঁহার স্নায়ুমণ্ডলীতে বিশেষ বিশেষ ভাবের এরূপ দৃঢ় সংস্কার জন্মিয়া গিয়াছিল যে, নিদ্রাকালেও তিনি ধাতুদ্রব্য স্পর্শ করিতে পারিতেন না, এবং জাগ্রত অবস্থায় কোন পুস্তক বা কলম উহার মালিকের নিকট প্রত্যর্পণ করিতে ভুলিয়া গিয়া থাকিলে, নিদ্রিতাবস্থায় তাঁহার হাত যেন আপনা হইতেই উহা যথাস্থানে ফিরাইয়া দিয়া আসিত।

জগতের ঋষিপদবীভুক্ত মহাপুরুষগণের কাহারও সম্বন্ধে কোন ভারতীয় মনস্তত্ত্ববিদ্ই বলিবেন না যে, উক্ত মহাপুরুষ দেবতাদিগের সহিত কথোপকথন করিয়াছেন; তাঁহারা শুধু ইহাই বলিবেন যে, তিনি এমন একটী মানসিক অবস্থায় উপনীত হইতে পারিতেন, যেখানে তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস হইত যে, তিনি দেবতাদিগের সহিত কথা কহিয়াছেন, অর্থাৎ যাহাকে ভারতীয় দার্শনিকগণ 'স্ব-সংবেদ্য' ব্যাপার বলিয়া থাকেন। এই অবস্থার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্য-

গণ দেখিয়াছেন। এখনও তাঁহারা গল্প করিয়া থাকেন যে, তাঁহারা অতি বিস্ময়ের সহিত শুনিতেন—কয়েক ঘণ্টা ধরিয়া যেন দুই বা বহু জনে কথাবার্ত্তা হইতেছে, তন্মধ্যে একপক্ষের কথাগুলিই শুধু তাঁহাদের কানে আসিতেছে; এদিকে তাঁহাদের গুরুদেব শান্তভাবে বিশ্রাম করিতে করিতে নিশ্চয়ই বিশ্বাস করিতেছিলেন যে, তিনি শিষ্যগণের অদৃশ্য দেবদেবীসমূহের সহিত ধ্যানযোগে কথোপকথন করিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের এই অজস্র দর্শনসমূহের পশ্চাতে সর্ব্বদাই মানবকে সেবা করিবার দৃঢ়সঙ্কল্প বিদ্যমান থাকিয়া এইসকলকে একটী মহাজীবনরূপে গ্রথিত করিয়া তুলিয়াছিল। ইহার বহুকাল পরে স্বামী বিবেকানন্দ তৎসম্বন্ধে বলিতেন যে, তিনি তমসাচ্ছন্ন নিশায় সময়ে সময়ে যন্ত্রণায় মাটিতে পড়িয়া ছটফট করিতে করিতে প্রার্থনা করিতেন, তিনি যেন আবার পৃথিবীতে, এমন কি কুকুরযোনিতেও, জন্মগ্রহণ করেন, যদি উহাতে একটী জীবেরও কিছু সহায়তা হয়। অন্যান্য সময়ে যখন তিনি নিজের মনের কথা অপরের সামনে কিছু কিছু খুলিয়া বলিতে পারিতেন, তিনি বলিতেন যে, উচ্চ উচ্চ দর্শন আসিয়া তাঁহাকে সেবার ভাব হইতে টানিয়া লইবার জন্য প্রলোভিত করিতেছে। তাঁহার শিষ্যগণ, তাঁহাদের গুরুদেব কখনও কখনও গভীর সমাধিভঙ্গের পর যে দুই-চারিটী কথা আপন মনে বলিতেন, তাহাও এইবিষয়ক বলিয়া স্থির করিতেন। তিনি যেন তখন শিশুর ন্যায় মায়ের কাছ হইতে দৌড়িয়া গিয়া খেলিবার জন্য জগন্মাতার নিকট আবদার করিতেন। এরূপ ক্ষেত্রে সাধারণ জ্ঞানভূমিতে অবরোহণ করিবার জন্য তিনি 'আর একটী মাত্র

জীবসেবাকার্য্য' বা 'আর একটী ছোটখাট জিনিস ভোগ' করিব—এই বলিয়া বাসনা ধরিতেন। কিন্তু ঐ ব্যুত্থানকালে তাঁহাতে সর্ব্বদা অনন্ত প্রেম ও গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় লক্ষিত হইত—যেমন ঈশ্বরে একান্ত তন্ময়তাপ্রাপ্ত ব্যক্তির হইয়া থাকে। যখন স্বামী বিবেকানন্দ হার্ভার্ড বক্তৃতা উপলক্ষ্যে ঐ দুইটীকেই সমাধিজনিত বাহ্যজ্ঞানশূন্যতা ও মৃগীরোগের বাহ্যজ্ঞানশূন্যতা, এই দুইয়ের মধ্যে লক্ষণের পার্থক্য বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তখন আমরা বুঝিতে পারি যে, তিনি তাঁহার গুরুদেবের জীবনে সমাধি-অবস্থালাভ ও পুনরায় তাহা হইতে সাধারণ অবস্থায় প্রত্যাবর্ত্তন, এতদুভয়কে সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার প্রত্যেক কথাটীতে ওরূপ দৃঢ় প্রত্যয় নিহিত রহিয়াছে।

শ্রীরামকৃষ্ণের আরও অনেক বিশেষত্ব ছিল। তাঁহার স্নায়ুমণ্ডলীর ক্রিয়ার উপর কিরূপ আধিপত্য ছিল, তাহার একটী দৃষ্টান্ত এই যে, তিনি তাঁহার শেষ অসুখের সময় গলদেশ হইতে মনকে একেবারে উঠাইয়া লইতে পারিতেন; তখন তথায় অস্ত্রপ্রয়োগ করিলেও, যেমন ঔষধ দ্বারা ক্ষতস্থানকে অসাড় করিয়া ফেলিলে হইয়া থাকে সেইরূপ, কোনই বেদনা অনুভূত হইত না। তাঁহার সকল জিনিসকে তন্নতন্নভাবে লক্ষ্য করিবার শক্তিও অসাধারণ ছিল। শারীরিক গঠনের এতটুকু খুঁটিনাটিও তাঁহার নিকট অর্থপূর্ণ বলিয়া বোধ হইত, তিনি উহাতে শরীরাভ্যন্তরস্থ জীবের প্রকৃতির কিছু না কিছু পরিচয় পাইতেন। নবাগত শিষ্যগণকে তিনি একরূপ যোগনিদ্রায় অভিভূত করিয়া ফেলিতেন এবং তাহার মগ্নচৈতন্য হইতে কয়েক মিনিটের মধ্যে তথায় বহু অতীতের যেসকল সংস্কার নিহিত

রহিয়াছে, তাহাও জানিয়া লইতেন। লোকের প্রত্যেক সামান্য কথা ও কার্য্য, যাহা অপরের নিকট তুচ্ছ বলিয়া বোধ হইত, তাহা তাঁহার নিকট চরিত্ররূপ মহাপ্রবাহে নীত তৃণখণ্ডের ন্যায় ঐ স্রোতের গতি নির্দ্দেশ করিয়া দিত। তিনি বলিতেন, "কখনও কখনও এমন একটা অবস্থা হয়, যখন নরনারীদের কাচের জিনিসের মত বোধ হয়, এবং তাদের ভেতর-বার সব দেখতে পাই।"

সর্ব্বোপরি, তিনি স্পর্শমাত্র লোকের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করিয়া দিতে পারিতেন, তাহাতে তাহাদের সমগ্র জীবন এক নূতন শক্তি-প্রভাবে গঠিত ও পরিচালিত হইত; সমাধির বিষয়ে, বিশেষতঃ যে-সকল স্ত্রীলোক দক্ষিণেশ্বর দর্শন করিতে যাইতেন তাঁহাদের সম্বন্ধে, একথা সকলেই জ্ঞাত আছেন। কিন্তু এতদ্ব্যতীত জনৈক সাদাসিধা প্রকৃতির লোক আমায় শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের শেষ কয়মাসের একদিনের একটী ঘটনার কথা বলিয়াছিলেন। ঐদিন কাশীপুরের বাগানে বেড়াইতে বেড়াইতে তিনি সমবেত কতকগুলি ভক্তের মাথায় হাত দিয়া কাহাকেও বলিলেন, "চৈতন্য হোক," আবার কাহাকেও বলিলেন, "আজ থাক," এইরূপ সকলকে বলিলেন। ইহার পরেই এইরূপে কৃপাপ্রাপ্ত ভক্তগণের প্রত্যেকের এক এক বিভিন্ন প্রকারের অনুভূতি হইতে লাগিল। একজনের মনে অনন্ত বেদনা জাগিয়া উঠিল; অপর একজনের নিকট আশপাশের সকল জিনিস ছায়ার ন্যায় অবাস্তব এবং একটী ভাবের ব্যঞ্জকমাত্র হইয়া উঠিল; তৃতীয় ব্যক্তি ঐ কৃপা অপার আনন্দরূপে অনুভব করিলেন—আনন্দ আর ধরে না; একজন একটী মহাজ্যোতি দেখিলেন—উহা তদবধি আর তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল না, সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বত্র গমন করিত, ফলে

যখনই তিনি কোন মন্দির বা পথিপার্শ্বস্থ দেবালয়ের নিকট দিয়া যাইতেন, তখনই তাঁহার বোধ হইত যেন তিনি তথায় ঐ জ্যোতির মধ্যে একটী মূর্ত্তি আসীন দেখিতে পাইতেছেন ; দেখিতেন, তিনি সেই মুহূর্ত্তে যেরূপ দেখিবার উপযুক্ত হইতেন, তদনুসারে ঐ মূর্ত্তি কখনও হাসিতেছেন, কখনও বিষণ্ণ রহিয়াছেন ; ঐ মূর্ত্তিকে তিনি 'বিগ্রহাধিষ্ঠাতা চৈতন্য' বলিয়া জানিতেন এবং ঐরূপেই তৎসম্বন্ধে বলিতেন।

এইরূপে প্রত্যেকের মধ্যে যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ ও সার বস্তু নিহিত আছে, তাহা উদ্বোধিত করিয়া দিয়া, অথবা তৎকালে যিনি যতটুকু গ্রহণের উপযুক্ত হইতেন, তদনুসারে নিজ অনুভূতি তাঁহাদের মধ্যে সঞ্চারিত করিয়া দিয়া, শ্রীরামকৃষ্ণ সেই কঠোর সত্যপরায়ণতা এবং প্রবল বিচারবুদ্ধির সূত্রপাত ও পোষণ করিয়া যান, যাহা তাঁহার হাতে গড়া সকল শিষ্যের মধ্যেই আমরা দেখিতে পাই। তাঁহাদের মধ্যে একজন—স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ—বলিয়াছিলেন, "কোন কিছুকেই পরীক্ষা না করে আমরা বিশ্বাস করি না ; ঠাকুর আমাদের ঐরকম করতে শিখিয়ে গেছেন।" তারপর যখন আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ঐ শিক্ষা কিরূপ বিশেষ আকার প্রাপ্ত হইয়াছিল, তখন গভীর চিন্তার পর তিনি উত্তর দিলেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে নিত্য বস্তুর কিছু না কিছু আভাস অনুভূতি করাইয়া দিতেন, তাহা হইতেই প্রত্যেকে এমন একটী জ্ঞান লাভ করিতেন, যাহা কখনও প্রতারিত হইবার নহে। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার প্রথম বয়সের বক্তৃতাগুলির একটীতে বলিয়াছেন, "আমাদের নিজের চেষ্টায় অথবা কোন সিদ্ধ মহাপুরুষের কৃপায় আমরা সেই চরম বস্তু লাভ করি।"

গুরুর জীবনই শিষ্যের করতলগত রত্নসম্পদ, এবং ইহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই যে, স্বামিজী মানবের মনোবৃত্তিসমূহ কতদূর প্রসার লাভ করিতে পারে, তৎসম্বন্ধে নিজে যাহা দেখিয়াছিলেন এবং অনুভব করিয়াছিলেন, সেই সকলকে তৎক্ষণাৎ বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন বলিয়াই, পাশ্চাত্ত্য দেশের মনোরাজ্যবিষয়ক গবেষণাসমূহের সংস্পর্শে আসিবামাত্র সমগ্র জ্ঞানরাশিকে মগ্নচৈতন্যভূমি (subconscious), সাধারণ জ্ঞান-ভূমি (conscious) এবং অতীন্দ্রিয় জ্ঞানভূমি (superconscious) —এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারিয়াছিলেন। প্রথম শব্দ দুইটী ইউরোপ এবং আমেরিকায় অনেকটা প্রচলিত ছিল, তৃতীয়টী তিনি স্বয়ং নিপুণ, সূক্ষ্ম দৃষ্টি এবং নিজ জীবনের অনুভূতির বলে মনস্তত্ত্ববিষয়ক শব্দসমষ্টির অন্তর্ভুক্ত করিয়া দিলেন। তিনি একবার বলিয়াছিলেন, "সাধারণ জ্ঞান মগ্নচৈতন্য এবং অতীন্দ্রিয় জ্ঞানরূপ দুটী মহাসমুদ্রের মধ্যে একটা সামান্য পাতলা পর্দামাত্র।" তিনি সবিস্ময়ে আরও বলিয়াছিলেন, "যখন আমি পাশ্চাত্ত্য জাতিদের সাধারণ জ্ঞানের এত বড়াই করতে শুনলাম, তখন আমি নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারি নি। সাধারণ জ্ঞান? সাধারণ জ্ঞানে কি আসে যায়! তার নীচে যে অতলস্পর্শ সাগরের মত মগ্নচৈতন্য রয়েছে এবং তার ওপরে যে উঁচু উঁচু পর্বতের মত অতীন্দ্রিয় জ্ঞান রয়েছে, তাদের তুলনায় ও ত কিছুই নয়! এতে আমার ভুল হবার কোন সম্ভাবনা নেই। কারণ, আমি কি শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসকে দশ মিনিটের মধ্যে লোকের মগ্নচৈতন্য থেকে তার সমগ্র অতীতটা জেনে নিতে এবং তা থেকে তার ভবিষ্যৎ এবং সমস্ত ভেতরের শক্তি ঠিক করে নিতে দেখি নি?"

প্রকৃত অতীন্দ্রিয় জ্ঞানের সহিত কখনও বিচারবুদ্ধির বিরোধ থাকিতে পারে না—'রাজযোগে' লিপিবদ্ধ এই উক্তিটীর সত্যতাও নিঃসন্দেহে তাঁহার ঐরূপ সকল জ্ঞানভূমির অভিজ্ঞতা-প্রসূত। দক্ষিণেশ্বরের সাধুর নানা অসাধারণ উপায়ে অতীন্দ্রিয়-জ্ঞান লাভ করিবার ক্ষমতা ছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু তিনি কখনও তজ্জনিত বৃথাভিমানে আত্মহারা হইয়া যাহা সাধারণ উপায়ে নিশ্চয় করা যাইতে পারে, তাহা জানিবার জন্য অসাধারণ উপায় অবলম্বন করিবার প্রয়াস পাইতেন না। একবার এক অদ্ভুত সাধুবেশধারী দক্ষিণেশ্বর উদ্যানে আসিয়া বলে যে, সে না খাইয়া জীবনধারণ করিতে পারে। শ্রীরামকৃষ্ণ তাহাকে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত কোন অলৌকিক দর্শনের সাহায্য লইবার চেষ্টা না করিয়া শুধু কয়েকজন চতুর লোককে তাহাকে লক্ষ্য করিবার জন্য লাগাইয়া দিলেন, এবং বলিয়া দিলেন, যেন তাহারা সে ব্যক্তি কি খায় এবং কোথায় খায়, তাহা তাঁহাকে জ্ঞাপন করে।

কোন জিনিসই পরীক্ষা না করিয়া গ্রহণ করা চলিবে না, এবং সাধারণ লোকেরা স্বপ্ন, ভাবী ঘটনা পূর্ব্ব হইতে দেখা এবং তৎসম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করা ইত্যাদি যে-সকল উপায়ে পরস্পরের উপর প্রভাব বিস্তার করিবার এত চেষ্টা করিয়া থাকে, স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার দেহত্যাগের দিবস পর্য্যন্ত সে-সকলকে আতঙ্কের চক্ষে দেখিতেন। লোকে এসকলও প্রভূত পরিমাণে তাঁহার নিকট উপস্থিত করিত; করিবারই কথা, কিন্তু তিনি সর্ব্বদা এগুলিকে অগ্রাহ্য করিয়া উড়াইয়া দিতেন, এবং বলিতেন, যদি উহারা সত্য হয়, তবে তাঁহার না মানা সত্ত্বেও নিজ নিজ ফল প্রকাশ করুক। তিনি বলিতেন, কোন

একটী ভবিষ্যদ্বাণী কার্য্যক্ষেত্রে সত্য হইবে কিনা, সে কথা তাঁহার পক্ষে জানা অসম্ভব; তিনি শুধু এই বিষয়টী ধ্রুব জানিতেন যে, যদি তিনি একবার উহাকে মানেন, তাহা হইলে তিনি আর কখনও উহার হাত এড়াইতে পারিবেন না।

শ্রীরামকৃষ্ণের সম্বন্ধে ইহা সর্ব্বদা দেখা যাইত যে, অলৌকিক দর্শনাদি কেবল পারমার্থিক বিষয়েই প্রযুক্ত হইত; তিনি কখনও বেদেদের মত ঐহিক বিষয়সমূহ গণিয়া বলিয়া দিতেন না; এবং তাঁহার শিষ্যগণের মতে এইরূপ ভবিষ্যৎ বলিয়া দেওয়া শক্তির অল্পবিস্তর অপব্যবহারই সূচিত করে। স্বামিজী বলিতেন, "এসকল অবান্তর ব্যাপার, এগুলি প্রকৃত যোগ নয়। অপরোক্ষভাবে আমাদের কথাগুলোর সত্যতা প্রমাণিত করে বলে ওগুলির কতকটা প্রয়োজনীয়তা থাকতে পারে। একটু সামান্ত আভাসেও মানুষের বিশ্বাস হয় যে, স্থূল জড় জগতের বাইরে একটা কিছু আছে। কিন্তু যারা এসব জিনিস নিয়ে কাল কাটায়, তাদের গুরুতর বিপদের ভয় রয়েছে।" আর একবার তিনি অসহিষ্ণুভাবে বলিয়া উঠিয়াছিলেন, "এসকল 'সীমান্ত-সমস্যার ব্যাপার' (frontier questions)! ওগুলোর সাহায্যে কোন নিশ্চিত বা দৃঢ় জ্ঞান লাভ করা যায় না। আমি ত বলেছি, ওগুলি 'সীমান্ত-সমস্যার ব্যাপার'। সত্য ও মিথ্যার সীমারেখাটী সব সময়ই বদলে যাচ্ছে!"

আমাদের সামনে যাহা কিছু আসুক না কেন, বিচার দ্বারা বুঝিবার চেষ্টা সর্ব্বদা থাকা চাই। কাহারও অলৌকিক দর্শনাদির কথা শুনিলে বলিতেই হইবে, 'তখনই আমি ওটা সত্য বলে গ্রহণ করব, যখন আমি ঐরকম অনুভব করব।' কিন্তু আমাদের নিজের

অনুভূতিকেও তন্নতন্নভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে। কোন অলৌকিক ঘটনার যে ব্যাখ্যা প্রথমেই মনে আসিল, তাহাকেই সার জ্ঞান করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে চলিবে না। চট্ করিয়া কোন সিদ্ধান্ত মানিয়া লইতে অনিচ্ছুক হওয়া সত্ত্বেও স্বামিজী শেষ বয়সে পরলোকগত আত্মাসকলের মধ্যে মধ্যে আবির্ভাব সম্বন্ধে বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। একবার তিনি ইচ্ছাপূর্ব্বকই বলিয়াছিলেন, "আমি জীবনে অনেকবার ভূত দেখেছি এবং একবার শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের পরসপ্তাহে এক জ্যোতির্ম্ময় অশরীরী আত্মা দেখেছি।" কিন্তু ইহাতে একথা বুঝায় না যে, ভূতুড়েরা ভূত-নামানর জন্য যে-সকল চেষ্টা এবং পরীক্ষা করিয়া থাকে, তাহার অধিকাংশের প্রতি তাঁহার বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা ছিল। এইরূপ একদিনের ঘটনায় তিনি জনৈক প্রসিদ্ধ ব্যক্তিকে এই দলভুক্ত দেখিয়া বলিয়াছিলেন যে, যে ব্যক্তি জগতের সকল বিষয়ে অসাধারণ বুদ্ধিমান, সে যে তথাকথিত একজন মিডিয়মের (যাহার শরীরে ভূতাবেশ হয়, তাহার) সামনে আসিয়াই তাহার সমস্ত বলবুদ্ধি খোয়াইয়া বসে, ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয়। আমেরিকায় তিনি কয়েকটী ভূত-নামান ব্যাপারে দর্শকরূপে উপস্থিত ছিলেন, এবং ঐ সময়ে যেসকল অলৌকিক ব্যাপার দেখান হয়, তাহাদের অধিকাংশকেই তিনি একেবারে জুয়াচুরি মনে করিতেন। সকলগুলি দেখিয়া শুনিয়া তিনি এই সার মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, "সকল জায়গায়ই অতি সহজ উপায়ে অতি বড় জুয়াচুরি হয়ে থাকে।" আবার তিনি মনে করিতেন যে, এইসকল ঘটনার অনেকগুলিকে বহির্জ্জগতের সত্য না বলিয়া অন্তর্জ্জগতের ব্যাপার হিসাবেই

ব্যাখ্যা করিলে ভাল হয়।* যদি এইসকল বাদসাধ দিবার পরও উহাদের কিছু অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইলে ইহা সম্ভবপর যে, সেটুকু সত্যসত্যই যথার্থ।

কিন্তু যদি এইরূপই হয়, তথাপি মায়িক জগতের জ্ঞানলাভই আমাদের চরম লক্ষ্য হইতে পারে না। দুই-চারিটা জীব ঘুরিতে ঘুরিতে সূক্ষ্ম হইতে স্থূল জগতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেও, উহাতে অমৃতত্বের প্রকৃত ধারণা সম্বন্ধে অতি অল্প জ্ঞানই লাভ করা যায়। একমাত্র ত্যাগ দ্বারাই এই অমৃতত্ব লাভ করা যায়। স্বামিজীর মতে ভূতপ্রেতাদি লইয়া বেশী নাড়াচাড়া করিলে তাহাতে বাসনাবৃদ্ধি, অহঙ্কারবৃদ্ধি এবং অসত্যে পতন অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। যদি আত্মার জন্য জীবনের সাধারণ ভোগগুলিকেই পরিত্যাগ করিতে হয়, তাহা হইলে এইসকল অলৌকিক ক্ষমতা আরও কত অধিক পরিমাণে ত্যাজ্য! এমন কি, খৃষ্টধর্ম্মে যদি সিদ্ধাইয়ের ব্যাপারগুলি না থাকিত, তাহা হইলে তিনি উহাকে উচ্চতর ধর্ম্ম বলিয়া মনে করিতেন। সিদ্ধাইসকলের প্রতি ভগবান বুদ্ধের দারুণ ঘৃণা বৌদ্ধ-ধর্ম্মের চিরন্তন গৌরব। উহাদের উপকারিতা সম্বন্ধে বড় জোর এই কথা বলা যায় যে, উহাদের সাহায্যে একটু আধটু বিশ্বাস

* যেমন, দাক্ষিণাত্যে এক ব্যক্তির মনের কথা বলিয়া দিবার শক্তি আছে বলিয়া বিশেষ খ্যাতি ছিল। সে বলিত যে, এক অদৃশ্য স্ত্রীমূর্ত্তি তাহার কাছে দাঁড়াইয়া থাকিয়া তাহাকে কি বলিতে হইবে তাহা বলিয়া দেয়। স্বামিজী বলিতেন, "আমার এই ব্যাখ্যা পছন্দ না হওয়ায় আমি অপর একটা ব্যাখ্যার সন্ধান করতে লাগলাম।" তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে, এই সকল তথ্য সে নিজের ভিতর হইতেই প্রাপ্ত হইত।

উৎপাদন করিতে পারা যায়, তাহাও আবার ধর্ম্মশিক্ষার প্রথম সোপানগুলি সম্বন্ধে। বাইবেলের ভাষায়, "সিদ্ধাই-আদি যাহা কিছু, সব লোপ পাইবে; একমাত্র প্রেমই বিদ্যমান থাকিবে।" যে দৃঢ়চেতা ব্যক্তি এইসকল প্রলোভনকে দূর করিতে পারেন, তাঁহার নিকটই সত্যের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হয়। মহর্ষি পতঞ্জলির কথায়, "প্রসংখ্যানেঽপ্যকুসীদস্য সর্ব্বথা বিবেকখ্যাতের্ধর্ম্মমেঘঃ সমাধিঃ"— যিনি সিদ্ধিসকলকে সমূলে পরিহার করিতে পারেন, তাঁহারই ধর্ম্মমেঘ নামক সমাধিলাভ হয়; তিনিই ব্রহ্ম উপলব্ধি করেন।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

স্বামিজীর মৃত্যুসম্বন্ধীয় শিক্ষা

আমাদের আচার্য্যদেব যে বিবিধ উপায়ে শিক্ষা প্রদান করিতেন, তন্মধ্যে একটী অতীব হৃদয়গ্রাহী উপায় এই ছিল যে, তাঁহার উপস্থিতিই নীরবে শিষ্যের মধ্যে অজ্ঞাতসারে একটা পরিবর্ত্তন আনিয়া দিত। সে সকল জিনিসকে যে চক্ষে দেখিত, সেই দৃষ্টিটাই আমূল পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইত ; সে যেন কোন একটী নির্দ্দিষ্ট ভাবে একেবারে অনুপ্রাণিত হইয়া যাইত, অথবা সহসা দেখিত যে, তাহার কোন বিশেষভাবে চিন্তা করিবার সমস্ত অভ্যাসটাই চলিয়া গিয়াছে, এবং তৎস্থলে একটী নূতন মতের উদ্ভব হইয়াছে—অথচ ঐ বিষয়ে উভয়ের মধ্যে একটী কথারও আদানপ্রদান হয় নাই। লোকের মনে হইত, যেন শুধু তাঁহার নিকটে থাকা হেতুই কোন জিনিস তর্কযুক্তির রাজ্য ছাড়াইয়া চলিয়া গিয়াছে এবং আপনা হইতে তৎসম্বন্ধে জ্ঞান জন্মিয়া গিয়াছে। এইরূপেই রুচি ও মূল্যঘটিত নানা প্রশ্ন আর মনকে আন্দোলিত করিতে পারিত না। এইরূপেই তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তগণের হৃদয়ে ত্যাগের বাসনা জ্বলন্ত অনলশিখার ন্যায় উদ্দীপিত হইয়া উঠিত। আর, তাঁহার নিকটে থাকিলে লোকের মনে মৃত্যু সম্বন্ধে যে ধারণা সঞ্চারিত হইত, তৎসম্বন্ধে একথা যেমন খাটে, এমন আর কিছুর সম্বন্ধেই নহে।

তাঁহার জীবদ্দশায় তিনি দিন দিন এ বিষয়ে কোন বাঁধাধরা নিয়ম করার অধিকতর বিপক্ষে ছিলেন। কেহ এই চিরন্তন সমস্যাটীর মীমাংসা করিবার চেষ্টা করিয়া তাঁহার মত জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর দিতেন, "আমার মনে হয় এরকম, আমি ঠিক জানি না।" তিনি অনুভব করিয়া থাকিবেন যে, একটী সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম স্বার্থপরতা ভবিষ্যৎ সুখের মনোহর স্বপ্নে আত্মপ্রকাশ করে; এবং তিনি দেহত্যাগের পরের অবস্থাসমূহের উপর ঝোঁক দিয়া লোকের বাসনাজনিত অজ্ঞতার বৃদ্ধি করিতে ভয় পাইতেন। তাঁহার নিজের পক্ষে জীবনে ও মরণে ঈশ্বরই একমাত্র উপায় এবং নির্ব্বাণই চরম লক্ষ্য ছিল। তাঁহার মতে সর্ব্বোচ্চ সমাধিই একমাত্র প্রয়োজনীয় বস্তু, বাকী যাহা কিছু সমস্তই ইন্দ্রিয়সেবা। তথাপি এই ঘটনা হইতেই স্পষ্টতরভাবে বুঝা যায়, কিরূপে তাঁহার শিক্ষায় লোকের মৃত্যুসম্বন্ধীয় ধারণা পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইত; এবং যে দুই-তিনখানি পত্রে নিজের অনুভব ও সহানুভূতি, উভয়ে মিলিয়া তাঁহাকে এতৎ-সম্বন্ধে একটী নির্দ্দিষ্ট মত প্রকাশে বাধ্য করিয়াছিল, এই ঘটনাই সেগুলিকে সমধিক মূল্যবান করিয়া তুলিয়াছে।

আমার নিজের কথা বলিতে গেলে, যখন আমি স্বামিজীকে প্রথম দেখি, তখন অনেক বৎসর ধরিয়া আমার এই ধারণা প্রাণের ভিতর ক্রমশঃ বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল যে, আমাদের ইচ্ছা যাহাই হউক না কেন, শরীরত্যাগের পরও যে আমাদের ব্যক্তিত্ব বজায় থাকে, এরূপ কল্পনা করিবার কোন বাস্তব কারণ নাই। এরূপ ব্যাপার হয় অসম্ভব, না হয় অচিন্তনীয়। যদি মন না থাকিলে আমাদের শরীরের অনুভূতি না হয় (কারণ, মন দ্বারাই আমরা

ঐ অনুভূতি লাভ করিয়া থাকি), তাহা হইলে ইহাও তেমনি সত্য যে, শরীর না থাকিলে আমরা মনের অস্তিত্বও আদৌ কল্পনা করিতে পারি না। সুতরাং যদি মন বাস্তবিক শরীরেরই পরিণাম-স্বরূপ নাও হয়—"বীণার তারে যেমন আওয়াজ হইয়া থাকে"—তাহা হইলেও আমাদিগকে অন্ততঃ ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, শরীর ও মন উভয়েই একই বস্তুর বিপরীত সীমা বা প্রান্ত (Poles) মাত্র। উভয়ে—শরীর ও মন, জড়পদার্থ ও মন নহে—একই জিনিস, এবং মৃত্যুর পরও যে ব্যক্তিত্ব থাকিবে, এ ধারণা জৈব-সংস্কারপ্রসূত একটা ছায়া মাত্র। নীতিসম্মত আচরণ, এমন কি উহার চরম পরিণতি যে পূর্ণ আত্মত্যাগ, তাহা পর্যন্ত, আমাদের ব্যক্তিগতভাবে সমাজ-হিতকর ভোগগুলিকে গ্রহণ করারূপ ভিত্তিব উপর প্রতিষ্ঠিত। *

---

* উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে ইউরোপের মৃত্যুসম্বন্ধীয় ধারণা কতকটা এইরূপ বলা যাইতে পারে। একজন মনীষী বলিতেছেন, "আত্মা কি বীণার তারে উৎপন্ন আওয়াজের মত, অথবা নৌকায় উপবিষ্ট দাঁড়ীর মত?" জড় পদার্থের সূক্ষ্মাবস্থা-প্রাপ্তি সম্বন্ধে আজকাল যেসকল কথা শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাতে বৈজ্ঞানিকগণের পক্ষেও "একটা পরিণামাবস্থা (Cycle) কল্পনা করা—উহাকে মন বলিতে পার—সহজ হইয়া পড়িতেছে, যাহাতে জড়পদার্থ একপ্রকার নাই বলিলেই হয়," কিন্তু তাহা হইলেও পাশ্চাত্তা দেশসমূহের জন্ত ইহা বিশেষভাবে দেখাইতে হইবে, কিরূপে ব্যষ্টি শরীর-মন এই জড়পদার্থ ও মনের সমষ্টিকে আশ্রয় করে, যাহাতে উভয়েই একাকার হইয়া যায়। এখানে ইহা বলিবার অভিপ্রায় নহে যে, সকল ধর্মে নীতিসম্মত আচরণ অবশেষে আত্মার অমরত্বে বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে; এখানে শুধু অজ্ঞেয়বাদী ও হিন্দুমতের বৈপরীত্য প্রদর্শন করা হইতেছে। অজ্ঞেয়বাদী নীচে হইতে উপরে উঠিয়া আধ্যাত্মিক জীবন গড়িয়া তুলিতে চাহেন; হিন্দুগণ বলেন

ভারতীয় মনীষিবৃন্দ মনকেই জীবনের কেন্দ্রস্থানীয় কীলকস্বরূপ জ্ঞান করিয়া তাহারই উপর যত জোর দিয়া থাকেন—উহাই তাঁহাদের অভ্যাস। আমার নিজের সম্বন্ধে, পূর্ব্বকথিত ধারণাসকল তাঁহাদের এইরূপ চিন্তা দ্বারা খণ্ডিত হইয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে আধুনিক* লোকেরা বিশ্বাস করেন যে, মানুষ একটা দেহ। এখানে প্রাচ্য পণ্ডিতগণ একেবারে তাঁহাদের বিপরীত পক্ষ অবলম্বন করেন—ঐরূপ সংস্কারই প্রাচ্যদিগের মজ্জাগত হইয়া গিয়াছে। স্বামিজী যেমন নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, "পাশ্চাত্ত্য ভাষাগুলি বলে যে, মানুষ একটা দেহ, এবং তার একটী আত্মা আছে; কিন্তু প্রাচ্য ভাষাগুলি বলে যে, মানুষ আত্মা, এবং তার একটা দেহ আছে।"

এই নূতন ব্যাখ্যার ফলস্বরূপ আমি লোকদের সহিত কথা কহিবার কালে প্রথমে নিজেকে এইরূপে বুঝাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম, যেন আমি তাহাদের বাহ্য শ্রবণেন্দ্রিয়ের পরিবর্ত্তে ভিতরকার মনটীর সহিতই কথা কহিতেছি। ইহাতে যে বিপুল পরিমাণে অধিক সাড়া পাইলাম, তাহাই আমাকে ক্রমশঃ অগ্রসর করিয়া লইয়া চলিল; অবশেষে দ্বাদশ মাসান্তে আমি সহসা

---

* যে, বিচার করিয়া দেখিলে, আমাদের দেহবুদ্ধি আধ্যাত্মিক জীবনের একটা স্থূল বিকাশ ও আবরণ মাত্র। এই আধ্যাত্মিক জীবনের অদম্য আকাঙ্ক্ষা আত্মরক্ষার জন্য নহে, আত্ম-বলিদানের জন্য। আধুনিকগণ দৃশ্য হইতে বিচার দ্বারা অদৃশ্যে পৌঁছিতে চান, বিশেষ হইতে সামান্যে উপনীত হন; হিন্দুগণ সাধারণ বা সর্ব্বজনীন হইতে বিশেষের বিচার করেন এবং বলেন যে, মৃত্যুর পর কিরূপ অবস্থা হয়, তাহা জানিতে হইলে উহাই প্রকৃষ্ট বিচারপন্থা, কারণ, প্রকৃতপক্ষে আমরা একমাত্র আত্মার জীবন সম্বন্ধেই জ্ঞাত আছি।

দেখিলাম যে, আমার মনকেই মুখ্য জ্ঞান করিবার অভ্যাস দাঁড়াইয়া গিয়াছে ; তখন আর আমি শরীরের নাশের সঙ্গে সঙ্গে মনের বিনাশ কল্পনা করিতে পারিলাম না ! যত নূতন নূতন চেষ্টা করিতে লাগিলাম, ততই ক্রমশঃ আমার ধারণা হইয়া গেল যে, এই পরিদৃশ্যমান জগৎ বাস্তবিকই মনঃপ্রসূত ; এবং কোন একটী নির্দ্দিষ্ট মুহূর্ত্তে (যেমন, দেহত্যাগকালে) চিন্তারাজ্যে কোন আকস্মিক মহাপবিবর্ত্তন উপস্থিত হওয়া ক্রমশঃ অসম্ভব বোধ হইতে লাগিল।

কিন্তু স্বামিজীর ঐসম্বন্ধীয় চিন্তা অনেক অধিক দূর অবগাহিনী ছিল। তিনি সর্ব্বদা এই চেষ্টা করিতেন, যাহাতে ভ্রমেও কদাপি দেহাত্মবুদ্ধি না আসিতে পারে। তিনি 'আমি' শব্দটী কখনও এমনভাবে প্রয়োগ করিতেন না, যাহাতে লোকে ঐরূপ অর্থই করিতে পারে ; তৎপরিবর্ত্তে তিনি ঈষৎ অঙ্গভঙ্গিসহকারে 'এইটা' বা 'এইসব' বলিয়া শরীরটীকে লক্ষ্য করিতেন। অবশ্য উহা পাশ্চাত্ত্যবাসীদিগের কর্ণে একটু অদ্ভুত শুনাইত। কিন্তু তিনি সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্ব দ্বারা সীমাবদ্ধ ইন্দ্রিয়ের জীবনকে জীবন বলিয়াই স্বীকার করিতে চাহিতেন না, কেন না উহাতে নানা আপত্তি উঠিতে পারে। জয় পরাজয়, ভালবাসা ঘৃণা, উপযুক্ততা অনুপযুক্ততা— ইহারা প্রত্যেকেই ব্রহ্মের এক একটী আংশিক প্রকাশ বলিয়া সকলে মিলিয়া কখনও সেই সচ্চিদানন্দস্বরূপ হইতে পারে না। যেমন স্বামিজী বলিতেন, আমাদের বর্ত্তমান জীবনের মত শত শত জীবন, যাহার যথাকালে বিনাশ অবশ্যম্ভাবী, তদ্দ্বারা কখনও আমাদের অমৃতত্ব-পিপাসার নিবৃত্তি হইতে পারে না। তজ্জন্য মৃত্যুঞ্জয়ত্ব-লাভ ব্যতীত অপর কিছুই চলিবে না, এবং এ কথা কখনই বলা

যায় না যে, এই অবস্থা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সীমাবদ্ধ জীবনেরই বহুশঃ পুনরাবৃত্তি বা তাহারই কিঞ্চিৎ বিকশিত অবস্থামাত্র। এ বিষয়ে স্থিরনিশ্চয় হইতে হইলে ঐ অমৃতত্ব ইহজীবনেই লাভ করা চাই, নতুবা অন্য কি উপায়ে নিশ্চিন্ত হওয়া যাইতে পারে যে, আমরা শরীরানুভূতির বাহিরে গিয়াছি? পাশ্চাত্ত্যবাদীরা বলিয়া থাকেন, 'আত্মা আসেন এবং যান,' এইরূপে তাঁহারা দেহাত্মবুদ্ধিপ্রবণতারই পরিচয় দিয়া বসেন; যেন তাঁহারা এক উচ্চতর সত্তার আগমন-নির্গম লক্ষ্য করিতেছেন। কেণ্টপ্রদেশবাসী যে Druid (প্রাচীন-কালের পুরোহিতবিশেষ) সেণ্ট অগাস্টিনকে অভিনন্দন করিয়াছিলেন, তাঁহার বক্তৃতাই একশ্রেণীর লোকের ধর্ম্মবিশ্বাসের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ইঁহারা বলেন, জগৎ যেন একটী উষ্ণ, আলোকিত বৃহৎ কক্ষ, এবং আত্মা যেন একটী পক্ষী, বাহিরের শীত ও ঝঞ্ঝাবাত হইতে রক্ষা পাইবার নিমিত্ত ক্ষণকালের জন্য তথায় আশ্রয় লইয়াছে। তথাপি এই ধারণাতেও ইহার বিপরীত ধারণাটীতে যতগুলি, ঠিক ততগুলি বিষয়ই ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। যিনি বিচার দ্বারা দৃঢ়ভাবে এই ধারণায় উপনীত হন যে, আমরা আদৌ দেহসমষ্টি নহি, কিন্তু তাহাদের সীমানার বাহিরে অবস্থিত চৈতন্যস্বরূপ এবং তাহাদিগকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছি, যিনি এইরূপ ভাবেন, তাঁহার নিকট ইহাও তেমনি সত্য যে, আমরা বাস্তবিক শুধু এইমাত্র জানি যে, "দেহই আসে এবং যায়।"

এইরূপে ক্রমাগত মানুষকে শরীর না বলিয়া আত্মা বলায়, যাঁহারা স্বামিজীর সঙ্গলাভ করিয়াছেন, তাঁহারা আর মৃত্যুকে একটা অবশ্যম্ভাবী অন্তিম অবস্থা (যাহার পর আর কিছু নাই) বলিয়া মনে

করিতে পারেন না; তাঁহারা দেখেন, উহা আত্মার অবিচ্ছিন্ন অনুভূতিরূপ শৃঙ্খলের একটা আংটা মাত্র। এইরূপে আমাদের সমগ্র দৃষ্টিকেন্দ্র বদলাইয়া গেল। এই জীবন আলোকিত কক্ষ না হইয়া বরং আমাদের নিকট মোহ ও অজ্ঞানময় কারাগার, অথবা মাঝে মাঝে ক্ষণিক চেতনাবিশিষ্ট স্বপ্নসঞ্চরণতুল্য হইয়া দাঁড়াইল। কি! বাক্যোচ্চারণ কি চিরকাল মানবীয় ভাষার দ্বারাই পরিচ্ছিন্ন ও নিয়ন্ত্রিত থাকিবে? মাঝে মাঝে কি আমরা এইসকলের পারে অবস্থিত একটা-কিছুর ক্ষণিক আভাস প্রাপ্ত হই না, এমন একটা জিনিসের, যাহা বাক্যের সাহায্য ব্যতীত আমাদিগকে বলপূর্ব্বক কার্য্য করায়, যাহা বাহ্য শিক্ষার সাহায্য না লইয়া জ্ঞানালোক প্রদান করে —যাহা অপরোক্ষ, গভীর, প্রাণে প্রাণে অনুভবস্বরূপ? জ্ঞান কি চিরকালই সসীম, এবং অস্পষ্ট, মামুলি ইন্দ্রিয়জ অনুভূতিসমূহের উপরই প্রতিষ্ঠিত থাকিবে, আর চিরকাল আচরণরূপ কঠোর ও সঙ্কীর্ণ বর্ত্মেই আত্মপ্রকাশ করিবে? স্বামিজী নিউইয়র্কে একটী বক্তৃতায় যেন প্রাণের গভীর কাতরতা হইতেই বলিয়া উঠিয়াছিলেন, "অনন্ত অপরিচ্ছিন্ন স্বপ্নদ্রষ্টা যে মানুষ, সে কিনা সান্ত, পরিচ্ছিন্ন স্বপ্ন দেখবে!" ইহা অতি সত্য কথা!

এইপ্রকার ধারণাসমূহকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখা, নিজে সর্ব্বদা মৌনী হইয়া নগ্নবেশে গঙ্গার ধারে ধারে যদৃচ্ছা ভ্রমণ করিতে আগ্রহাতিশয্য প্রকাশ করা, সমাধি-অবস্থালাভকেই একমাত্র বাঞ্ছনীয় বস্তু বলিয়া নির্দ্দেশ করা এবং জীবনের সম্বন্ধনিচয়কে আত্মার স্বাধীনতার পক্ষে বন্ধন ও বিঘ্নস্বরূপ বলিয়া নিজে জ্ঞান করা, এইসকল উপায়ে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার ভক্তগণের হস্তে, প্রকৃত সত্তা কি, তাহা

নিরূপণ করিবার যেন একটী মাপকাঠি দিয়া গিয়াছিলেন। ফলে শরীরের নাশ হইবা মাত্র যে ঐ সত্তাতেও একটা গুরু পরিবর্ত্তন আসিতে পারে, একথা তাঁহাদিগের নিকট ক্রমশঃ অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল। আমাদের এই ধারণা মজ্জাগত হইয়া গিয়াছিল যে, জীবনের আনুষঙ্গিক সুখদুঃখাদি একটা ক্ষণস্থায়ী স্বপ্নের বাহ্য অবয়ব মাত্র, এবং আমরা ইহা স্পষ্ট বোধ করিতাম যে, মৃত্যুর পূর্ব্বেও আমরা যেমন চলিতেছিলাম, তাহার পরেও অনেকটা সেইরূপই চলিতে থাকিব; শুধু এইটুকু তফাৎ হইবে যে, তখন আমরা যে সূক্ষ্ম রাজ্যের অন্তর্ভু‍ক্ত হইব, তাহার ফলে আমাদের গতির তীব্রতা আরও বৃদ্ধি হইবে। আর একথাও আমরা স্পষ্ট বুঝিতাম যে, তিনি যেমন বলিয়াছিলেন—ইহজীবনের কর্ম্মপ্রসূত 'অনন্ত' স্বর্গ বা নরক একটা কথার কথামাত্র, কেননা সান্ত কারণ কোন উপায়েই অনন্ত ফল প্রসব করিতে পারে না।

তথাপি স্বামিজী এবিষয়ে লোকের মানিয়া লইবার জন্য কোন বাঁধাধরা সিদ্ধান্ত নির্দ্দেশ করেন নাই। যাঁহারা তাঁহার নিকটে থাকিতেন, তাঁহাদিগকে তিনি নিজের দর্শনের বলে এবং দৃষ্ট সত্যটীকে ভাষায় প্রকাশ করিতে তিনি যে চেষ্টা করিতেন, তাহারই শক্তিপ্রভাবে, কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহারা যতদূর পারেন, ততদূর লইয়া যাইতেন। কিন্তু তিনি কোন অপরিবর্ত্তনীয় মতামতের ধার ধারিতেন না, এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোনরূপ পাকা কথা দেওয়ার ঘোর বিপক্ষে ছিলেন। যেমন পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, 'আমি বলিতে পারি না'—ইহাই যত দিন যাইতে লাগিল, ততই 'মৃত্যুর পর আত্মার কি গতি হয়,' এই প্রশ্নের তাঁহার একমাত্র উত্তর হইয়া দাঁড়াইল। তাঁহার মতে,

প্রত্যেককে নিজ নিজ অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিয়া নিজের বিশ্বাস গঠন করিয়া লইতে হইবে। তাঁহার মুখের কোন কথা যেন কাহারও ব্যক্তিগত বিশ্বাসের স্বাধীনভাবে পরিণতিলাভের পথে বাধা প্রদান না করে।

তবে কয়েকটী জিনিস আমরা লক্ষ্য করিয়াছিলাম। মৃত্যুর পর যে আমরা আমাদের পূর্ব্বগদিগের সহিত মিলিত হই এবং ইহজগতের নানা বিষয়ের প্রসঙ্গ করিয়া থাকি—লোকের এই সাধারণ বিশ্বাস তাঁহারও ছিল বলিয়া মনে হইত। অতি কোমলতাপূর্ণ অথচ খেয়ালী ভাষায় তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে উদ্দেশ করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিতেন, "যখন আমি বুড়োর সামনে দাঁড়াব, তখন যেন আমাকে জবাবদিহি করতে না হয়।" আমি তাঁহাকে এই ধারণার বিরুদ্ধে কোনরূপ ওজর-আপত্তি করিতে শুনি নাই। তিনি ইহাকে সাদাসিধা ভাবে, জীবনের নানা সত্যঘটনার অন্যতমরূপে গ্রহণ করিতেন।

যিনি একবার নির্ব্বিকল্প সমাধি লাভ করিয়াছেন, তিনি তথায় পৌছিবার পথে নিশ্চয়ই অনেক মানসিক অবস্থার পরিচয় লাভ করিয়া থাকিবেন, যাহা অশরীরী অবস্থারই অনুরূপ। ঐকালে তিনি নিশ্চয়ই এমন অনেক অনুভূতি লাভ করিয়া থাকিবেন, যাহা হইতে আমরা সচরাচর বঞ্চিত হইয়া থাকি। স্বামিজী বিশ্বাস করিতেন যে, মধ্যে মধ্যে তাঁহার মৃতব্যক্তিগণের আত্মার সহিত দেখাশুনা ও কথাবার্ত্তা হইয়াছে। একজন তাঁহাকে ভূতপ্রেতাদি সম্বন্ধে স্বীয় ভয় জ্ঞাপন করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, "ইহা কাল্পনিক মাত্র। যেদিন তুমি সত্যসত্যই একটা ভূত দেখবে, তখন আর তোমার কোন ভয় থাকবে না।" তাঁহার গুরুভ্রাতৃগণ গল্প করিয়া

থাকেন যে, মাদ্রাজে তাঁহার নিকট কতকগুলি আত্মঘাতীর প্রেতাত্মা আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে তাহাদের দলভুক্ত হইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিয়াছিল, এবং তাঁহার জননী পরলোক গমন করিয়াছেন, এই কথা বলিয়া তাঁহাকে বিলক্ষণ বিচলিত করিয়াছিল। অনুসন্ধান দ্বারা তাঁহার মাতা কুশলে আছেন জ্ঞাত হইয়া তিনি ঐসকল প্রেতাত্মাকে মিথ্যা ভাষণের জন্য তিরস্কার করেন। তাহারা উত্তর দিয়াছিল যে তাহারা এখন এত অশান্তি ও যন্ত্রণার মধ্যে রহিয়াছে যে, তাহারা সত্য কি মিথ্যা বলিতেছে, তাহা তাহাদের খেয়ালেই আসিতেছে না। তাহারা তাঁহাকে মুক্তির জন্য প্রার্থনা করিয়াছিল। তিনিও রাত্রিতে তাহাদের শ্রাদ্ধ করিবার জন্য সমুদ্রতীরে গমন করিলেন। কিন্তু যখন তিনি শ্রাদ্ধকর্ম্মে যেখানে পিণ্ডদানের ব্যবস্থা আছে, সেই অংশে আসিলেন, তখন তিনি পিণ্ড দিবার মত কোন সামগ্রীই নিকটে নাই দেখিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেন। তৎপরে তাঁহার একখানি প্রাচীন শাস্ত্রের বচন মনে পড়িল যে, অন্য পিণ্ডের অভাবে বালুকার পিণ্ড দেওয়া যাইতে পারিবে। তখন তিনি অঞ্জলি ভরিয়া বালুকা গ্রহণ করিয়া সমুদ্রতটে দাঁড়াইয়া মৃতব্যক্তিগণকে সর্ব্বান্তঃকরণে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে সাগরজলে ঐ পিণ্ড নিক্ষেপ করিলেন। সেইসকল প্রেতাত্মাও শান্তিলাভ করিয়াছিল। তাহারা আর কখনও তাঁহাকে বিরক্ত করে নাই।

আর একটী ঘটনা তিনি কখনও ভুলিতে পারেন নাই। উহা শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের পরসপ্তাহে তাঁহার চকিত দর্শনলাভ। রাত্রিকাল; স্বামিজী ও আর একজন কাশীপুরের বাটীর বাহিরে বসিয়া কথা কহিতেছিলেন। যে শোক তৎকালে তাঁহাদের হৃদয়কে

দুর্ব্বিষহ-ভারাক্রান্ত করিয়াছিল, তাঁহারা নিঃসন্দেহ তাহারই প্রসঙ্গ করিতেছিলেন। মাত্র কয়েক দিন হইল তাঁহাদের আচার্য্যদেব তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। সহসা স্বামিজী দেখিলেন, একটী জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি উদ্যানে প্রবেশ করিয়া তাঁহাদের দিকে আসিতেছে। কয়েক মিনিট পরে তাঁহার বন্ধু রুদ্ধকণ্ঠে তাঁহাকে কানে কানে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও কি দেখলাম? ও কি দেখলাম?" দুই ব্যক্তির একই সময়ে কোন ছায়ামূর্ত্তি দেখার দৃষ্টান্ত অতি বিরল। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে কিন্তু তাহাই ঘটিয়াছিল।

যিনি এবম্প্রকার অনুভূতিসকল লাভ করেন, তাঁহার মনের মধ্যে উহারা সহজেই কতকগুলি বিশ্বাস উৎপাদন করিয়া দিয়া থাকে। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের আগস্ট মাসে 'থাউজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ড পার্ক' হইতে লিখিত একখানি পত্রে স্বামিজী উক্ত বিশ্বাসগুলির কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি লিখিতেছেন, "যতই বয়স বাড়িতেছে, ততই স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি যে, কেন হিন্দুগণ মানুষকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রাণী বলিয়া থাকেন। পরলোকবাসিগণই একমাত্র তথাকথিত উচ্চতর শ্রেণী, কিন্তু তাহারাও অপর একটী সূক্ষ্মদেহধারী মনুষ্য ছাড়া আর কিছুই নহে, এবং তাহাও হস্তপদাদিবিশিষ্ট মানুষের দেহ। তাহারা এই পৃথিবীতেই অপর কোন আকাশে বাস করে, এবং একেবারে অদৃশ্যও নহে। তাহারাও চিন্তা করে, আমাদের মত তাহাদেরও মন ইত্যাদি সবই আছে। সুতরাং তাহারাও মানুষ। দেবগণও তাহাই। কিন্তু কেবল মানুষই ঈশ্বর হয়, অন্যান্য সকলে মানবজন্ম গ্রহণ করিয়া তবে ঈশ্বরত্ব লাভ করিতে পারে।"

যাঁহারা আমাদের আচার্য্যদেবকে আপ্তপুরুষ বলিয়া বিশ্বাস করেন,

তাঁহাদের নিকট পূর্ব্বোক্ত উক্তিসকলের একটী নিজস্ব মূল্য থাকিবে। তাঁহারা প্রাণে প্রাণে বুঝিবেন যে, যেখানে স্বামিজী শুধু একটী অনুমান বা শুধু একটী মত প্রকাশ করিতেছেন, সেখানেও উহার মূলে কোন-না-কোন অনন্যসাধারণ উপলব্ধি নিহিত আছে।

যখন তাঁহার আমেরিকায় প্রথম বারের কার্য্য প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, সেই সময় ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে আগমনের অব্যবহিত পূর্ব্বে তিনি তাঁহার ধর্ম্মোপদেশসমূহকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিবার প্রয়োজন অনুভব করিয়াছিলেন বোধ হয়। আমাদের মনে হয়, প্রথমে তাঁহার জ্ঞান ও চিন্তাসম্পদ অকাতরে দান করার পর তিনি এখন উহাদিগের বিশালতা উপলব্ধি করিয়াছিলেন, উহাদের বিশেষত্বগুলি স্পষ্টভাবে দেখিতে পাইয়াছিলেন এবং বুঝিয়াছিলেন যে, এখন উহাদিগকে কয়েকটী মুখ্য চিন্তাসূত্রে একত্র গ্রথিত ও সংহত করা চলে। একবার এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াই তিনি সম্ভবতঃ দেখিয়া থাকিবেন যে, দেহান্তে আত্মার গতি সম্বন্ধে কিছু না বলিলে বেদান্ত সর্ব্ববাদিসম্মতরূপে পরিগৃহীত হইতেই পারে না। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে তাঁহার প্রথম বার ইংলণ্ডে আগমনকালে তিনি জনৈক ইংরেজ বন্ধুকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, কোন ধর্ম্মমতকে সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ করিতে হইলে উহাতে কোন্ কোন্ বিষয়ের সমাবেশ থাকা আবশ্যক, তৎসম্বন্ধে তিনি অবহিত আছেন। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে দুইজন যুবক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করায় কর্ম্মকাণ্ডের আবশ্যকতার প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল। যুবকদ্বয় সেই সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন, "যাঁহারা দর্শনশাস্ত্রের দিক হইতে ধর্ম্মালোচনা করিয়া থাকেন এবং অলৌকিক রহস্যাদির দিকও মাড়ান না।" তিনি

লিখিয়াছিলেন, "ইহা আমার চক্ষু খুলে দিয়েছে। সাধারণ লোকের জন্য কিছু না কিছু অনুষ্ঠান অত্যন্ত দরকার। প্রকৃতপক্ষে সচরাচর ধর্ম্ম বলতে লোকে শুধু প্রতীকাদি ও কর্ম্মকাণ্ড দ্বারা স্থূলাকারপ্রাপ্ত দর্শনকেই বুঝে থাকে। কেবল শুষ্ক দর্শন মানুষের ওপর তেমন প্রভাব বিস্তার করতে পারে না।"

এইরূপে তাঁহার মধ্যে যে সংগঠনমূলক কল্পনা (যাহা শুধু ভাঙ্গে না, নূতন কিছু গড়িতে চায়) উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা সেই বন্ধুকেই লিখিত পরবর্ত্তী দুই-তিনখানি পত্রে দেখিতে পাওয়া যায়; তাহার একখানিতে জনৈক বিখ্যাত তড়িত্তত্ত্ববিদের সহিত কথোপকথনজনিত মানসিক উত্তেজনা তাঁহার তখনও রহিয়াছে—তিনি প্রাণ ও জড়ের সম্বন্ধরূপ সমগ্র সমস্যাটীকে খণ্ডন করিতেছেন, এবং তৎসঙ্গে মৃত্যুসম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্র হইতে কি শিখিতে পারা যায়, তাহারও একটী সংক্ষিপ্ত অথচ তথ্যপূর্ণ সার সঙ্কলন করিয়া দিতেছেন। পত্রখানি পড়িলে সহজেই বুঝা যায় যে, তিনি প্রাচীন ভারতীয় চিন্তা ও আধুনিক বিজ্ঞানের মধ্যে সাদৃশ্য দেখিয়া বিশেষ পুলকিত হইয়াছেন। তিনি লিখিতেছেন, "আমাদের বন্ধু বেদান্তোক্ত প্রাণ, আকাশ ও কল্পের তত্ত্বশ্রবণে মুগ্ধ হইয়াছেন; তাঁহার মতে একমাত্র এইসকল মতই আধুনিক বিজ্ঞানের গ্রাহ্য। আবার প্রাণ ও আকাশ উভয়েই সমষ্টি মহৎ বা ব্রহ্মা বা ঈশ্বর হইতে উৎপন্ন। তিনি মনে করেন যে, তিনি গণিতশাস্ত্রের দ্বারা সপ্রমাণ করিতে পারেন যে, প্রাণ ও জড়কে অব্যক্ত শক্তিতে পরিণত করা যাইতে পারে। আগামী সপ্তাহে আমি তাঁহার নিকট গিয়া ঐ নূতন গণিতের প্রমাণটী দেখিয়া আসিব, এইরূপ কথা আছে।

"তাহা হইলে বৈদান্তিক সৃষ্টিতত্ত্ব অতীব দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত হইবে। আমি এক্ষণে বেদান্তোক্ত সৃষ্টিতত্ত্ব ও জীবাত্মার গতি সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করিতেছি। আমি আধুনিক বিজ্ঞানের সহিত উহাদের সম্পূর্ণ ঐক্য স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি, এবং একটী সরলভাবে প্রতিপাদিত হইলেই অপরটীও হইয়া যাইবে। পরে প্রশ্নোত্তরাকারে একখানি গ্রন্থ লিখিবার আমার ইচ্ছা আছে। তাহার প্রথম অধ্যায় সৃষ্টিতত্ত্ববিষয়ক হইবে, এবং উহাতে বৈদান্তিক মত-সমূহ এবং আধুনিক বিজ্ঞানের মধ্যে সামঞ্জস্য প্রদর্শিত হইবে।
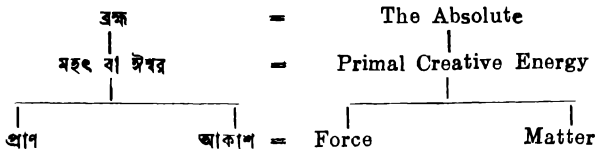
"জীবাত্মার গতি কেবল অদ্বৈতবাদ দ্বারাই ব্যাখ্যাত হইবে। অর্থাৎ দ্বৈতবাদী বলেন যে, জীবাত্মা মৃত্যুর পর যথাক্রমে সূর্য্যলোক, চন্দ্রলোক ও বিদ্যুৎলোকে গমন করেন, তথা হইতে এক অমানব পুরুষ উঁহাকে সঙ্গে করিয়া ব্রহ্মলোকে লইয়া যান। (অদ্বৈতবাদী বলেন, তথা হইতে তিনি নির্ব্বাণপদবী লাভ করেন।)

"অদ্বৈতবাদীরা বলেন যে, আত্মা আসেনও না, যানও না, এবং এই সকল লোক বা জগতের বিভিন্ন স্তর কেবল আকাশ ও প্রাণের বিভিন্ন ফলস্বরূপ। অর্থাৎ সর্ব্বনিম্ন বা সর্ব্বাপেক্ষা স্থূল লোক—সূর্য্যলোক; উহাতে প্রাণ জড়শক্তিরূপে প্রকাশ পায়, আকাশ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জড়পদার্থরূপে। ইহার পরে চন্দ্রলোক, উহা সূর্য্যলোককে বেষ্টন করিয়া আছে। এতদ্দ্বারা আদৌ চন্দ্র বুঝায়

না—দেবতাদিগের আবাস বুঝায়, অর্থাৎ ইহাতে প্রাণ মনঃশক্তিরূপে এবং আকাশ তন্মাত্রারূপে প্রকাশ পায়। তাহারও পরে বিদ্যুৎ-লোক, অর্থাৎ একটী অবস্থা, যেথানে প্রাণ আকাশ হইতে প্রায় অবিচ্ছেদ্য, আর বিদ্যুৎ প্রাণ না জড়, তাহা ঠিক করিয়া বলা কঠিন। তাহার পর ব্রহ্মলোক, যাহার প্রাণ বা আকাশ কিছুই নাই, উভয়েই মহৎ বা আদিশক্তিতে লীন হইয়া আছে। এইখানে প্রাণ, আকাশ কিছুই না থাকায় জীব সমগ্র জগৎকে সমষ্টি মহৎরূপে ভাবনা করেন। ইহা বৈরাজপুরুষরূপে প্রতিভাত হয়, তথাপি ইহা ব্রহ্ম নহে, কারণ তখনও বহুত্ব রহিয়াছে। তথা হইতে জীব সেই একত্বে পৌছেন, যাহা চরম লক্ষ্য। অদ্বৈতবাদ বলে যে, এইসকল জীবের মনে ক্রমান্বয়ে উদিত কল্পনামাত্র জীব স্বয়ং আসেন না, যানও না; এইরূপে বর্ত্তমান পরিদৃশ্যমান জগতের সৃষ্টি হইয়াছে। সৃষ্টি ও প্রলয় একই পর্য্যায়ক্রমে হইয়া থাকে, কেবল একটীতে বিকাশ, অপরটীতে সঙ্কোচ বুঝায়।

"এখন, যেহেতু প্রত্যেক ব্যক্তি কেবল তাহার নিজের জগৎটাই দেখিতে পায়, সেইহেতু সে জগৎ তাহার বন্ধনের সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্ট হইয়াছে, এবং তাহার মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া যায়—যদিও অপর যাহারা বদ্ধ রহিয়াছে, তাহাদের পক্ষে উহা বর্ত্তমান থাকে। নাম-রূপ লইয়াই জগৎ। সমুদ্রের একটী তরঙ্গ কেবল ততক্ষণই তরঙ্গ, যতক্ষণ উহা নাম-রূপের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন থাকে। তরঙ্গ সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হইলে সমুদ্র হইয়া যায়, কিন্তু তখন ঐ নামরূপ তৎক্ষণাৎ চিরদিনের মত অন্তর্হিত হইয়াছে। সুতরাং যে জল নাম-রূপের দ্বারা তরঙ্গাকারে পরিণত হইয়াছিল, তাহা ব্যতীত তরঙ্গের ঐ নাম-রূপ থাকিতেই পারে

যা, কিন্তু নাম-রূপ কিছু তরঙ্গ নয়। তরঙ্গ জলে মিলিয়া যাইলেই ঐ নাম-রূপ বিনাশপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু অন্যান্য তরঙ্গের সম্বন্ধে অপরাপর নাম-রূপ তখনও বর্ত্তমান থাকে। এই নাম-রূপই মায়া, আর ঐ জল ব্রহ্ম। তরঙ্গ সর্ব্বদা জল ছাড়া অপর কিছুই ছিল না, তথাপি যতক্ষণ উহা তরঙ্গপদবাচ্য ছিল, ততক্ষণ উহার নাম-রূপও ছিল। আবার ঐ নাম-রূপ এক মুহূর্ত্তের জন্যও তরঙ্গ হইতে পৃথক থাকিতে পারে না, যদিও জলাকারে ঐ তরঙ্গ অনন্তকাল নাম-রূপ হইতে পৃথক থাকিতে পারে। কিন্তু যেহেতু নাম-রূপকে পৃথক করা যায় না, সেইহেতু তাহারা সৎ একথা বলা যায় না। তথাপি তাহারা শূন্য নহে। ইহাই মায়া।

"আমি এইগুলিকে সাবধানে বিস্তারিত করিতে চাই, কিন্তু আমি যে ঠিক পথে চলিয়াছি, তাহা আপনি নিমেষেই বুঝিতে পারিবেন। ইহার জন্য আমাকে শারীরবিজ্ঞান আরও বেশী করিয়া পড়িয়া উচ্চতর ও নিম্নতর কেন্দ্রগুলির মধ্যে কি সম্বন্ধ তাহা জানিতে হইবে। মনস্তত্ত্বের মন, চিত্ত, বুদ্ধি ইত্যাদির কাহার কতটুকু ক্রিয়া প্রভৃতি বিষয় ঠিক করিয়া লইতে হইবে। কিন্তু আমি এখন স্পষ্ট আলোক দেখিতে পাইতেছি, তাহার মধ্যে আর হাবজা-গোবজা কিছু নাই।"

আবার এই পত্রখানিতে, অন্যান্য বহু স্থলের ন্যায়, আমরা স্বামিজীর প্রতিভার সামঞ্জস্য ও ঐক্যবিধায়িনী শক্তির পরিচয় পাই। আচার্য্য শঙ্কর যে উচ্চাদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, তাহার নড়চড় হইতে দেওয়া হইবে না। "আত্মা আসেনও না, যানও না"—এই বাক্য চিরকালের জন্য সত্য থাকিবে, এবং অপর সকল সত্যের উপর আধিপত্য করিবে। কিন্তু যাঁহারা অপর প্রান্ত হইতে কার্য্যারম্ভ

করিয়াছেন, তাঁহাদের পরিশ্রমও বৃথা যাইবে না। অদ্বৈতবাদীর দার্শনিক সূক্ষ্মদৃষ্টি এবং দ্বৈতবাদীর মনের পূর্ব্বাপর অবস্থাসমূহকে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে লক্ষ্য করিয়া যাওয়া—এই দুইটীই পরস্পরের এবং নূতন ধর্ম্মব্যাখ্যার পক্ষে আবশ্যক। *

কিন্তু মৃত্যু জিনিসটাকে বাহির হইতে দেখিলেই তবে উহাকে ঠিক চিনিতে পারা যায়। নিজ আত্মীয়বিচ্ছেদে আমরা এই চিরন্তন নিয়তির মহাসত্যগুলিকে তত স্পষ্টরূপে দেখিতে পাই না, যেমন গভীর বন্ধুত্ব ও ভালবাসাপ্রণোদিত হইয়া আমরা অপরের দুঃখে আমাদের সহানুভূতিকে অলন্তভাবে চিত্রিত করিতে গেলে দেখিতে পাই। যে সান্ত্বনার উপর আমরা নিজেদের বেলায় নির্ভর করিতে সাহসী হই না, তাহা অপরের জন্য অন্বেষণ করিতে গেলে মধ্যাহ্ন-তপনের ন্যায় স্পষ্ট, দৃঢ় বিশ্বাসরূপে প্রতিভাত হয়। স্বামিজীও যে এই নিয়মের পার ছিলেন তাহা নয়, এবং সম্ভবতঃ আমাদের মধ্যে অনেকে এ সম্বন্ধে তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উক্তি একখানি পত্রে লিপিবদ্ধ দেখিতে পাইবেন। পত্রখানি তিনি যাঁহাকে 'ধীরা মাতা' বলিতেন, সেই আমেরিকাবাসিনী মহিলাকে তাঁহার পিতৃবিয়োগ উপলক্ষ্যে লিখিত। ইহাতে আমরা তাঁহার সার বিশ্বাসটুকু আত্মীয়তা ও সহানুভূতি দ্বারা

---

* স্বামিজীর প্রশ্নোত্তরাকারে একখানি পুস্তক লিখিবার সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হইতে পারে নাই। কিন্তু তিনি ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনে যেসকল বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন, সেগুলি পাঠ করিলে সহজেই বুঝা যায় যে, তিনি এস্থলে যেসকল ভাবের পূর্ব্ব সূচনা দিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে তখনও চিন্তা করিতেছেন। 'ব্রহ্ম ও মায়া', 'বহির্জ্জগৎ' এবং তাঁহার আমেরিকায় প্রদত্ত 'মানবের যথার্থ স্বরূপ' এবং 'সৃষ্টিতত্ত্ব'—এই বক্তৃতাগুলি বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য।

সঞ্জীবিত দেখিতে পাই, এবং উহা হইতে আমাদের প্রিয়জনেরাও মৃত্যুর পর কিরূপ গতি লাভ করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধেও কতকটা আভাস প্রাপ্ত হই।

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে তিনি ব্রুকলীন হইতে এই শোকসন্তপ্ত মহিলাটীকে লিখিতেছেন, "আপনার পিতা যে জীর্ণ শরীর ত্যাগ করিবেন, তাহা আমি পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছিলাম, আর যখন কোন ভাবী অপ্রিয় মায়াতরঙ্গ কাহাকেও আঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছে, তখন তাহাকে পত্র লেখা আমার রীতি নহে। কিন্তু এইগুলিই জীবনের মহাসন্ধিক্ষণ, এবং আমি জানি আপনি বিচলিত হন নাই। সমুদ্রের উপরিভাগ পর্য্যায়ক্রমে উঠিতেছে ও নামিতেছে, কিন্তু যিনি সাক্ষিস্বরূপ, আনন্দময়ের সন্তান, তাঁহার নিকট প্রত্যেক পতন সমুদ্রের গভীরতা এবং তাহার তলদেশে যে অসংখ্য মণি-মাণিক্য-প্রবালাদি সঞ্চিত আছে, তাহাই অধিকতররূপে প্রকাশ করিয়া থাকে। আসা-যাওয়া নিরবচ্ছিন্ন ভ্রম মাত্র। আত্মা কখনও যানও না, আসেনও না। যখন সমগ্র দেশই আত্মার ভিতরে, তখন এমন স্থান কোথায়, যেখানে আত্মা যাইতে পারেন? যখন সমগ্র কালই আত্মার ভিতরে, তখন এমন সময় কখন হইবে, যখন তিনি শরীরে প্রবেশ এবং তাহা পরিত্যাগ করিতে পারেন?

"পৃথিবী পরিভ্রমণ করিতেছে, তাহাতেই ভ্রম হইতেছে যে, সূর্য্য পরিভ্রমণ করিতেছেন; কিন্তু সূর্য্য স্থির আছেন। সেইরূপ প্রকৃতি বা মায়া গতিশীল, পরিবর্ত্তনশীল—আবরণের পর আবরণ উন্মোচন করিতেছেন, এই মহাগ্রন্থের পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা উল্টাইতেছেন, আর সাক্ষিস্বরূপ আত্মা স্থির অপরিবর্ত্তিত থাকিয়া জ্ঞানামৃত পান

করিতেছেন। ভূত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ সকল আত্মাই বর্ত্তমানকালে, এবং একটী জড় উদাহরণ গ্রহণ করিলে—সকলে একই জ্যামিতিক বিন্দুতে অবস্থিত। যেহেতু আত্মার দেশবোধ নাই, সেইহেতু যাহা কিছু আমাদের ছিল, আছে এবং হইবে, সমস্তই সর্ব্বদা আমাদের সঙ্গে রহিয়াছে, সর্ব্বদা সঙ্গে ছিল এবং সর্ব্বদা সঙ্গে থাকিবে। আমরা তাহাদের ভিতরে, তাহারা আমাদের ভিতরে।

"ধর, কতকগুলি গোলাকার প্রকোষ্ঠ রহিয়াছে। যদিও প্রত্যেকে পৃথক, তথাপি সকলেই ক, খ-তে অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। এইখানে
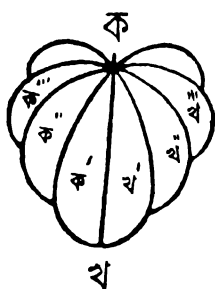
তাহারা এক। প্রত্যেকে এক একটী স্বতন্ত্র বস্তু, তথাপি সকলে ক, খ মেরু-রেখায় এক। কেহই ঐ মেরুরেখা হইতে সরিয়া যাইতে পারে না, এবং উহাদের কোনটী যতই মেরুরেখা হইতে সরিয়া যাইবার চেষ্টা করুক না কেন, তথাপি মেরুরেখায় দণ্ডায়মান হইয়া আমরা প্রকোষ্ঠগুলির যে-কোনটীতে প্রবেশ করিতে পারি। এই মেরুরেখাই ঈশ্বর। ঐখানে আমরা তাঁহার সহিত এক, সকলেই পরস্পরের মধ্যে এবং সকলেই ঈশ্বরে রহিয়াছে।

"চাঁদের উপর দিয়া মেঘ চলিয়া যায়, ভ্রম হয় যেন চাঁদ চলিয়া যাইতেছে। সেইরূপ প্রকৃতি, দেহ ও জড় পদার্থ গতিশীল, তাহাতেই ভ্রম হইতেছে যেন আত্মা গতিশীল। এইরূপে আমরা অবশেষে দেখিতে পাই যে, প্রত্যেক জাতির কি উচ্চ, কি নীচ, সকল লোকেই

যে সহজাত সংস্কার (না দৈব প্রেরণা ?)-বশে মৃতব্যক্তিগণ কখনও কখনও নিকটে আসিয়াছেন বলিয়া অনুভব করে, তাহা বিচারের দিক হইতেও সত্য।

"প্রত্যেক আত্মা এক একটী নক্ষত্র, এবং সকল নক্ষত্র ঈশ্বররূপী সেই অনন্ত নীলিমায়, সেই অনাদি অনন্ত আকাশে খচিত রহিয়াছে। ঐখানেই প্রত্যেকের এবং সকলের মূল, যথার্থ সত্তা, এবং যথার্থ ব্যক্তিত্ব। এই নক্ষত্রসমূহের মধ্যে যেগুলি আমাদের চক্রবালের বহির্ভূত হইয়া গিয়াছে, তাহাদিগকে অন্বেষণ করাতেই ধর্ম্মের সূত্রপাত, এবং তাহাদের সকলকে ঈশ্বরে এবং আমাদিগকেও সেই স্থলেই দেখিতে পাওয়া—ইহাই ধর্ম্মের শেষ। সুতরাং সমগ্র রহস্য এই যে, আপনার পিতা পরিহিত জীর্ণ বস্ত্রখানি ফেলিয়া দিয়াছেন, এবং যেখানে তিনি অনাদি অনন্ত কাল হইতে আছেন, সেইখানেই দণ্ডায়মান আছেন। এই জগতে বা অপর কোন জগতে তিনি ঐরূপ আর একখানি বস্ত্র প্রকট করিবেন কিনা? আমার আন্তরিক প্রার্থনা, তিনি যেন না করেন, যতদিন না তিনি উহা পূর্ণজ্ঞানের সহিত করেন। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, যেন কেহ নিজ কৃতকর্ম্মের অলক্ষ্য শক্তিদ্বারা কোথাও বলপূর্ব্বক নীত না হয়। প্রার্থনা করি, যেন সকলেই মুক্ত হয়, অর্থাৎ জানিতে পারে যে, তাহারা মুক্তই আছে। আর যদি তাহাদিগকে পুনরায় স্বপ্ন দেখিতে হয়, তবে আসুন আমরা সকলে প্রার্থনা করি, যেন তাহাদের স্বপ্ন শান্তি ও আনন্দেরই স্বপ্ন হয়।"

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

সমাধি

যে ব্যক্তি একখানি সরু তক্তার উপর দিয়া কোন গভীর গহ্বর পার হয়, তাহার প্রতি মুহূর্ত্তে হঠাৎ সমস্ত অভ্যস্ত সংস্কার ও অনুভূতির কথা মনে উদিত হইয়া সেই অত্যুচ্চ স্থান হইতে পড়িয়া যাইবার আশঙ্কা থাকে। আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতার বাহিরে অবস্থিত মনোরাজ্যে মানবের মধ্যে মধ্যে প্রবেশলাভ সম্বন্ধে আমরা শাস্ত্রে যে-সকল গল্প লিপিবদ্ধ দেখিতে পাই, তাহারাও অনেকটা এই রকমের। সাগরের উপর দিয়া হাঁটিয়া যাইতে যাইতে যেমন পিটারের মনে পড়িল তিনি কোথায়, অমনি তিনি ডুবিতে আরম্ভ করিলেন। পর্ব্বতসানুতে নিদ্রিত কতিপয় ক্লান্ত নর জাগরিত হইয়া দেখিলেন যে, তাহাদের আচার্য্যদেব এক সম্পূর্ণ নূতন আকৃতিতে সম্মুখে বিদ্যমান। কিন্তু আবার তাঁহারা মর জগতে নামিয়া আসিলেন; তখন সেই অপূর্ব্ব দর্শন কোথায় চলিয়া গিয়া স্মৃতিমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে। রাত্রিতে ক্ষেতের উপর বসিয়া মেষপালকে পাহারা দিতে দিতে এবং চুপে চুপে উচ্চ উচ্চ ধর্ম্মপ্রসঙ্গ করিতে করিতে মেষপালকগণ দেবদূতগণের আবির্ভাব দেখিতে পাইল। সেই মুহূর্ত্ত কয়টী চলিয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে সেই স্থান এবং কালে তাহাদের মনের যে উচ্চাবস্থা আসিয়াছিল, তাহাও

চলিয়া গেল। আর একি! সে দেবদূতগণও যে সব আকাশ হইতে অন্তর্হিত হইয়াছেন! তাঁহাদের শ্রোতৃগণ নিকটবর্ত্তী গ্রামে কি অসাধারণ ব্যাপার ঘটিয়াছে দেখিবার জন্য সাধারণ লোকদিগেরই ন্যায় পদব্রজে যাইতে বাধ্য হইল।

ভারতীয় আদর্শ এসকলের ঠিক বিপরীত। ভারতের আদর্শ পুরুষ তিনিই, যিনি মনের প্রবৃত্তিসমূহকে এমন উত্তমরূপে জয় করিয়াছেন যে, তিনি যে-কোন মুহূর্ত্তে চিন্তাসমুদ্রে ডুব দিতে পারেন এবং তথায় ইচ্ছামত থাকিতে পারেন; যিনি অমোঘ ভাবস্রোতে হুহু করিয়া ভাসিয়া যাইতে পারেন—সহসা ঐ ভাব ভঙ্গ হইয়া অকস্মাৎ তিনি যে পুনরায় ইন্দ্রিয়ের রাজ্যে নামিয়া আসিবেন, তাহার অনুমাত্র সম্ভাবনা থাকে না। অবশ্য শিক্ষার গভীরতা ও অনুভূতির প্রগাঢ়তা দ্বারা এই শক্তিলাভের সহায়তা হয়। কিন্তু উহা সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিবার একমাত্র সদুপায় কঠোর আত্মনিয়মন—এরূপ কঠোর যে, সাধক যেন ইচ্ছামাত্র চিন্তারও বাহিরে যাইতে পারেন। যিনি নিজ মনকে এরূপ একাগ্র করিতে পারেন যে, যখন ইচ্ছা উহাকে একেবারে নিরোধ পর্য্যন্ত করিতে পারেন, তাঁহার নিকট মন আজ্ঞাবাহী ভৃত্যের ন্যায় বা দ্রুতগামী অশ্বের ন্যায় হইয়া যায় এবং শরীরও মনের অনুগত প্রজা হইয়া দাঁড়ায়। এরূপ ক্ষমতা না পাওয়া পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ অবিচলিত আত্মসংযম আসে না। এক পুরুষের মধ্যে কয়টা লোক জন্মগ্রহণ করে, যাহারা এরূপ উচ্চাধিকারী হইতে পারে! এরূপ মহাপুরুষগণের কার্য্যে ও কথায় এমন একটা জ্যোতি, এমন একটা দৃঢ় প্রত্যয় থাকে, যাহা বুঝিতে ভুল হয় না।

বাইবেলের ভাষায়, "তাঁহারা এমনভাবে কথা কন, যেন তাঁহাদের 'চাপরাস' আছে, যেন তাঁহারা পুঁথিপড়া পণ্ডিতমাত্র নহেন।"

একথা নিঃসন্দেহ যে, শ্রীরামকৃষ্ণ বালক নরেন্দ্রকে প্রথম দর্শনেই 'আজন্ম ব্রহ্মজ্ঞানী' বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন, এবং দক্ষ ইঞ্জিনিয়ার যেমন কোন প্রবাহের বেগনিরূপণকালে করে, তিনিও তেমনি বালকের ইতিপূর্ব্বেই কতদূর মানসিক উচ্চাবস্থা লাভ হইয়াছে, তাহা ধরিতে পারিয়াছিলেন। তিনি আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁগা, তুমি কি ঘুমাবার আগে একটা জ্যোতি দেখতে পাও?" বালক সবিস্ময়ে উত্তর দিলেন, "কেন, সকলেই কি দেখে না?" উত্তরকালে তিনি প্রায়ই এই প্রশ্নটীর উল্লেখ করিতেন এবং প্রসঙ্গক্রমে তিনি কিরূপ জ্যোতি দেখিতেন, তাহাই বর্ণনা করিতেন। কখনও কখনও উহা একটী গোলকের মত হইত, এবং একটী বালক উহাকে পা দিয়া খেলিতে খেলিতে তাঁহার দিকে লইয়া আসিত। ক্রমে উহা নিকটবর্ত্তী হইত। তিনি উহার সহিত এক হইয়া যাইতেন, এবং সমস্ত জগৎ বিস্মৃত হইতেন। কখনও কখনও উহা এক অগ্নিপুঞ্জের মত হইত, এবং তিনি উহাতে প্রবেশ করিতেন। আমরা অবাক হইয়া ভাবি, যে নিদ্রার প্রারম্ভই এইরূপ, তাহা কি আমরা সচরাচর নিদ্রা বলিতে যাহা বুঝি তাহাই? সে যাহাই হউক, যাঁহারা স্বামী বিবেকানন্দের সমবয়স্ক বালক ছিলেন, তাঁহারা বলেন যে তিনি নিদ্রিত হইলে তাঁহাদের গুরুদেব তাঁহার শ্বাস-প্রশ্বাস লক্ষ্য করিয়া অপর সকলকে বলিতেন যে, স্বামিজী শুধু নিদ্রা যাইতেছেন বলিয়া মনে হইতেছে মাত্র, এবং তিনি এখন ধ্যানের কোন্ অবস্থায় পৌঁছিয়াছেন, তাহা

তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ যখন কাশীপুর উদ্যানে পীড়িত হইয়া অবস্থান করিতেছেন, সেই সময় একদিন স্বামিজী ঐরূপে যেন কয়েক ঘণ্টাকাল নিদ্রাই যাইতেছিলেন। নিকটে যিনি ছিলেন, তাঁহার ঐরূপই মনে হইয়াছিল। প্রায় মধ্যরাত্রে তিনি সহসা চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "আমার দেহ কোথায় গেল ?" তাঁহার সঙ্গী—পরে যিনি গোপাল দাদা নামে পরিচিত হইয়াছিলেন —নিকটে দৌড়িয়া গিয়া জোরে জোরে হাত বুলাইয়া দিয়া, মস্তকের নিম্ন হইতে সমস্ত শরীরের যে অনুভূতি লুপ্ত হইয়াছিল, তাহা পুনরানয়ন করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। যখন কিছুতেই কিছু হইল না এবং বালক বিশেষ কষ্ট ও ভয় পাইতে লাগিলেন, তখন গোপাল দাদা শ্রীরামকৃষ্ণের নিকটেই দৌড়িয়া গেলেন এবং তাঁহাকে তাঁহার শিষ্যের অবস্থা জ্ঞাত করাইলেন। তিনি শুনিয়া একটু হাসিলেন এবং বলিলেন, "থাক্ ঐরকম! কিছুক্ষণ ঐ অবস্থায় থাকলে তার কোন ক্ষতি হবে না। ঐ অবস্থা পাবার জন্য সে আমাকে অনেক জ্বালাতন করেছে।" পরে তিনি গোপাল দাদা ও অপর সকলকে বলিলেন যে, নরেন্দ্রের নির্ব্বিকল্প সমাধিলাভ হইয়া গিয়াছে; এখন তাহাকে কার্য্য লইয়া থাকিতে হইবে। স্বামিজী নিজে পরে এই অবস্থা সম্বন্ধে তাঁহার গুরুভ্রাতা স্বামী সারদানন্দের নিকট এইরূপে বর্ণনা করিয়াছিলেন: "মাথার ভেতরে যেন একটা আলো দেখতে পাচ্ছিলাম। সেটা এত উজ্জ্বল যে আমি ধরেই নিয়েছিলুম যে আমার মাথার পেছনে কেউ একটা উজ্জ্বল আলো রেখে গিয়ে থাকবে।" তৎপরে যে তাঁহার ইন্দ্রিয়ানুভূতির বন্ধনসকল ছিন্ন হওয়ায় তিনি 'যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে

অপ্রাপ্য মনসা সহ', সেই রাজ্যে উধাও হইয়া চলিয়া গিয়াছিলেন, একথা আমরা সহজেই অনুমান করিতে পারি।

ইহা সহজেই বুঝা যায় যে, মনকে একাগ্র করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে আমাদের দেহটাকে ভুলিতে পারা চাই। এইজন্যই লোকে তপস্যা ও কঠোরতা অভ্যাস করিয়া থাকে। কিছুকাল কঠোর তপস্যায় কাটাইতে হইবে, এই চিন্তা আজীবন স্বামিজীর আনন্দদায়ক ছিল। তিনি নির্ভীকভাবে বিজয়ীর ন্যায় সংসারের মধ্যে বিচরণ করিয়া বেড়াইলেও, প্রায়ই এই তপস্যার কথা উত্থাপন করিতেন। সুদক্ষ সওয়ার যেমন ঘোড়ার লাগাম ধরিয়া দেখে, অথবা প্রসিদ্ধ সঙ্গীতবিশারদ যেমন বাদ্যযন্ত্রের পর্দ্দার উপর দিয়া অঙ্গুলি সঞ্চালন করিয়া দেখে, তিনিও সেইরূপ শরীরটা ইচ্ছাশক্তির সম্পূর্ণ বশে চলে কিনা, পুনরায় দেখিতে ভালবাসিতেন—এখনও তাঁহার যন্ত্রের উপর পূর্ব্ববৎ দখল আছে কিনা, নূতন করিয়া দেখিতে প্রীতি অনুভব করিতেন। তাঁহার জীবনের শেষ দশায় তিনি কলিকাতার গরমের মধ্যেও ঐ কয় মাস জল পান করিব না, এইরূপ স্বীকৃত হইয়াছিলেন; তবে মুখ ধুইবার কোন নিষেধ ছিল না। সেই সময়ে তিনি দেখিয়াছিলেন যে, তাঁহার গলদেশের পেশীসমূহ একবিন্দু জল প্রবেশ করিতে গেলেও আপনা হইতে বন্ধ হইয়া যাইত, সুতরাং তিনি ইচ্ছা করিলেও জল পান করিতে পারিতেন না। যেদিন তিনি কোন ব্রত উপলক্ষ্যে উপবাসী আছেন, সেইদিন তাঁহার নিকটে থাকিলে অপরেরও খাদ্যসামগ্রী অনাবশ্যক মনে হইত এবং চেষ্টা করিয়াও তদ্বিষয়ে রুচি হইত না। আমি একটী ঘটনার কথা শুনিয়াছি—তিনি সেদিন বসিয়া ছিলেন, এবং তাঁহার চারি পার্শ্বে

কতকগুলি লোক তর্ক-বিবাদ করিতেছিল; সেইসকল তিনি শুনিতেছিলেন না বলিয়াই মনে হইতেছিল। হঠাৎ তাঁহার হস্তস্থিত একটা শূন্য কাঁচের গেলাস ভূমিতে নিক্ষিপ্ত হইয়া চূর্ণ হইয়া গেল— ঐ তর্কে তাঁহার যে কষ্টবোধ হইতেছিল তাহার ঐটুকুমাত্র নিদর্শন তিনি দিয়াছিলেন! কত কঠোর সাধনা দ্বারা এইরূপ আত্মসংযম-শক্তি পুষ্ট হইয়াছে, তাহা হৃদয়ঙ্গম করা সহজ নহে। হয়ত কত ঘণ্টাই পূজাধ্যানাদিতে অতিবাহিত হইয়াছে, কতক্ষণ ধরিয়া একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকিতে হইয়াছে এবং দীর্ঘকাল আহারনিদ্রা পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে। শেষোক্ত বিষয়টী সম্বন্ধে এক সময়ে স্বামিজী পঁচিশ দিন প্রত্যহ অর্দ্ধ ঘণ্টা মাত্র নিদ্রায় অতিবাহিত করিয়াছিলেন। আবার এই অর্দ্ধ ঘণ্টার নিদ্রা হইতেও তিনি নিজেই জাগরিত হইতেন। সম্ভবতঃ অতঃপর আর কখনও নিদ্রা তাঁহাকে পীড়াপীড়ি করিতে বা বহুক্ষণ আটকাইয়া রাখিতে পারে নাই। তাঁহার 'যোগীর চক্ষু' ছিল। একথা বাল্যে যখন তিনি গঙ্গাবক্ষে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বজরায় উঠিয়া তাঁহাকে "মশায়, আপনি কি ঈশ্বরকে দেখেছেন?" —এই প্রশ্ন করেন, তখন তিনি তাঁহাকে বলিয়াছিলেন। 'যোগীর চক্ষু' সম্পূর্ণরূপে মুদ্রিত হয় না এবং সূর্যোদয় হইবামাত্র একেবারে উন্মীলিত হইয়া যায়, ইহাই প্রবাদ। পাশ্চাত্ত্য দেশে যাঁহারা তাঁহার সহিত এক গৃহে বাস করিতেন, তাঁহারা শুনিতে পাইতেন যে, তিনি রাত্রিশেষে স্নান করিতে যাইবার সময় 'পরব্রহ্ম' কি ঐরূপ কোন নাম সুর করিয়া আবৃত্তি করিতেছেন। তাঁহাকে কঠোরতা অভ্যাস করিতে কখনও দেখা যাইত না, কিন্তু তাঁহার সমগ্র জীবন এমন প্রগাঢ়-একাগ্রতাময়

ছিল যে, অপর কাহারও পক্ষে উহা অতি ভীষণ তপস্যা হইত। আমেরিকার ন্যায় রেলরাস্তা, ট্রামওয়ে এবং জটিল নিমন্ত্রণতালিকার দেশে তাঁহাকে প্রথম প্রথম কি কষ্টে ধ্যানের বেগ সামলাইতে হইত, তাহা তাঁহার আমেরিকাবাসী বন্ধুগণ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। জনৈক ভারতবাসী, যিনি তাঁহাকে গৃহে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছিলেন, বলিয়াছিলেন, "তিনি ধ্যান করতে বসলে দশ মিনিট যেতে না যেতেই বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে পড়তেন, যদিও তাঁর শরীর মশায় ছেয়ে যেত।" এই অভ্যাসটী তাঁহাকে দমন করিতে হইয়াছিল। প্রথম প্রথম, লোকে হয়ত রাস্তার অপর সীমায় তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে, তিনি এদিকে গভীর চিন্তায় বাহ্যহারা হইয়া গিয়াছেন; ইহাতে তিনি বড়ই লজ্জিত হইতেন। একবার নিউইয়র্কে তিনি একটী ক্লাসে ধ্যান শিক্ষা দিতেছেন, শেষে দেখা গেল যে কিছুতে তাঁহার আর বাহ্য সংজ্ঞা আসে না; তখন তাঁহার ছাত্রগণ একে একে নিঃশব্দে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। কিন্তু যখন তিনি এই ব্যাপারটী শুনিলেন, তখন তিনি অতীব মর্ম্মাহত হইলেন এবং আর কখনও ক্লাসে ধ্যান শিখাইতে সাহস করেন নাই। নিজের ঘরে দুই-এক জনকে সঙ্গে লইয়া ধ্যান করিবার সময় তিনি কোন একটী কথা বলিয়া দিতেন, যাহা পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিলে তাঁহাব বাহ্যচৈতন্য ফিরিয়া আসিত।

কিন্তু ধ্যানকালের কথা একেবারে ছাড়িয়া দিলেও, তিনি সকল সময়ে প্রায়ই চিন্তায় তন্ময় হইয়া যাইতেন। দশজনে মিলিয়া গল্পগুজব, হাস্যপরিহাস চলিতেছে, এমন সময়ে দেখা গেল, তাঁহার নয়নদ্বয় স্থির হইয়া গিয়াছে। শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রমেই ধীরে

ধীরে হইতেছে, ক্রমে একেবারে স্থির। তৎপরে ধীরে ধীরে আবার পূর্ব্বাবস্থাপ্রাপ্তি। তাঁহার বন্ধুগণ এসকল জানিতেন এবং সেইমত ব্যবস্থা করিতেন। যদি তিনি দেখাশুনা করিবার জন্য কাহারও বাটীতে প্রবেশ করিয়া কথা কহিতে ভুলিয়া যাইতেন, অথবা যদি কেহ তাঁহাকে কোন ঘরে চুপচাপ বসিয়া থাকিতে দেখিতে পাইত, তাহা হইলে কেহ তাঁহাকে বিরক্ত করিত না, যদিও তিনি কখনও কখনও উঠিয়া মৌনভঙ্গ না করিয়াই আগন্তুককে সাহায্য করিতেন। এইরূপে তাঁহার মন ভিতরের দিকেই পড়িয়া থাকিত, বাহিরের বস্তু অন্বেষণ করিত না। তাঁহার চিন্তা কত উচ্চে আরোহণ করিয়াছে বা কতদূর ব্যাপ্ত হইয়া আছে, তৎসম্বন্ধে তাঁহার কথাবার্ত্তাই আমাদের একমাত্র ইঙ্গিত ছিল। তিনি সর্ব্বদা নির্গুণ তত্ত্ব সম্বন্ধেই প্রসঙ্গ করিতেন। লোকে যাহাকে ধর্ম্মপ্রসঙ্গ বলে, উহা সকল সময়ে ঠিক সেরূপ হইত না—তাঁহার গুরুদেবের সম্বন্ধেও ঐ কথা খাটে। উহা অনেক সময়েই ঐহিক বিষয়ের কথা হইত। কিন্তু উহার পরিধি সকল সময়েই অতি বিস্তৃত থাকিত। উহাতে কোন কিছু এতটুকু নীচ বা সঙ্কীর্ণ বা ক্ষুদ্র থাকিত না। উহার কোথাও সহানুভূতির সঙ্কোচ হইত না। তাঁহার বিরুদ্ধ সমালোচনা পর্য্যন্ত শুধু সংজ্ঞানির্দ্দেশ ও বিশ্লেষণ বলিয়াই লোকের মনে হইত। উহাতে বিদ্বেষ বা ক্রোধ থাকিত না। তিনি একদিন নিজের সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, "আমি একজন অবতারের পর্য্যন্ত বিরুদ্ধ সমালোচনা করতে পারি, অথচ এতে তাঁর প্রতি আমার ভালবাসা একটুকু কমে যাবে না। কিন্তু আমি বেশ জানি যে, অনেক লোকই এরকম

পারবে না; তাদের পক্ষে নিজ নিজ ভক্তিটুকু বাঁচিয়ে রাখাই সবচেয়ে নিরাপদ।" তাঁহার বিশ্লেষণ-শ্রবণে শ্রোতার মনেও আলোচ্য বিষয়ের প্রতি কোন বিরাগ বা ঘৃণার ভাব থাকিয়া যাইত না। জগতের প্রতি এই উদার ও মধুর দৃষ্টি তাঁহার গুরুভক্তির উপর দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত ছিল। তিনি একবার বলিয়াছিলেন, "আমার ভক্তি কুকুরের প্রভুভক্তির মত। আমি কারণ খুঁজি না, আমি শুধু পদানুসরণ করেই সন্তুষ্ট!" আবার শ্রীরামকৃষ্ণেরও নিজ গুরু তোতাপুরীর প্রতি এইরূপ ভাব ছিল। এই আচার্য্য-শ্রেষ্ঠ একদিন অম্বালার নিকটবর্ত্তী কৈথাল নামক স্থানে নিজ শিষ্যগণকে এই বলিয়া চলিয়া আসিলেন, "আমায় বাংলাদেশে যেতে হবে। আমি প্রাণে প্রাণে অনুভব করছি যে, সেখানে একজন মুমুক্ষুর আমার সাহায্যের দরকার।" দক্ষিণেশ্বরে তাঁহার কার্য্য শেষ হইলে তিনি আবার নিজ শিষ্যদিগের নিকট ফিরিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার সমাধিস্থান আজ পর্য্যন্ত লোকের শ্রদ্ধা-ভক্তি আকর্ষণ করিতেছে। কিন্তু যাঁহাকে তিনি দীক্ষিত করিলেন, তিনি তদবধি তাঁহার প্রতি এত ভক্তিসম্পন্ন হইলেন যে, তাঁহার নাম পর্য্যন্ত উচ্চারণ করিতেন না। "ন্যাংটা আমাকে একথা বলত"—এইরূপেই তিনি তৎসম্বন্ধে উল্লেখ করিতেন। জগতের প্রতি পূর্ণ প্রেম এবং মানবের উপর পূর্ণ বিশ্বাস কেবল সেই হৃদয়বান ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভবপর, যিনি নিজ আদর্শ একবার কাহারও চরিত্রে সম্যকরূপে প্রতিফলিত দেখিয়াছেন।

কিন্তু দেহবোধের পারে যাইবার শক্তিই আমাদের আচার্য্যদেবের ন্যায় চরিত্রবিকাশের একমাত্র কারণ নহে। হিন্দুগণ বিশ্বাস

করেন যে, চরমশক্তি বিকাশ করিতে হইলে প্রথমে প্রগাঢ় অনুভব-শক্তি জাগাইয়া তুলিতে হইবে, এবং তৎপরে উহাকে সম্পূর্ণরূপে সংযম করিতে হইবে। এই ব্যাপারটী এমন এক অনুভূতির রাজ্যের ইঙ্গিত করে, যাহা আমাদের অধিকাংশেরই কল্পনাতীত; তথাপি স্বামিজীর শিষ্যজীবনের একটী ঘটনা হইতে আমরা ইহার কথঞ্চিৎ আভাস প্রাপ্ত হই। তাঁহার বয়স তখনও খুব অল্প, এমন সময়ে সহসা একজনের মৃত্যু তাঁহার পরিবারের মধ্যে দারুণ অবস্থা-বিপর্য্যয় আনয়ন করিল। তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্র বলিয়া দিন দিন তাঁহাদের জন্য চিন্তায় অধীর হইয়া পড়িতে লাগিলেন। প্রিয়জনদিগের কষ্টে তাঁহার হৃদয়ের তন্ত্রীসকল যেন ছিন্ন হইয়া যাইতে লাগিল, এবং স্বচ্ছন্দতা ও সম্পদের অবস্থা হইতে সহসা এক বিপরীত অবস্থায় আসিয়া পড়ায় তিনি কতকটা হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন। তাঁহাদের বিপদ কত গুরুতর, তাহা দেখিয়া তিনি যেন বিশ্বাসই করিতে পারিলেন না।

অবশেষে মর্ম্মবেদনা আর সহ্য করিতে না পারিয়া তিনি তাঁহার গুরুদেবের নিকট ছুটিয়া গেলেন, এবং তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিতে লাগিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ধীরভাবে সমস্ত শ্রবণ করিয়া সস্নেহে ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "যাও বাবা, ওখানে যাও, গিয়ে মা-কালীর কাছে প্রার্থনা কর। তুমি যা চাইবে, মা তোমাকে নিশ্চিত তাই দেবেন।"

অত্যন্ত সাধারণভাবে দেখিলেও এই অঙ্গীকারের মধ্যে কিছুই অসঙ্গত বা অস্বাভাবিক ছিল না; কারণ, শ্রীরামকৃষ্ণের অনেক ধনী মারোয়াড়ী ভক্ত ছিলেন, যাঁহারা তাঁহার বাক্য রক্ষা করিবার জন্য

সর্ব্বস্ব অর্পণ করিতে পারিতেন। বালক গুরুদেবের উপদেশের শান্ত ও দৃঢ়তাব্যঞ্জক ভাবে কতকটা আশ্বস্ত হইয়া তথা হইতে মন্দিরে প্রার্থনা করিবার জন্য চলিয়া গেলেন। কিয়ৎক্ষণ অতীত হইলে তিনি প্রত্যাগত হইলেন, এবং তখন যাঁহারা তথায় উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা বলেন যে, সে সময় তাঁহার আকৃতি বিস্ময়-বিহ্বল ছিল এবং বাক্য নিঃসরণ করিতে যেন তাঁহার কষ্ট হইতেছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রার্থনা করেছিলে কি?" শিষ্য উত্তর দিলেন, "হাঁ, করেছি।"

গুরুদেব আবার বলিলেন, "মার কাছে কি চেয়েছিলে?"

নরেন্দ্র উত্তর দিলেন, "পরা ভক্তি ও জ্ঞান।"

শ্রীরামকৃষ্ণ কিছু না বলিয়া সংক্ষেপে শুধু বলিলেন, "আবার যাও।"

কিন্তু কোন পরিবর্ত্তন হইল না। তিনবার তিনি ইচ্ছামত বর প্রার্থনা করিবার জন্য প্রেরিত হইলেন, তিনবারই তিনি ফিরিয়া আসিয়া ঐ একই কথা বলিলেন। মায়ের সামনে উপস্থিত হইয়াই তিনি আর সব ভুলিয়া গেলেন, এবং কি প্রয়োজনে তথায় আসিয়াছেন, তাহা পর্য্যন্ত তাঁহার মনে পড়িল না। আমাদের মধ্যে কেহ কখনও কি সেই উচ্চ অবস্থায় পৌছিয়াছেন, যখন ভালবাসার পাত্রদিগের কল্যাণকল্পে তন্ময়ভাবে প্রার্থনা করিতে করিতে আমাদের আত্মবিস্মৃতি আসিয়া উপস্থিত হয়? তাহা হইলে সাধারণ, ভেদবৈচিত্র্যময় আপেক্ষিক জগৎ হইতে এই অনুভূতির কতগুণ অধিক পার্থক্য, তাহা হয়ত আমরা কথঞ্চিৎ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছি।

স্বামিজীর চিন্তা কথা কহিতে কহিতেই দেশকালের সীমা অতিক্রম করিত। চিন্তাটা কি অন্তরাত্মা বা আদি শক্তির বিকাশের নানা রূপের অন্যতম রূপ মাত্র? উহাতে যে শক্তি ব্যয়িত হয়, তাহা কি যিনি চিন্তা করেন, তাঁহার কল্যাণের দিক হইতে দেখিলে বৃথা নষ্ট হইল বলিয়া ধরিতে হইবে? প্রথমে কতকগুলি ঘটনার পরিধি, তৎপরে কতকগুলি চিন্তার পরিধি এবং সর্ব্বশেষে সেই পরব্রহ্ম! যদি তাহা হয়, তাহা হইলে মহাপুরুষগণের নিজ নিজ চিন্তারত্নরাশি অপরের সহিত একত্র সম্ভোগ করার ন্যায় নিঃস্বার্থ কার্য্য আর কিছুই নাই। তাঁহাদের কল্পনারাজ্যে প্রবেশলাভ করাই মোক্ষদ্বার উন্মুক্ত করা; কারণ তৎকালে শিষ্যের মনে প্রত্যক্ষভাবে একটী বীজ উপ্ত হয়, যাহা মনোজগতে আত্মসাক্ষাৎকারে পরিণত না হইয়া কিছুতেই বিনষ্ট হয় না।

আমাদের আচার্য্যদেবের চিন্তা কতকগুলি আদর্শেরই সমষ্টিস্বরূপ ছিল, কিন্তু ঐসকল আদর্শকে তিনি এমন জীবন্ত, জ্বলন্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন যে, কেহ তাহাদিগকে বস্তুতন্ত্রতাহীন বলিয়া মনে করিতে পারিত না। ব্যক্তি ও জাতি উভয়কেই তিনি তাহাদের আদর্শসমূহের দিক হইতে, তাহাদের নৈতিক উন্নতির দিক হইতে দেখিতেন। আমাব অনেক সময় মনে হইয়াছে যে, চিন্তাশীল ব্যক্তিগণকে দুই বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভাগ করা যাইতে পারে—এক দলের স্বভাব সব জিনিসকে দুই ভাগে ভাগ করা, অপর দলের তিন ভাগে। স্বামিজী তিন ভাগে ভাগ করিতেই ভালবাসিতেন। কোন গুণের দুইটী বিপরীত সীমা (যেমন শীত-উষ্ণ, ভাল-মন্দ) ত তিনি স্বীকার করিতেনই, অধিকন্তু তিনি সর্ব্বদা উহাদের মধ্যে

একটী সন্ধিস্থল দেখিতে পাইতেন, যেখানে উভয় দিকই সমান হওয়ায় কোন গুণই নাই, এইরূপ বলা যাইতে পারে। ইহা কি প্রতিভারই একটী সর্ব্বজনীন লক্ষণ, না ইহা শুধু হিন্দু মনেরই একটী বিশেষত্ব?

কোন্ বস্তুতে তিনি কি দেখিতে পাইবেন, কোন্ জিনিস তাঁহার হৃদয়গ্রাহী হইবে, একথা কেহই বলিতে পারিত না। অনেক সময়ে কথা অপেক্ষা চিন্তার উত্তর তিনি সহজে ও উত্তমরূপে দিতে পারিতেন। তাঁহার কি অদ্ভুত ভাব-তন্ময়তা লাগিয়াই থাকিত, তাহা এখানে সেখানে এক-আধটু আভাস-ইঙ্গিত হইতে ধীরে ধীরে বুঝিতে পারা যাইত—সকল কথা ও চিন্তা তাহারই সহচরী মাত্র ছিল। কাশ্মীরে গ্রীষ্মের কয়মাস অতিবাহিত করিবার পর তবে তিনি আমাদিগকে বলিলেন যে, তিনি সর্ব্বদা জগন্মাতার মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতেছেন। মা যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া আমাদের মধ্যে চলিতেছেন, ফিরিতেছেন। আবার তাঁহার জীবনের শেষ শীত ঋতুতে তিনি তাঁহার শিষ্য স্বামী স্বরূপানন্দকে বলিয়াছিলেন যে, কয়েক মাস ধরিয়া তিনি দেখিতেছেন যেন দুইখানি হাত তাঁহার হস্তদ্বয়কে ধারণ করিয়া আছে। তীর্থযাত্রাকালে কেহ কেহ দেখিত তিনি একান্তে মালা জপ করিতেছেন। গাড়ীতে তাঁহার দিকে পিছন ফিরিয়া বসিয়া থাকিতে থাকিতে কেহ কেহ শুনিতে পাইতেন, তিনি কোন একটী মন্ত্র বা স্তোত্র বারবার আবৃত্তি করিতেছেন। তাঁহার প্রত্যূষে উঠিয়া স্তোত্রাদি আবৃত্তি করার কি অর্থ, তাহা আমরা একদিন জনৈক কর্ম্মীকে সংসারসমরাঙ্গণে প্রেরণকালে তিনি যাহা বলিলেন, তাহা হইতে বুঝিতে পারিলাম—

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস প্রত্যহ প্রত্যূষে অন্য কোন কাজ করবার আগে নিজের ঘরে দু ঘণ্টা ধরে 'সচ্চিদানন্দ', 'শিবোঽহম্' প্রভৃতি মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে পায়চারি করে বেড়াতেন।" সকলের সমক্ষে কথিত এই ইঙ্গিতটুকু ব্যতীত আমরা আর কিছু শুনিতে পাই নাই।

সুতরাং অবিরাম ভক্তি দ্বারাই তিনি তাঁহার অবিচ্ছিন্ন একাগ্রতা বজায় রাখিতেন। তিনি সর্ব্বদাই মাঝে মাঝে যে সকল অতীন্দ্রিয় তত্ত্বের আভাস দিতেন, ধ্যানই তাহাদের মূল কারণ। তিনি কথোপকথনে যোগদান করিতেন, যেন একজন লোক এক গভীর কূপে পাত্র ডুবাইয়া তথা হইতে স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছ শীতল বারি আনিয়া দিল। তাঁহার চিন্তাসমূহের সৌন্দর্য্য বা প্রগাঢ়তাও যেমন, তাহাদের উৎকৃষ্টতাও তেমনি ইহাই প্রকাশ করিত যে, ঐসকল চিন্তা আধ্যাত্মিক উপলব্ধিরূপ পর্ব্বতের চিরতুষারাবৃত শিখরদেশ হইতে আসিয়াছে।

তিনি তাঁহার বক্তৃতাকালীন অনুভূতিসমূহের যে-সকল গল্প করিতেন, তাহা হইতে এই একাগ্রতার কতকটা আভাস পাওয়া যাইত। তিনি বলিতেন, রাত্রে তাঁহার নিজের ঘরে কে যেন উচ্চৈঃস্বরে, পরদিন প্রাতঃকালে তিনি যে-সকল কথা বলিবেন, তাহাই তাঁহাকে বলিয়া দিতেছে, এবং পরদিন তিনি দেখিতেন যে, বক্তৃতামঞ্চে উঠিয়া তিনি সেই কথাগুলিই আবৃত্তি করিয়া যাইতেছেন। কখনও কখনও তিনি শুনিতেন, যেন দুইজন লোক পরস্পরের মধ্যে তর্কবিতর্ক করিতেছে। আবার কখনও ঐ কণ্ঠস্বর যেন বহুদূর হইতে আসিতেছে বলিয়া বোধ হইত—যেন একটী

লম্বা রাস্তার অপর প্রান্ত হইতে কেহ তাঁহার সহিত কথা কহিতেছে। তৎপরে হয়ত ঐ আওয়াজ ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, অবশেষে উহা চীৎকারে পরিণত হইল। তিনি বলিতেন, "একথা ঠিক জেনো যে, পুরাকালে ঈশ্বরীয় বাণী (inspiration) বলতে লোকে যাই বুঝে থাকুক না কেন, তা নিশ্চয়ই এই রকমের একটা কিছু হবে।"

কিন্তু এইসকল ব্যাপারের মধ্যে তিনি কিছুই অতিপ্রাকৃত দেখিতে পাইতেন না। উহা মনেরই স্বতঃপ্রবৃত্ত কার্য্যমাত্র; মন যখন কতকগুলি চিন্তাবিধিকে এত উত্তমরূপে আয়ত্ত করিয়া লয় যে, উহাদিগের প্রয়োগবিষয়ে আর কাহারও সাহায্যের অপেক্ষা করে না, তখন উহা আপনা হইতেই ঐরূপ করিয়া থাকে। হিন্দুগণ যে অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া 'মনই গুরু হইয়া দাঁড়ায়' বলিয়া থাকেন, উহা হয়ত সেই অনুভূতিরই একটা চরম আকার। ইহা হইতে আরও আভাস পাওয়া যায় যে, তাঁহাতে চক্ষু ও কর্ণ— এই দুইটী শ্রেষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের প্রায় সমান বিকাশ লক্ষিত হইলেও, দর্শনেন্দ্রিয় অপেক্ষা শ্রবণেন্দ্রিয়েরই যেন ঈষৎ প্রাধান্য ছিল। তাঁহার জনৈক শিষ্য একবার তাঁহার সম্বন্ধে যেমন বলিয়াছিলেন, "তিনি তাঁর নিজ মনের অবস্থাগুলোকে ঠিক ঠিক ভাবে বর্ণনা করতে পারতেন।" কিন্তু এইসকল কণ্ঠস্বর স্বসংবেদ্য ব্যাপার ছাড়া আর কিছু, তাঁহার এরূপ অনুমান করিবার অনুমাত্র আশঙ্কা ছিল না।

আর একটী অনুভূতির কথা যাহা আমি তাঁহার মুখে শুনিয়াছি, তাহাতে মনের ঐরূপ স্বতঃপ্রবৃত্ত ক্রিয়াই প্রকাশ পায়, তবে হয়ত ততটা পরিপুষ্ট আকারে নহে। তিনি বলিয়াছিলেন যে,

যখনই কোন অপবিত্র চিন্তা বা আকৃতি তাঁহার সম্মুখে আসিয়াছে, তিনি তৎক্ষণাৎ অনুভব করিতেন, যেন ভিতর হইতে মনের উপর একটা ধাক্কা আসিয়া পড়িল—উহা তাঁহাকে যেন চূর্ণ-বিচূর্ণ, অসাড় করিয়া দিল! উহার অর্থ—"না, ওরকম হতে পারবে না।"

তিনি অপরের মধ্যে সেইসকল কার্য্য অতি সহজে করিতে পারিতেন, যেগুলি প্রথমটা মনে হয় যেন আপনা-আপনি হইয়াছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অতীন্দ্রিয় উপলব্ধিগত উচ্চতর জ্ঞানই যাহাদের নিয়ামক। যে জিনিসটী ঠিক, কেন তাহা কেহ বলিতে পারে না, অথচ যাহা সাধারণ বিধিনিষেধের চক্ষে দেখিলে ভুল বলিয়াই মনে হইবে, এরূপ স্থলে তিনি এক উচ্চতর শক্তির প্রেরণা দেখিতে পাইতেন। তাঁহার চক্ষে সকল অজ্ঞানতাই সমান অন্ধকারময় বলিয়া বোধ হইত না।

তাঁহার গুরুদেব ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে, তাঁহার কার্য্য শেষ হইলে স্বামিজী আবার তাঁহার নির্ব্বিকল্প সমাধিরূপ আমটী খাইতে পাইবেন; সে কথা তাঁহার বাল্যসঙ্গিগণ কদাপি বিস্মৃত হন নাই। কেহই জানিত না, কোন্ মুহূর্ত্তে ঐ কার্য্য সমাপ্ত হইবে, এবং তাঁহার চরম অনুভূতি যে আসন্ন, একথা কেহ কেহ সন্দেহও করিয়াছিলেন। জীবনের শেষবর্ষে তাঁহার কতিপয় বাল্যসঙ্গী একদিন সেইসকল অতীত দিবসের আলোচনা করিতেছিলেন, এবং ঐ প্রসঙ্গে "নরেন যখনই জানতে পারবে সে কে এবং কি, তখন তাঁর শরীর রাখবে না"—এই ভবিষ্যদ্বাণীরও কথা উঠিল। তখন তাঁহাদের মধ্যে একজন কতকটা হাস্যচ্ছলে তাঁহার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "স্বামিজী, তুমি কে ছিলে. এখন জানতে

পেরেছ কি ?" তখনই এই অপ্রত্যাশিত উত্তর হইল, "হাঁ, এখন জেনেছি।" অমনি সকলে ত্রস্ত হইয়া গম্ভীরভাব ধারণ করিলেন এবং চুপ করিয়া গেলেন। কেহ তাঁহাকে ঐ বিষয়ে আর কিছু জিজ্ঞাসা করিতে সাহসী হইল না।

যতই শেষদিন নিকটবর্ত্তী হইতেছিল, ততই ধ্যান ও তপস্যা তাঁহার অধিকাংশ সময় অধিকার করিয়াছিল। যে-সকল বস্তু তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় ছিল, তাহাও এখন আর তাঁহার চিত্তকে তেমন আকৃষ্ট করিতে পারিত না। অবশেষে শেষ মুহূর্ত্তে যখন তিনি মহাসমাধিতে মগ্ন হইয়াছিলেন, তখন যেন ঐ বিরাট অতীন্দ্রিয় শক্তির কিছু কিছু নিকটে ও দূরে যাঁহারা তাঁহাকে ভালবাসিতেন, তাঁহাদিগকেও স্পর্শ করিয়াছিল। একজন স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন, যেন শ্রীরামকৃষ্ণ সেই রজনীতে পুনরায় শরীরত্যাগ করিয়াছেন, এবং প্রত্যুষে জাগরিত হইয়া শুনিলেন, দ্বারে সংবাদবাহক তাঁহাকে ডাকিতেছেন। আর একজন (ইনি স্বামিজীর বাল্যের অন্তরঙ্গ বন্ধুগণের মধ্যে একজন) দেখিয়াছিলেন, যেন তিনি উল্লাসভরে নিকটে আসিয়া বলিতেছেন, "শশী, শশী, শরীরটাকে থু থু করে ফেলে দিয়েছি।" আরও একজনকে সেই সন্ধ্যাকালে কে যেন জোর করিয়া ধ্যানের ঘরে লইয়া গিয়াছিল ; তিনি তথায় দেখিয়াছিলেন, তাঁহার আত্মা যেন একটী অসীম জ্যোতির সামনে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে ; তিনি "শিব গুরু !" বলিয়া ঐ জ্যোতির সম্মুখে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়াছিলেন।

ষড়্বিংশ পরিচ্ছেদ

স্বামিজীর মহাসমাধি

১৯০০ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে স্বামিজী যে-সকল বন্ধুর সহিত মিশরে ভ্রমণ করিতেছিলেন, তাঁহাদের নিকট হইতে সহসা বিদায় লইয়া ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। যাঁহারা এই সময়ে তাঁহার সঙ্গে ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে একজন বলেন, "তাঁকে দেখে বোধ হত যেন তিনি খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন।" যখন তিনি কাইরোর নিকটবর্ত্তী পিরামিডসমূহ, নারীমুখবিশিষ্ট সিংহমূর্ত্তিটী (the Sphinx) এবং অন্যান্য বিখ্যাত দৃশ্যগুলি দেখিতেছিলেন, তখন বাস্তবিকই তিনি যেন জানিতে পারিয়াছিলেন যে তিনি অভিজ্ঞতারূপ গ্রন্থের শেষ পৃষ্ঠাগুলি উল্টাইতেছেন। ঐতিহাসিক স্মৃতিচিহ্নসমূহ আর তাঁহার হৃদয়তন্ত্রী স্পর্শ করিতে পারিত না।

অন্যদিকে আবার তিনি তদ্দেশবাসিগণকে সর্ব্বদা 'নেটিভ' নামে অভিহিত হইতে শুনিয়া এবং নিজেকে ঐ সময়ে তাহাদিগের পরিবর্ত্তে বরং বিদেশীয়দিগের সহিত একশ্রেণীভুক্ত হইতে দেখিয়া বড়ই মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন। বরং এই হিসাবে তিনি যেন মিসর অপেক্ষা কন্‌স্টান্টিনোপল দর্শন করিয়া অধিক প্রীত হইয়াছিলেন, কারণ, তাঁহার জীবনের শেষভাগে তিনি বার বার একজন বৃদ্ধ তুর্কীর কথা বলিতেন; সে ব্যক্তির তথায় একটী হোটেল ছিল,

এবং সে এই বিদেশী যাত্রিদলকে—যাহাদের মধ্যে একজন ভারত হইতে আগত—পয়সা না লইয়া খাওয়াইবার জন্য বিশেষ জেদ করিয়াছিল। সত্যসত্যই আধুনিক বিষয়বুদ্ধিবর্জ্জিত প্রাচ্যদেশীয়-দিগের নিকট সকল ভ্রমণকারীই তীর্থযাত্রী, এবং সকল তীর্থযাত্রীই অতিথি বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে।

পরবর্ত্তী শীতকালে তিনি ঢাকায় গমন করিলেন এবং অনেক দলবল লইয়া ব্রহ্মপুত্র নদ দিয়া আসামের একটী তীর্থে স্নান করিতে গেলেন। তাঁহার স্বাস্থ্য এই সময়ে কত দ্রুত ভগ্ন হইতেছিল, তাহা যাঁহারা তাঁহার খুব নিকটে থাকিতেন তাঁহারাই জানিতেন। আমরা দূরে ছিলাম বলিয়া কেহই সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ করি নাই। ১৯০১ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মকাল তিনি বেলুড়ে যাপন করিলেন— এবং 'বাল্যকালে বৃষ্টি পড়ার যেরূপ শব্দ শুনিতেন, সেই শব্দ পুনরায় শুনিবার জন্য আশা করিতে লাগিলেন।' আবার যখন শীত আসিল, তখন তিনি এত পীড়িত হইলেন যে, তাঁহাকে শয্যাগত হইতে হইল।

তথাপি ১৯০২ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী এই দুই মাস তিনি আরও একটী তীর্থযাত্রা করিয়া আসিলেন। এবার তিনি প্রথমে বুদ্ধগয়া এবং তৎপরে বারাণসী দর্শন করেন। তাঁহার সকল ভ্রমণের উহাই উপযুক্ত অবসান হইয়াছিল। তাঁহার শেষ জন্মদিনের প্রাতঃকালে তিনি বুদ্ধগয়ায় পৌঁছিলেন। তথাকার মোহন্তজীর আদরযত্নের কথা বলিয়া শেষ করা যায় না। এখানে এবং পরে কাশীতেও তিনি এত পরিমাণে এবং স্বাভাবিকভাবে নিষ্ঠাবান হিন্দুসম্প্রদায়ের প্রীতি ও বিশ্বাসভাজন হইলেন যে, তিনি

নিজেই লোকদের হৃদয় কতটা অধিকার করিয়া লইয়াছেন দেখিয়া বিস্মিত হইলেন।

এখন যেমন বুদ্ধগয়া তাঁহার শেষ তীর্থদর্শন হইল, তেমনি উহাই তিনি সর্ব্বপ্রথমে দর্শন করিয়াছিলেন। আর উহার কয়েক বৎসর পরে তিনি কাশীধামেই একজনের নিকট বিদায় লইবার কালে বলিয়াছিলেন, "যতদিন না আমি সমাজের ওপর বজ্রের মত পড়ছি, ততদিন আর এ স্থান দেখব না।"

স্বামিজীর কলিকাতায় প্রত্যাগমনের পর তাঁহার দূরদেশস্থিত বহু শিষ্য তাঁহার নিকট আসিয়া সমবেত হইলেন। যদিও তাঁহাকে পীড়িত দেখাইতেছিল, তথাপি ইঁহাদের মধ্যে কেহই সম্ভবতঃ বুঝিতে পারেন নাই যে, অন্তিম সময়ের আর অধিক বিলম্ব নাই। এখনও সাগরবক্ষে অর্দ্ধ পৃথিবী অতিক্রম করিয়া লোকে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতে লাগিল, এবং পরস্পরের মধ্যে বিদায়গ্রহণাদি চলিতে লাগিল। আশ্চর্য্যের বিষয়, কাশীধাম হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াই তাঁহার প্রথম কথোপকথন এই সম্বন্ধে হইল যে, যাঁহারা তাঁহার কাছে থাকেন, তাঁহাদিগকে স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে দিবার জন্য তাঁহার নিজের কিয়ৎকাল সরিয়া থাকা আবশ্যক।

তিনি বলিলেন, "কত দেখা যায় যে, মানুষ দিনরাত তার শিষ্যগণের কাছে থেকে তাদের মাটি করে ফেলে! একবার লোকগুলি তৈরি হয়ে যাবার পর এটা বিশেষ প্রয়োজন যে, তাদের নেতা তাদের কাছ থেকে দূরে থাকবেন, কারণ, তাঁর অনুপস্থিতি ছাড়া তারা নিজেদের বিকাশ সাধন করতে পারবে না।"

বিদেশীয়গণের সহিত যে সংস্পর্শ তাঁহার প্রৌঢ়দশায় অবিচ্ছেদে চলিয়া আসিয়াছিল, তাহারই সর্ব্ব শেষেরটীর ফলে তিনি সহসা ধর্ম্মে গার্হস্থ্যজীবনে নিষ্ঠার উচ্চাদর্শসমূহের কি প্রয়োজন, তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। সন্ন্যাসিগণ সর্ব্বোপরি শুধু কথা ও কার্য্যে নহে, আন্তরিকভাবে ও প্রাণপণে চিন্তাতেও, নিজেদের ব্রতগুলিকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে চেষ্টা করেন বলিয়া, সামাজিক জীবনের আদর্শসমূহ তাঁহাদের নিকট সচরাচর নিতান্ত অসার পদার্থের ন্যায় বোধ হইয়া থাকে। স্বামিজী সহসা দেখিলেন যে, যে জাতি বিবাহিত জীবনের সম্বন্ধকে পবিত্র জ্ঞান করে না, সে জাতির মধ্যে কখনও নিষ্ঠাবান যাযককুল বা উচ্চদরের সন্ন্যাসিসম্প্রদায় জন্মিবার আশা নাই।

যেখানে বিবাহবন্ধন সম্পূর্ণ অবিচ্ছেদ্য বলিয়া পরিগৃহীত হইয়া থাকে, কেবল সেইখানেই দাম্পত্য-জীবনেতর পথগুলিতেও লোকে নিষ্ঠার সহিত চলিতে পারে। সামাজিক আদর্শকে পবিত্র জ্ঞান করিলেই যাহা সমাজবন্ধনের ঊর্দ্ধে অবস্থিত, সেই সন্ন্যাসজীবনকে পবিত্র জ্ঞান করা সম্ভবপর হয়।

এই অনুভূতিই তৎপ্রচারিত দর্শনের শীর্ষবিন্দুস্বরূপ। ইহা হইতেই মহামায়ার খেলার শেষ দেখিতে পাওয়া যায়। সন্ন্যাস-জীবনকে সম্ভবপর করিবার জন্য সমগ্র সমাজ, তাহার উন্নতিচেষ্টা ও তদ্বিষয়ে সিদ্ধি—এ সকলের প্রয়োজন। সনাতন ধর্ম্মে নিষ্ঠাবান সাধুরও যেমন প্রয়োজন, নিষ্ঠাবান গৃহস্থেরও তেমনি প্রয়োজন। বিবাহবন্ধন অক্ষুণ্ণ রাখা এবং সন্ন্যাসব্রত অক্ষুণ্ণ রাখা—এ দুইটী একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। সমাজে উন্নতচরিত্র লোক না থাকিলে শক্তিশালী সন্ন্যাসিবৃন্দের উদ্ভব হইতে পারে না। গার্হস্থ্য ব্যতীত

সন্ন্যাসজীবন হয় না, ঐহিক ব্যতীত পারমার্থিক জীবন হয় না; সুতরাং দেখা যাইতেছে যে সবই এক, তথাপি ইচ্ছাপূর্ব্বক কাহারও এতটুকু অঙ্গহানি হইতে দিলে চলিবে না; কারণ, প্রত্যেক পরমাণুর মধ্য দিয়া সেই ভূমাই প্রকাশ পাইতেছেন। ইহা তাঁহারই পুরাতন বাণী একটী নূতন আকারে মাত্র। তিনি এবং তৎপূর্ব্বে তাঁহার আচার্য্যদেব যেমন পুনঃ পুনঃ বিশেষ করিয়া বলিয়া গিয়াছেন, ভাবাবেশ অপেক্ষা চরিত্র খাঁটী হওয়াই ভগবৎসেবার পক্ষে অধিক উপযোগী। যে জিনিসটাকে রাখিবার ক্ষমতা নাই, তাহার ত্যাগে কি বাহাদুরী?

তাঁহার সম্মুখে নানা কার্য্য সর্ব্বদাই আসিয়া পড়িত; সেই সকল কার্য্যের খাতিরে স্বামিজী ১৯০২ খৃষ্টাব্দের বসন্তকালে একবার তাঁহার স্বাস্থ্য শোধরাইয়া লইবার বিশেষ চেষ্টা করিলেন, এমন কি, তিনি কবিরাজী চিকিৎসা শুরু করাইলেন, যাহাতে এপ্রেল, মে ও জুন মাস ভোর তিনি এক বিন্দু ঠাণ্ডা জল পান করিতে পাইতেন না। ইহাতে তাঁহার শরীরের কতদূর উপকার হইয়াছিল বলা যায় না, কিন্তু ঐ কঠোর পরীক্ষার মধ্য দিয়া যাইবার সময় তিনি তাঁহার ইচ্ছাশক্তির বল অক্ষুণ্ণ আছে দেখিয়া যৎপরোনাস্তি প্রীত হইয়াছিলেন।

জুন মাস শেষ হইলে কিন্তু তিনি বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, তাঁহার অন্তিমকাল নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। দেহত্যাগের পূর্ব্ব বুধবারে তিনি সমীপস্থ একজনকে বলিয়াছিলেন, "আমি মৃত্যুর জন্য তৈয়ার হচ্ছি। একটা মহা তপস্যা ও ধ্যানের ভাব আমার মধ্যে জেগেছে এবং আমি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হচ্ছি।"

আর আমরা যদিও স্বপ্নেও ভাবি নাই যে, তিনি অন্ততঃ তিন-চারি বৎসরের পূর্ব্বে আমাদিগকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইবেন, তথাপি জানিলাম যে তাঁহার কথাগুলি সত্য। এই সময়ে জগতের খবরাখবর শুনিয়া তিনি নামমাত্র উত্তর প্রদান করিতেন। সাময়িক কোন সমস্যা সম্বন্ধে তাঁহার মতামত জিজ্ঞাসা করা এখন অনর্থক হইয়া পড়িল। তিনি শান্তভাবে বলিতেন, "তোমার কথা ঠিক হতে পারে, কিন্তু আমি আর এসব ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করতে পারি না। আমি মৃত্যুর দিকে চলেছি!"

একবার কাশ্মীরে একটী অসুখের পর আমি তাঁহাকে দুই খণ্ড পাথর উঠাইয়া লইয়া বলিতে শুনিয়াছিলাম, "যখনই মৃত্যু আমার কাছে আসে, আমার সব দুর্ব্বলতা চলে যায়। তখন আমার ভয় বা সন্দেহ বা বাহ্যজগতের চিন্তা—এসব কিছুই থাকে না। আমি শুধু নিজেকে মৃত্যুর জন্য তৈয়ার করতে থাকি। তখন আমি এই রকম শক্ত হয়ে যাই—" তিনি দুই হাতে পাথর দুইখানিকে পরস্পর ঠুকিলেন—"কারণ আমি শ্রীভগবানের পাদপদ্ম স্পর্শ করেছি।"

নিজের জীবনের ঘটনাসমূহ তিনি এত কম উল্লেখ করিতেন যে, কথাগুলি আমরা কদাপি বিস্মৃত হই নাই। আবার সেই ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালেই তিনি অমরনাথ গুহা হইতে ফিরিয়া আসিয়া হাসিতে হাসিতে বলিয়াছিলেন যে, তিনি তথায় অমরনাথের নিকট ইচ্ছামৃত্যুবর লাভ করিয়াছেন। ইহাতে যেন এই কথাই নিশ্চয় বলিয়া জানা গিয়াছিল যে, তাঁহাকে সহসা মৃত্যু আক্রমণ করিবে না, এবং ইহার সহিত শ্রীরামকৃষ্ণের "ও নিজেকে জানতে পারলে আর এক মুহূর্ত্তও দেহ রাখবে না" এই ভবিষ্যদ্বাণীর এত চমৎকার

ঐক্য ছিল যে, আমরা এ সম্বন্ধে সকল চিন্তা এককালে দূর করিয়া দিয়াছিলাম। এমন কি, তাঁহার এই সময়ের নিজ মুখের গম্ভীর বহ্বর্থ বাক্যগুলিও ঐ কথা মনে পড়াইয়া দিতে পারিল না।

এতদ্ভিন্ন, তাঁহার যৌবনের সেই অদ্ভুত নির্ব্বিকল্প সমাধিলাভের কথাও আমাদের মনে ছিল। আমরা ইহাও জানিতাম যে, উক্ত সমাধি-অন্তে তাঁহার আচার্য্যদেব তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "এই তোমার আম। আমি এটা বাক্সে চাবি দিয়ে রাখলাম। তোমার কাজ শেষ হলে আবার তুমি এটা খেতে পাবে।"

যে সাধু আমাকে এই গল্পটী বলিয়াছিলেন, তিনি ঐসঙ্গে আরও বলিয়াছিলেন, "আমরা এখন নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকতে পারি। ঐ সময় এগিয়ে এলে আমরা নিশ্চিত জানতে পারব। কারণ, তিনি আমাদের বলবেন যে, তিনি আবার তাঁর আম খেতে পেয়েছেন।"

ঐ সময়ের কথা স্মরণ করিলে এখন এই ভাবিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হই যে, কত রকমে ঐ প্রত্যাশিত ইঙ্গিত আমরা পাইয়াছিলাম। কিন্তু তখন আমরা শুনিয়াও শুনি নাই, বুঝিয়াও বুঝিতে পারি নাই।

তিনি সর্ব্ববিধ দুর্ব্বলতা ও আসক্তিকে দূরে পরিহার করিলেও যেন একটী বিষয়ে আমরা তাঁহার ব্যতিক্রম লক্ষ্য করিয়াছিলাম। যাহা চিরকাল তাঁহার নিকট প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তর ছিল, সেই জিনিসটী এখনও তাঁহার হৃদয়তন্ত্রীসকল স্পর্শ করিতে পারিত। দেহান্তের অব্যবহিত পূর্ব্ব রবিবারে তিনি জনৈক শিষ্যকে বলিলেন, "দেখ, এসব কাজই চিরকাল আমার দুর্ব্বলতার স্থল! যখন আমি

ভাবি যে, ওসব নষ্ট হয়ে যাবে, তখন আমি একেবারে হতাশ হয়ে পড়ি!"

ঐ সপ্তাহেরই বুধবারে—সেদিন একাদশী—তিনি নিরম্বু উপবাস করিলেন, এবং পূর্ব্বোক্ত শিষ্যকে নিজহাতে প্রাতঃকালীন আহারীয় দ্রব্যসকল পরিবেশন করিবার জন্ত জেদ করিতে লাগিলেন। প্রত্যেক জিনিসটী—কাঁটালের বিচিসিদ্ধ, আলুসিদ্ধ, সাদা ভাত এবং বরফ দিয়া ঠাণ্ডা করা দুধ—দিবার সময় তৎসম্বন্ধে কৌতুক সহকারে গল্প করিতে লাগিলেন। সর্ব্বশেষে ভোজন সমাপ্ত হইলে তিনি নিজে হাতে জল ঢালিয়া দিলেন এবং তোয়ালে দিয়া হাত মুছাইয়া দিলেন।

স্বভাবতঃই শিষ্য প্রতিবাদ করিয়া বলিতেছিলেন, "স্বামিজী, এ সব আমারই আপনার জন্ত করা উচিত, আপনার আমার জন্ত নয়!" কিন্তু তাঁহার উত্তর অতি বিস্ময়জনক গাম্ভীর্য্যপূর্ণ হইল— "ঈশা তাঁর শিষ্যগণের পা ধুইয়ে দিয়েছিলেন!"

তদুত্তরে শিষ্যের মুখে আসিতেছিল, 'কিন্তু সে ত শেষ সময়ে!' কিসে যেন কথাগুলিকে আটকাইয়া দিল—তাহা আর বলা হইল না। ভালই হইয়াছিল। কারণ এখানেও শেষ সময় সমাগত হইয়াছিল।

এই কয়দিন স্বামিজীর কথাবার্ত্তা ও চালচলনে কোন বিষাদ-গম্ভীর ভাব ছিল না। পাছে তিনি অতিরিক্ত ক্লান্তি বোধ করেন, তজ্জন্ত আমরা বিশেষ চিন্তান্বিত থাকিতাম, এবং কথাবার্ত্তা ইচ্ছাপূর্ব্বক অতি লঘু বিষয়সকলেই নিবদ্ধ রাখা হইত। তাঁহার পালিত পশুগণ, তাঁহার বাগান, নানাবিধ পরীক্ষা (experiments), পুস্তক এবং দূরস্থিত বন্ধুবর্গ—এইসকলেরই প্রসঙ্গ হইত। কিন্তু এসকল

সত্ত্বেও আমরা ঐ সময়ে একটী জ্যোতির্ম্ময় সত্তা অনুভব করিতাম—তাঁহার স্থূল দেহ যেন উহারই ছায়া বা প্রতীক মাত্র বলিয়া বোধ হইত। তথাপি কেহই অত শীঘ্র সব শেষ হইয়া যাইবে, এ কথা বুঝিতে পারেন নাই—বিশেষতঃ সেই ৪ঠা জুলাই, শুক্রবারে—কারণ সে দিন তাঁহাকে বহু বৎসর যাবৎ তিনি যেমন ছিলেন, তদপেক্ষা অধিক সুস্থ ও সবল দেখা গিয়াছিল, এবং তজ্জন্য ঐ দিনটীকে বড় শুভ দিন বলিয়াই মনে হইয়াছিল।

ঐ দিন তিনি অনেক ঘণ্টাকাল রীতিমত ধ্যান করিয়াছিলেন। তৎপরে অনেকক্ষণ ধরিয়া একটী সংস্কৃত ক্লাস করিয়াছিলেন। শেষে মঠের ফটক হইতে দূরবর্ত্তী বড় রাস্তা পর্য্যন্ত বেড়াইয়াও আসিয়াছিলেন।

যখন তিনি বেড়াইয়া ফিরিয়া আসিলেন, তখন সন্ধ্যারতির কাঁসরঘণ্টা বাজিতেছে। তিনি নিজের ঘরে গিয়া গঙ্গার দিকে মুখ ফিরিয়া ধ্যান করিতে বসিলেন। ইহাই শেষ ধ্যান। তাঁহার আচার্য্যদেব প্রথম হইতেই যে মুহূর্ত্তের কথা ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, সেই মুহূর্ত্ত এখন উপস্থিত হইয়াছিল। আধ ঘণ্টা কাটিয়া গেল; তৎপরে সেই ধ্যানরূপ পক্ষে ভর করিয়া তাঁহার আত্মা দেশকালের সীমা ছাড়াইয়া, যথা হইতে আর পুনরাবৃত্তি হয় না, সেই পরম ধামে চলিয়া গেল; শরীরটা ভাঁজ করা পোশাকের মত পৃথিবীতেই পড়িয়া রহিল।

উপসংহার

১৯০২ খৃষ্টাব্দে বড়দিনের অব্যবহিত পূর্ব্বে স্বামী বিবেকানন্দের কতিপয় শিষ্য ঐ উৎসব করিবার জন্য কটকের সন্নিকটস্থ খণ্ডগিরিতে সমবেত হইয়াছিলেন। সন্ধ্যাকাল, আমরা একখানা জ্বলন্ত মোটা কাঠের চারিধারে ঘাসের উপর বসিয়াছিলাম। আমাদের একপার্শ্বে গুহা ও ক্ষোদিত প্রস্তরবিশিষ্ট পাহাড়গুলি উঠিয়াছে, আর চারিধারের সুপ্ত অরণ্যানী মারুত-হিল্লোলে অস্পষ্ট শব্দ করিতেছে। পূর্ব্বে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে খৃষ্ট-জন্মদিনের পূর্ব্ববর্ত্তী নিশা যেরূপে যাপিত হইত, আমরাও সেইরূপে উহা যাপন করিব স্থির করিয়াছিলাম। সাধুদিগের মধ্যে একজনের হাতে একগাছি লম্বা বাঁকানমাথা মেষ তাড়াইবার মত ছড়ি ছিল, এবং আমাদের সঙ্গে একখানি সেণ্ট লিউক-প্রণীত ঈশা-জীবনী ছিল—তাহা হইতে দেবদূতগণের আবির্ভাব এবং পাশ্চাত্ত্য জগতে প্রথম স্তুতিগান* পাঠ ও মনে মনে কল্পনা করিতে হইবে।

কিন্তু আমরা গল্পটী পড়িতে পড়িতে মাতিয়া গেলাম; খৃষ্টজন্মের পূর্ব্বরজনীর বর্ণনাতেই পাঠ শেষ হইল না; আপনা হইতেই একের পর একটী করিয়া ঘটনা পড়া হইয়া যাইতে লাগিল। এইরূপে

* "ঈশ্বরের নাম সর্ব্বতোভাবে জয়যুক্ত হউক, এবং পৃথিবীতে মানবগণের মধ্যে শান্তি ও সদ্ভাব বিরাজ করুক!"—দেবদূতগণের গীতি

সেই অদ্ভুত জীবনের সমগ্র অংশই আলোচিত হইল, তৎপরে মৃত্যু এবং সর্ব্বশেষে পুনরুত্থান। আমরা গ্রন্থের চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়ে আসিলাম, এবং এক একটী করিয়া ঘটনা পড়া হইতে লাগিল।

কিন্তু গল্পটী আমাদের কানে এমন শুনাইতে লাগিল, যাহা পূর্ব্বে আর কখনও হয় নাই। যাহার বিভিন্ন অংশের প্রাঞ্জলতা ও পূর্ব্বাপর সঙ্গতি দৃষ্টে তাহার সত্যাসত্যতা বিচার করা হইবে, এমন একটা সনতারিখযুক্ত এবং সাক্ষী দ্বারা প্রমাণিত আইনসঙ্গত দলিলের পরিবর্ত্তে, উহা এখন একব্যক্তি যে ইন্দ্রিয়ের অগোচর একটী ব্যাপারের কথা লিপিবদ্ধ করিতে প্রয়াস পাইতেছে, তাহার হাঁপাইতে হাঁপাইতে অর্দ্ধোচ্চারিত ভাষায় প্রদত্ত সাক্ষ্যের ন্যায় শুনাইতে লাগিল। পুনরুত্থানের বর্ণনাটী আর আমাদের নিকট কোন একটী ঘটনার বিবরণের ন্যায় ত্যাজ্য বা গ্রাহ্য বলিয়া বোধ হইল না। উহা চিরকালের জন্য একটী আধ্যাত্মিক অনুভূতির বর্ণনারূপে স্থান লাভ করিল—যাঁহার ঐ অনুভব হইয়াছিল, তিনি উহাকে ভাষায় নিবদ্ধ করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু সকল স্থলে সফলকাম হন নাই, এইমাত্র। সমগ্র অধ্যায়টী অসম্পূর্ণ এবং আঁচে ইশারায় বলা, এইরূপ বোধ হইতে লাগিল—যেন এক ব্যক্তি আগ্রহের সহিত শুধু পাঠকের নয়, কতকটা স্বয়ং লেখকেরও বিশ্বাস উৎপাদন করিবার চেষ্টা করিতেছে।

কারণ, আমরাও কি ঐরূপ এক পুনরাগমনের কিছু কিছু আভাস প্রাপ্ত হই নাই—যাহা পূর্ব্বোক্ত ইতিহাসের সহিত মিলাইয়া দেখা যাইতে পারে? আমাদের আচার্য্যদেব স্বয়ং যাহা স্পষ্ট ভাষায় এবং জানিয়া শুনিয়া বলিয়াছিলেন, তাহা সহসা আমাদের মনে

পড়িল, এবং তাহার অর্থও তখনি বুঝিতে পারিলাম—"জীবনে আমি অনেকবার পরলোকগত আত্মাসকলকে পুনরায় এ জগতে আসিতে দেখিয়াছি ; এবং একবার যে জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তির দর্শন করিলাম, তাহা শ্রীরামকৃষ্ণের মহাসমাধির পরসপ্তাহে !"

আমরা প্রত্যক্ষভাবে শুধু শিষ্যগণের স্ব-স্বরূপ-প্রাপ্ত প্রভুকে (ঈশাকে) আর একবার দেখিবার আকাঙ্ক্ষাই অনুভব করিলাম না, সেই অবতারপুরুষের স্বীয় বিরহকাতর শিষ্যগণকে সান্ত্বনা দিবার ও আশীর্ব্বাদ করিবার জন্য পুনরাগমনের বহুগুণে প্রগাঢ়তর কামনারও চাক্ষুষ পরিচয় পাইলাম।

বাইবেলে লিখিত আছে—"পথিপার্শ্বে তিনি যতক্ষণ আমাদের সহিত কথা কহিতেছিলেন, ততক্ষণ আমরা প্রাণের ভিতরে একটা উৎকট আনন্দ অনুভব করিতেছিলাম।" আমাদের আচার্য্যদেবের দেহত্যাগের অব্যবহিত পরবর্ত্তী কয়েক সপ্তাহে আমরাও কি ঐরূপ ক্ষণিক অপূর্ব্ব অনুভূতির অজস্র প্রমাণ পাই নাই?—তখন ত আমরা প্রায় বিশ্বাসই করিয়াছিলাম যে, তিনি সত্যসত্যই আমাদের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়াছেন।

বাইবেলে আরও বর্ণিত আছে—"রুটি-প্রসাদ ভাগ করিয়া দিবার সময় তাহারা তাঁহাকে দেখিতে পাইয়াছিলেন।"—ঠিক কথা। কখনও একটু আভাস, কখনও একটা কথা, কখনও একটা মুহূর্ত্তমাত্র স্থায়ী মধুর অনুভূতি, অথবা সহসা মনের ভিতরে জ্ঞানালোকের স্পষ্ট প্রকাশ—আমাদের ঐ প্রথম কয়েক সপ্তাহে এই সকলের কোন একটী নানা সময়ে উপস্থিত হইবামাত্র অমনি হৃৎপিণ্ড নাচিয়া উঠিত ; মনে হইত, ঐ বুঝি তিনি রহিয়াছেন,

এবং তীব্র আকাঙ্ক্ষাপ্রসূত সংশয় ও নিশ্চয়, এ দুয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব বাধিয়া যাইত।

সে রাত্রিতে খণ্ডগিরিতে আমরা পুনরুত্থানের বর্ণনার সেই অংশগুলি ছাড়িয়া দিয়া গেলাম, যেগুলি বোধ হয় যেন অপরাপর ব্যক্তি গল্পটীকে অবিকল অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়া পরে জুড়িয়া দিয়াছিলেন। এই পুরাতনের উপর নূতন চুনকাম-করা বিবরণের প্রাচীনতর অংশটুকুর বিষয়েই আমরা নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিতেছিলাম—সেই সাদাসিধা প্রাচীন বিবরণ, যাহাতে পুনঃ পুনঃ চকিতের ন্যায় প্রভুর দর্শন ও অদর্শনজনিত হর্ষবিষাদের করুণ ছবি রহিয়াছে; যাহাতে দেখিতে পাই, কতবার একাদশ শিষ্য একত্র হইয়া চুপে চুপে আপনাদের মধ্যে "দেখ দেখ, সত্যই প্রভু পুনরুত্থিত হইয়াছেন" এইরূপ বলাবলি করিতেছেন এবং পরিশেষে সকলে তাঁহার নিকট আশীর্ব্বাদলাভান্তে পরস্পরের নিকট বিদায় গ্রহণ করিতেছেন।

পড়িতে পড়িতে আমাদের মনে হইতে লাগিল যে, ঐ প্রাচীনতর কাহিনীতে আদৌ ঈশার স্থূলদেহের পুনরাবির্ভাবের কথা বলা হয় নাই; বলা হইয়াছে শুধু সহসা এবং অপ্রত্যাশিতভাবে প্রভু ও শিষ্যগণের ইচ্ছাশক্তির সম্মিলন, জ্ঞান ও প্রেমের বিবৃদ্ধি, প্রার্থনাকালে ক্ষণিক তন্ময়তাপ্রাপ্তি, এই সকল ব্যাপার। প্রভু তখন জ্যোতির্ম্ময় স্ব-স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছেন, এবং অতি অন্তরতম সূক্ষ্ম এক আকাশে বিরাজ করিতেছেন; আমরা ইন্দ্রিয়ের রাজ্যে বদ্ধ থাকায় সে ভূমির কথা ধারণাই করিতে পারি না।

আবার সেগুলি এত স্থূল ব্যাপার ছিল না যে, সকলে সমভাবে

এই অর্দ্ধশ্রুত, অর্দ্ধদৃষ্ট ক্ষণিক আভাসগুলি ধরিতে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। যাঁহারা স্থূলদৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন, তাঁহারা উহাদিগকে মোটেই ধরিতে পারেন নাই। এমন কি, যাঁহারা অতি সূক্ষ্মদৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন, তাঁহাদের নিকটেও ঐগুলি সন্দেহস্থল ছিল, যাহার সম্বন্ধে আগ্রহ সহকারে আলোচনা করিতে হয়, এবং সমস্ত অংশগুলি একত্র করিয়া যাহা বুঝিতে ও সযত্নে হৃদয়ে ধারণ করিতে হয়। খৃষ্টের অতি অন্তরঙ্গ এবং সর্ব্বজনগ্রাহ্য শিষ্যগণের মধ্যেও কেহ কেহ হয়ত উহা আদৌ বিশ্বাস করেন নাই। তথাপি সেই রাত্রে খণ্ডগিরির সেই সকল গুহা ও অরণ্যানীর মধ্যে বসিয়া খৃষ্টানদিগের এই পুনরুত্থান-কাহিনী পড়িতে পড়িতে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস হইল যে, ইহার মধ্য দিয়া একটী সত্য সূত্রের আভাস পাওয়া যাইতেছে ; বিশ্বাস হইল যে, কোথাও কোন এক সময়ে একজন মানব সত্যসত্যই এই ক্ষণিক উপলব্ধিটী করিয়া তাহার যে স্মৃতিচিহ্ন রাখিয়া গিয়াছেন, আমরা তাহাই অনুধাবন করিতে চেষ্টা করিতেছি। এইরূপই আমরা বিশ্বাস করিলাম, এইরূপই অনুভব করিলাম, কারণ, অতীব ক্ষণস্থায়ী হইলেও ঐরূপ একটী অনুভূতি ঐরূপই এক সময়ে আমাদেরও হইয়াছিল।

ঈশ্বর করুন যেন আমাদের আচার্য্যদেবের এই জীবন্ত সত্তা, স্বয়ং মৃত্যুও আমাদিগকে যাহা হইতে বঞ্চিত করিতে পারে নাই, তাহা যেন তাঁহার শিষ্য আমাদের নিকট শুধু একটা স্মরণীয় বস্তু না হইয়া চিরকাল জলন্ত-জাগ্রতভাবে সর্ব্বদা আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকে।